বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ

শ্রীসুকুমার সেন, এম্‌-এ., পি-এইচ্‌-ডি., এফ-এ-এস্‌
ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের খয়রা অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশক শ্রীপাঁচুগোপাল রায়, এম্‌-এ., বি.-টি.
বর্দ্ধমান সাহিত্য-সভা সম্পাদক

প্রথম মুদ্রণ ১৩৫০
দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৫৬
তৃতীয় সংস্করণ ১৩৬২

মূল্য দশ টাকা

মুদ্রাকর শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি.-এ.
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬

"যাহা বই গুরু বস্তু নাহি সুনিশ্চিত,
তথাপি গুরুর ধর্ম্ম গৌরব-বর্জ্জিত"

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
পূজ্যবরেষু

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডে বহু অজ্ঞাত ও বিস্মৃত রচনার প্রতি সাহিত্যকৌতূহলীর দৃষ্টি-আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছি। সমসাময়িক সমালোচনার নির্ম্মম সম্মার্জনী যে-সকল রচনাকে সাহিত্যের সভাপ্রাঙ্গণ হইতে বহুদিন পূর্ব্বে ঝাঁটাইয়া ফেলিয়াছিল এতদিন পরে সেগুলিকে কুড়াইয়া আনিবার প্রচেষ্টার সার্থকতায় প্রশ্ন উঠিতে পারে। এবিষয়ে লেখকের কিছু বক্তব্য আছে। প্রথমত, যে রচনা যে-ভাবে হউক যে-কোন শ্রেণীর পাঠকের ক্ষণকালের জন্যও মনোরঞ্জন করিয়াছিল সেগুলি বর্ত্তমানের হাটে অচল হইলেও অতীতের আলোচনা প্রসঙ্গে মূল্যহীন নয়। দ্বিতীয়ত, পরবর্ত্তী কালের অনেক মূল্যবান্ সাহিত্যসৃষ্টির জড় এই অবজ্ঞাত বিস্মৃতপ্রায় রচনাগুলির মধ্যে নিহিত আছে। তৃতীয়ত, সাহিত্যরসেরও স্বাদপ্রভেদ আছে। কিশোর রবীন্দ্রনাথের অধ্যাপক হেন্‌রি মর্লির কথায়,

> The true love of Literature does not walk only on the mountain tops, it leads us also to the copse and meadow on the lower slopes, and gives us rest upon the moss beside the small rills of the valley. Wherever the voice is true, if there be but a little touch of the divine gift that makes man look below the outward shows with sympathetic insight, and give poetic form to the life common to us all, the right reader has a ready ear, and passes easily through accidental fault to the essential life with which he communes.

এই তৃতীয় সংস্করণে কোন কোন অংশ পরিবর্দ্ধিত এবং কয়েকটি পরিচ্ছেদের নাম পরিবর্ত্তিত হইল। কয়েকটি অপরিজ্ঞাত রচনার পূর্ণতর পরিচয়ও দেওয়া গেল॥

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী।

উপক্রম।

১

যথা বিধি বন্দি কবি আনন্দে আসরে
কহে, জোড় করি কর, গৌড় সুভাজনে;—
সেই আমি ডুবি পূর্ব্বে ভারত-সাগরে
তুলিল যে তিলোত্তমা মুকুতা যৌবনে;
কবি এক বাল্মীকির প্রসাদে তৎপরে
গম্ভীরে বাজায়ে বীণা, গাইল কেমনে
নাশিলা সুমিত্রা-পুত্র, লঙ্কার সমরে
দেবদৈত্যনরাতঙ্ক— রক্ষেন্দ্র-নন্দনে.
কল্পনা দূতীর সাথে ভ্রমি ব্রজ-ধামে,
শুনিল যে গোপিনীর হাহাকার ধ্বনি
(বিরহে বিহ্বলা বালা হারা হয়ে শ্যামে);
বিরহ-লেখন পরে লিখিল লেখনী
যার, বীর জায়া-পক্ষে বীর পতি গ্রামে;
সেই আমি, শুন যত গৌড়-চূড়ামণি।—

ইতালী, বিখ্যাত দেশ, কাব্যের কানন,
বহুবিধ পিক যথা গায় মধুস্বরে,
সঙ্গীত-সুধার রস করি বরিষণ,
বাসন্ত আমোদে মন পূরি নিরন্তরে ;—
সে দেশে জনম পূর্ব্বে করিলা গ্রহণ
ফ্রাঁসিস্কো পেত্রার্কা কবি ; বাকদেবীর বরে
বড়ই যশস্বী সাধু কবি-কুলধন,
রসনা অমৃতে সিক্ত, স্বর্ণ বীণা করে।
কাব্যের খনিতে পেয়ে এই ক্ষুদ্র মণি,
স্বমন্দিরে প্রদানিলা বাণীর চরণে
কবীন্দ্র : প্রসন্নভাবে গ্রহিলা জননী
মনোনীত বর দিয়া। ~~[illegible]~~ এ উপকরণে
ভারতে ভারতী-পদ উপযুক্ত গণি,
উপহাররূপে আজি অরপি রতনে ॥

ফরাসীস দেশস্থ ভরশেল নগরে।
১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভূমিকা

১

আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনার ভূমিকারূপে বাঙ্গালা সাহিত্যের ধারাপরিবর্ত্তন ও যুগান্তরের সম্বন্ধে দুই-চারি কথা বলা আবশ্যক। ইংরেজি সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিয়া বাঙ্গালী তাহার সাহিত্যের অপূর্ণতার প্রতি সচেতন হইতে থাকে। ইহার প্রথম ফল ফলিল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, গদ্য-পাঠ্যপুস্তকপ্রবর্ত্তনে এবং সাময়িকপত্রিকার প্রতিষ্ঠায়। সাহিত্যে আধুনিকতার পথ পরিষ্কৃত হইতে লাগিল ইংরেজি শিক্ষা ও তজ্জনিত নব মানসিকতার সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে। রঙ্গলাল-মধুসূদন-ভূদেব-বঙ্কিমের রচনাকে সম্ভাবিত করিয়াছিল ইংরেজি-শিক্ষা। ইংরেজি-সাহিত্যের রস গ্রহণ করিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালীর চিত্তে যে আত্মসম্মান দেশপ্রীতি ও বিস্ফারবোধ জাগ্রত হইল তাহাই আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রেরণার মূলে। এই নব প্রচেষ্টার রূপে যে বিদেশি-অনুচিকীর্ষা দেখা যায় তাহা লজ্জার কথা নয়, কিন্তু শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনে বিদেশি সাহিত্যের আস্বাদজনিত যে নূতনতর রসানুভূতি প্রবল হইয়াছিল তাহাই গৌরবের।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য ছিল মোটামুটি ধর্ম্ম-ঘটিত ও আধিদৈবিক। এই সাহিত্যের বিষয় ছিল দেবতার অনুগ্রহ-নিগ্রহ-কাহিনীর মধ্য দিয়া গল্পরসের যোগান দেওয়া এবং সনাতন পৌরাণিক গার্হস্থ্যধর্ম্মনিষ্ঠ জীবনের আদর্শ-খ্যাপন। এই গতানুগতিকতা ভঙ্গ হইল ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণব গীতিকবিতার অনুশীলনে এবং চৈতন্যচরিত কাব্যের প্রবর্ত্তনে। এ কাব্যের বিষয় দেবদেবী নয়, সমসাময়িক এক মানুষ। শ্রীচৈতন্য শুধু "বাহু তুলি হরি বলি প্রেমদৃষ্ট্যে" চাহিয়া বাঙ্গালী জাতিকে "আপনাপন বাঁশবাগানের পার্শ্বস্থ ভদ্রাসনবাটির মনসাসিজের বেড়া ডিঙ্গাইয়া পৃথিবীর মাঝখানে আসিতে" ডাক দিয়াছিলেন। পূর্ব্ব হইতেই রাধাকৃষ্ণ-পদাবলীতে দেবসচেতনতার ফাঁকে ফাঁকে আত্ম-সচেতনতার আভাস জাগিতেছিল। এখন বৈষ্ণব-গীতিকবিতা মর্ত্যমানবের

বিরহমিলনের হাসিকান্নাকে বিমানে চড়াইয়া বৈকুণ্ঠের পথে পাঠাইয়া দিল। কীর্তনের সুরে ফুকরিয়া উঠিল দেহপাশবদ্ধ বিরহী মানবাত্মার ব্যাকুল বেদনা —"অশ্রুজলে ভাসাইয়া সমস্ত একাকার করিবার জন্য ক্রন্দনধ্বনি। বিজন কক্ষে বসিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া একটিমাত্র বিরহিণীর বৈঠকী কান্না নয়, প্রেমে আকুল হইয়া নীলাকাশের তলে দাঁড়াইয়া সমস্ত বিশ্বজগতের ক্রন্দনধ্বনি।"

বৈষ্ণব-গীতিকবিরা যাহা রসদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, দেহব্রহ্মাণ্ডের সহজ-ধর্ম্মের সাধক-সিদ্ধাচার্য্যগণ পূর্ব্বে তাহা তত্ত্ববোধে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব গীতিকবির ধ্যানমন্ত্র—"কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাঁহার স্বরূপ।" আর সহজসাধকের তত্ত্বকথা—"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" বৈষ্ণব-কবি দেবতাকে হৃদয়কুটীরে তৃণাসনে আহ্বান করিয়াছেন, বাউল-কবি প্রিয়কে দেবতার সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছেন। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব-কবির অকৃত্রিম হৃদয়োচ্ছ্বাস অনুকরণের আবর্ত্তে পড়িয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। সহজ-কবির কথা কোনদিনই ভদ্রসমাজ শোনে নাই। সুতরাং যে ধারার অনুসরণে আধুনিকতার আবির্ভাব অনেক আগে এবং স্বাভাবিকভাবে হইতে পারিত সে পথ শিক্ষিত বাঙ্গালীর কোনদিনই গোচর হয় নাই।

ইংরেজি শিক্ষার ফলে সহরবাসী ভদ্র বাঙ্গালীর যে মানসিক পরিবর্ত্তন শুরু হইল তাহাতে প্রথমে জাগিল প্রতিক্রিয়া, আত্মরক্ষার চেষ্টা, যাহা মুখ্যভাবে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ব্যঙ্গ-কবিতায় বিজাতীয় আচারব্যবহারের প্রতি তীব্র কটাক্ষে প্রকাশিত। কিন্তু ইহাতে সংস্কারপ্রচেষ্টা বাধাগ্রস্ত হইল না। দেখা দিল সমাজ-চেতনা। ইহার প্রথম পরিচয় পাই সাহিত্যের দুই বিভিন্ন রূপে—পাঠ্যপুস্তকে এবং বিবিধ সামাজিক নাট্যরচনায়।

দ্বিতীয় লক্ষণ ব্যক্তি-চেতনা দেখা দিল সর্ব্বপ্রথম মাইকেলের কাব্যে। তাঁহার অগ্রগামীদের রচনায় পাত্রপাত্রীর ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য ছিল না, তাহারা ছিল সামাজিক মানুষের বিশেষ বিশেষ টাইপ। মধুসূদনের কাব্যের প্রধান ভূমিকাগুলি টাইপ নয়, ব্যক্তি। তাই মেঘনাদবধে রামের তুলনায় রাবণ মহৎ, এবং দশরথের মাপে কেকয়ী বড়। চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর কোন কোনটিতে ব্যক্তি-চেতনার সঙ্গে আত্ম-চেতনাও আভাসিত হইয়াছে।

তৃতীয় লক্ষণ, আধুনিক গীতিকাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য, আত্মকেন্দ্রিকতা

প্রথমে দেখা দিল বিহারীলালের রচনায়। তবে বিহারীলালের কাব্যে আত্ম-কেন্দ্রিকতা আত্মসর্বস্বতার জালে বদ্ধ হইয়া দিশাহারা।

চতুর্থ লক্ষণ আত্ম-প্রসার—বর্ত্তমান আলোচনার বাহিরে পড়ে। রবীন্দ্র-নাথের অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়াবহ কাব্যসৃষ্টিতে কবির ভাবনা আত্মকেন্দ্রিকতা ছাপাইয়া রূপরসের বিশ্বে সম্প্রসারিত হইয়া দ্যুলোক-ভূলোককে আত্মসাৎ করিয়াছে, প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের একতারে সুর গাঁথা হইয়াছে॥

২

ঊনবিংশ শতকের আগে বাঙ্গালা গদ্যের ব্যবহার ছিল পত্রদলিলে আর শিক্ষার প্রয়োজনে। শিক্ষার প্রয়োজনে অর্থাৎ ধর্ম্মতত্ত্বব্যাখ্যান-প্রশ্নোত্তরমালায় এবং আয়ুর্ব্বেদ জ্যোতিষ স্মৃতি ন্যায় ও কথকতা শিক্ষার্থীর সংক্ষিপ্ত কড়চা বইয়ে।[১] ধর্ম্মতত্ত্বব্যাখ্যান-প্রশ্নোত্তরমালার চলন ছিল পূর্ব্ব হইতেই নাথ-যোগীদের মধ্যে। ষোড়শ শতকের শেষার্দ্ধ হইতে বৈষ্ণব-বৈরাগীদের মধ্যেও ইহা চলিত হয়। নাথ-যোগী ও বৈষ্ণব-বৈরাগী দুই দলের কড়চাতেই ছড়ার আধিক্য, কর্ত্তা-কর্ম্ম-ক্রিয়াযুক্ত সম্পূর্ণ গদ্যরীতির বাক্যের ব্যবহার খুব কম। ষোড়শ শতকের একেবারে শেষ হইতে পোর্তুগীস পাদ্রীরাও নিজেদের ধর্ম্ম এদেশে তাঁহাদের দাস ও অনুগত ব্যক্তিদের শিক্ষার জন্য প্রশ্নোত্তরময় কড়চা বই লিখিতে থাকেন। এই ধরণের বই প্রথম লেখা হইয়াছিল ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। এ কথা জানি এক সমসাময়িক চিঠি হইতে। জানুয়ারি ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীপুর হইতে ফ্রান্সিস্কো ফের্নান্দেজ (মৃত্যু ১৬০২) উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষকে এই কথা লিখিয়াছিলেন একটি চিঠিতে[২]

> ছেলেরা শোভাযাত্রা করিয়া গান গাহিতে গাহিতে আমাদের স্বাগত করিতে আসিল। তাহারা সনির্বন্ধে বলিল, আমাদের শিক্ষা দাও ধর্ম উপদেশ দাও। শিক্ষকের অভাবে তাহাদের কাল বৃথা কাটিতেছিল। তাহাদের প্রার্থনায় আমরা বিচলিত হইলাম, কিন্তু আমাদের অবসর না থাকায় আমরা আমাদের একজনকে পাঠশালা করিয়া ছেলেদের পড়াইবার ভার লইবার ব্যবস্থা করিলাম। ইহাই আমাদের মিশনের প্রথম এবং একটি সবিশেষ মূল্যবান্ কাজ। শিক্ষা-কাজের উপযোগী হইবে মনে করিয়া আমাদের ধর্মের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক প্রশ্নোত্তরময় একটি ছোট কড়চা বই লিখিলাম। সে বইখানি পাদ্রী দোমিঙ্গো দে সোসা তাহাদের ভাষায় অনুবাদ

[১] বাঙ্গালা গদ্যের ইতিহাস 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য' (তৃতীয় সংস্করণ ১৯৪৯) গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

[২] বার্থোলোমে আল্‌কাজারের 'ক্রোনো-হিস্‌টোরিআ দে লা কান্‌পাঞিআ দে য়েসুস্' দ্বিতীয় খণ্ড (মাদ্রিদ ১৭১০) হইতে বার্ণেট কর্ত্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত এবং গ্রীয়ার্সন কর্ত্তৃক 'লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া' প্রথম খণ্ড প্রথম ভাগে উদ্ধৃত (পৃ ২২৩)।

করিল। এই বইখানির উপযোগিতা শুধু ছেলেদের পক্ষে নয়, বড়োদের পক্ষে এবং খাস পোর্তুগীসদের পক্ষেও—যেহেতু বইটির সাহায্যে তাহারা তাহাদের ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীদের এবং তাহাদের অধীন দেশীয় লোকদের খ্রীষ্টীয় ধর্মমত শিক্ষা দেয়।

ফের্নান্দেজ ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কোচিন হইতে শ্রীপুর আসিয়াছিলেন। সুতরাং বইটির রচনা ও অনুবাদ-কাল ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্দ্ধ।

পোর্তুগীস পাদ্রীদের ছাপা কড়চা বই যাহার সন্ধান মিলিয়াছে তাহা হইতেছে মানোএল-দা-আস্সুম্প্সাম্ রচিত (১৭৩৪) এবং লিসবন শহরে রোমান হরফে মুদ্রিত (১৭৪৩) 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ'।[১] যতদূর জানা গিয়াছে ছাপার অক্ষরে বাঙ্গালা বই এইটিই প্রথম। এ ধরণের বই যে তাঁহারা আরও লিখিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ আছে। কিন্তু পোর্তুগীসদের এই সব রচনা সাধারণ লোকের গোচরে আসে নাই। এগুলি তাঁহাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্যে লেখা এবং তাই রোমান হরফে ছাপানো। সাধারণের প্রবেশ এখানে ছিল না। আর এক কথা। পোর্তুগীস পাদ্রীরা উপদেশ দিয়া বক্তৃতা করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করে নাই, তাহারা করিত বলপ্রয়োগ দ্বারা। তাহাদের প্রলোভনে বা বলপ্রয়োগে যাহারা বশীভূত হইত এবং যাহাদের আর সমাজে ফিরিবার পথ একেবারে রুদ্ধ হইত তাহাদের এবং এদেশে জাত পোর্তুগীস অসবর্ণ সন্তানদের ও ক্রীতদাসদের শিক্ষার জন্যই তাঁহাদের এই "সাহিত্যিক" প্রচেষ্টা। অষ্টাদশ শতকের শেষ কয় বছর হইতে ইংরেজ পাদ্রীদের ধর্ম্মপ্রচার অন্য ছাঁদের। তাঁহাদের দাস বা ক্রীতদাস ছিল না, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জন্য তাঁহাদের বলপ্রয়োগের পথও ছিল না। সুতরাং বলিয়া-কহিয়া, সাধ্যমত উপকার করিয়া, বই লিখিয়া ছাপাইয়া বিতরণ করিয়া তাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তখন সাধারণ লোকে ছাপা বই জানিত না, জানিত হাতে লেখা পুথি। ছাপার বই যেখানে অচল সেখানে তাঁহারা তুলট কাগজে পুরানো ছাঁদে সযত্নে লেখা পুথি চালাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দখল দৃঢ় হইবার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যশাসন ও রাজস্ব আদায়ের কাজে দেশি ভাষা শিখিবার ও সে ভাষায় আইনকানুন লিখিবার প্রয়োজন অপরিহার্য্য হয়। তখনই বাঙ্গালা ছাপিবার অক্ষর সৃষ্টি হইল।

[১] বইটির নাম সম্বন্ধে একটু ব্যাখ্যার আবশ্যক। মূলে আছে **Crepar Xaxtrer Orth, bhed** এবং সকলে কমা চিহ্নটি উপেক্ষা করিয়া মানে করেন কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-বিচার। আসলে হইবে কৃপার শাস্ত্রের অর্থ ও রহস্য, ইংরেজি করিলে Meaning and Implication of the Faith of Mercy—হইবে।

এ কাজের কৃতিত্ব কোম্পানির সংস্কৃতজ্ঞ কর্ম্মচারী চার্ল্স্ উইল্কিন্সের। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে তিন চারিখানি আইনের বই বাঙ্গালা গদ্যে অনূদিত ও বাঙ্গালা হরফে ছাপা হইল। বাঙ্গালা হরফে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রথম ছাপা হইল উইলিয়ম জোন্স্ সম্পাদিত কালিদাসের 'ঋতুসংহার' (১৭৯২)।

উইলিয়ম কেরির (১৭৬১-১৮৩৪) নেতৃত্বে শ্রীরামপুরে ব্যাপ্টিস্ট্ মিশনের ছাপাখানা বসিল। এখান হইতে বাইবেলের অনুবাদ বাহির হইল (১৮০০-০১)। কোম্পানির নবাগত কর্ম্মচারীদের শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হইলে কেরি প্রথমে শুধু বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যক্ষ পরে অধিকন্তু সংস্কৃতের ও মারাঠী ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। সহকারী শিক্ষকগণের দ্বারা কেরি বাঙ্গালায় পাঠ্যপুস্তক লিখাইতে লাগিলেন। ইঁহাদের মধ্যে দুইজনের কাজ উল্লেখযোগ্য। একজন রামরাম বসু (?-১৮১৩)। ইনি প্রথমে কেরির মুন্সি ছিলেন এবং বাইবেলের অনুবাদে ও অন্যান্য খ্রীষ্টীয় বাঙ্গালা রচনায় কেরি-সম্প্রদায়কে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ইনি যে বই দুটি লিখিয়াছিলেন 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) ও 'লিপিমালা' (১৮০২) তাহাতে মুন্শিয়ানা অর্থাৎ ফারসীমিশাল সাধারণব্যবহৃত দলিলি ছাঁদের সহজ ভাষার নিদর্শন রহিয়াছে। পাঠ্যপুস্তক হিসাবে রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র বহুকাল চলিত ছিল। লিপিমালার রচনারীতি উচ্চতর। ইহাতে কয়েকটি চলিত ও পৌরাণিক গল্প সঙ্কলিত আছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (?-১৮১৯)। ইনি সংস্কৃত হইতে অনুবাদ করিয়াছিলেন 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২) ও 'রাজাবলি' (১৮০৮)। ইঁহার সবচেয়ে বিখ্যাত বই 'প্রবোধচন্দ্রিকা' মৃত্যুর অনেক কাল পরে বাহির হইয়াছিল (১৮৩৩)। এ বইটির কিছু অংশ বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ, বেশির ভাগই স্বাধীন রচনা। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার পূর্ব্বে ও পরে কলেজের প্রায় একমাত্র বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক রূপে একাধিপত্য করিয়া বইখানি ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের বাঙ্গালা লেখকদের কুণ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছিল। মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা সংস্কৃত শব্দ ও সমাসবহুল এবং তাঁহার রচনারীতি পণ্ডিতি। কেরি যতদিন রামরাম বসুর প্রভাবাধীন ছিলেন ততদিন তাঁহার রচনারীতি—বাইবেল অনুবাদের প্রমাণ অনুসারে—অপেক্ষাকৃত সহজ ও সরল ছিল। মৃত্যুঞ্জয়ের প্রভাবে আসিবার পর হইতে কেরি সংস্কৃত শব্দের ভক্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার কথোপকথনের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ

মিলাইয়া পড়িলে এবং বাইবেলের পরবর্ত্তী সংস্করণগুলি দেখিলে এ কথার প্রমাণ মিলিবে।

কেরি নিজে দুইখানি বই সঙ্কলন করিয়াছিলেন, 'কথোপকথন' (১৮০১) ও 'ইতিহাসমালা' (১৮১২)। কথোপকথনে বাঙ্গালার কোন কোন আঞ্চলিক উপভাষার সুন্দর নিদর্শন আছে। মেয়েলি কোন্দল হইতে আরম্ভ করিয়া বাবুর্চিকে সাহেবের হুকুম পর্য্যন্ত অনেক কিছুই বইটির দ্বিভাষিক বাঙ্গালা-ইংরাজি কথোপকথনের বিষয়ীভূত। ইতিহাসমালায় অনেকগুলি ছোট বড় গল্প সংগৃহীত। এগুলির অধিকাংশই চলিত দেশি গল্প, সেগুলির রূপও দেশি। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সাহিত্যিক গল্প রচনার এইগুলিই একমাত্র অকৃত্রিম নিদর্শন। কেন জানি না (নামের জন্যেই কি ?) ইতিহাসমালা শ্রীরামপুরি-ফোর্টউইলিয়মি সাহিত্যের মধ্যে সবচেয়ে অবজ্ঞাত বই। এটির যথোপযুক্ত সমাদর হইলে বাঙ্গালায় গল্প-উপন্যাসের দেখা অনেক আগেই মিলিত।

বিচারবিশ্লেষণে উচ্চতর চিন্তার বাহন হিসাবে প্রথম ব্যবহারে লাগাইয়া বাঙ্গালা গদ্যকে জাতে তুলিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম তৃতীয়াংশের সবচেয়ে শক্তিশালী ও মনস্বী ব্যক্তি রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩), যাঁহার কর্ম্ম ও চিন্তা ভারতবর্ষের ইতিহাসে আধুনিক যুগের দরজা খুলিয়া দিয়াছে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকদের মত রামমোহন শুধু সংস্কৃতব্যবসায়ী অথবা ফারসীনবীশ ছিলেন না। তিনি সংস্কৃত জানিতেন, আরবী-ফারসী আরও ভালো করিয়া জানিতেন, তিনি ভারতবর্ষের ইংরেজি শিক্ষিতদের অগ্রণী। ইঁহার হাতে বাঙ্গালা গদ্যের যেরূপ ঢালাই হইল তাহাতে মাধুর্য্য না থাক বোধগম্যতা ছিল, কার্য্যোপযোগিতা ছিল। এখনকার দিনে ছেদচিহ্নবিরল রামমোহনের বাক্যাবলী উদ্‌ভট ঠেকিতে পারে কিন্তু সে সময়ের কলেজি রচনার সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলে বোঝা যাইবে কেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মত প্রাচীনতার ভক্তও বলিয়াছিলেন, "দেওয়ানজী জলের মত বাঙ্গালা লিখিতেন"।

শ্রীরামপুরের পাদ্‌রীদেরও খ্রীষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধতা করিয়া রামমোহন উপনিষদ্-বেদান্ত-আশ্রিত একেশ্বরবাদী হিন্দুধর্ম্মের প্রচারে ও প্রতিষ্ঠায় মনোযোগ দিলেন। তিনি কয়েকটি উপনিষদের অনুবাদ করিলেন। গীতার পদ্য অনুবাদ করিলেন (বা করাইলেন) এবং সর্ব্বপ্রথম বাহির করিলেন 'বেদান্ত-গ্রন্থ' ও

'বেদান্ত-সার' (১৮১৫)। রামমোহনের বিরুদ্ধে পাদরীরা খাড়া করাইলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে, তিনি লিখিলেন 'বেদান্ত-চন্দ্রিকা' (১৮১৭)। পাদরীদের সঙ্গে বাদপ্রতিবাদ জমিয়া উঠিল, ক্রমশঃ গোঁড়া হিন্দুরাও তৃতীয়পক্ষরূপে সাক্ষাৎ-পরোক্ষ বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। পাদরীরা পরাস্ত হইল, গোঁড়ারা হারিয়াও হার মানিতে চাহিল না। রামমোহনের মৃত্যু হইলে তাঁহার অসমাপ্ত কাজ যোগ্য ব্যক্তিরা গ্রহণ করিলেন।

শ্রীরামপুরের পাদ্‌রীরা ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে 'সমাচারদর্পণ' প্রকাশ করিলেন। সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক (তখন অবশ্য সংখ্যায় যৎসামান্য) খবরের কাগজের রস প্রথম আস্বাদন করিল এবং তাহাতে বাঙ্গালা গদ্য ঘরোয়া পরিচিতি লাভ করিতে লাগিল। সমাচারদর্পণের সাফল্য বিবিধ বাঙ্গালা সাময়িকপত্রের প্রকাশ ত্বরান্বিত করিল। এই সাময়িকপত্রের মধ্যে অনুশীলিত হইয়াই বাঙ্গালা গদ্যের জড়তামুক্তি ঘটিল।

বাঙ্গালায় আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাসে তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকার প্রকাশ একটি গুরুতর ঘটনা বা বিশিষ্ট দিগ্‌দর্শনী। পুথিপত্র দলিল-দস্তাবেজ তর্কাতর্কি ধর্ম্মপ্রচারপুস্তিকা ও পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি "কেজো" রচনার বাহিরে সত্যকার সাহিত্য বলিতে যাহা বোঝায় তাহার কিঞ্চিৎ আস্বাদ বাঙ্গালী পাঠকের কাছে প্রথমে আনিয়া দেয় সাময়িক-পত্র। সমাচারদর্পণ, সংবাদকৌমুদী, সমাচার-চন্দ্রিকা, বঙ্গদূত, জ্ঞানান্বেষণ, সংবাদ-প্রভাকর ইত্যাদি সাময়িক-পত্রের দ্বারাই বাঙ্গালা সাহিত্যে আধুনিকতার সূচিপ্রবেশ। কিন্তু সে-সময়ে বাঙ্গালা গদ্যের রূপ অপূর্ণ এবং সৌষ্ঠববর্জ্জিত, তাই সাময়িকপত্রের সাহায্যে তখন নূতন সাহিত্যের সৃষ্টি সম্ভব হয় নাই। তখনকার কবিতাকারেরা তাই পয়ার-ত্রিপদী-মালঝাঁপের তালেই মশগুল ছিলেন। গদ্যে সাহিত্যরচনার সম্ভাবনা কাহারও মনে জাগে নাই।

১২৫০ সালের ভাদ্র মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া সাময়িক-পত্রের গতানুগতিকতা ভঙ্গ করিল। সম্পাদক হইলেন অক্ষয়-কুমার দত্ত। ধর্ম্মব্যাখ্যান ছাড়া ইহাতে নীতিগর্ভ বিজ্ঞানবিষয়ক এবং অধ্যাত্ম-তত্ত্বঘটিত জ্ঞানোদ্দীপক প্রবন্ধ বাহির হইতে লাগিল। সরল সহজবোধ্য রচনাগুলি বাঙ্গালা গদ্যে দৃঢ়তা ও সংযম আনিল। অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইত্যাদি

মনীষীর রচনামণ্ডিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বাঙ্গালা সাময়িক-পত্রের যে আদর্শ স্থাপন করিল, পরে তাহাই বিবিধার্থসংগ্রহ-বঙ্গদর্শন-ভারতীতে অনুসৃত হইল। সেই হইতে বরাবর বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ লেখকগণ সাময়িক-পত্রের অবলম্বনেই সাহিত্যের আসরে প্রথম দেখা দিয়াছেন।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির নব-আলোক-উদ্ভাসিত নূতনতর পরিবেশে ভারতের সনাতন অধ্যাত্ম-ঐতিহ্যকে কর্ম্মে চিন্তায় গ্রহণ করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) রাজা রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টাকে সত্যপথে পরিচালিত করিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বাহির করিয়া দেবেন্দ্রনাথ বাঙ্গালা গদ্যের পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন। তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান ও ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত বক্তৃতা এই পত্রিকাতে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইত। এগুলি পরে 'ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান' (১৮৬১) ইত্যাদি গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছিল। ঋগ্‌বেদের অনুবাদে ইনিই প্রথম হাত দিয়াছিলেন এবং বাঙ্গালা গদ্যে প্রথম সংস্কৃত ব্যাকরণ ইঁহারই রচনা (১৮৪৫)। দেবেন্দ্রনাথের 'স্বরচিত জীবনচরিত' (১৮৯৮) উপাদেয় বই। ইহাতে ইঁহার আঠার হইতে একচল্লিশ বছর পর্য্যন্ত বয়সের উল্লেখযোগ্য ঘটনা আছে।

ঋষি দেবেন্দ্রনাথের অন্তরে যে একটি সাহিত্যিক বাস করিত সে দ্বিজেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যগুরু। দেবেন্দ্রনাথের এই সাহিত্যিক-রূপের পরিচয় তাঁহার প্রকাশিত আনুষ্ঠানিক রচনায় নাই, আছে অন্তরঙ্গ-সুহৃদ্‌-আত্মীয়-বন্ধুদিগকে লেখা পত্রাবলীতে। এই পত্রাবলীতে এবং তাঁহার স্বরচিত জীবনচরিতে দেখিতে পাই যে অক্ষয়কুমার-বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ সকলের অগোচরে বাঙ্গালা গদ্যের একটি নিজস্ব সরল ষ্টাইল খাড়া করিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথের ষ্টাইল, তাঁহার চিঠি লেখার ভঙ্গি তাঁহার সন্তানেরা, বিশেষ করিয়া জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্র লাভ করিয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের বাঙ্গালা রচনার সহজসৌন্দর্য্যের এবং তাঁহার সৌন্দর্য্যপ্রিয় মানসের পরিচয় হিসাবে পঞ্জাবে ধরমশালা হইতে শ্রীকণ্ঠসিংহকে লেখা (১৮৭০) পত্রের অংশ উদ্ধৃত করি,

> এই পর্বতের চূড়ার উপরে এই প্রাতঃকালে সূর্য্যের কিরণ অতি মধুর বোধ হইতেছে। মনে হইতেছে যে, এই সময়ে আপনার মুখ হইতে এই গানটি শুনিতে পাইলে স্বর্গীয় আনন্দ অনুভব করিতাম।—"নয়ন খুলিয়া দেখ নয়নাভিরামে! হৃদয়কমল বিকাশে যাঁর নামে। গগনে ভানু সহস্র কর বিস্তারি জগৎ-মন্দিরে বিরাজেন সপ্রকাশ—দেখ দেখ প্রেমাকরে দিবাকর

জিনিয়া সুন্দর অনুপমে॥" কোথায় গত বৎসরের এই আশ্বিন মাসের এই প্রথম দিবসে আপনার সহিত আপনাদের পুষ্পকাননে—আর কোথায় অদ্য এই প্রাতঃকালে এই বনে বসিয়া আপনাকে ভাবিতে ভাবিতে এই পত্র লিখিতেছি। আবার আগামী বৎসরে এই সময়ে যে কোথায় থাকি, তাহার কিছুই বলা যায় না। আপনি মধুর স্বরে আমাকে ডাকিতেছেন "তু আওরে।" কিন্তু কিছুই বলা যায় না—হয় তো "আগল ফাগনমে তুমসে মেলৌঙ্গি।" আওর "মনকি কমলদল খোলিয়া" শুনৌঙ্গি।

৩

তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-৮৬) ছিলেন ইহার প্রধান লেখকও। তিনি প্রথম জীবনে প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে পদ্যে একখানি রোমান্টিক কাহিনী লিখিয়াছিলেন 'অনঙ্গমোহন' নামে। রচনার তুচ্ছতার জন্য না হোক, বোধ করি আকারের ক্ষুদ্রতার জন্যই রচনাটি একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। অক্ষয়-কুমারের অধিকাংশ রচনা তত্ত্ববোধিনীতে প্রথমে বাহির হইয়াছিল। দুইখণ্ড 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (১৮৫২-৫৩), তিনভাগ 'চারুপাঠ' (১৮৫২-৫৯), এবং 'ধর্ম্মনীতি' (১৮৫৬) বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল। প্রথম বইটি জর্জ্জ কুম্বের *Constitution of Man* অবলম্বনে লেখা। চারুপাঠের অনেক প্রবন্ধ এবং ধর্ম্মনীতির অনেক অংশও ইংরেজি হইতে নেওয়া। অক্ষয়কুমারের শ্রেষ্ঠ রচনা হইতেছে দুই ভাগ 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (১৮৭০, ১৮৮৩)। উইলসনের *Essays and Lectures on the Religion of the Hindus* অবলম্বনে রচিত হইলেও অক্ষয়কুমার ইহাতে অনেক কিছু নূতন বস্তু যোগ করিয়াছেন। উপক্রমণিকা দুইটিতে অক্ষয়কুমারের শ্রমশীল পাণ্ডিত্যের ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির পরিচয় রহিয়াছে।

অক্ষয়কুমারের লেখার ভঙ্গি ছিল সহজ সরল পরিমিত এবং প্রকাশক্ষম। তিনি বাঙ্গালা গদ্যের সংশোধনে বিদ্যাসাগরের প্রধান সহযোগী ছিলেন। এ দেশে নবযুগের উদ্বোধনে তাঁহার প্রচেষ্টা অবজ্ঞেয় নয়। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জ্ঞানবিজ্ঞান-অনুশীলন বাঙ্গালা দেশে তিনিই প্রথম শুরু করেন যদিও কতকটা এমেচার ভাবে॥

৪

বাঙ্গালা গদ্যের জটিলতা ঘুচাইয়া বাক্যে অনেকখানি ভারসমতা ও ব্যবহার-যোগ্যতা দিয়াছিলেন অক্ষয়কুমার। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৯২০-৯১) বাঙ্গালা গদ্যে প্রাণ সঞ্চার করিলেন পরিমিতি ও লালিত্য সঞ্চার করাইয়া।

বাঙ্গালা ভাষার ধ্বনিপ্রবাহ অনুধাবন করিয়া বাক্যে স্বাভাবিক শব্দানুবৃত্তির রূপ দিয়া তিনি বাঙ্গালা গদ্যে তাল বাঁধিয়া দিলেন।

বিদ্যাসাগরের বই প্রায় সবই পাঠ্যপুস্তকজাতীয়। তাঁহার প্রথম রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধ 'বাসুদেবচরিত'-এর কথা পরে বলিতেছি। 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ব্যবহারের জন্য লেখা। তাহার পর ১৮৪৯ হইতে ১৮৬৯ মধ্যে 'বাঙ্গালার ইতিহাস (দ্বিতীয় ভাগ)', 'জীবন চরিত', 'বোধোদয়', 'শকুন্তলা', 'কথামালা', 'চরিতাবলী', 'সীতার বনবাস', 'আখ্যান-মঞ্জরী' এবং 'ভ্রান্তিবিলাস' বাহির হয়। বেতাল-পঞ্চবিংশতির মূল হিন্দী। শকুন্তলা ও সীতার-বনবাস সংস্কৃত নাটক অবলম্বনে লেখা। বাকি বইগুলির মূল ইংরেজি। বিদ্যাসাগরের স্বাধীন রচনা হইতেছে 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩), দুই খণ্ড 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৫), এবং দুই খণ্ড 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' (১৮৭১, ১৮৭৩)। প্রথম নিবন্ধটিতে বিদ্যাসাগরের অসাধারণ সাহিত্য-রসজ্ঞতার পরিচয় আছে। শেষের বই দুইটিতে তাঁহার গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের ও প্রগাঢ় বিচারশক্তির পরিচয় জাজ্জ্বল্যমান। 'ব্রজবিলাস' প্রভৃতি কয়েকটি বেনামী সরস ব্যঙ্গ-রচনা বিদ্যাসাগরের লেখা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

বিদ্যাসাগরের অসামান্য কৃতিত্ব এই যে তিনি প্রচলিত ফোর্ট-উইলিয়মি পাঠ্যপুস্তকের বিভাষা, রামমোহন রায়ের পণ্ডিতি ভাষা এবং সমসাময়িক সংবাদপত্রের অপভাষা কোনটিকেই একান্ত ভাবে অবলম্বন না করিয়া তাহা হইতে যথাযোগ্য গ্রহণবর্জ্জন করিয়া সাহিত্যযোগ্য লালিত্যময় সুডৌল গদ্যরীতি প্রতিষ্ঠা করিলেন যাহা সাহিত্যের ও সংসারের প্রায় সব রকম প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ।

শিল্পী দুই রকমের—স্রষ্টা-এবং সংস্কর্ত্তা। স্রষ্টা তিনিই যিনি রচনা করেন যাহা আগে ছিল না। আগে যাহা ছিল তাহাতে নবরূপ দেন, তাহাতে নবশক্তি সঞ্চার করেন সংস্কর্ত্তা। বিদ্যাসাগর ছিলেন এই দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পী এবং এখানে তিনি আমাদের দেশে অদ্বিতীয়। বাঙ্গালা সাহিত্যের গদ্য রীতি কেন যে পূর্ব্ববর্ত্তী অথবা সমসাময়িক আর কাহারো দ্বারা না হইয়া (—তখন দেশে প্রতিভাশালী শক্তিমান্ বাঙ্গালীর অভাব ছিল না—) বিদ্যাসাগরের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইল তাহার নিগূঢ় কারণ এখানেই মিলিবে। বিদ্যাসাগর

ছিলেন বাঙ্গালীর মানসিক ও সামাজিক জীবনের সংস্কর্তা, এইই ছিল যেন তাঁহার জীবনের মিশন। বাঙ্গালীর মানসিক ও সামাজিক জীবনের প্রতিফলন চিরদিন ধরিয়া প্রধানত সাহিত্যের মধ্যেই হইয়া আসিয়াছে। এই জন্যই বিদ্যাসাগরের সংস্কারপ্রচেষ্টা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সঙ্গতভাবে প্রথমে সাহিত্যসরণি অনুসরণ করিয়াছিল। বাঙ্গালা গদ্যের সংস্কার—ঝাড়ুদারি নয়, রাজমজুরগিরি—তাঁহার জীবনের প্রথম উদ্যম।

উনবিংশ শতাব্দীর সত্তর বছর বলা যাইতে পারে বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তকের যুগ। এ যুগের অধিপতি বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের বাঙ্গালা রচনাবলীর মধ্যে যেগুলি প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত সেগুলি সবই পাঠ্যপুস্তক, এবং সেগুলির মূল সংস্কৃত, হিন্দী অথবা ইংরেজি। এ বইগুলির উল্লেখ আগে করিয়াছি।

বিদ্যাসাগর প্রথমে 'বাসুদেবচরিত' বলিয়া একটি বই লিখিয়াছিলেন, এ কথা তাঁহার চরিতকারেরা বলিয়াছেন। এই উক্তিই একমাত্র প্রমাণ। এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে পাওয়া একটি পাণ্ডুলিপি আছে। সেটি কলেজের এক সিভিলিয়ান্ ছাত্র হেন্‌রি সারজ্যাণ্ট্-এর লেখা, 'বাসুদেবচরিত' জাতীয় কৃষ্ণলীলা বই। আমার মনে হয় এই রচনাটি লিখিবার সময়ে বিদ্যাসাগর—তখন তিনি বোধ করি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষক ছিলেন—সারজ্যাণ্ট্‌কে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই থেকেই বোধ হয় 'বাসুদেবচরিত' কিংবদন্তীর উৎপত্তি। সারজ্যাণ্টের লেখায় বিদ্যাসাগরের ছাপ আগাগোড়া নাই। তাহা থাকিবার কথাও নয়। তাঁর কৃতিত্ব বোধ করি সংশোধনে। রচনারীতিতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজি ভঙ্গি বেশ আছে, তবে ষ্টাইল বেশ সরল হইয়া আসিয়াছে। বইটির আরম্ভ এইভাবে

শ্রীশ্রীনারায়ণের অষ্টমাবতার।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ তাঁহার জন্ম ও বাল্যলীলা এবং কংসবধের উপাখ্যান। ভাষা সংগ্রহঃ। হেনরি সারজ্যাণ্ট শাহেবেন ক্রিয়তে॥

পূর্ব্বকালে পরীক্ষিত নামা এক রাজা তিনি অস্ত্রশাস্ত্রে বিশারদ এবং যুদ্ধেতে অতি বড় শূর ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ পাণ্ডুনামে রাজা অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন।

এক দিবস রাজা পরীক্ষিত মৃগয়াসক্ত হইয়া মৃগান্বেষণ করত এক হরিণ প্রতি বাণাঘাত করিলেন। তাহাতে কুরঙ্গ সেই স্থান হইতে অতি শীঘ্র পলায়ন করিল। নৃপতিও পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া পিপাসার্ত্ত ও ক্লান্ত হইয়া বনমধ্যে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সেই নির্জ্জন স্থানে শমীকনামা এক সিদ্ধ ঋষি বাস করেন তাঁহার আরাধনার এই

> নিয়ম দুগ্ধপোষ্য গোবৎস মুখ হইতে ভূমিতে স্বয়ংপতিত দুগ্ধমাত্র পান করিয়া তপস্যা করেন।

তবে মাঝে মাঝে বিদ্যাসাগরের কলমের ছোঁয়া বেশ স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। যেমন

> অনন্তর নন্দ বহুকালাবধি সন্তানাকাঙ্ক্ষী ছিলেন বসুদেব দত্ত সন্তানপ্রাপ্তিদ্বারা অত্যন্তাহ্লাদিত হইয়া এবং তাহাকে স্বীয় বালক জ্ঞান করিয়া গোকুলনগরস্থ সকল লোককে আহ্বান করিয়া মহোৎসব করিলেন অনন্তর বহু দান করিয়া সকল দেবতার পূজা করিলেন পরে সামগ্রী আয়োজন করিয়া বালকের কৃষ্ণবর্ণপ্রযুক্ত কৃষ্ণ এই নাম রাখিলেন।

বিদ্যাসাগরের গদ্যরচনায় পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটি প্রধান ধারাই অনুশীলিত হইয়াছে। ফোর্ট-উইলিয়ম-কলেজি পদ্ধতির সংস্কার দেখি তাঁহার পাঠ্যপুস্তকগুলিতে, রাম-মোহনের বিচারবিবৃত শৈলীর সরলীকরণ পাই তাঁহার বিধবাবিবাহ ও বহু-বিবাহ বিষয়ক নিবন্ধগুলিতে। বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রজ্ঞানের ও শাস্ত্রাভ্যাসের নিপুণ পরিচয়ও শেষোক্ত বইগুলিতে পাই।

তৃতীয় শ্রেণীর রচনাগুলি বিদ্যাসাগরের গভীর সাহিত্যরসগ্রাহিতার পরিচয় বহন করে। 'সংস্কৃত-সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব' নামক ছোট পুস্তিকাটি ভারতবর্ষে সাহিত্য-ইতিহাস রচনার প্রথম প্রচেষ্টা। ইহা অবলম্বন করিয়াই রামগতি ন্যায়রত্ন 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭৩) রচনা করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর কয়েকখানি সংস্কৃত কাব্য ও নাটকের বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং একখানি কাব্য—বাণভট্টের 'হর্ষচরিত'—তাঁহার দ্বারাই প্রথম প্রকাশিত। এই সংস্করণগুলিতে বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্যের ও সূক্ষ্ম রসগ্রাহিতার সমান পরিচয় রহিয়াছে। তাহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'মেঘদূত'। বিদ্যাসাগর মেঘদূতের কয়েকটি উৎকৃষ্ট শ্লোক বিশ্লেষণ করিয়া প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে এই সর্ব্বজন-পরিচিত শ্লোকটিও আছে—"মন্দাকিন্যাঃ সলিলশিশিরৈঃ সেব্যমানা মরুদ্‌ভিঃ" ইত্যাদি। বিদ্যাসাগরের মেঘদূত সংস্করণ বাহির হইবার প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে তাঁহার এই সূক্ষ্ম বিচারশীলতার ও রসগ্রাহিতার অকাট্য প্রমাণ মিলিল। মেঘদূতের প্রাচীনতম অথচ অজ্ঞাতপূর্ব্ব টীকাকার বল্লভদেবের টীকার একখানি প্রাচীন পুথি পাওয়া গেল কাশ্মীরে। তাহাতে দেখা গেল যে বিদ্যাসাগর যে শ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন তাহার একটিও তাহাতে

নাই। বল্লভদেবের টীকার সম্পাদক পণ্ডিত হুল্‌ট্‌শ বিদ্যাসাগরের এই অনন্য-সাধারণ পাণ্ডিত্য ও রসগ্রাহিতার প্রতি পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন॥

৫

বিদ্যাসাগরের অনুপ্রেরণায় যে লেখকগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয় তাহাকে সংস্কৃত-কলেজ গোষ্ঠী বলা চলে, কেননা ইঁহারা সংস্কৃত কলেজের ছাত্র অথবা অধ্যাপক অথবা দুইই ছিলেন। একদা যে পণ্ডিতসমাজ বাঙ্গালা গদ্যকে কঠিন ও ভীতিপ্রদ করিয়া তুলিয়াছিলেন, যাঁহারা বিদ্যাসাগরের গদ্যকে তুচ্ছ করিতেন সহজবোধ্য বলিয়া, তাঁহাদেরই দলের লোকে এখন বিদ্যাসাগরের গদ্যের অনুসরণে ব্রতী হইলেন, সুললিত ও মনোরম করিয়া লিখিতে চেষ্টিত হইলেন। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা উচিত মনে করি,—তখন বিদ্যাসাগরীয় ভাষার দাম ছিল, পাঠ্যগ্রন্থের চাহিদার জন্য। নাটকে এবং পদ্যেও সংস্কৃত-কলেজ গোষ্ঠী শীর্ষস্থান অধিকার করিল। নাটকে রামনারায়ণ এবং কাব্যে বিহারীলাল তাহার দৃষ্টান্ত।

সংস্কৃত-কলেজ গোষ্ঠীর মধ্যে দুইজন বাঙ্গালা গদ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, তারাশঙ্কর তর্করত্ন এবং রামগতি ন্যায়রত্ন (১৮৩১-৯৪)। তারাশঙ্করের প্রধান রচনা হইতেছে বাণভট্টের কাব্যের ভাবানুবাদ ‘কাদম্বরী’ (১৮৫৪) এবং জন্‌সনের *Rasselas*-এর কালীকৃষ্ণ দেব কৃত অনুবাদ অবলম্বনে (?) ‘রাসেলাস’ (১৮৫৭)। পাঠ্যপুস্তক ছাড়া রামগতি দুইখানি মৌলিক আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছিলেন—‘রোমাবতী’ (১৮৬৩) এবং ‘ইলছোবা’ (১৮৭২)। শেষেরটিতে তিনি নিজের বাসভূমির কিংবদন্তী বিষয় রূপে লইয়াছিলেন। রামগতির ‘বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব’ (১৮৭২-৭৩) বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম বিস্তৃত ইতিহাস। ইহার পূর্ব্বে দুইখানি বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস লেখা হইয়াছিল—হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের ‘কবিচরিত’ (১৮৬৯) এবং মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ‘বঙ্গভাষার ইতিহাস’ (১৮৭১)। সংস্কৃত-কলেজ গোষ্ঠীর দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮২০-৮৬) ‘সোমপ্রকাশ’ পত্রিকা (১৮৫৮) সম্পাদন করিয়া জার্নালিষ্ট হিসাবে কৃতিত্বের ভাগী হইয়াছিলেন॥

৬

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পরিচালকবর্গের মধ্যে অনেকেই ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র। বাঙ্গালা গদ্যের ও পদ্যের উন্নয়নে হিন্দু কলেজ-গোষ্ঠীর দান কিছু

কম নয়। সংস্কৃত-কলেজ গোষ্ঠী করিয়াছিলেন সংস্কার, হিন্দু-কলেজ গোষ্ঠী আনিলেন বিপ্লব। গদ্যে প্যারীচাঁদ মিত্র এবং পদ্যে-নাটকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত যুগান্তর আনিয়াছিলেন। হিন্দু-কলেজ গোষ্ঠীর গদ্য লেখকদিগের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর উল্লেখযোগ্য হইতেছেন রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়॥

৭

কোন কোন দেশে কোন কোন কালে কদাচিৎ এমন অ-সাধারণ সাধারণ মানুষের আবির্ভাব হয় যাঁহার মধ্য দিয়া সমাজের মঙ্গলচেতনা বিশেষভাবে জাগ্রত হইয়া নানাদিকে উৎসারিত হইবার পথ খুঁজে। এমন ব্যক্তিকে বলা চলে যুগমূর্ত্তি। বিশেষ কালের সমগ্র রূপটি যেন প্রতিবিম্বিত হয় ইঁহাদের ব্যক্তিত্বে। এই বিরল মানবের একজন ছিলেন রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-৯৯)। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে ইংরেজি শিক্ষার বসন্তবাতাসে উদ্দীপ্ত বাঙ্গালীর মনে প্রাণে যে সাড়া পড়িয়াছিল তাহা পরিপূর্ণভাবে অনুভূত হইয়াছিল রাজনারায়ণের জীবনে। তাই তিনি সব দিক দিয়া বাঙ্গালীর অবশ চিত্তকে অলস চরণকে ঠেলা দিয়াছিলেন বারবার। ধর্ম্ম ও সমাজ চিন্তায়, শিক্ষায় ও সাহিত্যে, দেশপ্রেমে ও রাষ্ট্রীয়-চেতনায়—সবদিক দিয়াই তিনি স্বদেশকে আগাইয়া দিতে ব্যগ্র ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহযোগিতায় রাজনারায়ণ ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রাণবান্ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন শিক্ষাব্রতী, শিক্ষকতা ছিল তাঁহার জীবিকা। এই কাজে তাঁহার সার্থকতার পরিচয় একটি পশ্চাদ্বর্ত্তী মফস্বল শহরের চিত্তসংস্কারে। স্বাধীনতাস্পৃহায় মেদিনীপুরের অগ্রবর্ত্তিতার মূলে রাজনারায়ণের কৃতিত্ব স্বীকার্য্য।

সাহিত্যিক বলিয়া রাজনারায়ণ আজ আমাদের কাছে তেমন পরিচিত নন। অথচ সাহিত্যগুরু বলিতে যাহা বোঝায় তিনি ছিলেন ঠিক তাই। বাঙ্গালার একাধিক শ্রেষ্ঠ লেখক রাজনারায়ণের সৌহৃদ্যে সাহিত্যরচনায় উৎসাহিত হইয়াছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁহার এই ভূতপূর্ব্ব সহপাঠীর মুখ চাহিয়া অনেকগুলি কাব্য ও কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজনারায়ণের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। ইঁহার তাত্ত্বিক ও দার্শনিক চিন্তার মূলে রাজনারায়ণের সহযোগিতা ছিল। কিশোর রবীন্দ্রনাথের শিক্ষায় রাজনারায়ণের হাত যে কতটা ছিল তাহা জীবনস্মৃতি পাঠকের অজ্ঞাত নয়।

রাজনারায়ণের বাঙ্গালা রচনার প্রধান গুণ ঋজুতা ও সরসতা। কথ্যভাষার রস তিনি অনেকটাই সঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন সাধুভাষার কঠিনতার মধ্যে। এই হিসাবে তাহার শ্রেষ্ঠ রচনা হইতেছে 'সেকাল আর একাল' (১৮৭৪), 'গ্রাম্য উপাখ্যান' (১৮৮৩) এবং 'আত্মচরিত' (১৩০৮)। অন্য লেখার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা' (১৮৬১), 'বক্তৃতা' (৮৭০), 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭৮) এবং 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' (১২৯৩)। রাজনারায়ণ উপন্যাসরচনায়ও হাত দিয়াছিলেন। ইঁহার লেখা 'অমৃতাঙ্কুর' উপন্যাসের একটু অংশ ছাপা হইয়াছিল 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ ১২৮২)।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সাহিত্যের মধ্য দিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালীর চিত্তে যে স্বাধীনতা-ঔৎসুক্য জাগিয়াছিল তাহা প্রধানত ইতিহাস পাঠের ফল। টডের রাজস্থান-কাহিনী রঙ্গলাল-প্রমুখ লেখকের অস্ফুট রাষ্ট্রীয়-চেতনাকে উস্‌কাইয়া দিয়াছিল বাঙ্গালা রচনায়। যে-কয়েকটি ব্যক্তির চিত্তে এই চাঞ্চল্য প্রস্ফুট হইয়াছিল তাঁহাদের অগ্রণী ছিলেন রাজনারায়ণ এবং তাঁহার পিছনে ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। রাজনারায়ণ রাজনীতি-ব্যবসায়ী ছিলেন না, টাউন হলে বা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভায় বক্তৃতা দিয়াই তাঁহার স্বাধীনতা-উদ্দীপনা জুড়াইয়া যাইত না। তিনি ব্যাকুল ছিলেন দেশের সর্বাঙ্গীণ জাগরণের জন্য। তাই রাজনারায়ণ ও তাঁহার সুহৃদ্‌বর্গের ন্যাশন্যালিজম্ আত্মনির্ভর কর্ম্মপরায়ণতার পথ ধরিল। তাহারই ফলে প্রতিষ্ঠা হইল চৈত্রমেলা-হিন্দুমেলার, জাতীয়-সভার—এমন কি বৈপ্লবিক গুপ্তসভা "হাঞ্চু-পামু-হাফ"-এর। এই সব প্রচেষ্টার মধ্যে হয়ত হাসির খোরাক যথেষ্টই মিলিবে, কিন্তু ইহার মূলে যে অকৃত্রিম ব্যাকুলতা ছিল তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। শিক্ষিত বাঙ্গালীর চিত্ত যখন সুপ্তিসঙ্কীর্ণ গ্রামের বেড়া ভাঙ্গিয়া বঙ্গদর্শনেই পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে তখন রাজনারায়ণ ও তাঁহার তরুণ বন্ধুরা অখণ্ড ভারতের জাতীয় আদর্শখানি তুলিয়া ধরিলেন। তাই 'বঙ্গদর্শন'-এর পর 'ভারতী' (১২৮৪)।

সাহিত্যিক কৃতিত্বের পরিমাণ দিয়া রাজনারায়ণের জীবনের সার্থকতার বিচার করা চলে না। তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা যথেষ্ট না হইতে পারে, কিন্তু যাহা করাইয়াছেন তাহা অপর্য্যাপ্ত। যে ব্যক্তি যুগপৎ প্রায় তিনপুরুষের অন্তরঙ্গতা রাখিতে পারেন তাঁহার ব্যক্তিত্বের উদারতা, বৈচিত্র্য ও গভীরতা

অনুভবগম্য। রাজনারায়ণের সঙ্গ পাইয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অধ্যাত্মস্ফূর্তি হইয়াছিল, রাজনারায়ণের অট্টহাসিতে দ্বিজেন্দ্রনাথ স্বপ্নপ্রয়াণ-পাথেয় লাভ করিয়াছিলেন, রাজনারায়ণের সান্নিধ্যে মুখচোরা কিশোর রবীন্দ্রনাথের মন খুশি হইত। এ মানুষটি ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের মাতামহ ॥

৮

রাজনারায়ণ-মধুস্থদনের সহপাঠী ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-৯৪) ছিলেন প্রধানত শিক্ষাব্রতী। গোড়া থেকেই তিনি গদ্য-রচনায় প্রবৃত্ত হন। উপন্যাস-রচনায় তিনিই বঙ্কিমের গুরু। তাঁহার 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' উল্লেখযোগ্য রচনা। সদাচার ও গৃহধর্ম্মের প্রসঙ্গে তিনি যে শিক্ষাত্মক নিবন্ধগুলি লিখিয়া গিয়াছেন—'পারিবারিক প্রবন্ধ' (১২৮৮), 'সামাজিক প্রবন্ধ' (১২৯৯), 'আচার প্রবন্ধ' (১৮৯৪), ইত্যাদি—সেগুলি এখনো সর্ব্বাংশে উপযোগিতা হারায় নাই। ইংরেজি শিক্ষার গভীরতার সহিত দেশীয় সংস্কৃতির উদার সম্মিলন ভূদেবের চরিত্রে দৃঢ় ও উজ্জ্বল রূপ পাইয়াছিল। ইহার পরিচয় তাঁহার রচনায় লভ্য।

রাজনারায়ণ ও ভূদেব মাইকেলের সহপাঠী ছিলেন হিন্দু কলেজে। তিন জনের চরিত্রে তিনটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। রাজনারায়ণ সংস্কারপন্থী, ভূদেব সংস্থানপন্থী, মাইকেল বিপ্লবপন্থী।

প্যারীচাঁদ মিত্রও (১৮১৪-৮২) হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। ইনি গদ্যে এক নূতন ভঙ্গির সৃষ্টি করেন। প্রচুর তদ্ভব এবং চলিত বিদেশি শব্দ ব্যবহার করিয়া ইনি পশ্চিমবঙ্গের কথ্যভাষাকে সর্ব্বজনবোধ্য (বিশেষ করিয়া মহিলা-বোধ্য) সাহিত্যের বাহনরূপে প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ। সাহিত্যের ভাষা শুধু শিক্ষিতের ভাষা না থাকিয়া যাহাতে অন্তঃপুরিকাদের ও অল্পশিক্ষিত জনসাধারণের ব্যবহার-যোগ্য হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় প্যারীচাঁদ 'মাসিক পত্রিকা' বাহির করেন (১৮৫৪)। ইহাতেই তাঁহার প্রথম গদ্য রচনাগুলি বাহির হইয়াছিল ॥

৯

বাঙ্গালা গদ্যের প্রচলনে গভর্ণমেণ্টের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত (১৮৫১) ভার্নাকিউলার লিটারেচর সোসাইটি বা বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ খানিকটা সহায়তা করিয়াছিল।

বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি বিদেশি শাসনকর্তাদের এই অনুকূলতায় রাজেন্দ্রলাল মিত্রের (১৮২২-৯১) হাত ছিল। ইংরেজি হইতে বহু সুপাঠ্য গ্রন্থ অনুবাদ ও নিতান্ত স্বল্পমূল্যে প্রকাশ করিয়া বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ বাঙ্গালা সাহিত্যের দুর্দ্দিনে উপকার করিয়া গিয়াছে। রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনায় 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ'-এর প্রকাশ (১৮৫১) সমাজের বোধকরি সবচেয়ে বড় কাজ। এই পত্রিকাটিতে জ্ঞান-বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ, কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য ও ক্বচিৎ কবিতা ইত্যাদি প্রকাশিত হইয়া সেকালের বাঙ্গালীর জ্ঞানের ও আনন্দের যোগান দিয়াছিল। রাজেন্দ্রলালের রচনাভঙ্গি সমল এবং বক্তব্যের উপযোগী। প্রত্নতত্ত্বের এবং ইতিহাসের গবেষণায় রাজেন্দ্রলাল দেশে-বিদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে রাজেন্দ্রলালের নাম অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদের খুব চাহিদা ছিল। কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৩০-৭০) কর্ত্তৃক মহাভারতের গদ্য-অনুবাদ প্রকাশ (১৮৬০-৬৬) এই প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার পূর্ব্বে ও এই সময়ে বর্দ্ধমানের মহারাজা মহাতাপচাঁদ রামায়ণ ও মহাভারত বাঙ্গালায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্নের বিশিষ্ট রচনা হইতেছে 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' (১৮৬২-৬৩)।[১]

এই প্রসঙ্গে বর্দ্ধমানের মহারাজা মহাতাপচাঁদের (১৮২০-৭৯) অপর কীর্ত্তি স্মরণীয়। ইনি বহু পণ্ডিতের আশ্রয়দাতা ছিলেন। ইঁহার উদ্যোগে অনেক শাস্ত্রগ্রন্থের মূল এবং অনুবাদ বিনামূল্যে বিতরিত হয়। রামায়ণের পদ্যানুবাদ, রামায়ণ-মহাভারতের গদ্যানুবাদ, 'সেকেন্দরনামা', 'চাহার দরবেশ', 'হাতেম তাই' ইত্যাদি ফারসী ও উর্দ্দু উপাখ্যানের গদ্যানুবাদ, মস্‌নবির পদ্যানুবাদ প্রভৃতি গ্রন্থও ইনি পণ্ডিত এবং মৌলবী দ্বারা অনুবাদ করাইয়া ছাপাইয়া বিতরণ করিয়াছিলেন। মহাতাপচাঁদ স্বরচিত অথবা সভাকবি-রচিত এবং প্রাচীন বহু গান প্রকাশ করিয়াছিলেন॥

১০

ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের কোঠায় বাঙ্গালা নাটকের জন্ম হয়। পুরানো নাটগীত বা যাত্রা হইতে বাঙ্গালা নাটকের উৎপত্তি হয় নাই। বিলাতি

[১] পরে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

রঙ্গমঞ্চের উপযোগী করিয়া সংস্কৃত নাটককে ইংরেজি নাটকের আদর্শে ঢালিয়াই বাঙ্গালা নাটকের সৃষ্টি। ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে যে দুই-একখানি "নাটক" নামিত বাঙ্গালা রচনা হইয়াছিল তাহার কোন কোনটি সংস্কৃত নাটকের নাট্যানুবাদ হইলেও অভিনয়োপযোগী নয়। এগুলি এবং ইহার পূর্ব্বের নাটক নামিত রচনাগুলি সবই কাব্যাকারে, পদ্যে অথবা গদ্যে-পদ্যে লেখা, নাটকের মত সংলাপময় নয়। এগুলিকে "পাঠ্য অনুবাদ" বলা চলে। ইংরেজি আদর্শ সর্ব্বদা ক্রিয়াশীল থাকিলেও পাশ্চাত্য প্রভাব বাঙ্গালা নাটকের বেলায় ততটা কার্য্যকর হয় নাই যতটা হইয়াছিল কাব্যে এবং উপন্যাসে। ইংরেজি আদর্শ-ঘেঁষা মৌলিক এবং ইংরেজি হইতে অনূদিত নাটক কোনটিই আলোচ্য সময়ে অভিনয়-সৌভাগ্য পায় নাই। সামাজিক নক্‌শা-নাটক ও পৌরাণিক নাটক এবং সংস্কৃত হইতে অনূদিত নাটকই তখন কলিকাতার রঙ্গমঞ্চ জাঁকাইয়া তুলিতেছিল।

কিন্তু বাঙ্গালা প্রহসনের উৎপত্তি ঠিক বাঙ্গালা নাটকের মত নয়। কলিকাতার ও মফস্বলের ধনী ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের কদাচার অথবা সমাজের কুৎসিত রীতি ভেঙচানো ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম দশকে বাঙ্গালা দেশে লোকচিত্তবিনোদনের একটা বিশেষ প্রচলিত পদ্ধতি ছিল। তাহার পর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ভণ্ডামি, ইংরেজি-শিক্ষিতের অভিমানিতা ও সমাজ-সংস্কারব্যগ্রতা, মিশনরিদের ধর্ম্মপ্রচার, বিধবাবিবাহ, অবশেষে ব্রাহ্মধর্ম্ম এইধরণের নক্‌শার বিষয় যোগাইতে লাগিল। গদ্যে-পদ্যে অথবা গদ্যে লেখা এই-সব নক্‌শায় বাঙ্গালা প্রহসনের পূর্ব্বরূপ বিদ্যমান। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা কমলালয়' (১২৩০) ও 'নববাবুবিলাস', অজ্ঞাতনামা লেখকের 'নববিবিবিলাস', বিশ্বনাথ মিত্রের 'কলিরাজার মাহাত্ম্য' (১৮৫০), রামধন রায়ের 'কলিচরিত' (১৮৫৫), নারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধির 'কলিকুতূহল' (১৮৫৩) ও 'কলিকৌতুক' (১৮৫৮) এই ধরণের প্রাক্-প্রাহসনিক রচনা। এইসব রচনার সাহিত্যিক মূল্য নাস্তি। সর্ব্বত্র সুরুচির পরিচয় নাই। সাহিত্যের ইতিহাসে প্রহসনের অগ্রদূত বলিয়াই এগুলির নাম স্মরণীয়॥

৬১

বাঙ্গালা কাব্যে আধুনিকতার সূত্রপাত হইয়াছিল প্রধানত তিনটি ধারায়। প্রথমত হইল চলিত সাহিত্যে ভাবপরিবর্ত্তন। এই ভাবপরিবর্ত্তনের নিদর্শন

পাই (১) অধ্যাত্ম-গীতে ও প্রণয়-সঙ্গীতে, (২) নীতিমূলক কবিতায়, (৩) ঋতু ও প্রাকৃতিক দৃশ্য-বর্ণনাময় কবিতায়, এবং (৪) সামাজিক রীতি অথবা সাময়িক ঘটনাবিষয়ক ছড়ায় ও কবিতায়। ঈশ্বর গুপ্তের অনেক শিষ্য গুরুর অনুসরণে প্রকীর্ণ কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। এইশ্রেণীর বইয়ের মধ্যে আনন্দচন্দ্র বর্ম্মার 'পদার্থপ্রবোধ' (১৮৪৯), দ্বারকানাথ অধিকারীর 'সুধীরঞ্জন' (১৮৫৫), রসিকচন্দ্র রায়ের 'বিজ্ঞানসাধুরঞ্জন' (১৮৫৫) এবং কৃষ্ণকামিনী দেবীর 'চিত্তবিলাসিনী' (১৮৫৬) নাম করা যায়। পদ্যের সঙ্গে গদ্যের ব্যবহার এই সময়ের আখ্যায়িকা অথবা উপদেশমূলক কাব্যে অসুলভ নয়।

দ্বিতীয়ত হইল ইংরেজি গদ্য ও পদ্য আখ্যায়িকার এবং কাব্যের অনুবাদ ও অনুসরণ। সেকালে ফারসী ও হিন্দী আখ্যায়িকার অনুবাদ লোকে আগ্রহ করিয়া শুনিত। তাই প্রথমেই এইসব আখ্যায়িকার ইংরেজি অনুবাদের দিকে লেখকদের দৃষ্টি পড়িল। মূল ফারসীর অনুগত না হওয়ায় এইসকল অনুবাদে বিরক্তিজনক বাগাড়ম্বর বাদ গেল। তাহাতে পূর্ব্বতন মুসলমান লেখকদের অনুবাদের তুলনায় এগুলি সাধারণের অধিকতর ব্যবহারযোগ্য হইল। গ্রন্থকারের বা অনুবাদকের ভনিতা-যোগের রীতিও বর্জ্জিত হইল। এইধরণের পদ্য-আখ্যায়িকার মধ্যে প্রাচীনতম হইতেছে গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নীলমণি বসাক অনূদিত 'পারস্য ইতিহাস' (প্রথম খণ্ড ১৮৩৪), মহেশচন্দ্র মিত্রের 'লয়লা মজনু' (রচনাকাল ১৮৫৩), অজ্ঞাতনামা লেখকের 'কাজির বিচার' (১৮৫৪), হরিমোহন কর্ম্মকারের 'ইসফ্ জেলেখা' (১২৬২) ও 'ক্যেমার জিলম্যানের মনোহর উপাখ্যান' (১২৬২) এবং দ্বারকানাথ কুণ্ডুর 'তুরকীয় ইতিহাস' (১৮৫৯)। মৌলিক ইংরেজি আখ্যায়িকার অনুবাদের মধ্যে প্রথম হইতেছে কালীকৃষ্ণ দেব কৃত গে-র *Fables*-এর অনুবাদ 'হিতসংগ্রহ' (১৮৩৬)।

ইউরোপীয় প্রসিদ্ধ কাব্যের অনুবাদ প্রথম করিয়াছিলেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নবীন কর্ম্মচারী, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্র সার্জেণ্ট (J. Sargent)। ভর্জিলের এনেইদ (*Aeneid*) কাব্যের প্রথম সর্গের অনুবাদ ইনি করিয়াছিলেন। তাহা ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা হইয়াছিল। হোমরের ইলিয়দের প্রথম সর্গ অনুবাদ করিয়া মূলের সহিত প্রকাশ করিয়াছিলেন গিরিশচন্দ্র বসু। ইনি মিল্টনের প্যারাডাইজ্ লষ্ট্ অনুবাদ করিয়াছিলেন 'স্বর্গভ্রষ্ট কাব্য' নামে। এই কাব্যের অপর অনুবাদ শ্রীরামপুর কলেজের ছাত্র

বেচারাম রায় ও বিশ্বম্ভর দত্ত কৃত 'সুখদ-উদ্যানভ্রষ্ট কাব্য' (শ্রীরামপুর জ্ঞানারুণোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে অথবা তৎপূর্ব্বে)। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত 'ভেক-মূষিকের যুদ্ধ' (হোমরের নামে প্রচলিত ব্যঙ্গ কাব্যের অনুবাদ) এবং হরিমোহন গুপ্ত কৃত 'সন্ন্যাসীর উপাখ্যান' (পার্নেলের 'হার্মিট্' কাব্যের অনুবাদ) ইত্যাদি বাহির হয়। ইহার পর উল্লেখযোগ্য হইতেছে গোল্ডস্মিথের সুপ্রসিদ্ধ কবিতার অনুবাদ 'পরিত্যক্ত গ্রাম' (১৮৬২) যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় কৃত।

মহাভারত-রামায়ণ বিবিধ পুরাণ এবং বৈষ্ণব-গোস্বামীদের গ্রন্থ সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালায় রূপান্তরিত হইতে থাকে পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক শতাব্দী হইতে। আলোচ্য সময়েও নূতন করিয়া, মূলানুগত ভাবে, রামায়ণ-মহাভারত এবং শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ পদ্যছন্দে অনূদিত হইতে লাগিল। ধর্ম্ম অথবা তত্ত্ববিদ্যার সহিত কোনই সম্বন্ধ নাই এমন বিশুদ্ধ সংস্কৃত কাব্যের পদ্য-অনুবাদ এই যুগেই প্রথম দেখা গেল। এই ধরণের রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে কালিদাসের কাব্যের অনুবাদ কয়খানি। মেঘদূত অনুবাদ করিয়াছিলেন লালমোহন গুহ ও ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ একত্র (১২৫৭), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬০) এবং ভুবনচন্দ্র বসাক (১৮৬১)। পরবর্ত্তী কালে নীলমণি নন্দী, প্রাণনাথ পণ্ডিত এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত অনুবাদগুলিও সমাদৃত হইয়াছিল। অপর কাব্যানুবাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মাধবচন্দ্র শর্ম্মার 'ঋতুসংহার' (১৮৫৫), প্যারীমোহন সেনগুপ্তের 'কুমারসম্ভব' (১৮৬১) এবং হরিমোহন গুপ্তের 'শকুন্তলা' (১৮৬৯)।

বাঙ্গালা কাব্যে আধুনিকতা-সূত্রপাতের তৃতীয় এবং প্রধান ধারা হইতেছে ইংরেজি আখ্যায়িকা-কাব্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত বীরত্বব্যঞ্জক ও দেশ-প্রেম-উদ্দীপক রোমান্টিক কাহিনীকাব্য। রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এ (১৮৫৮) ইহার সূচনা।

নাটকের ও কাব্যের বিকাশের পর তবে বাঙ্গালা উপন্যাসের উৎপত্তি হইয়াছিল। বাঙ্গালা নাটকের উৎপত্তিতে যেমন ত্রিধারা—সংস্কৃত নাটক, ইংরেজি নাটক এবং দেশী যাত্রা-নকশা, বাঙ্গালা উপন্যাসের উৎপত্তির মূলেও তেমনি ত্রিধারা—পুরানো আদিরসাত্মক কাহিনী, সংস্কৃত ও ইংরেজি আখ্যায়িকা, এবং দেশি নকশা। কিন্তু এই ত্রিধারা হইতে সাক্ষাৎভাবে

উপন্যাসের সৃষ্টি হয় নাই। আধুনিক বাঙ্গালা কাব্যের মত বাঙ্গালা উপন্যাসও প্রধানভাবে ইংরেজি শিক্ষালব্ধ নব রসদৃষ্টি এবং স্বাজাত্যবোধ সঞ্জাত। ইংরেজি রোমান্‌সের আদর্শে ভারতবর্ষীয় ইতিহাসকাহিনীর রূপান্তরে বাঙ্গালা উপন্যাসের জন্ম। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' (১৮৫৭) এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) বাঙ্গালা ভাষার যথাক্রমে প্রথম উপন্যাসিকা ও উপন্যাস, যদিচ ইতিপূর্ব্বে সমসাময়িক সমাজচিত্র যে নভেলের আদর্শের কাছাকাছি পৌঁছাইয়াছিল। তাহার প্রমাণ প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৫-৫৮)।

গদ্যে অথবা গদ্যে-পদ্যে বিরচিত প্রাচীনধরণের আদিরসাত্মক কাহিনী আলোচ্যযুগের পরেও সাধারণ পাঠকের কাছে সমাদর হারায় নাই। সাহিত্যিক গুণ না থাকিলেও এই ধরণের আখ্যায়িকা সবই অবজ্ঞেয় নয়। গদ্যে-পদ্যে লেখা নবীনকালী দেবীর 'কামিনী কলঙ্ক'-এর (১২৭৭) কাহিনীতে রচয়িত্রীর আত্মকথার ছায়া আছে বলিয়া মনে হয়, এবং সেই জন্য ইহা বাঙ্গালায় প্রথম বাস্তব উপন্যাসের প্রচেষ্টা বলিয়া দাবি করিতে পারে।[১]

সংস্কৃত আখ্যায়িকার এবং দেশি রূপকথার পদ্ধতিতেও অনেকগুলি আখ্যায়িকা লেখা হইয়াছিল। এইধরণের একটি বইয়ে—গোপীমোহন ঘোষের 'বিজয়বল্লভ'-এ (১৮৬৩)—উপন্যাসের আদর্শ অনুকরণের ব্যর্থ প্রচেষ্টা দেখা যায়। বিদ্যাসাগরী পাঠ্যপুস্তকরীতি যে উপন্যাসে অচল তাহার প্রমাণ এই বইটি। বিজ্ঞাপনে গ্রন্থকার যদিও বলিয়াছেন "ইংলণ্ডীয় ভাষায় নবল নামে মনোহর প্রসিদ্ধ উপাখ্যান গ্রন্থ যে প্রণালীতে সঙ্কলিত হইয়া থাকে, সেই প্রণালী অনুসারে এই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে", তথাপি কি প্লটে কি চরিত্রচিত্রণে কোথাও বিলাতি উপন্যাসের স্বাদগন্ধ পাওয়া যায় না॥

[১] ইঁহার অপর উপন্যাস 'কিরণমালা' (১৮৭৮)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নাটক ঃ ১৮৫২-১৮৭২

১

বিলাতি ষ্টেজ-অভিনয় দেখিয়াই আমাদের দেশের লেখকেরা নাটক লেখায় উৎসাহিত হইয়াছিলেন। নাটক বলিতে এখন যাহা বুঝি তাহা আমাদের দেশে ইংরেজ আমলের আগে ছিল না। তখন ছিল যাত্রা। তাহার সহিত নাটকের খানিকটা মিল আছে নিশ্চয়ই, অমিলও আছে অনেকটা। বাঙ্গালা নাটকের উৎপত্তি যাত্রা হইতে হয় নাই, তবে যাত্রার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল।

আমাদের দেশে ইংরেজ আমলের পূর্ব্বে যাত্রা-পালা কেমন ছিল তাহা বুঝিতে পারি নেপাল দরবারের কবিদের লেখা পৌরাণিক নাটকগুলিতে। এগুলির রচনাকাল সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী। যাত্রার রঙ্গমঞ্চে পদার বালাই ছিল না, পশ্চাৎপট দৃশ্যপট ইত্যাদিও অজ্ঞাত ছিল। ভূমিকাগুলি রঙ্গভূমিতে আসিয়া আপন আপন পরিচয় দিত। সংলাপের কাজ হইত গানে কিংবা ছড়ায়, ক্বচিৎ গদ্যে। গদ্য অংশ সাধারণত উপস্থিত রচনা হইত। আবশ্যক হইলে কাহিনীর ধারাবাহিকতা রক্ষা করিত অধিকারী পয়ারে অথবা ছড়ায়। যাত্রার অধিকারী সাধারণত মধ্যস্থ ভূমিকা গ্রহণ করিত। অধিকারী ও বাদকগণ ছাড়া যাত্রার দলের সকলেই ছিল অল্পবয়স্ক, তাহাতে আবশ্যকমত নারীভূমিকা অভিনয়ে সুবিধা হইত।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'মায়া' কবিতায় সেকালের (ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ-পঞ্চম দশকের) যাত্রার দলের কিছু বর্ণনা আছে। যৎকিঞ্চিৎ হইলেও বর্ণনাটি মূল্যবান্।

জলধর বাদ্যকর বাদ্য করে কত,
সমীরণ সঙ্গীত করিছে অবিরত।
ছয় কালে ছয় কাল হয় ছয় রূপ
রঙ্গভূমে ব্যঙ্গ করে ভাঁড়ের স্বরূপ।
অধিকারী একমাত্র অখিল-পালক,
আমরা সকলে তাঁর যাত্রার বালক।

প্রকৃতি-প্রদত্ত সবে শরীরেতে লয়ে
বহুরূপ সঙ সাজি বহুরূপী হয়ে।...
ওহে জীব ভাল তুমি রঙ করিয়াছ
তিন কালে তিন রূপ সঙ সাজিয়াছ।...
ভাল করে যাত্রা কর বুঝে অভিপ্রায়
তাই কর অধিকারী তুষ্ট হন যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, বাঙ্গালা নাটক লেখা হইবার আগে, যাত্রা-পালার রূপ কেমন দাঁড়াইয়াছিল তাহা একটি অপ্রকাশিত 'সীতাহরণ' পালার পুথি হইতে জানিতে পারি। ভূমিকা এই কয়টি—রাম সীতা লক্ষ্মণ শূর্পণখা রাবণ মারীচ ও জটায়ু। তাহা ছাড়া শুক শারি আছে। অধিকারীরও স্বতন্ত্র ভূমিকা—তাহা কেবল কাহিনীর খেই যোগাইবার কথক রূপে। একই ব্যক্তি একাধিক ভূমিকা গ্রহণ করিত সন্দেহ নাই। রচনা গন্থ-পদ্য, গান-ছড়া মিশ্রিত। "কথা" এবং "উক্তি" গদ্যে লেখা; "ছড়া" পয়ার বা ত্রিপদী পদ্য; "গান" রাগরাগিণী সংবলিত; "ঢপ" বর্ণনাত্মক অথবা আঁখরের মত সংক্ষিপ্ত গান।

এই উদ্ধৃতি হইতে রচনারীতি বোঝা যাইবে। যোগিবেশে রাবণ সীতার কাছে ভিক্ষা মাগিতে আসিয়াছে।

সীতার কথা। ওহে যোগীবর ধর এই ভিক্ষা নেও।
রাবণের কথা। সীতে ভিক্ষা নিতেছি।
এই বইলে সীতার হাত ধইরে রেখার অন্তরে আনয়ন করিলে।
সীতার কথা। যোগীবর একি ? হায় হায় জাতিনাশের লক্ষণ ছাড় ছাড় একি কদয্য কাজ।[১]
ওহে যোগীরাজ পাপমতি ত্যাগ কর ছিছি একি যোগীর কর্ম্ম হায় হায় অবলার হাত ছাড়।
অধিকারীর উক্তি। কথা ও ছড়া
রাবণ হস্তে পতিতা সীতা কিরূপ ভীতা হইয়াছে তাহা বলি শুন—
রাহু দশনে চন্দ্র সূর্য্য জেন কম্পমান।
দস্যুভয়ে সাধু হয় জেমন অজ্ঞান॥...
সীতার কথা। ওহে যোগীবর তোমার এরূপ অত্যাচার কেন ছাড় ছাড় আমার অন্তরে দুঃখ দিয় না।[২]

রাবণ সীতাকে রথে তুলিয়াছে। তাহার পর

সীতার কথা। হায় হায় কোথায় আমার দেবর লক্ষ্মণ একবার বিপদকালে শীঘ্র আইস মৃগতৃষ্ণা ন্যায় আমার মৃগ আনন হইএছে।
ঢপ। কোথায় শ্রীরাম চিন্তামণি
একবার বিপদকালে আইস দেবর লক্ষ্মণ মণি।

[১] অতঃপর ৪১ নম্বর গান।
[২] অতঃপর সীতার উক্তি ছড়া ও ৪২ নম্বর গান।

২

বিলাতি ধরণের রঙ্গমঞ্চে বাঙ্গালা নাটকের অভিনয় প্রথম হইয়াছিল কলিকাতায় ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর তারিখে। হেরাসিম লেবেডেফ (Herasim Lebedeff) নামে এক রুশীয় এই কাজ করিয়াছিলেন। ইহাই বাঙ্গালা নাট্যাভিনয়ের তথা অভিনয়যোগ্য নাট্যরচনার সূত্রপাত। লেবেডেফ তাঁহার এই প্রচেষ্টার ইতিহাস তাঁহার হিন্দী ব্যাকরণের ভূমিকায় যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে উপযুক্ত অংশ নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিতেছি।[১]

মাদ্রাজ হইতে লেবেডেফ কলিকাতায় আসেন ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে। দুই বছর এখানে থাকিবার পর তিনি দেশি ভাষা শিখিতে লাগিয়া যান। লেবেডেফ লিখিয়াছেন,

> আমার সরকার আমাকে একজন স্কুলমাষ্টারের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেন। নাম শ্রীগোলোক-নাথ দাস (Shree Golocknat-dash)। বাঙ্গালার ও মিশ্র ভাষাগুলির ব্যাকরণে ইঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল এবং ইনি সংস্কৃত ভাষাও ভালোরকম বুঝিতে পারিতেন।

[১] *The Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects* (লণ্ডন ১৮০১)। নামপত্রে ভারতচন্দ্রের কাব্য হইতে এই কয়ছত্র উদ্ধৃত আছে,

> Shoono anondit, Raja kohilo taharc ;
> beia-koron adic shastro poraho Beddcre.
> Aggo pae beprobor beddere poray ,
> beia-koron adie kabbeo shongito nirnoy.
> Joitish, tipponie, tica, koteco percar ,
> alpo cale bahoo shashtre hoilo odhicar.
> Chitro korie ak-shloc lekelec pate ,
> nijo poriechoy deia tooilo tahate.

Beddc Shoondar, Vol. 1. Shrie Chondro Riy. বাঙ্গালায় অক্ষরান্তরিত করিলে এই পাঠ দাঁড়ায়,

> শুন আনন্দিত, রাজা কহিল তাহারে ;
> বেয়াকরন আদী শাস্ত্র পড়াহ বেদ্দেরে।
> আজ্ঞে পাএ বিপ্রবর বেদ্দেরে পড়ায় ,
> বেয়াকরন আদী কাব্য শঙ্গিত নির্ণয়।
> জৈতিষ, টিপ্পনী, টিকা, কতেক পের্‌কার ,
> অল্প কালে বহু শাস্ত্রে হইল অধিকার।
> চিত্র করী এক-শ্লোক লেকেলেক (= লেখিলেক) পাতে ;
> নিজ পরীচয় দেইআ তুইল (= থুইল) তাহাতে।
> বেদ্দে শুন্দর প্রথম খণ্ড শ্রী [ভারত] চন্দ্র রায়।

তখন লেবেডেফের মন গিয়াছে হিন্দী ও বাঙ্গালা ব্যাকরণ রচনায়।[১] ব্যাকরণের খসড়া তৈয়ারি হইলে পণ্ডিতদের দেখাইলেন।

আমার পরিশ্রমের ফল আমি নিঃসঙ্কোচে কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিতের কাছে পেশ করিলাম,—জগন্মোহন বিদ্যাপঞ্চানন ভট্টাচার্যের কাছে, জগন্নাথ তর্কর[২] কাছে, এবং অন্যান্য বিদ্বান পণ্ডিতদের কাছে।

পণ্ডিতদের অনুমোদন পাওয়া গেলে পর লেবেডেফ বাঙ্গালা এবং হিন্দী উভয় ভাষাতেই শব্দকোষ সংকলন করিলেন এবং সাধারণ কাজের, প্রতিদিনের ব্যবহারের এবং বৈজ্ঞানিক বিষয়ের উপযুক্ত কথোপকথন-মালা রচনা করিলেন।

এই সব গবেষণার পর আমি ইংরেজি হইতে বাঙ্গালায় দুইটি নাট্যরচনা অনুবাদ করিলাম, যথা—ছদ্মবেশ এবং প্রেমই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক।[৩] আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে ভারতবর্ষীয়েরা সোজাসুজি গম্ভীর বাস্তব বুদ্ধিভাবনার—তাহা যতই শুদ্ধ ও সুন্দর ভাবে বলা হউক না কেন—তাহার অপেক্ষা ভেংচানি ও ভাঁড়ামি বেশি পছন্দ করে;[৪] তাই আমি ওই নাটক দুইটি নির্বাচন করিয়াছিলাম এবং তাহার মধ্যে অতি সুন্দরভাবে ঢুকাইয়া দিয়াছিলাম একদল পাহারাওয়ালা—"চৌকীদার", নটী (?)—"কানেরা", চোর—"ঘুনিয়া", আইনজীবী—"গোমস্তা", এবং বাদবাকির মধ্যে এক ঝাঁক ছিঁচকে লুঠেরা।

আমার অনুবাদ সমাপ্ত হইলে আমি কয়েকজন পণ্ডিতকে আমন্ত্রণ করিলাম; তাঁহারা মনোযোগ দিয়া রচনাটি পড়িলেন, এবং তখন আমি বুঝিবার সুযোগ পাইলাম কোন্ কোন্ বাক্যগুলি তাঁহাদের সবচেয়ে ভালো লাগিয়াছিল এবং কোন্ কোন্ অংশ মনে ভাব জাগাইয়াছিল। আমার বিশ্বাস আমি নিজেকে অযথা বাড়াইব না যদি জোর করিয়া বলি যে এই অনুবাদে হাস্য ও গম্ভীর দুই দৃশ্যই যথেষ্ট উন্নীত হইয়াছে এবং এ কাজের অনুকরণে কোন ইউরোপীয়ই সমর্থ হইবে না যদি না সে আমার মত শিক্ষক পাইবার অসাধারণ সুযোগ সৌভাগ্য পাইয়া থাকে।[৫]

[১] লেবেডেফের হিন্দী ব্যাকরণ হইতে বোঝা যায় যে ও ভাষায় তাঁহার দখল ভালো হয় নাই, এবং তাঁহার সংস্কৃত জ্ঞান আরও কম ছিল। হয়তো এই কারণেই তাঁহার স্পষ্ট বিরাগ ছিল স্যার উইলিয়ম জোন্স্ ও অন্যান্য বিদেশি পণ্ডিত যাঁহারা ভারতীয় ভাষা চর্চা করিতেছিলেন তাঁহাদের প্রতি। জন ফার্গুসনের হিন্দুস্থানী ব্যাকরণের বিরুদ্ধে কটাক্ষ যথেষ্ট আছে।

[২] জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ?

[৩] "I translated two English dramatic pieces, namely, The Disguise, and Love is the best doctor, into the Bengali language."

[৪] "having observed that the Indians preferred mimicry and drollery to plain grave solid sense, however purely expressed".

[৫] "When my translation was finished, I invited several learned Pundits, who perused the work very attentively; and I then had the opportunity of observing those sentences which appeared to them most pleasing, and which most excited emotion; and I presume I do not much flatter myself, when I affirm that by this translation the spirit of both the comic and

পণ্ডিতদের অনুমোদনের পর আমার ভাষা-শিক্ষক গোলোকনাথ দাস[১] আমার কাছে প্রস্তাব করিলেন, যদি আমি নাট্যরচনাটি সাধারণ্যে অভিনয় করিতে চাই তাহা হইলে তিনি দেশি নটনটী[২] জোগাড় করিবার ভার লইতে পারেন। এ প্রস্তাবে আমি অত্যন্ত খুশি হইলাম। যাহাতে আমার রচনাটি ইউরোপীয় জনসাধারণের সম্মুখে অবিলম্বে অভিনীত হইতে পারে সেজন্য গভর্ণর জেনেরেল স্যার জন শোর (অধুনা লর্ড টেন্‌মাউথ)-এর কাছে নিয়মমত লাইসেন্‌স্ চাহিলাম। তিনি দ্বিধা না করিয়া লাইসেন্‌স দিলেন।

লেবেডেফ ডোমতলায় (ডোম লেন) থাকিতেন। স্থানটি কলিকাতার কেন্দ্রে, অধুনা রাধাবাজার এজরা ষ্ট্রীট অঞ্চল। এইখানেই তিনি থিয়েটার নির্ম্মাণ করাইলেন।

তিন মাসের মধ্যে ষ্টেজ তৈয়ারি হইল এবং অভিনেতৃবর্গও প্রস্তুত হইল ছদ্মবেশী অভিনয় করিতে। রচনাটি বাঙ্গালা ভাষায় সাধারণের সমক্ষে যথারীতি অভিনীত হইল ২৭শে নভেম্বর ১৭৯৫ তারিখে এবং পুনরায় ২১শে মার্চ ১৭৯৬ তারিখে।

দুইদিনই দর্শকের খুব ভিড় হইয়াছিল। গভর্ণর জেনেরেল খুশি হইয়া লেবেডেফকে ইংরেজি ও বাঙ্গালা দুই ভাষাতেই অভিনয় করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। কিন্তু কি কারণে জানি না নাটক-অভিনয়ে লেবেডেফের অকস্মাৎ উৎসাহহীনতা দেখা দিল এবং তিনি সংস্কৃত বাঙ্গালা হিন্দী প্রভৃতি ভাষা ও ইতিহাস এবং জ্যোতিষের অনুশীলনে মনোযোগী হইয়া পড়িলেন। তাহারই প্রথম এবং একমাত্র ফল হিন্দীভাষার ব্যাকরণ॥[৩]

৩

লেবেডেফের অভিনয়ের পর কলিকাতায় ষ্টেজে নাট্যাভিনয়ের খোঁজ পাওয়া যায় অনেককাল পরে। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের শেষ দিকে শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসু তাঁহার ভবনে বিলাতি ধরণের রঙ্গমঞ্চ তৈয়ারি করাইয়া বাঙ্গালী নটনটীর দ্বারা বিদ্যাসুন্দর নাট্যাভিনয় করাইয়াছিলেন।[৪]

লেবেডেফের ও নবীনচন্দ্র বসুর প্রচেষ্টার কথা ছাড়িয়া দিলে বাঙ্গালা নাটকের প্রথম অভিনয় হয় আশুতোষ দেবের বাড়ীতে। এখানে সর্ব্বপ্রথমে অভিনীত

serious scenes were much heightened, and which would in vain be imitated by any European who did not possess the advantage of such an instructor as I had the extraordinary good fortune to possess."

[১] "Golucknat-dass, my linguist."

[২] "actors of both sexes from among the natives."

[৩] আমাদের কাছে এই বইয়ের তথা লেবেডেফের অভিনয়ের কথা গ্রীয়র্সন প্রথম শুনাইয়াছেন (ক্যালকাটা রিভিউ ১৯২৩, পৃ ৮৪-৮৫)।

[৪] বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (দ্বি-স), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ১৩।

হইয়াছিল (৩০ জানুয়ারি ১৮৫৭)[১] নন্দকুমার রায়ের অভিজ্ঞান-শকুন্তলা নাটক (১২৬২, দ্বি-স ১২৮৯)।

তাহার পরে উল্লেখযোগ্য অভিনয় হইতেছে রামজয় বসাকের বাড়ীতে রামনারায়ণ তর্করত্নের কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব নাটকের অভিনয় (মার্চ্চ ১৮৫৭)।[২] তাহার পরে কালীপ্রসন্ন সিংহের গৃহে বিদ্যোৎসাহিনী সভার রঙ্গমঞ্চে (১৮৫৭) রামনারায়ণের বেণীসংহার নাটকের এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের অভিনয়। তাহার পর বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এবং বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে বোধ করি সবচেয়ে গুরুতর ঘটনা বেলগাছিয়ায় পাইকপাড়ার রাজাদের বাগান-বাড়ীতে রামনারায়ণের রত্নাবলী নাটক ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের অভিনয় (১৮৫৮-৫৯)। অতঃপর সিঁদুরিয়াপটীতে পূর্ব্বতন মেট্রোপলিটান কলেজ গৃহে উমেশচন্দ্র মিত্রের বিধবা-বিবাহ নাটকের অভিনয় (১৮৫৯) এবং পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর-বাড়ীর রঙ্গমঞ্চে রামনারায়ণের একাধিক নাটক-প্রহসনের অভিনয়। তাহার পর উল্লেখযোগ্য হইতেছে শোভাবাজার রাজবাড়ীতে (১৮৬৫ ?) মধুসূদনের একেই-কি-বলে-সভ্যতা ও কৃষ্ণকুমারী নাটকের অভিনয়, জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ীতে রামনারায়ণের নবনাটক, মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী নাটক ইত্যাদির অভিনয়, এবং বহুবাজার অবৈতনিক নাট্যসমাজে মনোমোহন বসুর রামাভিষেক নাটক, সতী নাটক ও হরিশ্চন্দ্র নাটকের অভিনয়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সাধারণ রঙ্গমঞ্চ বা পাবলিক থিয়েটারের প্রতিষ্ঠায় বাঙ্গালা নাট্যাভিনয়ের শখের পর্ব্বের শেষ হইল বলা যায়॥

৪

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে "নাটক" নামে অনেক বই গদ্যে পদ্যে অথবা গদ্যে-পদ্যে লেখা হইয়াছিল। এগুলি হয় সংস্কৃত নাটকের পাঠ্য অনুবাদ, যেমন রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের 'কৌতুকসর্ব্বস্ব নাটক' (১২৩৫), নয় আদিরসাত্মক অথবা উপদেশমূলক আখ্যায়িকা বা নকশা, যেমন পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রমণী নাটক' (১৮৪৮) ও 'প্রেম নাটক' (১২৬০) এবং দ্বারিকানাথ রায়ের 'বিশ্বমঙ্গল নাটক' (১৮৪৫)। এইগুলিকে বাঙ্গালা নাটকের প্রাচীনতম নিদর্শন মনে করা ভুল। এই সময়ে সংস্কৃত অধ্যাত্ম-রূপক নাটক প্রবোধচন্দ্রোদয়ের অনুবাদ

[১] ঐ পৃ ৩১। [২] ঐ পৃ ৩৬।

অনেকগুলিই লেখা হইয়াছিল। কিন্তু দুই-একটি ছাড়া কোনটিই নাটক-আকারে নয়। সবচেয়ে পুরানো অনুবাদ হইতেছে 'আত্মতত্ত্বকৌমুদী' (১৮২২)। জগদীশের 'হাস্যার্ণব' প্রহসনের অনুবাদও (১৮২২) নাটকাকারে নয়। নীলমণি পাল রত্নাবলী নাটকের অনুবাদ করিয়াছিলেন (১৭৭১ শকাব্দ = ১৮৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দ)। ইহাও গদ্যপদ্যাকারে পাঠ্য গ্রন্থ ॥

৫

ঠিক অভিনয়ের উদ্দেশ্যে লেখা না হইলেও সংস্কৃত নাটকের নাট্যানুবাদ লইয়াই ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝের দিকে বাঙ্গালায় নাটক-ছাঁদের রচনার সূত্রপাত হইয়াছিল। যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন অনূদিত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকই এই ধরণের প্রথম লেখা (রচনাকাল ১২৪৬, প্রকাশ ১৮৭১)।[১] বিশ্বনাথের অনুবাদে নাটকের প্রাচীন ঠাট বজায় আছে। প্রারম্ভে পয়ারে বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রহিয়াছে। শ্লোকগুলির পদ্য অনুবাদ যথাসম্ভব যথাযথ। সংলাপের গদ্য অংশের ভাষা প্রাচীনধরণের হইলেও উৎকট নয়। তোটক ছন্দে একটি গান এবং জয়দেবের ছন্দে একটি স্তোত্র আছে।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ জুন তারিখের সংবাদ-প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রামতারক ভট্টাচার্য্য কৃত "গৌড়ীয় গদ্যে পদ্যে শ্রীমন্মহাকবি কালিদাস বিরচিত অভিজ্ঞান শকুন্তলা নামক সুবিখ্যাত নাটকগ্রন্থের" (জ্ঞানদর্পণ যন্ত্রে মুদ্রাপ্যমান) যে অনুবাদের কথা বলিয়াছেন, তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল কিনা বলিবার উপায় নাই, এবং ঈশ্বরচন্দ্রের উক্তি হইতে ইহাও সিদ্ধান্ত করা যায় না যে অনুবাদটি ঠিক নাটক-আকারেই হইয়াছিল।

ভদ্রার্জ্জুন নাটকের (১৮৫২) "বিজ্ঞাপন" হইতে জানা যায় যে ইতিপূর্ব্বে কয়েকটি সংস্কৃত নাটকের নাট্যানুবাদ হইয়াছিল। কিন্তু সেগুলির এখন উদ্দেশ নাই ॥

[১] প্রকাশক উৎসর্গপত্রে লিখিয়াছেন, "আমাদিগের পিতা ৺ বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় শ্রীকৃষ্ণমিশ্র বিরচিত, সুপ্রসিদ্ধ, সংস্কৃত নাটক দৃষ্টে সন ১২৪৬ সালে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া অল্পকাল পরে লোকান্তরিত হয়েন, এজন্য তাঁহার জীবিতাবস্থায় ইহা মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয় নাই। সকল বিষয়ে সুযোগ না হওয়ায় আমরাও এই ৩১ বৎসরের মধ্যে ইহা প্রকাশ করিতে পারি নাই।" বিশ্বনাথ দুইখানি কবিতার বইও লিখিয়াছিলেন 'কাব্যকৌমুদী' এবং 'কৃষ্ণকেলিকল্পলতা' নামে।

৬

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার মৌলিক নাট্যরচনার পত্তন হইল 'কীর্ত্তিবিলাস' ও 'ভদ্রার্জ্জুন' নাটকের দ্বারা। গ্রন্থের নামপত্র না পাওয়ায় কীর্ত্তিবিলাস নাটকের লেখকের নাম জানা যায় না। লঙ্ তাঁহার মুদ্রিতগ্রন্থের তালিকায় লেখকের নাম দিয়াছেন জি. সি. গুপ্ত।[১] রচনা অমার্জ্জিত এবং বিশৃঙ্খল হইলেও বিষাদান্তনাটক-রচনায় প্রথম প্রচেষ্টা বলিয়া কীর্ত্তিবিলাসের ঐতিহাসিক মূল্য আছে। লেখক যে ইংরেজি সাহিত্যে অনভিজ্ঞ ছিলেন না তাহা ভূমিকা হইতে জানা যায়। ভারতীয় সাহিত্যে মরণান্তিক নাটকের বিধি নাই অথচ লেখক বিষাদান্ত নাটক লিখিতেছেন, তাই কৈফিয়তে একটি দীর্ঘ ভূমিকা সংযোজিত হইয়াছিল। ভূমিকায় তখনকার দিনের যাত্রা-গানের অবজ্ঞেয় অবস্থার উল্লেখ আছে। লেখক প্রথমে ট্রাজেডির সমর্থন করিয়াছেন,

> অনেকের এইরূপ ভ্রান্তি জন্মাইতে পারে যে, যে অভিনয় অবলোকন করিলে অন্তরে অশেষ শোক উপস্থিত হয়, সে অভিনয় দর্শন করিতে কিরূপে মানবগণ স্বভাবতঃ অভিলাষী হইবে। অত্যল্প বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে শোকজনক ঘটনা আন্দোলন করিলে মনোমধ্যে এক বিশেষ সুখোদয় হয়, একারণ সেক্সপিয়ার নামা ইংলণ্ডীয় মহাকবি লিখিয়াছেন—
>
> আমার অন্তঃকরণ শোকানলে দহন হইতেছে, তথাপি আমার মন অবিরত ঐ শোক প্রয়াসী।...

শেষে সমসাময়িক যাত্রাগানের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন,

> অস্মদ্দেশীয় লোকেরা করুণাভিনয় করিয়া অবশেষে সেই ব্যক্তির সুখাভিনয় করিলে ইহা না করিলে অধর্ম্মভোগী হইতে হইবে তাহা স্থির জানিতেন। অদ্যাবধি যাত্রার সময়ে অধিকারী কোন বীরের মরণান্তর সে বীরের উদ্ধার না করিয়া যাত্রা বন্ধ করে না+।
>
> [+অনেকেই অবগত আছেন, যে বঙ্গদেশে যাত্রানামে এক প্রকার অভিনয় সাধারণ জনগণের মনোনীত হইয়াছে বাস্তবিক ইহা মন্দ নহে। কিন্তু বঙ্গদেশীয় প্রচলিত ব্যবহার দ্বারা এই অভিনয় ক্রমশঃ অপকৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাহার হেতু এই, যে যাত্রার গীত ও পয়ার রচকেরা অধিকাংশ সামান্য অজ্ঞ ব্যক্তি সুতরাং সমস্ত বিরস হইয়া উঠে। যদি সাধারণের উৎসাহে পণ্ডিত লোকেরা সমস্ত রচনা করে তবে যাত্রার উৎকৃষ্টতা জন্মে তাহার কি সন্দেহ।]
>
> দেশ বিশেষে মানবগণের মনের ভাব ভিন্ন ভিন্ন হয়। শীতলদেশ নিবাসিগণ স্বভাবতঃ প্রগাঢ় চিন্তায় মত্ত হইতে অভিলাষ করে, কিন্তু উষ্ণদেশীয় লোকেরা হাস্যরসে প্রবৃত্ত।

[১] কেহ কেহ মনে করেন পূর্ণ নাম যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত। কিন্তু "যোগেন্দ্র" নামের আদ্যক্ষর ইংরেজিতে G হইবে না, J কিংবা Y হইবে।

'কীর্ত্তিবিলাস' বর্দ্ধমান সাহিত্য-সভা কর্তৃক পুনঃপ্রকাশিত হইতেছে।

বঙ্গদেশ অতিশয় উষ্ণ সুতরাং বঙ্গদেশীয় লোকেরা হাস্যরসাভিনয় অবলোকন করিতে সদাই অভিলাষী *।

[* উষ্ণ দেশীয় লোকেরা প্রেম বিষয়ে বিশেষরূপে অনুরাগী সুতরাং বঙ্গদেশীয় মনুষ্য-সমূহ প্রেম বিষয়ক রচনা পাঠ করিতে বাসনা করে।]

কীর্ত্তিবিলাস পঞ্চাঙ্ক নাটক। প্রত্যেক অঙ্ক বিভিন্ন "অভিনয়" নামক দৃশ্যে বিভক্ত। নান্দী পদ্যে, এবং "নান্দ্যন্তে সূত্রধার" অর্থাৎ প্রস্তাবনা আছে। সংস্কৃত নাটকের অনুগতি এই পর্য্যন্তই।

বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা হইলে সাধারণত সংসারে যে বিপদ ঘটে তাহাই নাটক-কাহিনীর প্রতিপাদ্য। কাহিনীতে বাঙ্গালা দেশের একটি বিশিষ্ট রূপকথার আভাস আছে—বিমাতার বিরূপতায় মাতৃহারা ভ্রাতৃদ্বয়ের লাঞ্ছনা এবং অনুগত ভৃত্যের সান্ত্বনা। হেমপুরাধিপতি মহারাজ চন্দ্রকান্তের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ যুবরাজ কীর্ত্তিবিলাস, কনিষ্ঠ মুরারি। বিপত্নীক রাজা বৃদ্ধবয়সে নলিনীকে বিবাহ করিলে নলিনীর ভ্রাতা রাজচন্দ্র রাজার পরামর্শদাতা হইল। রাজার এক পারিষদ প্রাণনাথ অত্যন্ত দুরাচার এবং লম্পট। তাহাকে দমন করিতে গিয়া কীর্ত্তিবিলাস তাহার শত্রুতা অর্জ্জন করিল। এদিকে রানী সপত্নীপুত্র কীর্ত্তি-বিলাসের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। তাহার মনের কথা জানিয়া কীর্ত্তিবিলাস তাহাকে ঘৃণা করিতেছে ভাবিয়া রানী রাজার কাছে কীর্ত্তিবিলাসের বিরুদ্ধে কুৎসিত অভিযোগ আনিল। রাজা প্রথমে পুত্রের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিল, কিন্তু পরে অনুতপ্ত হইয়া তাহা রহিত করিল এবং অকস্মাৎ পীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। যখন কীর্ত্তিবিলাস মুমূর্ষু পিতার কাছে আটক পড়িয়া গিয়াছে,—তখন তাহার আগমনে বিলম্ব দেখিয়া তাহার পত্নী সৌদামিনী পতির প্রাণদণ্ড হইতেছে মনে করিয়া আত্মহত্যা করিল। ফিরিয়া আসিয়া পত্নীর অবস্থা দেখিয়া কীর্ত্তিবিলাস আত্মঘাতী হইল। ইহাই কীর্ত্তিবিলাসের কাহিনী।

নাটকটিতে শেক্‌স্‌পিয়রের হ্যাম্‌লেটের অনুকরণ প্রচেষ্টা আছে। নায়ক কীর্ত্তিবিলাসের হ্যাম্‌লেটের মত।

যুবরাজের বন্ধু মেঘনাথ প্রথমে যখন ছদ্মবেশে রাজার সহিত পরিচিত হইয়া অনুচররূপে গৃহীত হইল তখন তাহার সেই "চটুল লোকের" ভূমিকায় দেশীয় রীতিতে হাস্যরসের চেষ্টা আছে।

কীর্ত্তিবিলাস গদ্যে-পদ্যে রচিত। পদ্যের ও গদ্যের ছাঁদ পুরানো এবং

তাহাতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। স্বগতোক্তির বাহুল্য আছে। কয়েকটি গানও আছে, তবে রাগরাগিণীর উল্লেখ নাই। নাটকটি অভিনীত তো হয়ই নাই, পাঠ্য বই রূপেও প্রচারলাভ করে নাই॥

কীর্ত্তিবিলাস নাটকের সঙ্গে সঙ্গে তারাচরণ শীকদারের 'ভদ্রার্জ্জুন' (১৮৫২) প্রকাশিত হয়।[১] ইহাই ইংরেজি ও সংস্কৃতের যুক্ত আদর্শে রচিত প্রথম মৌলিক মধুরান্তিক বাঙ্গালা নাটক। ভদ্রার্জ্জুনের কাহিনী পৌরাণিক কিন্তু পরিকল্পনায় সংস্কৃত নাটকের আদ্যন্ত অনুকরণ নাই। তবে নান্দী-প্রস্তাবনা এবং বিদূষক-ভূমিকা বাদ দেওয়া ছাড়া সংস্কৃত রীতির কোন উৎকট উল্লঙ্ঘনও নাই। নাটকটি কীর্ত্তিবিলাসের মতই পঞ্চাঙ্ক। ইংরেজি রীতি অনুসারে অঙ্ক বিভক্ত হইয়াছে "সংযোগস্থল"-এ অর্থাৎ দৃশ্যে। ইংরেজি নাটকের Prologue-এর মত গ্রন্থারম্ভে ("আভাস") কাহিনীর পূর্বকথা পয়ারে বর্ণিত হইয়াছে।

সে-সময়ে বাঙ্গালা দেশে যাত্রার গীত-অভিনয় যে কতটা অনুন্নত ছিল সে বিষয়ে ইঙ্গিত করিয়া তারাচরণ ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে বাঙ্গালা ভাষায় প্রকৃত অভিনয়োপযোগী নাটক রচনার উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন।

> এতদ্দেশীয় কবিগণ প্রণীত অসংখ্য নাটক সংস্কৃত ভাষায় প্রচারিত আছে, এবং বঙ্গভাষায় তাহার কয়েক গ্রন্থের অনুবাদও হইয়াছে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, যে এদেশে নাটকের ক্রিয়া সকল রচনার শৃঙ্খলানুসারে সম্পন্ন হয় না। কারণ কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদায় বিষয় কেবল সঙ্গীত দ্বারা ব্যক্ত করে এবং মধ্যে মধ্যে অপ্রয়োজনার্হ ভণ্ডগণ আসিয়া ভণ্ডামি করিয়া থাকে। বোধ হয়, কেবল উপযুক্ত গ্রন্থের অভাবই ইহার মূল কারণ। তন্নিমিত্ত মহাভারতীয় আদি পর্ব্ব হইতে সুভদ্রা হরণ নামক প্রস্তাব সঙ্কলন করিয়া এই নাটক রচনা করিলাম।

কীর্ত্তিবিলাসের মত ভদ্রার্জ্জুনও কখনো অভিনীত হয় নাই, পাঠ্যরূপেও আদৃত হয় নাই।

ভদ্রার্জ্জুন সার্থক রচনা নয়। বলদেব ছাড়া কোন প্রধান ভূমিকাই ফুটে নাই। অপ্রধান ভূমিকাগুলি মন্দ নয়, বিশেষ করিয়া ভীম রোহিণী এবং দুঃশাসন। সপত্নী দেবকীর পছন্দ না হইলেও বলদেবের নির্ব্বাচিত পাত্র বলিয়া দুর্য্যোধনকে সুভদ্রার যোগ্য পাত্র বলিয়া সমর্থন করায় রোহিণী-চরিত্রে একটু বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে। নায়িকা সুভদ্রার ভূমিকা একেবারে ব্যর্থ।

[১] শ্রীসুকুমার সেন ও শ্রীকালীপদ সিংহের সম্পাদনায় পুনর্মুদ্রিত।

বাড়ীর ছাদ হইতে দেখিয়াই অর্জ্জুনের প্রেমে পড়া বিসদৃশ। নায়ক অর্জ্জুনের চরিত্রে দৃঢ়তা আছে। কৃষ্ণের ভূমিকা নিতান্ত অবান্তর। ননদ হিসাবে সত্যভামার ভূমিকা একটু ঘোরালো হইয়াছে, সত্যভামাকে দূতী বলা চলে। অন্তঃপুরিকাদের চিত্রে ঐতিহাসিকতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তবে বাঙ্গালী ঘরের ছবি বলিয়া লইলে মন্দ নয়।

ভদ্রার্জ্জুন প্রধানত পদ্যে রচিত এবং তাহার বেশির ভাগ পয়ার। তাই সংলাপ জমে নাই, এবং বইটি পাঠ্য কাব্যের মত হইয়াছে। গদ্যাংশের ভাষা সরল। গ্রাম্যতা নাই। ঘটনাপ্রবাহে গতির অভাব থাকিলেও এবং মধ্যপথে প্লট ফাঁস হইয়া গেলেও পাঠকের কৌতূহল অনেকটা সজাগ থাকে। যাত্রা-গানের প্রভাব স্বীকার করিয়া নাট্যকার কয়েকটি গান দিয়াছেন। মদ্যপায়ীর ভূমিকাতে সমসাময়িক অবস্থা প্রতিফলিত ॥

৮

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজি-শিক্ষার প্রথম উচ্ছ্বাসে ইংরেজি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাবলির মধ্যে সর্ব্বপ্রথম শেক্‌স্‌পিয়রের নাটকের গল্পই বাঙ্গালা গদ্যে রূপান্তরিত হইয়াছিল। ১২৫৫ সালে গুরুদাস হাজরা "লেম্বস্‌ কৃত ইতিহাসের গ্রন্থ" অবলম্বন করিয়া 'রোমিও এবং জুলিএটের মনোহর উপাখ্যান' বাহির করেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রোয়ার (Edward Roer) কৃত 'মহাকবি সেক্ষপীর প্রণীত নাটকের মর্ম্মানুরূপ কতিপয় আখ্যায়িকা' ভার্নাকিউলার লিটারেচর সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। এই বৎসরে শেক্‌স্‌পিয়রের প্রথম বাঙ্গালা নাট্যানুবাদ হরচন্দ্র ঘোষ (১৮১৭-৮৪) কৃত 'ভানুমতী-চিত্তবিলাস নাটক'ও বাহির হয়।[১] বইটি 'মার্চেন্ট অব্‌ ভিনিস্‌'-এর মর্ম্মানুবাদ গদ্যে ও পদ্যে লেখা। লেখক কয়েকটি অবান্তর পাত্রপাত্রী সৃষ্টি করিয়াছেন, শেষে একটি নূতন দৃশ্য যোগ করিয়াছেন এবং দৃশ্যের নাম দিয়াছেন "অঙ্গ"। নাটক হিসাবে বইটি একেবারে ব্যর্থ এবং পাঠ্য হিসাবে সম্পূর্ণ অসার্থক। তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে হরচন্দ্র বইটিকে অভিনেতব্য নাটক করিয়া লেখেন নাই, পাঠ্যপুস্তক করিয়াই লিখিয়াছিলেন। তাঁহার আশা ছিল যে রচনা-সৌষ্ঠব ও কাহিনী-গৌরবের জন্য বইটি পাঠ্যপুস্তকরূপে সমাদৃত হইবে।

ব্যর্থকাম হইয়া হরচন্দ্র ভাবিলেন, পদ্যাংশের বাহুল্য এবং কাহিনীর

[১] রচনাকাল ধরিলে ভানুমতী-চিত্তবিলাস ভদ্রার্জ্জুনের সমসাময়িক (১৮৫২)।

বৈদেশিকতা ও প্রণয়মূলকতা ভানুমতী চিত্ত-বিলাসের অসাফল্যের কারণ। তাই তিনি পরবর্ত্তী নাটক 'কৌরব বিয়োগ'-এ (১৮৫৮) প্রধানত গদ্য অবলম্বন করিলেন। মহাভারত-কাহিনীর পাঠোপযোগিতা স্মরণ করিয়া এবং কাশীরাম দাসের কাব্যের "কিয়দ্ভাগের প্রাচীন পরিচ্ছেদ যাহা মলিন মুদ্রাযন্ত্রের মুদ্রাদোষে ক্রমশঃ মলিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা পরিবর্ত্তন" করিয়া হরচন্দ্র "ঐ মহাগ্রন্থের কিয়দংশ এতাবতা রাজা দুর্য্যোধনের উরু ভাঙ্গাবধি ও অন্ধ রাজাদির যজ্ঞানলে দগ্ধ হওয়া পর্য্যন্ত অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত সুমার্জ্জিত সাধুভাষায় বহুলাংশ গদ্য ছন্দে ও অতি স্বল্পাংশমাত্র পদ্যপ্রবন্ধে ইংলণ্ডীয় নাটকের প্রচলিত প্রণালীতে রচনা" করিলেন। "ইংলণ্ডীয় প্রণালী" কতটা অনুসৃত হইয়াছে তাহা বলা শক্ত, তবে হরচন্দ্রের চারিটি নাটকেই সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের নির্দ্দেশমত নান্দী ও সূত্রধার সমেত প্রস্তাবনা বজায় আছে। এবারেও লেখকের উদ্দেশ্য সফল হইল না। বোধ করি উৎকট গদ্যরীতির জন্যই কৌরববিয়োগ পাঠ্যরূপেও সমাদর পাইল না।

হরচন্দ্র আবার ফিরিয়া গেলেন শেক্‌স্‌পিয়রের অনুবাদে। তাঁহার তৃতীয় রচনা 'চারুমুখ-চিত্তহরা নাটক' (১৮৬৪) 'রোমিও-জুলিয়েট'-এর দেশীয় সংস্করণ। এই নাটকটি প্রধানত অভিনয়ের উদ্দেশ্যে লেখা হইয়াছিল। ভাষা পূর্ব্বের অপেক্ষা সরল। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, হরচন্দ্রের রচনায় লালিত্য বা রস কোনটিই ছিল না। কি পাঠ্য কি নাট্য কোন ভাবেই হরচন্দ্রের কোন রচনা সার্থক হয় নাই। তবে শেষ পর্য্যন্ত তিনি আশা ছাড়েন নাই। চারুমুখ-চিত্তহরা প্রকাশিত হইবার দশ বৎসর পরে (১৮৭৪) তাঁহার চতুর্থ এবং শেষ নাট্য রচনা 'রজতগিরিনন্দিনী'-র ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন যে যেহেতু এদেশে সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে নাটকরচনায় এবং অভিনয়-দর্শনে লোকের অনুরাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে সেইহেতু তিনি "ব্রহ্মদেশীয় এক মনোহর কাব্য আধুনিক নাটকের প্রণালীতে লিখিয়া প্রকাশ" করিতেছেন। এখানি বর্মী আখ্যায়িকা অবলম্বনে লেখা ইংরেজি নাটকের অনুবাদ। 'রজতগিরি' নামে এই বিষয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরও পরে একখানি নাটক লিখিয়াছিলেন।

এই সময়ে এবং পরবর্ত্তী কালে ইংরেজি নাটক অবলম্বনে আরও কয়েকখানি বাঙ্গালা নাটক লেখা হইয়াছিল। সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিই। শ্যামাচরণ দাস দত্তের 'অনুতাপিনী নবকামিনী নাটক' (১২৬৩) রো-এর (Rowe) 'দি

ফেয়ার পেনিটেণ্ট'-এর অনুবাদ। মেয়েদের পড়িবার জন্যই এই অনুবাদ, অভিনয়ের উদ্দেশ্যে নয়। নামপৃষ্ঠায় আছে,

যত্ন সহ করিয়াছি গ্রন্থ বিরচন।
যত্ন সহ, রসময়ি, কর অধ্যয়ন॥
পাঠান্তে যদ্যপি হয় পতি প্রতি মতি।
সফল হইল শ্রম, ভাবিব যুবতী॥

শেষে হোরেসিয়র মুখে ভরতবাক্য,

দেখ আসিয়া কামিনীগণ কেলিষ্টার দশা।
"পাপাৎ ভবতি সুখঃ" করো না এ আশা॥
অছিন্ন রাখিতে চাহ প্রণয় বন্ধন।
ধর্ম্মগ্রন্থ দিও তাহে করে আকিঞ্চন॥

তাহার পর "পূর্ব্বপ্রকাশিত নাটক শ্রবণান্তর কোন কামিনী কর্ত্তৃক সঙ্গীত" নামে একটি দেবীবিষয়ক গান আছে। নাটকটি ষড়ঙ্ক। অঙ্ক অর্থে "ব্যাপার" শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। প্রত্যেক অঙ্কে "রঙ্গস্থল" অর্থাৎ দৃশ্যের স্থান এবং "ঘটনার সময়" নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে অল্পস্বল্প পয়ার আছে। কঁয়েকটি গানও আছে। ইংরেজি নাম অপরিবর্ত্তিত আছে। ভাষা পুথিগত সাধুভাষা, স্থানে স্থানে অনুবাদগন্ধী।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সুশীলা-বীরসিংহ নাটক' (১৮৬৭) এবং চন্দ্রকালী ঘোষের 'কুসুমকুমারী নাটক' (১৮৬৮, দ্বি-স ১৮৭২) শেক্‌স্‌পিয়রের 'সীম্বেলিন' অবলম্বনে লেখা।

'সুশীলা-বীরসিংহ' নাটকে লেখকের নাম ছিল না।[১] প্রধানত অমিত্রাক্ষরে লেখা। একটি গান ও কয়েকটি ছোট কবিতা আছে। শেষে এই ভরতবাক্য,

১

হোন রাজা প্রকৃতিরঞ্জন
প্রজা রাজভক্তিপরায়ণ
আনন্দে মিলুক সর্ব্বজন।

২

বসুমতী হোক ফলবতী,
প্রসন্ন হইয়ে সরস্বতী
সভাকার দিন শুভমতি।

[১] গ্রন্থশেষে 'মনুষ্যজীবন' নামে নয় স্তবকের একটি কবিতা আছে।

৩

দ্বেষ হিংসা করি পরিহার,
বিকশিয়ে প্রণয় উদার
সুখ শান্তি করুক বিস্তার।

'কুসুমকুমারী নাটক' কালীকৃষ্ণ দেবের অনুরোধে শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানির জন্য লেখা হইয়াছিল। বইটি ন্যাশন্যাল থিয়েটারে একাধিকবার অভিনীত হইয়াছিল। রচনাকাল ১৮৬৫।[১]

পরবর্ত্তী কালে শেক্স্পিয়রের যে কয়টি অনুবাদ অর্থাৎ মর্ম্মানুবাদ হইয়াছিল তাহার কয়েকখানি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে একাধিকবার অভিনীত হইয়া সার্থকতা প্রমাণ করিয়াছিল। বেণীমাধব ঘোষ করিয়াছিলেন 'কমেডি অব্ এররস্'-এর অনুবাদ 'ভ্রমকৌতুক' নামে (১৮৭৩)। তারিণীচরণ পালের 'ভীমসিংহ' 'ওথেলো'-র অনুবাদ (১২৮১)। হরলাল রায়ের 'রুদ্রপাল' (১৮৭৪) 'ম্যাক্বেথ' অবলম্বনে লেখা। 'টেম্পেষ্ট' অনুবাদ করিয়াছিলেন কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'নলিনীবসন্ত' নামে (১২৭৫)। ইনি 'রোমিও জুলিয়েট্'-ও অনুবাদ করিয়াছিলেন (১৮৯৫)। প্রথম তিনখানি বই নাট্যমঞ্চে জনপ্রিয় হইয়াছিল॥

৯

যেকালের কথা আলোচনা করিতেছি সেকালে বাঙ্গালা নাটকের—ঠিক করিয়া বলিতে গেলে প্রহসনের—একটা প্রধান পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিল রামনারায়ণ তর্করত্নের (১৮২২-৮৬) 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক' (১৮৫৪)। বাঙ্গালা নাটক-লেখকদের মধ্যে রামনারায়ণই প্রথম এই কাজে অর্থ ও যশ লাভ করিয়াছিলেন। দুই-তিনখানি সমাজচিত্রঘটিত নক্শা-নাটক, চারিখানি সংস্কৃত নাটকের স্বচ্ছন্দ

[১] প্রথম সংস্করণের (জ্যৈষ্ঠ ১২৭৫) ভূমিকায় পাই, "শোভাবাজারস্থ গোপনীয় নাট্য সভায় তৎকালীন কৃষ্ণকুমারী নাটকের অভিনয় হইয়াছিল, সেই সময় উক্ত সভার কয়েক জন সভ্য আমাকে সেক্সপিয়ারের আভাস লইয়া বঙ্গীয় সাধুভাষায় একখানি নাটক প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করেন।...... কিন্তু কুসুমকুমারী সিম্বেলিনের অবিকল অনুবাদ নহে, ইহাতে কেবল সেক্সপিয়ারের স্থূল ভাবটি গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং যাহাতে অঙ্ক সকল আর নায়ক-নায়িকা সংখ্যা অল্প হয়, এইরূপ প্রণালীতে এই পুস্তক রচনা করা হইয়াছে, এবং মধ্যে মধ্যে নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিদিগের যাহাতে বিশ্রাম হয়, সে বিষয়েও বিশেষ যত্ন করা গিয়াছে. ফলে বর্ত্তমানের বঙ্গভাষায় নাট্যাভিনয়ের যে যে নিয়ম আছে, সেই সকলকে অবলম্বন করিয়া আমি এই গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছি।"

দ্বিতীয় সংস্করণে (ভাদ্র ১২৭৯) প্রকাশক বলিয়াছেন যে ইহা উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব ও ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সংশোধন করিয়াছেন এবং ইহাতে নান্দী যোগ করা হইয়াছে।

কুসুমকুমারীর প্রথম অঙ্ক ১ কার্ত্তিক ১২৭৪ সংখ্যার মাসিক প্রভাকরে বাহির হইয়াছিল।

অনুবাদ, তিনখানি পৌরাণিক নাটক, একটি প্রচলিত আখ্যায়িকাঘটিত নাটক এবং তিন-চারিখানি প্রহসন রামনারায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। 'বেণীসংহার' (১৮৫৬), 'রত্নাবলী' (১৮৫৮), 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' (১৮৬০) ও 'মালতীমাধব' (১৮৬৭)—এই চারিখানি নাটক সংস্কৃতের অনুবাদ। অনুবাদ সর্ব্বত্র স্বচ্ছন্দ, "চলিত ভাষায় অনুবাদিত"। স্থানে স্থানে যথাযোগ্য পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন আছে। যেমন মূল রত্নাবলীর ঐন্দ্রজালিক রামনারায়ণের নাটকে বাঙ্গালী বেদে বাজীকর হইয়াছে। ভাষা স্বাচ্ছন্দ্যের এবং গীতবাহুল্যের জন্য এই নাট্যগুলি অভিনয়ে সাফল্য লাভ করিয়াছিল।[১] পাইকপাড়ার রাজা দুই ভাই ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ও প্রতাপচন্দ্র সিংহের উদ্যোগে তাঁহাদের বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ীতে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রত্নাবলী নাটকের যে চমৎকার অভিনয় হইয়া গিয়াছিল তাহা মধুসূদনকে বাঙ্গালা লেখায় প্রথম প্রবৃত্তি দিয়াছিল। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় রত্নাবলী ও শর্ম্মিষ্ঠা অভিনয়ের খ্যাতিই বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারিত করিয়াছিল।

রামনারায়ণের লেখা পৌরাণিক নাটক হইতেছে তিনখানি—'রুক্মিণীহরণ' (১৮৭১), 'কংসবধ' (১৮৭৫) এবং 'ধর্ম্মবিজয়' (১৮৭৫)। শেষের বইটির বিষয় হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান। 'স্বপ্নধন' (১৮৩৩) নাটকের বিষয় একটি রূপকথা। রামনারায়ণ যে প্রহসনগুলি লিখিয়াছিলেন তাহার কোন-কোনটি মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নামে প্রচলিত ছিল। 'বুঝ্‌লে কি না' যতীন্দ্রমোহনের নামে এখনও চলে।

ইংরেজি-শিক্ষার প্রথম সক্রিয় ফল দেখা দিয়াছিল সমাজ-সংস্কারে। পূর্ব্ব হইতেই যাত্রায় কবিতায় ও নক্‌শায় সমাজ অথবা শ্রেণী বিশেষের ব্যঙ্গচিত্র জনসাধারণের চিত্তবিনোদনের একটি প্রধান উপকরণ যোগাইয়া আসিয়াছিল। সাধুবেশী পাষণ্ডের ভণ্ডামি, মূর্খের ধনগর্ব্ব ও কুলাভিমান, পণ্ডিতের বিদ্যামদ, মাতালের দুর্দ্দশা, ধনীর লাম্পট্য, কুট্টনীর ছলনা, অসতীর বিড়ম্বনা এবং সতীর দুর্দ্দশা ইহাই ছিল সাধারণত যাত্রার সঙের এবং নক্‌শা-চিত্রের প্রধান বিষয়।

[১] রত্নাবলীর বিজ্ঞাপনে রামনারায়ণ বলিয়াছেন, "যদিচ যাত্রার প্রতি আমাদিগেরও অসীম অশ্রদ্ধা আছে, তথাপি এককালে সংগীতমাত্র উচ্ছেদ করা অভিমত কথনই নহে। প্রত্যুত নাটক অভিনয়ে সংগীত সম্পর্ক নিতান্ত পরিবর্জ্জিত হইলে তাহাতে রস ও সৌন্দর্য্যের বিশেষ হানির সম্ভাবনা"।

রত্নাবলী নাটকের গান গুরুদয়াল চৌধুরীর লেখা। মালতীমাধবের গান কবি বনয়ারীলাল রায় লিখিয়া দিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা নাটকের আবির্ভাবের সময়ে কোন কোন সহৃদয় ব্যক্তির মনে হইল, নাটকে এইভাবে সপরিণাম সমাজকলঙ্কচিত্র দেখাইতে পারিলে সাধারণের চোখ শীঘ্র ফুটিবে। রঙ্গপুর কুণ্ডীগ্রামের জমিদার কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী সাময়িকপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন যে, পতিব্রতার "ধর্ম্ম কর্ম্ম পবিত্রতা চরিত্র চিহ্নাদি বিষয়ে" পতিব্রতোপাখ্যান নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া যিনি পারদর্শিতা দেখাইতে পারিবেন তাঁহাকে ৫০ টাকা পুরস্কার দিবেন। রামনারায়ণ 'পতিব্রতোপাখ্যান' (১৮৫৩) লিখিয়া এই পুরস্কার পাইয়াছিলেন। কালীচন্দ্র পুনরায় বিজ্ঞাপন দিলেন, "বল্লাল সেনীয় কৌলিন্য প্রথা প্রচলিত থাকায় কুলীনকামিনীগণের এক্ষণে যেরূপ দুর্দ্দশা ঘটিতেছে, তদ্বিষয়ক প্রস্তাব সম্বলিত 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নামে এক নবীন নাটক যিনি রচনা করিয়া রচকগণের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন তিনি তাঁহাকে ৫০ টাকা পারিতোষিক দিবেন।" এই বিজ্ঞাপনের উত্তরে রামনারায়ণের কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব নাটক রচিত হয়। কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব রামনারায়ণের প্রধান মৌলিক রচনা, এবং তাঁহার নাটকগুলির মধ্যে ইহার সমাদর সর্ব্বাধিক হইয়াছিল। কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব যে পথ দেখাইয়া দিল সেই পথের অনুসরণ করিয়া অচিরে বিধবাবিবাহ-বহুবিবাহ-বাল্যবিবাহ ও গ্রাম্য-দলাদলি ইত্যাদি লইয়া অজস্র নাটক-প্রহসন রচিত ও প্রকাশিত হইয়া সাহিত্যে আবর্জ্জনার স্তূপ গড়িয়াছিল।

ভূমিকায় রামনারায়ণ কুলীন-কুলসর্ব্বস্বের কাহিনীর পরিচয় দিয়াছেন, "এই নাটক ছয় ভাগে বিভক্ত। প্রথমে, কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাগণের বিবাহানুষ্ঠান। দ্বিতীয়ে, ঘটকের কপট ব্যবহারসূচক রহস্যজনক নানা প্রস্তাব। তৃতীয়ে, কুলকামিনীগণের আচার ব্যবহার। চতুর্থে, শুক্রবিক্রয়ীর দোষোদ্-ঘোষণ। পঞ্চমে, নানা রহস্য ও বিরহি পঞ্চাননের বিয়োগ-পরিবেদন। ষষ্ঠে বিবাহ নির্ব্বাহ। এই রীতিক্রমে এই নাটক রচিত হইয়াছে, ইহা কেবল রহস্য-জনক ব্যাপারেই পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু আদ্যোপান্ত সমস্ত পাঠ করিয়া তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে কৃত্রিম কৌলীন্যপ্রথায় বঙ্গদেশের যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহা সম্যক্ অবগত হওয়া যাইতে পারে।" সংস্কৃত নাটকের ধরণে প্রারম্ভে নান্দী-প্রস্তাবনা[১] থাকিলেও কাহিনী সাধারণ নাটকের মত ধারাবাহিক নয়, কতকগুলি বিচ্ছিন্ন দৃশ্যে বিভক্ত। প্লট বলিতে কিছুই নাই, আছে নিতান্ত ক্ষীণ সূত্র অবলম্বনে

[১] প্রস্তাবনায় জয়দেবের ধরণে একটি ভাঙ্গা সংস্কৃত পদ আছে। রুক্মিণীহরণে এমন পদ দুইটি আছে, নবনাটকে একটি।

কয়েকটি কৌতুকাবহ ব্যঙ্গচিত্র। নায়ক-নায়িকা বলিয়াও কিছু নাই। কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ সমেত উদ্ধৃত আছে। পদ্যে ভারতচন্দ্রের অনুকরণ সুস্পষ্ট। কৌতুকরস মন্দ নয়, যদিচ প্রায়ই তাহা গ্রাম্যত্বে পর্য্যবসিত। পঞ্চম অঙ্কে ফলারের বর্ণনা কৌতুককর। সংলাপে ঔচিত্যের অভাব আছে। অভব্যচন্দ্রের ভূমিকায় মৃচ্ছকটিকের শকার অনুকৃত।[১] কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব ঠিক অভিনয়ের উদ্দেশ্যে লেখা হয় নাই। কিন্তু ব্যঙ্গচিত্রগুলির বাস্তব সরসতার জন্য অভিনয়ে (১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে) খুব জমিত। এইজন্যই এই অকিঞ্চিৎকর নাট্য-নক্‌শাটি বহু-অনুকৃত হইয়াছিল।

'রত্নাবলী নাটক' (১৮৫৮, দ্বি-স ১৮৬১, তৃ-স ১৮৬৮)[২] চারি অঙ্ক। দৃশ্যের নাম প্রকরণ। 'অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক' (১৮৬০, দ্বি-স ১৮৬৯) সপ্ত অঙ্ক, এখানে দৃশ্যের নাম প্রস্তাব। নাট্যরচনা হিসাবে এটি রত্নাবলীর অপেক্ষা উন্নততর। গান বেশি নাই। শকুন্তলার পতিগৃহ যাত্রার দৃশ্যে এই কোরাস গানটি আছে।

আকাশে। বনদেবতাদিগের মঙ্গলসঙ্গীত

প্রধানা। এই আশিষ করি, এই আশিষ করি,
বিরহ সাগরে পাবে, মিলন পরম তরি।
সকলে। থাক হরিষে সদা বহু সুখে কাল হরি।
প্রধানা। প্রাণনাথ দরশনে, যাবে পুলকিত মনে,
বিতরিবে তরুগণে, সুখছায়া দেহোপরি।
সকলে। থাক হরিষে ... ...
প্রধানা। এই আশিষ করি, ...
সকলে। থাক হরিষে ... ...
প্রধানা। হবে পথধূলি যত, শতদল রেণুমত
সরোবর সুশোভিত, কমল সহিত বারি।

[১] তুলনীয় ষষ্ঠ অঙ্কে

শ্রীমন্ত করিয়া কোলে বেহুলা নাচনী।
রথের তলায় ওই দেখলো সজনী॥
পঞ্চানন বলে সত্যপীরের বারতা।
ব্যাধের রমণী আমি হবে মোর সতা॥

[২] রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের ব্যয়ে রত্নাবলী প্রথম ছাপা হইয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় রামনারায়ণ লিখিয়াছেন, "এবারে পূর্ব্বপ্রকাশিত প্রাথমিক যোগন্ধরায়ণের প্রস্তাবটি অনুপযোগী বোধে উঠাইয়া দিয়া এবং কএকটি স্থানে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্ত করিয়া মুদ্রিত করিলাম ও মূল্য অর্দ্ধমুদ্রা অবধারণ করা গেল।"

সকলে। থাক হরিষে ··· ··· ···
প্রধানা। এই আশিষ করি, ··· ···
সকলে। থাক হরিষে ··· ··· ···
প্রধানা। কুসুম সৌরভ সনে, মলয়ার সমীরণে,
আমোদ পাইবে মনে, শ্রম সব পরিহরি।
সকলে। থাক হরিষে ··· ··· ···
প্রধানা। এই আশিষ করি, ··· ···
সকলে। থাক হরিষে ··· ··· ···
প্রধানা। কোন দুখ না রহিবে, সব আশা পূরাইবে,
প্রেমলাভে সমভাবে, রবে দিবা বিভাবরী।
সকলে। থাক হরিষে ··· ··· ···
প্রধানা। এই আশিষ করি, ··· ···
সকলে। থাক হরিষে ··· ··· ···

শকুন্তলার জেলে-পুলিস দৃশ্যটি রামনারায়ণ এই ভাবে সংক্ষেপে সারিয়াছেন।

বীর[১]। তা বল্ এখন অঙ্গুরী কোথায় পেলি।
ধীব[২]। এগ্যে বলি, কাল সঞ্জে বেলা মোদের বৌ মোকে ঐ বড় গাঙে মাচ মাদ্দি পেটিয়ে দেহ্যালো—তাই মুই গেহ্যালাম মোর দোষ কি? তা মোশাই নাত্তিরে হ্যা মাগ্ করে হ্যালো—সারা নাত্তির ইল্‌সে গুড়নি পড়তি নাগ্‌লো—জাল বেয়ে মুই সারা হলুম।
বীর। তার পর।
ধীব। তার পর ভোর বেলা মাকাল ঠাকুরির নাম করে ঝেমন এককেপ জাল মুই ফেল্লাম অমনি এই (হস্তসঙ্কেত) এত্ত বড় এট্টা উই মাচ ধরা পল্যো!
বীর। শীঘ্র শীঘ্র বল বেলা হলো।
ধীব। এই যে বল্‌চি মোশাই, তারপর সেই মাচটা মোদের বৌ ভাগা দে বেস্তি হবে বলে বঁটি দিয়ে ঝেমন কাট্‌বে অমনি ঐ আংটি তার প্যাট থেকে বেরুয়ে পল্লো—তাই বৌ মোকে বেণেগার দোকানে বেস্তি পাঠিয়ে দে হ্যালো—সেথায় মোশাই এসে মোকে ধর্‌লে আর মুই কিছু জানিনে—দৈ মাকাল ঠাকুরির!

রামনারায়ণের শকুন্তলার মলাটে ও নামপৃষ্ঠায় এই শ্লোকটি আছে,

চতুষ্টয়েঽপি টীকানাং প্রাচীনানাঞ্চ তুষ্টয়ে।
চমৎকৃতিকরী ভূয়ান্নবীনানাঞ্চ সংকৃতিঃ॥

রামনারায়ণের পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক 'নবনাটক' (১৮৬৬)—পূরা নাম 'বহু বিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নবনাটক'—জোড়াসাঁকো নাট্যশালার প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘোষিত পুরস্কারপ্রাপ্ত। জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ীর রঙ্গমঞ্চে, "জোড়াসাঁকো থিয়েটার"-এ, ইহা

[১] অর্থাৎ বীরশেখর। [২] অর্থাৎ ধীবর।

সাফল্যের সহিত বহুবার অভিনীত হইয়াছিল। নবনাটকের বিষয় হইতেছে দ্বিতীয় স্ত্রীর ঈর্ষ্যায় এক জমিদারের প্রথম স্ত্রীর ও তাঁহার গর্ভজাত পুত্রের নির্য্যাতন এবং তুকতাকের ঔষধ খাইয়া জমিদারের এবং প্রথম স্ত্রীর ও পুত্রের মৃত্যু। দীনবন্ধুর নীলদর্পণ নাটকের অনুসরণে উপসংহারে পাত্রপাত্রীর অধিকাংশের মৃত্যু ঘটাইয়া নাটকটিতে ঘোর ট্রাজিক রঙ ফলানোর চেষ্টা আছে। নবনাটক কুলীন-কুলসর্ব্বস্বের মত প্লটহীন নয় বটে, কিন্তু প্লটের পরিকল্পনায় নাটকীয়তার স্পর্শ নাই। প্রকট উদ্দেশ্যমূলকতায় প্লটের সঙ্গতির ও স্বাভাবিকতার হানি হইয়াছে। পদ্যের ভাগ অল্প এবং ভাষা লঘুতর হওয়ায় নবনাটকের অভিনয়োপযোগিতা কুলীন-কুলসর্ব্বস্বের তুলনায় বাড়িয়াছে। কৌতুকরসে গ্রাম্যতার অভাব লক্ষণীয়।

রামনারায়ণের প্রহসনগুলি ছোট রচনা, 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' (দ্বি-স ১২৭৯) ছাড়া। ভূমিকাও অল্প। 'উভয় সঙ্কট'-এ (১৮৬৯) বহুবিবাহের দোষ এবং 'চক্ষুদান'-এ (১৮৬৯, দ্বি-স ১২৭৯) স্ত্রীর কৌশলে স্বামীর লাম্পট্যব্যাধির চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে। যেমন-কর্ম্ম-তেমনি-ফলের বিষয়ও লাম্পট্যের লাঞ্ছনা। ইহাতে দীনবন্ধুর নবীন-তপস্বিনীর প্রভাব আছে। "হেদ্দেখ সুন্দরি, এই যেমন দময়ন্তীর রূপ দেখে রাবণ রাজা উন্মত্ত হয়ে"—এখানে মৃচ্ছকটিকের শকারের উক্তি স্মরণীয়। মুন্সোব বাবুর ভূমিকায় সরসতার অবতারণা অসার্থক নয়।

পাথুরিয়াঘাটা এবং জোড়াসাঁকো দুই ঠাকুর-বাড়ীতেই রামনারায়ণের খাতির ছিল। যতীন্দ্রমোহন ছিলেন তাঁহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁহার ছাত্র। পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে রামনারায়ণের প্রায় সব নাটক-প্রহসনেরই অভিনয় হইয়াছিল। জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় নবনাটকের অভিনয়সাফল্যের ফলে "নাটুকে" রামনারায়ণের খ্যাতি বাড়িয়াছিল।

বাল্যবিবাহের দোষ দেখাইয়া যে সকল নাটক-প্রহসন লেখা হইয়াছিল তাহার মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হইতেছে 'কুলীন বৈদিককুল-কৌলীন করবাল ভূতং সম্বন্ধ সমাধি নাটকম্', সংক্ষেপে 'সম্বন্ধ-সমাধি নাটক' (১৮৬৭)। বইয়ে লেখকের নাম নাই। আভ্যন্তর প্রমাণে ইহা রামনারায়ণের অথবা তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের রচনা বলিয়া অনুমান করি। ইঁহারা দাক্ষিণাত্য বৈদিকশ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাই সমাজ-রোষ এড়াইবার জন্যই বোধ করি রচয়িতা নাম গোপন করিয়াছিলেন।

নবনাটকের মত সম্বন্ধ-সমাধিও গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে উৎসর্গিত এবং উৎসর্গপত্রের শিরোনামাও প্রায় অভিন্ন। লেখক যে পাথুরিয়াঘাটা ও জোড়াসাঁকো নাট্যশালার সহিত সম্পর্কিত ছিলেন তাহা সূত্রধারের কথায় বোঝা যায়,

> আজ অনেকগুলি ভদ্রলোক একত্র হয়ে আমাকে আদেশ কচ্চেন, যে একখানি নূতন নাটকের অভিনয় কর; কিন্তু আমি ত নূতুন নাটক খুঁজে পাইনে, বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রভৃতি মহোদয়গণের প্রসাদে প্রায় সকল নাটকেরই অভিনয় হয়ে গেছে, এখন আবার নূতুন কোথা পাই?

সম্বন্ধ-সমাধির নামপৃষ্ঠায় ও নান্দীতে যথাক্রমে এই দুইটি সংস্কৃত পদ আছে,

> সজ্জনমানসতোষবিধানং ন চ নবনাটককারকমানং।
> যাচে কেবলসুখনিদানং ত্যক্তুং বৈদিকরীতিবিতানং॥
> দ্বিজকুলসেবিত-দূরবিসারিত-গাঢ়নিবেশিতমূলং।
> ছেত্তুং বাঞ্ছতি বৈদিকপদ্ধতিশালমখিলসুখশূলং॥

প্রথম শ্লোকে "নবনাটক" শব্দে বোধ করি অব্যবহিতপূর্ব্ব রচনা নবনাটকের ইঙ্গিত আছে।

গরীব কুলীন আশুতোষ চক্রবর্ত্তীর একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে আশুতোষ নবজাতার বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিবার জন্য বাহির হইল, কিন্তু অনেক গ্রাম ঘুরিয়াও কিছু করিতে পারিল না। আশু তাহার মামা ন্যায়ভূষণের প্রেসে কম্পোজিটারের কাজ করিত। ন্যায়ভূষণ আশুর অজ্ঞাতসারে তাহার শিশু কন্যার এক সম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখে। তাহা আশুর মনঃপূত হয় নাই কেননা পাত্রের সংসার নিতান্ত দুঃস্থ। এই সম্বন্ধ স্থাপনের খরচা বলিয়া ন্যায়ভূষণ আশুর সামান্য বেতন হইতে চারি টাকা কাটিয়া লয়। কুলীনদের এই ঘৃণ্য রীতির উপর নিতান্ত বিরক্ত হইয়া আশু উপায়ান্তর না দেখিয়া সংস্কারক-দলের প্রতিনিধি ন্যায়রত্নের মতানুবর্ত্তী হইয়া মেয়েকে বড় করিয়া অন্যত্র বিবাহ দেয়। ইহাতে কুলীন সমাজের গোঁড়ারা একত্র হইয়া জমীদারের সাহায্যে তাহার বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের মামলা আনিবার প্ররোচনা দেয় দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তীকে, যাহার পুত্রের সহিত আশুর নবজাত কন্যার প্রথম সম্বন্ধ হইয়াছিল। মামলায় দুর্গাপদ হারিয়া যায়। উচ্চতর আদালতে আপীল হয়, সেখানেও নিম্ন আদালতের রায় বহাল থাকে। এই মামলার ফলে বৈদিক কুলীন সমাজে শৈশব-সম্বন্ধপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত পড়ে। ইহাই সপ্তাঙ্ক নাটকটির কাহিনী।

নাটকটি গদ্যে লেখা, ক্বচিৎ পয়ার আছে। কাহিনী সুসম্বদ্ধ ও বাস্তব, এবং সমস্যা প্রত্যক্ষ। তবে রচনার বেশি ভাগই অবান্তর দৃশ্যে পূর্ণ। গার্হস্থ্য ও সামাজিক চিত্রে অতিরঞ্জন নাই এবং ভাঁড়ামির সাহায্যে কৌতুকরস জমাইবার চেষ্টাও নাই। দ্বিতীয় অঙ্কে সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতদের প্রতি টুলো বামুনদের ঈর্ষা-উক্তি মন্দ নয়।

সম্বন্ধ-সমাধি নাটকের পূর্ব্বে বাল্যবিবাহ বিষয়ে অন্তত দুইখানি নাট্যরচনা বাহির হইয়াছিল—শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়ের 'বাল্যবিবাহ নাটক'[১], এবং শ্যামাচরণ শ্রীমানীর চতুরঙ্ক 'বাল্যোদ্বাহ নাটক' (১৮৬০)। এই নাটকটি বিষাদান্ত। কয়েকটি গান আছে। পদ্যাংশ স্বল্প। পুরুষ-ভূমিকার প্রায় সব নামই বিশেষণাত্মক। যেমন, বলহীন ধনাঢ্য, ধনহীন মহদাশয়, স্বার্থপর ঢোল, বিদ্যাহীন দাম্ভিক, অর্জ্জনস্পৃহ ভট্টাচার্য্য, বুদ্ধিহীন মতিচ্ছন্ন, সুধীর মহদাশয়, ইত্যাদি। কায়স্থ জাতির কৌলীন্যের দোষ দেখাইয়া একটি ছোট নাটক লিখিয়াছিলেন অম্বিকাচরণ বসু 'কুলীন কায়স্থ নাটক' নামে (১৮৬১)। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদের কন্যাশুল্কগ্রহণ বিষয়ে দুইখানি নাট্যরচনার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে—নফরচন্দ্র পালের 'কন্যাবিক্রয় নাটক' (১৮৬৩) এবং জনৈক "শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ" প্রণীত 'আসুরোদ্বাহ নাটক' (১৮৬৯)।

কুলীন-কুলসর্ব্বস্বের স্পষ্ট অনুকৃতির মধ্যে বিশিষ্ট হইতেছে তারকচন্দ্র চূড়ামণির 'সপত্নী নাটক' প্রথমভাগ (১৮৫৮)। বিজ্ঞাপনে লেখক বলিয়াছেন, "বর্ত্তমানকালে, বাঙ্গলাদেশে যে সকল কদাচার ও কুব্যবহার চলিতেছে, বিশেষতঃ, বহুবিবাহ সংক্রান্ত যে সকল অত্যাচার ঘটিতেছে, নাট্যচ্ছলে সেই সমস্ত প্রকাশিত করাই, এই সপত্নী নাটকের মূলোদ্দেশ্য।" উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বইটি লেখা হইয়াছিল। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ রচনা সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। প্লটে নাটকোচিত সংহতি না থাকিলেও সপত্নী নাটক শুধু বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের সমষ্টিমাত্রও নয়। একটি কেন্দ্র-স্থানীয় ঘটনাসূত্র পূর্ব্বাপর ব্যাপিয়া রহিয়াছে—ভূধরের পতিব্রতা প্রথমা পত্নী সৌদামিনী বর্ত্তমান থাকিতে দ্বিতীয়বার বিবাহের উদ্যোগ এবং সেইহেতু সৌদামিনীর আত্মহত্যার প্রচেষ্টা। অসম্পূর্ণ এবং নাট্যকলাবিহীন হইলেও সপত্নী নাটক সে সময়ের অধিকাংশ নাট্যরচনার মত একেবারে বাজে লেখা নয়। লেখকের প্রখর

[১] ১৭৮১ শকাব্দের কার্ত্তিক সংখ্যা বিবিধার্থসংগ্রহে সমালোচিত।

বাস্তবদৃষ্টি[১] এবং সহানুভূতি মিলিয়া ভূমিকাগুলিকে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করিয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের সংলাপ বেশ স্বাভাবিক। পণ্ডিতের কথাবার্ত্তা বিশুদ্ধ ও সরল সাধুভাষায়। অন্যত্র ভাষায় সাধু ও কথ্য ভঙ্গির মিশ্রণ হইয়াছে। অনেকগুলি দীর্ঘ কবিতা আছে, "অভিপ্রায়" নামে। আসলে এগুলি গ্রন্থকারেরই প্রক্ষিপ্ত স্বগতোক্তি। এগুলির রচনারীতিতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রভাব সত্ত্বেও তারকচন্দ্রের স্বকীয়তা ফুটিয়া উঠিয়াছে। বইটিতে লেখকের কবিতারচনাশক্তির পরিচয়ই বেশি প্রকট। যেমন দিবা "দ্বিতীয় প্রহর বর্ণন"।[২]

দুই স্ত্রী লইয়া সংসার করার ঝঞ্ঝাট বর্ণিত হইয়াছে হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'কাদম্বিনী নাটক'-এ (১৮৬১)। পরবর্ত্তী কালে দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাই বারিক' এ বিষয়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা॥

১০

সামাজিক-কুপ্রথাপেষণের যন্ত্ররূপে নাটক লিখিতে আরম্ভ করিলেন রামনারায়ণ কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব লইয়া। দুই বৎসর পরে সেকালের সামাজিক নাটক প্রহসনের সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও পিষ্টপেষিত বিধবা-বিবাহ আন্দোলনকে নাট্যের বিষয় করিয়া উমেশচন্দ্র মিত্র বিদ্যাসাগর প্রবর্ত্তিত বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে নূতন জোর দিলেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিধবাবিবাহ আইন পাশ হইয়া গেল, কিন্তু অশিক্ষিত ও গোঁড়া সমাজের সংস্কারবিমুখতা বিধবাবিবাহ-প্রচলনের পক্ষে দুস্তর বাধা হইয়া রহিল। সুতরাং ইংরেজিনবীশ লেখক নাট্যের আসরে নামিলেন বিধবার বিবাহ না দিলে তাহার অবশ্যম্ভাবী বিষময় ফলের চিত্র আঁকিয়া গোঁড়াদের মত ফিরাইতে। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ নাটক' এই ধরণের নাট্যরচনার উৎস খুলিয়াছিল। গোঁড়ারাও চুপ করিয়া রহিল না। তাহাদের রচনায় দেখানো হইতে লাগিল বিধবা-বিবাহের বিষময় ফল। পরে বঙ্কিমচন্দ্রও এই দলে যোগ দিয়াছিলেন 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস লিখিয়া।

[১] প্রথম অঙ্কে রমাকান্ত বিদ্যাবাগীশের অন্তঃপুর-চিত্র এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

[২] বৈকাল সুখের কাল বটে,
কবিরা এরূপ ভাবে রটে।
কিন্তু দুপুরের বেলা,
যমে আর জীবে খেলা,
যদি রয় এ জীবন ঘটে॥ ...

পাঠকসমাজে এবং রঙ্গমঞ্চে উভয়ত্র উমেশচন্দ্র মিত্রের চতুরঙ্ক বিধবাবিবাহ নাটক সমাদর লাভ করিয়াছিল।[১] দ্বিতীয় সংস্করণে কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল।[২]

কীর্ত্তিরাম ঘোষের বিধবা কন্যা সুলোচনা পড়শী নাপতিনী রসবতীর মধ্যস্থতায় রামকান্ত বসুর পুত্র মন্মথর প্রতি আসক্ত হয় এবং এই গোপন প্রণয়ের ফলে সুলোচনা গর্ভবতী হয়। সুলোচনা যখন নিজের শারীরিক অবস্থা ঠিকমত বুঝিতে পারিল তখন লোকলজ্জায় বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিল। ইহাই নাটকটির কাহিনী। আনুষঙ্গিকভাবে অদ্বৈত দত্তর জ্যেষ্ঠ বিধবা কন্যা প্রসন্নর দ্বিতীয়বার বিবাহের কথা আছে। সমগ্র কাহিনীর মধ্যে নাটকোচিত ঐক্য আছে এবং উপসংহারে গভীর বিষাদে কাহিনীর দোষত্রুটি খানিকটা ঢাকিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে দীর্ঘ স্বগতোক্তি, এবং বিশেষ করিয়া সুলোচনার মরণকালে দীর্ঘ খেদ-উক্তি, নাটকীয়তার হানি করিয়াছে।[৩]

বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহবিষয়ক (দ্বিতীয়) পুস্তক অবলম্বনে বিধবা-বিবাহের সমর্থনে পণ্ডিতদের আলোচনা দৃশ্যে উদ্দেশ্যমূলকতার কাছে নাট্যকলা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। রসবতীর দৌত্যে সুলোচনা-মন্মথর প্রণয়লীলা বিদ্যাসুন্দরের পথ ধরিয়াছে। পদ্য অংশেও ভারতচন্দ্রের প্রভাব আছে। নাটকটি আগাগোড়া সহজ কথ্যভাষার ছাঁদে লেখা—পাণ্ডিত্য নাই, গ্রাম্যতাও নাই। চরিত্রচিত্রণ বাহুল্যবর্জ্জিত এবং যথাসম্ভব স্বাভাবিক। এমন কি মন্মথও পাষণ্ড নয়। কৌতুকরসের সামান্য স্পর্শ আছে, পাঠশালার এবং বাসরঘরের দৃশ্যে।

গ্রন্থকার যে বলিয়াছেন তাঁহার রচনা "is the first attempt made to introduce the regular tragedy into Bengallee drama," সে দাবি মিথ্যা

[১] প্রথম মুদ্রণ ১৮৫৬, দ্বি-স ১৮৫৭, তৃ-স ১৮৬৮, চ-স ১৮৭৮। অভিনয়ে (১৮৬০) অভিনেতাদের মধ্যে কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন।

[২] দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লেখক বলিয়াছেন, "পুস্তকের কোন অংশই সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হয় নাই, কেবল শেষভাগে সুলোচনার মৃত্যু বিবরণ বর্ণনা কালীন, বিধবাদিগের একাদশীর কঠিন উপবাসের বিষয় সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছি এবং সর্ব্বশেষে বাতুলের কথা পরিত্যাগ করিয়া সুলোচনার মৃত্যুতেই পুস্তক সমাপ্ত করিয়াছি এতদ্ভিন্ন আর সমুদয় অংশ প্রায় পূর্ব্বমতই আছে।"

[৩] তবে এ বিষয়ে গ্রন্থকারের কৈফিয়ৎ প্রণিধানযোগ্য : Fault has been found by some with the style of Soolochona's soliloquy before her death, which has been characterised as too declamatory for dramatic purposes. The author admits that the style of the passage alluded to is not in exact keeping with the rest, but as his object chiefly was to make an impression, he decided on sacrificing dramatic purity to what he conceived would produce effect.

নয়। বিধবাবিবাহ নাটকের পূর্ব্বে মরণান্তিক নাটক লেখা হইয়াছিল—কীর্ত্তিবিলাস। কীর্ত্তিবিলাস নাট্যরচনা হিসাবে কিছুই নয় এবং বইটির প্রচারও হয় নাই। সুতরাং বাঙ্গালায় প্রথম ট্রাজিক নাটক আসলে 'বিধবাবিবাহ'। সুলোচনার আত্মহত্যার মত মর্ম্মান্তিক পরিণতি সেকালের নাটকগুলির মধ্যে মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী ছাড়া অন্যত্র পাই না। কিন্তু কৃষ্ণকুমারীর আত্মলোপ এমন ট্রাজিক নয়।

উমেশচন্দ্র মিত্রের দ্বিতীয় নাট্যরচনা চতুরঙ্ক 'সীতার বনবাস নাটক' (পৌষ ১২৭২), বিদ্যাসাগরের 'সীতার-বনবাস' অবলম্বনে লেখা। নাটকটি আদ্যোপান্ত সাধুভাষায় লিখিত। গান বা কবিতা নাই। উপক্রমণিকায় লেখক বলিয়াছেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রণীত সীতার বনবাসই এই নাটকখানির আদর্শ বলিতে হইবেক। ইহার অনেক স্থানে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অবিকল ব্যবহার করিয়াছি"। উমেশচন্দ্র ভবানীপুরে শখের যাত্রার দল করিয়াছিলেন। তাহাতে সীতার-বনবাস যাত্রায় রূপান্তরিত হইয়া বহুবার গীতাভিনীত হইয়াছিল।

অসমীয়সাহিত্যের প্রথম আধুনিক নাট্যরচনা গুণাভিরাম শর্ম্মার 'রামনবমী নাটক'[১] লেখা হইয়াছিল বিধবাবিবাহের সমর্থনে এবং উমেশচন্দ্রের অনুসরণে।

অল্পবয়স্ক বিধবা কন্যাকে ঘরে রাখিয়া দিলে যে বিপদ হইতে পারে তাহার শোভন চিত্র আঁকা হইয়াছে বিধবা-বিবাহ নাটকে আর কদর্য্য ছবি লেখা হইয়াছে শিমূয়েল পিরবক্‌সের ষড়ঙ্ক 'বিধবা-বিরহ নাটক'-এ (১৮৬০)।[২] দুই নাট্যকাহিনীই মোটামুটি বাস্তব, তবে শেষেরটিতে বাস্তবের নিতান্ত নগ্নরূপ

[১] রচনাকাল ১৮৫৭। প্রথম প্রকাশ 'অরুণোদয়' পত্রিকায়, পরে গ্রন্থাকারে (১৮৭০)।

[২] লেখক "শ্রীশিমূয়েল পিরবক্‌স" ভূমিকায় বলিয়াছেন, "পাঠক মহোদয়গণ সমীপে নিবেদন এই যে পরমহিতৈষী সর্ব্বমঙ্গলেচ্ছুক আমার একজন ব্রাহ্মণ বন্ধু ছিলেন, এবং কতিপয় দিবস হইল আমার প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়া অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছেন। তিনি যে ২ বিষয়ে একটি পুস্তক রচনা করিতে আমাকে আদেশ করিয়াছেন, বিশেষতঃ মরণকালেও যাহার বিষয়ে দৃঢ় আদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সেই আদেশ অনুসারে, সেই ২ বিষয়ে, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ সাধারণ ভাষায় যাহাতে এতদ্দেশীয় সামান্য ও ভদ্র স্ত্রীলোকেরা পরস্পর কথোপকথন করিয়া থাকেন, রচনা করিয়া ইহার নাম বিধবা বিরহ নাটক রাখিলাম। এক্ষণে অপেক্ষা এই যে আপনারা আমার দোষাদি পরিহরী গুণাদি গ্রহণে আমাকে বাধিত করিবেন ইতি"।

লেখক বোধ করি ইসলাম ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি খ্রীষ্টীয় 'গীতসংহিতা'-র একটি সটীক সংস্করণ সম্পাদন করিয়াছিলেন।

প্রতিফলিত হইয়া নাটকীয়তা নষ্ট করিয়া দিয়াছে। বিধবা-বিরহ সার্থক রচনা নয়। বিধবা-বিবাহের স্পষ্ট প্রভাব বিধবা-বিরহে আছে, বিধবা-বিবাহের রামদাস বাবাজী বিধবা-বিরহের কানাইদাস বৈরাগি হইয়াছে।

কাহিনী সামান্যই। ভদ্রঘরের বিধবা মেয়ে মনোমোহিনী পিতার ব্যভিচার-পরায়ণতা এবং প্রতিবেশী পরিবারের দুর্নীতি দেখিয়া ঝিয়ের সহযোগিতায় নঙ্গরা নামক এক নীচ শ্রেণীর দুশ্চরিত্রের প্রলোভনে ভুলিয়া গহনাপত্র চুরি করিয়া পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়াছিল। তাহাতে তাহার পিতামাতাকে লজ্জায় দেশত্যাগ করিতে হইয়াছিল। গল্পটির মূলে কোন বাস্তব ঘটনা থাকা অসম্ভব নয়। নিম্নে উদ্ধৃত অংশে সমসাময়িক ব্যক্তির ও ঘটনার উল্লেখ কৌতুকাবহ।

> ···সাগর মহাশয়ের ইহাতে কিছুমাত্র ক্রটি নাই তিনি যৎপরোনাস্তি সাধ্য পর্য্যন্ত চেষ্টা করেছেন, কেবল যে তিনি একা তা নয় তাঁহার স্বপক্ষ বর্দ্ধমানের মহারাজা ও কলিকাতার অনেক ২ রাজা ও বাবুগণ ছিলেন; ইঁহারা কি না করতে পারেন তবে এটা যে সিদ্ধ হল না সে কেবল আমরা যে অবলা বিধবা আমাদেরই ভাগ্যদোষ বলতে হয়। কেননা যখন এই বিধবা বিবাহের উদ্‌যোগ হতেছিল প্রায় সেই সময় দুষ্ট নিমক হারাম সিপাইগণ যাহারা এত বছর অবধি সন্তান সন্ততির ন্যায় রাজ্যেতে প্রতিপালিত হইল একেবারে রাজ্য নিবার আশায় রাজবিদ্রোহি হয়ে উঠল। ···এখন চিরদুঃখিনী বিধবা যে আমরা আমাদের কর্ত্তব্য এই যে আমরা সতত ভগবান চন্দ্রের নিকট এই প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের মহারাণীকে জয়ী করেন আর দুষ্ট সিপাইগণকে নিপাত করিয়া দেশে কুশল দেন।[১]

বিধবা-বিবাহের সমর্থনে (বেশি) অথবা বিরুদ্ধে (অল্প) যে সব নাটক-প্রহসন লেখা হইয়াছিল তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়খানির নাম করিতেছি প্রকাশ কাল ধরিয়া। বলা বাহুল্য সাহিত্যসৃষ্টি হিসাবে এগুলি অত্যন্ত ব্যর্থ। [১৮৫৬ঃ] রাধামাধব মিত্রের 'বিধবা মনোরঞ্জন' দুই খণ্ড (দ্বি-স ১৮৭৭), উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'বিধবোদ্বাহ', অজ্ঞাতনামার 'বিধবা বিষম বিপদ'। [১৮৫৭ঃ] বিহারীলাল নন্দীর 'বিধবা পরিণয়োৎসব', যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের 'চপলা চিত্তচাপল্য'। [১৮৬১ঃ] হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'দলভঞ্জন'। [১৮৬৪ঃ] যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'বিধবাবিলাস'। ঢাকায় এই ধরণের প্রহসন অনেকগুলি লেখা ও ছাপা হইয়াছিল ১৮৬২-৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। যেমন, হরিশ্চন্দ্র মিত্রের 'ম্যাও ধরবে কে ?' অজ্ঞাতনামার 'শুভস্য শীঘ্রং', গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর 'অশুভস্য কালহরণং', গৌরমোহন বসাকের 'অশুভ পরিহারক' ও হরিশ্চন্দ্র বসাকের 'শ্যামকিশোরী'।

নাট্যরচনার দ্বারা সংস্কারপ্রচেষ্টা শুধু বহুবিবাহ-বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধতার এবং বিধবাবিবাহের সমর্থনে ক্ষান্ত থাকে নাই, লাম্পট্যের কদর্য্যতা, নেশাখুরির বীভৎসতা এবং দলাদলির শোচনীয়তা অচিরে নাটক-প্রহসনের একটি প্রধান বিষয় হইয়া উঠে। ইহাতে পথ দেখাইল মধুসূদনের প্রহসন দুইটি। একেই-কি-বলে সভ্যতা ? ও বুড়ো-শালিকের-ঘাড়ে-রোঁ বাহির হইবার পর হইতে অধিকাংশ প্রহসন এই ছাঁচেই ঢালা হইতে লাগিল। মধুসূদনের পূর্ব্বেকার একটিমাত্র নব্শাজাতীয়

১ বইটির রচনাকাল তাহা হইলে ১৮৫৭-৫৮; বিধবা-বিবাহ নাটকের গ্রন্থকার দ্বিতীয় সংস্করণের ইংরেজি ভূমিকায়ও সিপাহী-বিদ্রোহের উল্লেখ আছে।

প্রহসনের নাম করা যায়—মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'চার ইয়ারে(র) তীর্থযাত্রা' (১৮৫৮)। বইটিতে শহুরে নেশাখোর যুবকদের দুরবস্থা চিত্রিত হইয়াছে।

আর একটি রচনার উল্লেখ করা যাইতে পারে—"সহর শ্রীরামপুরনিবাসি শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র দে চতুর্ধুরীণ মহাশয়ের কৌতূহলার্থ শ্রীশ্রীনারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধিকর্তৃক বিরচিত" পঞ্চাঙ্ক নক্‌শা-নাট্য 'কলিকৌতুক নাটক' (শ্রীরামপুর ১৮৫৮)। বিষয়বস্তু লেখকের কলিকুতূহলের অনুরূপ। কলিকৌতুকে সমাজসংস্কারপ্রচেষ্টার প্রতি কটাক্ষ করা হইলেও উদ্দেশ্য শিক্ষাত্মক, কেননা কৌলীন্যের ও ধর্ম্মের নামে কাপট্য এবং ব্যভিচারিতা ইত্যাদি সামাজিক দোষের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা হইয়াছে। বইটি গদ্যে-পদ্যে লেখা, প্রাচীন ধরণের। গোড়ার দিকে প্রবোধচন্দ্রদয় নাটকের প্রভাব আছে। গ্রন্থকারের রুচি মধ্যে মধ্যে শ্লীলতার গণ্ডী উল্লঙ্ঘন করিয়াছে॥

শ্যামাচরণ দের 'বাসরকৌতুক নাটক' (১৮৫৯) ঠিক নাট্যরচনা নয়। এই ক্ষুদ্র নিবন্ধটিকে নাট্যকৌতুক-শ্রেণীর মধ্যে ধরাই সঙ্গত। পরবর্ত্তী কালে বাসরঘরের আচরণ লইয়া আরও অন্তত তিনখানি প্রহসন লেখা হইয়াছিল—বটকৃষ্ণ রায়ের 'বাসরকৌতুক রহস্য' (১৮৭৫), নন্দকুমার রায়ের 'বাসরকৌতুক' (১৮৭৫) এবং নবগোপাল দাস দের 'বাসর উদ্যান' (১৮৮০)। গুরুপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়ের 'পুনর্বিবাহ নাটক'-এ (১৮৬২) একটি অধুনালুপ্ত কুৎসিত মেয়েলি উৎসবের বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। ভাষা পুরাপুরি কথ্য।

১১

কালিদাসের নাটক লইয়া অভিনয়যোগ্য প্রথম বাঙ্গালা নাটক লেখা হইল নন্দকুমার রায়ের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' (১৮৫৫)।[১] তাহার পর কালীপ্রসন্ন সিংহ "বিদ্যোৎসাহিনী সভার কারণ" আক্ষরিকভাবে অনুবাদ করিলেন (বা করাইলেন) 'বিক্রমোর্বশী নাটক' (১৮৫৭)।[২] ইহার পূর্ব্বে তিনি নিতান্ত ক্ষুদ্রাকার 'বাবুনাটক' লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সেটি প্রহসন অথবা নক্‌শা তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তখনকার দিনে "নাটক" নামে অনেক নক্‌শা বাহির হইয়াছিল। গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরও "বাবুনাটক" লিখিয়াছিলেন বলিয়া সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার বাল্যকথায় উল্লেখ করিয়াছেন।

কালীপ্রসন্নের দ্বিতীয় নাটক 'সাবিত্রী সত্যবান' (১৮৫৮) মৌলিক রচনা। তৃতীয় নাটক 'মালতীমাধব' (১৮৫৯) ভবভূতির অনুবাদ। এই বই দুইটিও "বিদ্যোৎসাহিনী সভার কারণ" রচিত। নাটকগুলির রচনায় কোন বৈশিষ্ট্য নাই, অভিনয়যোগ্যতাও কিছু নাই। কালীপ্রসন্নের স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত

[১] রামনারায়ণের অনুবাদের কথা আগে বলিয়াছি।

[২] মূলের শ্লোকগুলি পয়ারে অনূদিত। গদ্য অংশের ভাষা বিদ্যাসাগরীয়। বইখানি বর্দ্ধমানের মহারাজা বাহাদুরকে উপহৃত। বোঝা গেল তখনও কালীপ্রসন্ন বর্দ্ধমানের মহারাজার প্রতি বিদ্বিষ্ট হন নাই। কালীপ্রসন্ন নাটকখানিকে বিদ্যোৎসাহিনী সভার নামে অভিনয় করাইয়াছিলেন।

বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে বই দুইটি ঠিক অভিনীত হয় নাই, নাট্যোচিত আবৃত্তি (dramatic recital) হইয়াছিল।

নন্দকুমার রায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ ও রামনারায়ণ তর্করত্নের পর কালিদাসের নাটক অনুবাদ করিলেন শৌরীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'মালবিকাগ্নিমিত্র' (১২৬৬)। মনে হয় এই অনুবাদ আসলে করিয়াছিলেন কালিদাস সান্যাল। 'বিক্রমোর্বশী' অনুবাদ করিয়াছিলেন গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরও (১২৭৫) জোড়াসাঁকো থিয়েটারে অভিনয়ের উদ্দেশ্যে। 'চণ্ডকৌশিক নাটক' (১৮৬৯) রামগতি ন্যায়রত্নের অনুবাদ বলিয়া অনুমান করি।

শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই মধুসূদনের 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক' প্রকাশিত হইয়া বাঙ্গালা নাট্যরচনায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিল এবং তাঁহার প্রহসন দুইটি বাঙ্গালা প্রহসনের রূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল। মধুসূদনের সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন দীনবন্ধু মিত্র। ইনি চাষী বাঙ্গালীর এক মরণবাঁচনের সমস্যাকে নাটকের মধ্য দিয়া উপস্থাপিত করিলেন। দীনবন্ধুর নাট্যরচনাগুলির অভিনয় বাঙ্গালায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা সহজ করিয়াছিল।

পৌরাণিক নাটকে ভক্তিরসের সঞ্চার করিলেন ডাক্তার দুর্গাদাস কর 'স্বর্ণশৃঙ্খল নাটক' (ঢাকা ১৮৬৩) লিখিয়া।[১] এই পঞ্চাঙ্ক নাটকটির বিষয় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। ভক্তিরসাত্মক নাটকে ইঁহার পথ অনুসরণ করিলেন মনোমোহন বসু। তাহার পরে গিরিশচন্দ্র ঘোষ॥

১২

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে রামনারায়ণ তর্করত্নের রত্নাবলী-নাটক বেলগাছিয়া নাট্যশালায় সাড়ম্বরে অভিনীত দেখিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) বাঙ্গালা নাটক লিখিতে অনুপ্রাণিত হন। এই অনুপ্রেরণার প্রথম ফল 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক' (১৮৫৯)। শর্ম্মিষ্ঠা বাহির হইবার দুই-এক মাসের মধ্যেই 'একেই কি বলে সভ্যতা?' এবং তাহার অনতিবিলম্বে 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসন দুইটি বাহির হইল। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে প্রকাশিত হইল 'পদ্মাবতী নাটক'। পদ্মাবতী-নাটক রচনার পর মধুসূদন কিছু দিন নাট্যরচনায় ক্ষান্ত ছিলেন। তবে এই সময়ে ইনি 'সুভদ্রা' নামে একটি নাট্যকাব্য রচনায়

[১] প্রকাশকের বিজ্ঞাপন হইতে জানা যায় যে নাটকখানি ১২৬২ সালের দিকে বরিশালে রচিত ও অভিনীত হইয়াছিল।

হাত দিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলিকে লেখা একটি চিঠিতে জানা যায় যে ইহার দুইটি অঙ্ক লেখা হইয়া গিয়াছিল।[১] ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদনের তৃতীয় নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' বাহির হইল।[২] ইহার পর মধুসূদন নাট্যরচনায় হাত দিয়াছিলেন একেবারে শেষ জীবনে। মধুসূদন 'মায়া-কানন' (১৮৭৪) সমাপ্ত করিয়াছিলেন কিন্তু মুদ্রিত দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। মায়া-কাননের প্রকাশকের বিজ্ঞাপন হইতে জানা যায় যে কবি 'বিষ না ধনুর্গুণ' নামে আর একটি নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন মাত্র। চারিটি নাটকই পঞ্চাঙ্ক।

শর্ম্মিষ্ঠা বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম দস্তুরমত নাটক। ইহার পূর্ব্বে যে সকল নাটক প্রকাশিত হইয়াছিল সেগুলির প্লট সুকল্পিত নয়, এবং অধিকাংশই সংলগ্ন-অসংলগ্ন কতকগুলি দৃশ্যের সমষ্টিমাত্র। গুণের মধ্যে এইটুকু যে সমাজসংস্কার-ঘটিত নাটকগুলি অতিরঞ্জন সত্ত্বেও বাস্তবজীবনের প্রতিফলন-বঞ্চিত নয়। বাঙ্গালা সাহিত্যে বাস্তবতার প্রথম আমদানি এই নাটক-প্রহসনগুলির মধ্য দিয়াই।

সমসাময়িক যাত্রাগানের কদর্য্যতা ও নাটকের দুরবস্থা দেখিয়া মধুসূদন নাটক লিখিবার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের প্রস্তাবনা-কবিতায় তাই তিনি লিখিয়াছিলেন,

শুন গো ভারতভূমি, কত নিদ্রা যাবে তুমি,
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ, ত্যজ ঘুম-ঘোর, হইল, হইল ভোর
দিনকর প্রাচীতে উদয়।
কোথায় বাল্মীকি, ব্যাস কোথা তব কালিদাস,
কোথা ভবভূতি মহোদয়।
অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোকে রাঢ়ে, বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।
সুধারস অনাদরে, বিষবারি পান করে,
তাহে হয় তনু, মন ক্ষয়।
মধু কহে, জাগো জাগো বিভুস্থানে এই মাগো,
সুরসে প্রবৃত্ত হ'ক্ তব তনয় নিচয়।

বাঙ্গালা নাটকের আদর্শ খুঁজিতে গিয়া স্বভাবতই মধুসূদনের মন আকৃষ্ট হইয়াছিল কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রতি। শকুন্তলার একটি শ্লোকে

[১] মধুস্মৃতি, নগেন্দ্রনাথ সোম, পৃ ৭৬৭ দ্রষ্টব্য।

[২] এই প্রকাশ সাধারণ্যে বিক্রয়ার্থ নয়। বিক্রয়ার্থে প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৭২ সালে (১৮৬৫)।

মধুসূদন প্রকল্পিত নাটকের কাহিনীসূত্রের সন্ধান পাইলেন। শ্লোকটি পতিগৃহগমনোন্মুখী শকুন্তলার প্রতি কণ্বের আশীর্ব্বচন,

যযাতেরিব শর্ম্মিষ্ঠা ভর্ত্তুর্বহুমতা ভব।
সুতং ত্বমপি সম্রাজং সেব পুরুমবাপ্নুহি॥

শর্ম্মিষ্ঠার ঘটনাসংস্থানেও কালিদাসের নাটকের প্রভাব অলক্ষ্য নয়। শর্ম্মিষ্ঠার প্রণয়লীলার পরিবেশ শকুন্তলার প্রণয়লীলা স্মরণ করাইয়া দেয়। পুরু যে-অবস্থায় অজ্ঞাতসারে দেবযানীর কাছে আত্মপরিচয় দিল তাহা শকুন্তলার সপ্তম অঙ্কে রাজা-সর্ব্বদমনের মিলনের অনুরূপ। যযাতি-শর্ম্মিষ্ঠা দুষ্যন্ত-শকুন্তলার মত। দেবযানীর সখীও শকুন্তলার সখীদ্বয়ের আদর্শে গড়া। শর্ম্মিষ্ঠার বিদূষক শকুন্তলার মাধব্যের অনুরূপ। এমন কি শকুন্তলার কোন কোন ছত্রের অনুবাদ বা প্রতিধ্বনিও শর্ম্মিষ্ঠায় বহু স্থানে রহিয়াছে।[১]

শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের কাহিনী মধুসূদন লইয়াছিলেন মহাভারতের আদিপর্ব্ব হইতে।[২] সেখানে যযাতি-উপাখ্যানের যে আদিম রূপ আছে তাহা বেশ নাটকীয় হইলেও সর্ব্বত্র আধুনিক রুচিসম্মত নয়। মধুসূদন তাই আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। মহাভারতের যযাতির পূর্ব্বরাগ নাই, দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠা উভয়েই উপযাচিকা হইয়া রাজার নিকট প্রণয় প্রার্থনা করিয়াছিল। কূপ হইতে দেবযানীকে উদ্ধারের পর হইতে দেবযানী ও যযাতিকে মধুসূদন পরস্পরমুগ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু মহাভারতের মতে অনেক কাল পরে বনে তৃষাতুর যযাতিকে দেখিয়া দেবযানীর পূর্ব্বকথা মনে পড়িয়া যায় এবং সে

[১] যেমন "আর তার মধুর অধরকে রতিসর্ব্বস্ব বল্‌লেও বলা যেতে পারে" (তৃতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)—"পিবসি রতিসর্ব্বস্বমধুরং" (প্রথম অঙ্ক); "তথায় সেই পরমরমণীয়া নবযৌবনা কামিনীকে দেখলেম, আপনার করতলে কপোল বিন্যাস করো্যে অশোক-বৃক্ষতলে উপবিষ্টা আছে! বোধ হল্যো যে, সে চিন্তার্ণবে মগ্না রয়েছে" (ঐ)—"অণুসূএ পেক্‌খ দাব বামহত্থোবহিদবদণা আলিহিদা বিঅ পিঅসহী ভত্তুগদাএ চিন্তাএ" (চতুর্থ অঙ্ক)। "একি? আমার দক্ষিণবাহু স্পন্দন হত্যে লাগ্‌লো কেন? এ স্থলে মাদৃশ জনের কি ফললাভ হত্যে পারে? বলাও যায় না, ভবিতব্যের দ্বার সর্ব্বত্রই মুক্ত রয়েছে।" (ঐ তৃতীয় গর্ভাঙ্ক)—"শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্য। অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্ব্বত্র॥" (প্রথম অঙ্ক)। অন্য সংস্কৃত নাটকাদির শ্লোকাংশের ছায়াও দেখা যায়। যেমন, "যাকে সুশীতল চন্দনবৃক্ষ ভেব্যে আশ্রয় কল্লেম, সে ভাগ্যক্রমে দুর্ব্বিপাক বিষবৃক্ষ হয়ে উঠলো!" (চতুর্থ অঙ্ক চতুর্থ গর্ভাঙ্ক)—"শ্রিতাসি চন্দনভ্রান্ত্যা দুর্বিপাকং বিষদ্রুমম্" (উত্তররামচরিত প্রথম অঙ্ক।)

[২] ৭৮-৮৫ অধ্যায়।

এই ছল করিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে যযাতিকে বাধ্য করে যে কূপ হইতে উদ্ধারের সময়ই যযাতি তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছে,

তং মে ত্বমগ্রহীরগ্রে বৃণোমি ত্বামহং ততঃ।

মহাভারতে শর্ম্মিষ্ঠার প্রণয়ঘটনা রোমান্টিক নয়। দেবযানীর পুত্র হইয়াছে শুনিয়া দাসীকৃত রাজকন্যা-সখীর ঈর্ষ্যা স্বভাবতই জাগিয়া উঠে এবং সেকালের নিয়ম অনুসারে যযাতিকে শর্ম্মিষ্ঠা তাহার আকাঙ্ক্ষিত পুত্রের পিতারূপে কামনা করে। সে ভাবে, দেবযানী যেমন করিয়া যযাতিকে পাইয়াছে নিজেও তেমনি করিবে।

দেবযানী প্রজাতাসৌ বৃথাহং প্রাপ্তযৌবনা।
যথা তয়া বৃতো ভর্ত্তা তথৈবাহং বৃণোমি তম্॥

তখন হইতে শর্ম্মিষ্ঠা প্রতিক্ষণে রাজার দর্শনকামনায় রহিল,

অপীদানীং স ধর্ম্মাত্মা ইয়ান্মে দর্শনং রহঃ।

নির্জ্জনে রাজার দেখা পাইতেই শর্ম্মিষ্ঠা আত্ম-নিবেদন করিল। রাজা বলিল, সে কি করিয়া হইবে ; আমি দেবযানীকে যখন বিবাহ করি তখন শুক্রাচার্য্য এই প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছে,

নেয়মাহ্বয়িতব্যা তে শয়নে বার্ষপর্ব্বণী।

মহাভারতের শর্ম্মিষ্ঠা প্রগ্‌লভা তরুণী। নানারকম যুক্তি দেখাইয়া রাজাকে তাহার পাণিগ্রহণে স্বীকৃত করিতে তাহাকে বিশেষ কষ্ট করিতে হয় নাই। মধুসূদন সংস্কৃত এবং পাশ্চাত্য নাটকের ধারা অনুসারে যযাতি-দেবযানীর এবং যযাতি-শর্ম্মিষ্ঠার পূর্ব্বরাগ একসময়েই করিয়াছেন। নায়িকাদের ভূমিকা-পরিকল্পনায়ও তিনি স্বাধীনতা দেখাইয়াছেন। মহাভারত-কাহিনীর নায়িকা দেবযানী। মধুসূদনের নাটকের আসল নায়িকা কার্য্যত শর্ম্মিষ্ঠা, অথচ নাট্যরস জমিয়া উঠিয়াছে দেবযানীর কার্য্যে। মহাভারতে দেবযানী মহিমময়ী তেজস্বিনী এবং আত্মসম্মানজ্ঞানবতী আর শর্ম্মিষ্ঠাই যেন ঈর্ষ্যাকুলা ও কলহকারিণী। তুচ্ছ কারণে দেবযানীর সহিত কিছু কথা-কাটাকাটি হইতেই সে মর্ম্মান্তিক রূঢ়ভাবে বলিয়া বসিল,

আদুন্বস্ব বিদুন্বস্ব দ্রুহ্য কুপ্যস্ব যাচকি।
অনায়ুধা সায়ুধায়া রিক্তা ক্ষুভ্যসি ভিক্ষুকি॥

মধুসূদন দেবযানীকেই কোপনস্বভাব এবং ঈর্ষ্যাপরায়ণ করিয়াছেন এবং শর্ম্মিষ্ঠাকে শকুন্তলার আদর্শে নাটকের নায়িকা করিয়া গড়িয়াছেন।

দেবযানীর কাছে শর্ম্মিষ্ঠার প্রণয়কাহিনী প্রকাশ মহাভারতে যেমন আছে মধুসূদন ঠিক তেমনভাবে করেন নাই। শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র জন্মিলে দেবযানী খবর পাইল। সে জানিত না যে যযাতি শর্ম্মিষ্ঠাকে বিবাহ করিয়াছে। তাই শর্ম্মিষ্ঠার অধঃপতনে সে দুঃখিত হইল,

চিন্তয়ামাস দুঃখার্ত্তা শর্ম্মিষ্ঠাং প্রতি ভারত

এবং শর্ম্মিষ্ঠার কাছে আসিয়া অনুযোগ করিয়া বলিল,

কিমিদং বৃজিনং সুভ্রু কৃতং বৈ কামলুব্ধয়া।

শর্ম্মিষ্ঠা ঘুরাইয়া উত্তর দিল,

ঋষিরভ্যাগতঃ কশ্চিদ্ ধর্ম্মাত্মা বেদপারগঃ।
স ময়া বরদঃ কামং:যাচিতো ধর্ম্মসংহিতম্॥

শর্ম্মিষ্ঠার বাঁকা কথায় দেবযানীর সন্দেহ ঘুচিল না। সে বলিল,

গোত্রনামাভিজনতো বেত্তুমিচ্ছামি তং দ্বিজম্।

শর্ম্মিষ্ঠা কপট উত্তর দিল,

তপসা তেজসা চৈব দীপ্যমানং যথা রবিম্।
তং দৃষ্ট্বা মম সম্প্রষ্টুং শক্তির্নাসীচ্ছুচিস্মিতে।

এই দৃশ্যটি বাদ দিয়া মধুসূদন ভালই করিয়াছেন। শর্ম্মিষ্ঠা নাটকে যযাতিই উপযাচক,

> যা হোক, যদ্যপি তুমি মহিষীর সহচরী হও, তবে তোমাতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। অতএব হে ভদ্রে, তুমি আমাকে বরণ কর।

শর্ম্মিষ্ঠার পুত্রদের পিতা যযাতি, যখন দেবযানী এই কথা জানিতে পারিল তখনকার দৃশ্যটিতে মধুসূদন মহাভারতের সম্পূর্ণ অনুসরণ করেন নাই, কালিদাস যেমন করিয়া দুষ্যন্তের সহিত সর্ব্বদমনের মিলন করিয়াছেন অনেকটা সেইমত করিয়াছেন। শর্ম্মিষ্ঠা যযাতির অঙ্কলক্ষ্মী হইয়াছে শুনিয়া দেবযানী ক্রুদ্ধ হইয়া পিতার কাছে গিয়া অনুযোগ করিয়াছিল। সেখানেও মধুসূদন মহাভারত-কাহিনীর ঠিক অনুসরণ করেন নাই। মহাভারতে দেবযানীর পিতা শুক্রাচার্য্যের আচরণ বেশ স্বাভাবিক ও সঙ্গত। এই সঙ্গতি মধুসূদন অনেকটা বজায় রাখিয়াছেন এবং তাহাকে আরও মানবোচিত করিয়াছেন। মহাভারতে যযাতির প্রতি দেবযানীর এই অভিযোগ যে সে নিজে পাটরানী হইয়া দুই

পুত্রের মাতা অথচ শর্মিষ্ঠা দাসী হইয়াও তিন পুত্রের জননী। মধুসূদনের নাটকে দেবযানীর অভিমান যযাতির প্রতি,

দৈত্যকন্যা দুশ্চারিণী শর্মিষ্ঠাকে গান্ধর্ব্ববিধানে পরিণয় করো আমার যথেষ্ট অবমাননা করেছ।

মধ্যপথে পিতাপুত্রীর মিলনদৃশ্যটি মধুসূদনের নিজস্ব।

মহাভারতে শর্মিষ্ঠার দোন দাসীর উল্লেখ নাই। শুধু এই আছে যে সহস্র-দাসীপরিবৃত শর্মিষ্ঠা দেবযানীর দাসত্ব করিয়াছিল। মহাভারতে দেবযানীর এক দাসীর নাম আছে—ঘূর্ণিকা। ইহা মধুসূদনের নাটকে পূর্ণিকা হইয়াছে।

শর্মিষ্ঠা নাটকের প্রধান দোষ হইতেছে প্লটে গতির অভাব এবং প্রায় সমস্ত নাটকীয় ঘটনা নাট্যের মধ্য দিয়া না দেখাইয়া অতীত ব্যাপাররূপে পাত্রপাত্রীর মুখ দিয়া বর্ণিত হইয়াছে, অর্থাৎ নাট্য ঘটনাগুলি বর্ণিত ঘটনায় পরিণত হইয়াছে। দেবযানীর সহিত শর্মিষ্ঠার কলহ, যাহা নাটকটির বীজ, তাহা বকাসুরের উক্তিতে পাই। যযাতি কর্তৃক দেবযানীর উদ্ধার বিবৃত হইয়াছে দেবযানী-পূর্ণিকার সংলাপে। দেবযানীর কাছে শর্মিষ্ঠার প্রণয়লীলার প্রকাশও রাজার মুখে।

শর্মিষ্ঠার বিদূষক সংস্কৃত নাটকের, বিশেষ করিয়া শকুন্তলার মাধব্যের আদর্শে অঙ্কিত, এবং এই ভূমিকার সাহায্যে যেটুকু কৌতুকরসের সঞ্চার হইয়াছে তাহা মৃদু ও অনাবিল।

ক্রিয়াপদগুলিতে কথ্য রূপ থাকিলেও তৎসম শব্দের বাহুল্য এবং সংস্কৃত-রীতির বাক্‌ভঙ্গি নাটকের ভাষাকে গতিমন্থর করিয়াছে। এই দোষ হইতে মধুসূদনের গদ্যপদ্ধতি কখনো মুক্ত হয় নাই। তাঁহার পদ্যে যাহা ওজোগুণ ও ধীরগম্ভীর গতি দিয়াছে তাঁহার গদ্যে তাহাই হইয়াছে গুরুভার শৃঙ্খল। তবে অভিনয়ে এই তৎসম-শব্দপ্রচুর ধ্বনিগাম্ভীর্য্য ও শব্দগৌরব যে পৌরাণিক নাটকটিকে প্রাচীনত্বের দূরত্বমর্য্যাদা দিয়াছিল তাহা ঠিক। পণ্ডিতদের কাছে শিক্ষা এবং সংস্কৃত নাটকের একান্ত আনুগত্য এই দোষের প্রধান কারণ। সংস্কৃত-পদ্ধতির অলঙ্কারের, বিশেষ করিয়া রূপক-উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার গদ্যে একেবারে খাপ খায় নাই। বাঙ্গালা গদ্য মধুসূদন রপ্ত করিতে পারেন নাই।

শর্মিষ্ঠা নাটক গদ্যে লেখা, কেবল দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে রাজার

উক্তিতে এই আট ছত্র পয়ার আছে। ইহাই বোধ হয় মধুসূদনের বাঙ্গালা কবিতা রচনার এ সময়ে প্রথম প্রচেষ্টা।

ভুবনমোহিনী যিনি সাধনের ধন,
বিরাগেতে ত্যাজ্য তিনি করি ত্রিভুবন,
অতল জলধি-তলে কমল আসনে,
বিরাজেন কমলা কমল উপবনে ,
সেইরূপ তপোবন ভার্গব আশ্রম,
উজ্জ্বল করয়ে ধনী রূপে নিরুপম !
কে ডরায় সিন্ধু তোর করিতে মথন,
পায় যদি সে এই রমণীরতন !

শর্ম্মিষ্ঠায় ছয়টি গান আছে, তাহার মধ্যে পাঁচটিতে মধুসূদনের ছাপ আছে। অপরটি. (পঞ্চম অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের প্রথম গান) রামনারায়ণের রচনা হওয়া সম্ভব।[১]

দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে এই গানটি আর কিছু না হোক অন্তত ছন্দের খাতিরে সেকালের পক্ষে সম্পূর্ণ অভিনব,

হায়, কুহু, কুহু, কুহু কোকিলের নাদ !
বসন্ত এলো সহ অনঙ্গ উন্মাদ।
হায় যৌবন-মুকুল তব,
শুনি ওই কুহুরব,
বিকশিলে ঘটিবে প্রমাদ !···

বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে শর্ম্মিষ্ঠার অভিনয় খুব জমিয়াছিল। রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই অভিনয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন।[২]

শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের বীজ সখী-সপত্নীর সৌভাগ্যের ঈর্ষ্যা। পদ্মাবতী নাটকের বীজ নারীসৌন্দর্য্যের স্বাভাবিক ঈর্ষ্যা। গ্রীক-পুরাণের একটি আখ্যায়িকা অবলম্বনে পদ্মাবতী নাটকের পরিকল্পনা। কাহিনীটি এই। জেউসের কন্যা থেতিসের সহিত পেলেউসের বিবাহের সময়ে ঈর্ষ্যাদেবী এরিস একটি সোনার

[১] রামনারায়ণ তর্করত্ন শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের ভাষার ব্যাকরণগত অশুদ্ধি দেখিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু মধুসূদন তাঁহাকে তাঁহার নাটকের উপর কলম চালাইতে দেন নাই। এই সম্পর্কে তিনি গৌরদাস বসাককে লিখিয়াছিলেন, Ram Narayan's "version", as you justly call it, disappoints me. I have at once made up my mind to reject his aid.............. I have no objection to allow a few alterations and so forth, but recast all my sentences—the Devil if I would sooner burn the thing.

[২] বিবিধার্থসংগ্রহ ১৭৮০ শকাব্দের মাঘ সংখ্যা।

আপেল পাঠাইয়া দেয়। তাহাতে লেখা ছিল, শ্রেষ্ঠ যে সুন্দরী সেই সেটি পাইবে। শ্রেষ্ঠ-সুন্দরীত্বের মর্য্যাদা লইয়া হেরা, আথেনে ও আফ্রোদিতে এই ত্রিদেবীর মধ্যে বিবাদ হইল। শেষে মধ্যস্থ হইল পারিস, যে ছিল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুপুরুষ। হেরা তাহাকে মানুষপ্রধান করিয়া দিবে বলিল। আথেনে প্রালোভন দেখাইল সর্বদা যুদ্ধজয়ী করিবার। আফ্রোদিতে বলিল যে তাহাকে ফলটি দিলে সে সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েকে পত্নীরূপে পাইবে। পারিস আফ্রোদিতেকেই আপেলটি দিল এবং তাহার ফলে হেলেনকে বিবাহ করিল। মধুসূদনের কাহিনী এই, বিদর্ভের রাজা ইন্দ্রনীল একদা মৃগয়া-উপলক্ষ্যে বিন্ধ্যগিরিস্থিত দেবউপবনে গিয়াছিল। সেখানে ইন্দ্র-পত্নী শচী, কাম-পত্নী রতি এবং কুবের-ভার্য্যা মুরজা এই তিন দেবসখীও বেড়াইতেছিল। তাহাদের দেখিয়া নারদের ইচ্ছা হইল বিবাদ বাধাইতে। এই উদ্দেশ্যে নারদ তাহাদের নিকট গিয়া একটি সুবর্ণ পদ্ম রাখিয়া বলিল তাহাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী সেই যেন পদ্মটি নেয়, অন্যথা যে স্পর্শ করিবে সে পাষাণমূর্ত্তি হইয়া সেই উপবনে রহিয়া যাইবে। এই বিচারে নারদ ইন্দ্রনীলকে মধ্যস্থ করিয়া দিল। বিশেষ বিবেচনা করিয়া ইন্দ্রনীল রতিকে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী বলিয়া নির্বাচন করায় শচী ও মুরজা তাহার শত্রু হইল। রতি তুষ্ট হইয়া তাহাকে উপযুক্ত পুরস্কার দিতে অঙ্গীকার করিল—মাহেশ্বরী পুরীর রাজকন্যা অপূর্ব্ব সুন্দরী পদ্মাবতীর সহিত তাহার বিবাহ দিয়া। দুইজনের মধ্যে অনুরাগ জমাইবার জন্য রতি একজনের মূর্ত্তি ধরিয়া অপরকে দেখা দিতে লাগিল। শেষে একদিন পদ্মাবতীকে ইন্দ্রনীলের চিত্রপট দেখাইয়া পরিচয় দিল। ইন্দ্রনীল বণিক্‌বেশে বয়স্যের সঙ্গে মাহেশ্বরী পুরীতে আসিয়াছে, এদিকে রাজকন্যারও স্বয়ংবরসভা আহূত হইয়াছে। ইন্দ্রনীলের সঙ্গে দৈবক্রমে পদ্মাবতীর সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু তাহাকে সামান্য বণিক্ ভাবিয়া পদ্মাবতী দুঃখিত হইল। তাহার অসুস্থতায় স্বয়ংবরসভা ভাঙ্গিয়া গেল। অবশেষে বয়স্যের অনবধানতায় মাহেশ্বরী পুরীতে ইন্দ্রনীলের প্রকৃত পরিচয় জানা গেলে অচিরে পদ্মাবতীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। রতির বাসনা পূর্ণ হইল বলিয়া শচী পদ্মাবতীর অনিষ্টচেষ্টা করিয়া ইন্দ্রনীলকে জব্দ করিতে চেষ্টিত হইল। স্বয়ংবরে সমাগত ব্যর্থকাম রাজারা অপমানিত বোধ করিয়া যুদ্ধার্থে সমাগত হইল। ইন্দ্রনীল যখন যুদ্ধে ব্যাপৃত তখন শচীর প্ররোচনায় কলি রাজসারথির ছদ্মবেশে পদ্মাবতী ও তাহার সহচরীকে হরণ করিয়া এক পর্ব্বতশিখরে গহনকাননে রাখিয়া

আসিল এবং কিছুকাল পরে আহত যোদ্ধার বেশে আসিয়া পদ্মাবতীকে বলিল যে ইন্দ্রনীল যুদ্ধে মারা পড়িয়াছে। শুনিয়া পদ্মাবতী মূর্চ্ছিত হইল। তখন কাঠুরিয়া-নারীর বেশে রতি আসিয়া পদ্মাবতী ও তাঁহার সখীকে তপস্বীদের আশ্রমে লইয়া গেল। এদিকে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইন্দ্রনীল রাজধানীতে ফিরিয়া পদ্মাবতীকে না দেখিয়া মূর্চ্ছাগত হইল। ইতিমধ্যে মুরজা জানিতে পারিয়াছে যে পদ্মাবতী তাহার শাপভ্রষ্ট কন্যা বিজয়া। রতির মুখে শিবভক্ত ইন্দ্রনীল রায়ের লাঞ্ছনার কথা শুনিয়া পার্ব্বতী শচীর উপর বিরক্ত হইয়াছেন,—নারদের কাছে এই কথা শুনিয়া শচী রাজার অনিষ্টচেষ্টা ত্যাগ করিল। পরিশেষে তমসানদীতীরে মহর্ষি অঙ্গিরার আশ্রমে ইন্দ্রনীল-পদ্মাবতীর মিলন ঘটিল।

কাহিনীতে রূপকথার প্রভাব অস্পষ্ট নয়, বিশেষ করিয়া অনুরাগসঞ্চারে এবং নায়িকার অপহরণে। নাট্য-পরিকল্পনায় সংস্কৃত নাটকের আদর্শ গৃহীত হইয়াছে। বিদূষক মাণবক পূরাপূরি সংস্কৃত নাটকের অনুযায়ী। স্বপ্ন ও চিত্রপট দর্শনে অনুরাগও তাই। রাজাকে প্রথম দেখিয়া পদ্মাবতীর উক্তি—"সখি, দেখ, দেখ, এই নূতন তৃণাঙ্কুর আমার পায়ে বাজ্‌তে লাগলো! উহু, আমি ত আর চল্‌তে পারি না, তোমরা একজন আমাকে ধর। (রাজার প্রতি লজ্জা এবং অনুরাগ সহকারে দৃষ্টিপাত)"—শকুন্তলার অনুকরণ। পঞ্চমাঙ্কে প্রথম গর্ভাঙ্কের দৃশ্য "শক্রাবতারাভ্যন্তরে—শচীতীর্থ", এবং তপসী গৌতমী ও ঋষিবালক শার্ঙ্গধর পদ্মাবতী নাটকের উপর শকুন্তলার প্রভাবের চিহ্ন। নাটকের উপসংহারও শকুন্তলার মত। সংস্কৃত নাটকের শ্লোকের অনুবাদ যে একেবারে নাই তাহা নয়। যেমন, তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে

> শুভে, যেমন নিশাবসানে সরসীতে নলিনী উন্মীলিতা হয়, দেখ তোমার সখীও মোহান্তে আপন কমলাক্ষি উন্মীলন কল্যেন। আহা! ভগবতী জাহ্নবী দেবী, ভগ্নতটপতনে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তে কলুষা হয়ে, এইরূপেই আপন নির্ম্মল শ্রী পুনর্দ্ধারণ করেন।

ইহার মূলে আছে কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশীয়ের প্রথম অঙ্কের এই শ্লোকার্দ্ধ,

> মোহেনান্তর্বরতনুরিয়ং মুচ্যমানা বিভাতি
> গঙ্গা রোধঃপতনকলুষা গচ্ছতীব প্রসাদম্।

পদ্মাবতী নাটক পূরাপূরি গল্পসর্ব্বস্ব। চরিত্রচিত্রণে কোন বৈশিষ্ট্য নাই। ভাষা প্রধানত গদ্য, কেবল কয়েকস্থানে প্রবহমাণ অমিত্রাক্ষরে পয়ার ব্যবহৃত

হইয়াছে। নিম্নে উদ্ধৃত সংলাপে ভঙ্গ-অভঙ্গ মিলহীন প্রবহমাণ পয়ার বেশ জমিয়াছে।

কলি। (প্রকাশ্যে)
দেবি, আশীর্ব্বাদ করি।
শচী। প্রণাম! হে দেববর, কি করেছ বল ?
কলি। পালিনু তোমার আজ্ঞা যতনে ইন্দ্রাণী,
বিদায় করহ এবে যাই স্বর্গপুরে।
শচী। (ব্যগ্রভাবে)
কোথায় রেখেছ তারে ?
কলি। এই ঘোর বনে
সখীসহ আনি তারে রেখেছি, মহিষি।
(সহাস্যবদনে)
রথে যবে তুলি দোঁহে উঠিনু আকাশে,
কত যে কাঁদিল ধনি, করিল মিনতি,
সে সকল মনে হলে—হাসি আসে মুখে।
মুরজা। (স্বগত)
হেন দুরাচার আর আছে কি জগতে ?
(প্রকাশ্যে)
ভাল কলিদেব,—
কিছু কি হলো না দয়া তোমার হৃদয়ে ?
কলি। সে কি দেবি ? হরিণীরে মৃগেন্দ্রকেশরী
ধরে যবে শুনি তার ক্রন্দনের ধ্বনি,
সদয় হইয়া সে কি ছাড়ি দেয় তারে ?

অমিত্রাক্ষরের এমন নাটকীয় উপযোগিতা সত্ত্বেও শুধু দর্শক-শ্রোতাদের অপরিচয়জনিত বিমুখতা আশঙ্কা করিয়াই বোধ করি মধুসূদন মনে করিয়াছিলেন অমিত্রাক্ষর পদ্য নাটকে চলিবে না। তাই তিনি কৃষ্ণকুমারী নাটকের মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন,

অমিত্রাক্ষর পদ্যই নাটকের উপযুক্ত পদ্য ; কিন্তু অমিত্রাক্ষর পদ্য এখনও এদেশে এতদূর পর্য্যন্ত প্রচলিত হয় নাই যে, তাহা সাহসপূর্ব্বক নাটকের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া সাধারণ জনগণের মনোরঞ্জন করিতে পারি। তথাচ ইহাও বক্তব্য যে, আমাদিগের সুমিষ্ট মাতৃভাষায় রঙ্গভূমিতে গদ্য অতীব সুশ্রাব্য হয়। এমন কি, বোধ করি, অন্য কোন ভাষায় তদ্রূপ হওয়া সুকঠিন।

পদ্মাবতী নাটকে আটটি গান আছে। শেষের গানটির ছন্দে নূতনত্ব আছে,

পাইলে হারানিধি
প্রিয়তমা পুনরায়,
বাসনা পূর্ণ হলো,
সুখে কর রাজকাজ।

কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি হইতে জানা যায় যে 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' লিখিতে একমাস মাত্র লাগিয়াছিল (৬ আগষ্ট হইতে ৭ সেপ্টেম্বর ১৮৬০)। বইটি বন্ধুগণের পাঠার্থে ও অভিনয়ার্থে ছাপা হইয়াছিল ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে।[১] কৃষ্ণকুমারী নাটকের মূলকথা হইতেছে ধনলোভী কপট পুরুষের উপর নারীর প্রতিহিংসা এবং তাহার ফলে এক নিরপরাধ তরুণীর আত্মাহুতি। জয়পুরের রাজা জয়সিংহকে উদয়পুরের রাজকন্যা কৃষ্ণকুমারীর পাণিগ্রহণের লোভ দেখাইয়া চাটুকার ধনদাস নিজের দুইটি স্বার্থ সিদ্ধ করিতে চেষ্টা করে, অর্থলাভ এবং রাজার অনুরক্ত গণিকা বিলাসবতীর আধিপত্যনাশ। বিলাসবতীর সখী মদনিকা ধনদাসের চাতুরী বুঝিয়া কৌশলে মরুদেশের রাজা মানসিংহকে কৃষ্ণকুমারীর পাণিপ্রার্থিরূপে দাঁড় করায় এবং মানসিংহের প্রতিকৃতি বলিয়া এক চিত্রপট দেখাইয়া কৃষ্ণকুমারীকে মানসিংহের অনুরক্ত করিয়া তোলে। উদয়পুরের রাজা ভীমসিংহ স্বদেশরক্ষার্থে বারবার যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়া বলহীন এবং মহারাষ্ট্রশক্তিকে ঘুষ দিয়া থামাইতে গিয়া অর্থহীন হইয়াছে। এই অবস্থায় জয়সিংহ অথবা মানসিংহ কাহারো বৈর সহ্য করিবার মত শক্তি তাহার ছিল না। ভীমসিংহের ইচ্ছা জয়সিংহের সহিত কৃষ্ণকুমারীর বিবাহ হয়, কেননা সে পাত্র হিসাবে উপযুক্ত এবং পাণিপ্রার্থীদের মধ্যেও প্রথম। কিন্তু কৃষ্ণকুমারীর মন পড়িয়াছে মানসিংহের উপর এবং রাজমহিষীর ইচ্ছাও তাহাই। তাহার উপর মহারাষ্ট্রপতি মানসিংহের সঙ্গে যোগ দিয়াছে। এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোন উপায় নাই কৃষ্ণকুমারীর মরণ ছাড়া। মন্ত্রী রাজাকে সেই কথাই বলিল। এই নিদারুণ কাজের ভার পড়িল রাজভ্রাতা সেনাপতি বলেন্দ্রসিংহের উপর। বলেন্দ্রসিংহ হত্যা করিতে গিয়াও পারিয়া উঠিল না। কৃষ্ণকুমারী আত্মহত্যা করিয়া পিতৃব্যের কঠিন কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিল।

ইতিহাস অবলম্বনে বাঙ্গালায় নাটক লেখা এই-ই প্রথম। মধুসূদন কৃষ্ণকুমারীর কাহিনী টডের রাজস্থান-ইতিবৃত্ত হইতে লইয়াছিলেন, তবে কাহিনীর সন্ধান পাইয়াছিলেন ১৭৭৯ শকাব্দের পৌষ সংখ্যা বিবিধার্থসংগ্রহে প্রকাশিত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কৃষ্ণকুমারী ইতিহাস' প্রবন্ধ হইতে। ইতিহাস-কাহিনীর সহিত নাটককাহিনীর সম্পর্ক ক্ষীণ। তাই কৃষ্ণকুমারীকে পূরাপূরি ঐতিহাসিক নাটক বলা চলে না।

[১] বিক্রয়ার্থ মুদ্রণ ১২৭২ সালে।

কৃষ্ণকুমারী নাটক।

শ্রী মাইকেল মধুসূদন দত্ত

প্রণীত।

কলিকাতা।

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১১২ সংখ্যক
ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ্ যন্ত্রে যন্ত্রিত।

সন ১২৭২ সাল।

কলিকাতা।

সন ১২৬৮ সাল।

কৃষ্ণকুমারী পূর্ববর্ত্তী বাঙ্গালা নাট্যরচনাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পরবর্ত্তী অধিকাংশ নাটকের তুলনায়ও বটে। প্লট নাট্যোপযোগী এবং দ্রুতগতি, পরিণতি স্বাভাবিক, অসংলগ্নতা নাই। মধুস্থদনের অপর দুই নাটকের মত রোমান্স-প্রধান নয়। মানবীয়তার প্রাধান্যে নাটকে কিছু বাস্তবতা আসিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে দুই-একখানি বিয়োগান্ত "নাটক" লেখা হইলেও কৃষ্ণকুমারী-নাটকই বাঙ্গালায় প্রথম সার্থক ট্রাজেডি। কৃষ্ণকুমারীর ভাগ্যচক্র গ্রীক ট্রাজেডির অপরিহার্য্য নিয়তির মত সমগ্র নাটকটির উপর ছায়াপাত করিয়াছে। এউরিপিদেস্-এর 'ইফিগেনেয়া' (*Iphigeneiā ē en Aulidi*) নাটকের ক্ষীণ প্রভাব লক্ষ্য করা যায় কৃষ্ণকুমারীর বলিদানে। কোন ভূমিকাই পরিস্ফুট নয়, এবং সংলাপের ভাষা নাটকোচিত নয়। দুর্দৈবগ্রস্ত রাজ্যচিন্তাকুল প্রবীণ ভীমসিংহ কতকটা স্বাভাবিক। অত্যন্ত অপরিস্ফুট হইলেও জয়সিংহের ভূমিকা খুব অস্বাভাবিক নয়। ধনদাস খাঁটি পাষণ্ড, যদিও তাহার উপর সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের ছায়া কিছু পড়িয়াছে। নারী-চরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মদনিকা। ধনদাসের নিগ্রহের পর তাহার প্রতি অনুকম্পা ভূমিকাটিকে বিশেষভাবে বাস্তব করিয়াছে,

> ধনদাস, আমি, ভাই, সতী স্ত্রী নই বটে, কিন্তু আমার ত নারীর প্রাণ বটে—হাজার হউক, পরের দুঃখ দেখলে আমার মনে বেদনা হয়।

বিলাসবতী মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনার অনুকরণ, তবুও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। স্বগত-উক্তির বাহুল্যে কৃষ্ণকুমারীর ভূমিকা কিছু অস্বাভাবিক হইয়াছে। গ্রীক নাট্যের অনুকরণে অশরীরী পদ্মিনীর আবির্ভাব নাট্যরসকে তরল করিয়াছে। অপ্রধান ভূমিকাগুলিতে প্রায়ই স্বাভাবিকতা আছে। তপস্বিনী কপালকুণ্ডলা ভবভূতির মালতীমাধব নাটককে স্মরণ করাইয়া দেয়। নায়িকা কৃষ্ণকুমারী একেবারে ব্যর্থ-চরিত্র।

কৃষ্ণকুমারী নাটক সম্পূর্ণভাবে গদ্যে লেখা। পাঁচটি গান আছে। ভাষা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা সহজ হইলেও নাটকের উপযোগী নয়।

মধুস্থদনের স্বদেশপ্রীতি ও স্বাজাত্যবোধ সুস্পষ্ট প্রকাশ কৃষ্ণকুমারী-নাটকে। ভীমসিংহের খেদে আমরা যেন সেকালের ইংরেজি শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনের কথা শুনি,

> (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, এ ভারতভূমির কি আর সে শ্রী আছে। এ দেশের পূর্ব্বকালীন বৃত্তান্ত সকল স্মরণ হল্যে, আমরা যে মনুষ্য, কোনমতেই ত এ বিশ্বাস হয় না। জগদীশ্বর যে আমাদের প্রতি কেন এত প্রতিকূল হলেন, তা বলতে পারি নে। হায়!

হায়! যেমন কোন লবণাম্বু তরঙ্গ কোন সুমিষ্টবারি নদীতে প্রবেশ করে তার সুস্বাদ নষ্ট করে, এ দুষ্ট যবনদলও সেইরূপ এ দেশের সর্ব্বনাশ করেছে! ভগবতি, আমরা কি আর এ আপদ হতো কখনও অব্যাহতি পাবো?

অভিনয়ের উদ্দেশ্যেই মধুসূদন নাটক লিখিতেন। তাই রচনা শেষ হইলে সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয়ার্থ ছাপান হইত না। মধুসূদনের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে কৃষ্ণকুমারী বেলগাছিয়া থিয়েটারে অভিনীত হয়। তাহার পর তিনি ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন যে মুসলমান ভূমিকা লইয়া 'রিজিয়া' নাটক লিখিবেন। মাদ্রাজে থাকিতে এইনামে তিনি একটি ক্ষুদ্র নাট্যকাব্য লিখিয়াছিলেন। এক চিঠিতে (১ সেপ্টেম্বর ১৮৬০) মধুসূদন লিখিয়াছিলেন,

> We ought to take up Indo-Mussulman subjects. The Mahommedans are a fiercer race than ourselves, and would afford splendid opportunity for the display of passion. Their women are more cut out for intrigue than ours.........After this, we must look to "Rizia". I hope that will be a drama after your own heart! The prejudice against Moslem names must be given up.[১]

প্রহসন দুইটি বেলগাছিয়া থিয়েটারে অভিনীত না হওয়ায় মধুসূদনের মনোভঙ্গ হইয়াছিল। কৃষ্ণকুমারীরও সেই দশা ঘটিলে নাটকরচনা ছাড়িয়া দিবেন এই ভয় দেখাইয়া তিনি কেশবচন্দ্রকে পরবর্ত্তী পত্রে লিখিয়াছিলেন,[১]

> Mind you, you all broke my wings once about the farces; if you play a similar trick this time, I shall forswear Bengali and write books in Hebrew and Chinese![২]

পাইকপাড়ার রাজাদের ঔদাসীন্য দেখিয়াও মধুসূদন আশা ছাড়েন নাই, ভাবিয়াছিলেন হয়ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কৃষ্ণকুমারীর অভিনয় করাইবেন। সে আশাও যখন পূর্ণ হইল না তখন মধুসূদন নাটকরচনা ছাড়িয়া দিলেন।

[১] অর্থাৎ, 'আমাদের উচিত হিন্দু-মুসলমান বিষয় অবলম্বন করা। মুসলমানেরা আমাদের অপেক্ষা রুদ্রতর জাতি, এবং আবেগের তীব্রতা প্রকাশের বিশেষভাবে উপযোগী পাত্র। তাহাদের স্ত্রীলোক আমাদের স্ত্রীলোকের চেয়ে ষড়্‌যন্ত্র ঘটাইবার অধিকতর উপযোগী।...... ইহার পরে আমরা 'রিজিয়া' লইয়া পড়িব। আমি আশা করি এটি তোমার মনের মত নাটক হইবে। মুসলমান নামের প্রতি যে বিতৃষ্ণা আছে তাহা ত্যাগ করিতেই হইবে।'

[২] অর্থাৎ, 'মনে রেখো প্রহসন দুইটি লইয়া তোমরা সকলে একদা আমার সমস্ত আশা নষ্ট করিয়াছিলে; এবারেও যদি তোমরা সে চাল চাল তাহা হইলে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বাঙ্গালা লেখা ছাড়িব এবং হিব্রু ও চীনা ভাষায় বই লিখিব!'

মধুসূদনের পাঁচখানি নাট্যরচনা, তিনখানি নাটক ও দুইখানি প্রহসন, দুই বছরের মধ্যে লেখা। চতুর্থ নাটক 'মায়াকানন' যখন লেখা হয় তখন মধুসূদনের প্রতিভা ভস্মাবশেষ। নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই মধুসূদনকে মায়াকানন লিখিতে হয়। রচনা মোটামুটি শেষ করিয়া গিয়াছিলেন, তবে সংস্কারের প্রয়োজন খুবই ছিল। সুতরাং ইহাতে নাট্যরচনার উন্নতি পাইবার কথা নয়। তবুও সমালোচকেরা মায়াকাননকে যতটা অনাদর করেন ততটা প্রাপ্য নয়। আর কিছু না হোক, মধুসূদনের শেষ জীবনের অনির্ব্বাণ আত্মগ্লানিবহ্নির শুদ্ধিলাভ করিয়াছে বলিয়াই মায়াকাননের প্রধান ভূমিকাটি প্রণিধানযোগ্য।

মায়াকানন কৃষ্ণকুমারী-নাটকের মত বিষাদান্ত। কিন্তু নাটক দুইটির ট্রাজেডি একরকম নয়। কৃষ্ণকুমারী আশাদীপ্ত কল্পনার সৃষ্টি, এবং কৃষ্ণকুমারীর আত্মোৎসর্গ পরম করুণ। তাহার চিন্তায় হতাশার দৈন্য ও অসহায়তা নাই। মায়াকাননের ট্রাজেডি নিষ্করুণ শোকাবহ, এবং মধুসূদনের জীবনে যেমন এখানেও তেমনি নায়ক-নায়িকার সব আশা ভরসা নিঃশেষে চুকিয়া গিয়া তবে যবনিকাপতন হইয়াছে।

কোন কোন দৃশ্যে পদ্মাবতী-নাটকের সঙ্গে মায়াকাননের ক্ষীণ সাদৃশ্য দেখা যায়। পদ্মাবতী-নাটকে নারদ দেবীত্রয়কে বলিয়াছিলেন, "আমাদের মধ্যে যিনি পরম সুন্দরী তিনি ব্যতীত আর কেহ এ পুষ্প স্পর্শ করবামাত্রেই তাঁকে পাষাণমূর্ত্তি ধরে এই উপবনে থাকৃতে হবে।" মায়াকাননের কাহিনীর প্রথম ইঙ্গিত এইখানেই পাই। এক শাপগ্রস্ত পাষাণমূর্ত্তিকে কেন্দ্র করিয়া কাহিনী প্রকল্পিত। ধূমকেতু সিংহ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া গান্ধারের রাজা কন্যা ইন্দুমতীকে লইয়া সিন্ধুরাজ্যে অজ্ঞাতবাস করিতেছিলেন। সিন্ধুনগরের অদূরে মায়াকানন উপবন। সেখানে এক পাষাণ দেবীমূর্ত্তি ছিল। জনশ্রুতি ছিল যে সূর্য্য যেদিন কন্যারাশিতে প্রবেশ করে সেইদিন কোন অনূঢ় যুবক বা যুবতী দেবীর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিলে ভাবী পত্নীর বা পতির মূর্ত্তি দেখিতে পায়। ইন্দুমতী একদিন ঐ সুলগ্নে মায়াকাননে সখীর সহিত বেড়াইতেছিল। সখীর কথায় সে দেবীর পূজা দিতে উদ্যত হইলে অকস্মাৎ ঝড় উঠিয়া ও বজ্রধ্বনি হইয়া অশুভ শংসন করিল। তবুও সে পূজা দিল। সেই সময় সিন্ধুর যুবরাজ অজয়ও পূজা দিতে আসিয়াছিল। পরস্পরকে দেখিয়া ভাবী পতি-পত্নী মনে করিয়া দুইজনে পরস্পর প্রেমে পড়িল। বনদেবীর সম্মুখে অজয় প্রতিজ্ঞা করিল যে ইন্দুমতী ছাড়া আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না। পরিচয় নিবিড়তর হইবার পূর্ব্বেই

অজয় সেস্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। অজয়ের পিতা বৃদ্ধ সিন্ধুরাজ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন যে পঞ্চাল-রাজদুহিতার সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়া বংশ-গৌরব ও রাজ্যশ্রী বৃদ্ধি করিবেন। ইন্দুমতীকে দেখিয়া আসিয়া অজয় পিতার প্রস্তাবে বিরক্তি প্রকাশ করিল। দেবমন্দিরে পূজা দিতে গিয়া বৃদ্ধ রাজার মৃত্যু হইল। অজয় রাজা হইল। পঞ্চালরাজ অজয়ের সহিত কন্যার সম্বন্ধ করিয়া দূত প্রেরণ করিল। মন্ত্রী চাণক্যের পরামর্শে অজয় এ প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিল না। তপস্বিনী অরুন্ধতীর কাছে অজয়ের প্রেমপাত্রীর পরিচয় পাইল। ইন্দুমতী গান্ধাররাজের কন্যা জানিয়া মন্ত্রী আনন্দিত হইল, "এঁর সহিত আমাদের মহারাজের বিবাহ হলে, কালে সিন্ধুপতি ভারতের সম্রাট্‌পদ লাভ কোরবেন।" কিন্তু অরুন্ধতী বলিলেন, "এ বিবাহ হলে, মহারাজের আর এই মহারাজ্যের অশুভ ঘটনা হবে; দেবতারা এ বিষয়ে একান্ত প্রতিকূল।" অরুন্ধতীর আরও আপত্তি এই যে স্বর্গত সিন্ধুরাজের আত্মা স্বপ্নে ও জাগরণে তাঁহাকে দেখা দিয়া এই বিবাহ পুনঃপুনঃ নিষেধ করিতেছে। এই কথা বলিতে বলিতে রাজার আত্মা আবির্ভূত হইয়া চাণক্যকেও সেই অনুরোধ করিল। বিপদ আপাতত ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য অরুন্ধতী ইন্দুমতীকে পরামর্শ দিলেন যে অজয় বিবাহের প্রস্তাব করিলে সে যেন এক বৎসর সময় চায় ব্রতপালনের জন্য। দেবালয়ের উদ্যানে অজয়-ইন্দুমতীর সাক্ষাৎ হইল। মূর্চ্ছিত রাজা ভবিষ্যৎ দৃশ্য দেখিল,

> আমি সম্মুখে কেবল রক্তস্রোত দেখছি! আর ওকি? এক পরম সুন্দরী রমণী! রূপে—সেই আমার মনোমোহিনী! আর তাঁর হৃদয়ে এক ছুরিকা!

একদিকে অজয়-ইন্দুমতীর গাঢ় অনুরাগ অপর দিকে উপেক্ষিত পঞ্চাল-রাজের রোষ—এই দুই কঠিন সমস্যা এড়াইবার জন্য অরুন্ধতী ধূমকেতু-সিংহের পুত্র গান্ধারের যুবরাজ জয়কেতুকে পাণিপ্রার্থিরূপে পাঠাইতে মন্ত্রীকে পরামর্শ দিলেন। মন্ত্রী তাহাই করিল। ধূমকেতুর অনুরোধে ইন্দুমতী তাহার শিবিরে প্রেরিত হইবে ঠিক হইল। অজয়ের ভগিনী শশিকলার কথা ইন্দুমতী ঠেলিতে পারিল না তবে শুধু এই প্রার্থনা করিল যে পরদিন মধ্যাহ্নে অজয় যেন স্বয়ং মায়াকাননে ইন্দুমতীকে ধূমকেতুর দূতের হাতে সমর্পণ করে। যথাসময়ে ইন্দুমতী মায়াকাননে গেল এবং অজয় আসিয়া পড়িবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে বুকে ছুরি হানিয়া আত্মহত্যা করিল। সুনন্দাও সখীর বিচ্ছেদ সহ্য করিতে না পারিয়া বিষ খাইল। ইতিমধ্যে সকলে আসিয়া পড়িল। ইন্দুমতীর অবস্থা দেখিয়া অজয়

আত্মঘাতী হইল। তখনি মায়াকাননের প্রস্তরমূর্ত্তি আপনা হইতে ভাঙ্গিয়া গেল। তখন সমবেত সকলকে ঋষ্যশৃঙ্গ প্রস্তরমূর্ত্তির ইতিহাস বলিলেন,—পূর্ব্বকালে অসমঞ্জ নামক রাজার ইন্দিরা নামে কন্যা ছিল। সে রূপমদমত্ত হইয়া রতিদেবীকে অবমাননা করিয়াছিল। রতি তাহাকে শাপ দিয়া মায়াকাননে পাথর করিয়া দিয়া বলেন, যেদিন ইন্দিরার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন রূপসী তাহার পাদমূলে আত্মঘাতিনী হইবে সেইদিন তাহার শাপমোচন হইবে। তাহার পর অজয়ের ভগিনী সিন্ধুরাজ্যের অধীশ্বরী হইল। ধূমকেতুর পুত্র জয়কেতুর সহিত তাহার বিবাহ হইল।

মধুসূদনের অপর তিনখানি নাটকের মত মায়াকাননে নারীর ঈর্ষ্যা নাট্যের বীজ নয় বটে কিন্তু এখানেও নারীর চক্রান্ত ঘটনাচক্রকে পরিণতির দিকে লইয়া গিয়াছে। অরুন্ধতীর কৌশলেই ইন্দুমতী-অজয়ের সম্ভাবিত মিলন ব্যর্থ হইয়া গেল। নায়ক-নায়িকার মিলনের দৈবকৃত দুস্তর বাধা গ্রীক নাট্যের নিয়তির মত সমগ্র নাটককাহিনীর উপর উদ্যত। কিন্তু এই নিয়তির অপরিহার্য্যতা বিষয়ে নাট্যকার নীরব থাকায় ট্রাজেডির গুরুত্ব কমিয়া গিয়াছে। রাজার অশরীরী আত্মার আবির্ভাব গ্রীক নাটকের ও শেক্স্পিয়রের প্রভাব জানাইতেছে।

অজয়ের ভূমিকায় মধুসূদন যেন নিজেরই অতীত চিত্র আঁকিয়াছেন। বৃদ্ধ রাজা পুত্রের কাছে পঞ্চাল-রাজকন্যার সহিত বিবাহের প্রস্তাব তুলিলে অজয় "একেবারে রাগান্ধ হয়ে" পিতাকে বলিল, "পিতা! আমার অনুমতি বিনা আপনি এ কর্ম্ম কেন কল্লেন ?" অজয়ের এই কথায় ও আচরণে আমরা কিশোর মধুসূদনের স্বেচ্ছাচারিতার ও একগুঁয়েমির আভাস পাই। রাজ্যচিন্তায় এবং ইন্দুমতীর বিরহে খিন্ন অজয় যেন মধুসূদনের শেষ জীবনের রূপ, যখন তিনি মায়াকানন লিখিতেছিলেন। আসল কথা অজয়ের ট্রাজেডি অজয়ের স্রষ্টার ট্রাজেডিরই আবরণ। ইন্দুমতী বোধ করি মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ নায়িকা। তবে বৃদ্ধ পিতার সহিত তাহার সম্পর্ক নাট্যকাহিনীতে একেবারে বাদ পড়ায় ভূমিকাটির মানবিকতা খর্ব্ব হইয়াছে। একথা ঠিক যে ইন্দুমতীর প্রেমের এবং সেই প্রেমের দুঃখের মধ্যে কৃত্রিমতা নাই। অপ্রধান ভূমিকার মধ্যে চাণক্য ও শশিকলা বেশ ফুটিয়াছে। সুনন্দা যেন সংস্কৃত নাটকের সখী। অরুন্ধতী মালতীমাধবের কপালকুণ্ডলার মত। বিদূষক নাই। অজয়-ইন্দুমতী-সুনন্দা নামে এবং কাহিনীর পরিণতিতে রঘুবংশের অজ-ইন্দুমতীর কথা মনে পড়ায়।

মায়াকাননে অভিজ্ঞানশকুন্তলার সামান্য ছায়া আছে। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম

গর্ভাঙ্কে রাজসিংহাসন-প্রাপ্তির পর অজয় কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণতরুণীর দুই পাণিপ্রার্থীর বিচারের দৃশ্য শকুন্তলার ষষ্ঠ অঙ্কে দুষ্যন্ত কর্ত্তৃক বণিকের উত্তরাধিকার-বিচারের অনুকরণ। শকুন্তলার দুই-এক ছত্রের অনুবাদও ক্বচিৎ আছে। যেমন,

> যেমন রথের পতাকা প্রতিকূল বায়ুতে রথের বিপরীত দিকে উড়িতে থাকে, যদিও আমি এখন চল্লেম, তথাপি আমার মন তোমার সখীর দিকে থাক্‌লো।

ইহার সহিত তুলনীয়,

> গচ্ছতি পুরঃ শরীরং পশ্চাদ্ ধাবত্যসংশয়ং চেতঃ।
> চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য ॥

> যে সরোবরে কমলিনী প্রস্ফুটিত হয়, সে সরোবরের শৈবালকুলও তৎসম্পর্কে রম্য কান্তি ধারণ করে।

এখানে কালিদাসের মূল,

> সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
> মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
> ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
> কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডলং নাকৃতীনাম্ ॥

নাটকটিতে কয়েকটি গান দিবার ইচ্ছা মধুসূদনের ছিল, কিন্তু বই শেষ করিয়া সেগুলি রচনা করিবার সময় তিনি পান নাই। মায়াকাননের ভাষা কৃষ্ণকুমারীর তুলনায় আরও বিসদৃশ। মধুসূদনের সংস্কৃত অলঙ্কারপ্রিয়তার পরিচয় যথেষ্টই আছে। যেমন,

> ভেবেছিলেম, যেমন, ভীষণদন্ত বরাহ ভগবতী বসুন্ধরার কোমল হৃদয় বিদারণ কোরে, উদ্যানশোভা লতিকার মূলোৎপাটন পূর্ব্বক ভক্ষণ করে, সেইরূপ তাপসবৃত্তিও কালসহকারে অস্মদাদির হৃদয়কাননের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিরূপ লতা গুল্মাদির মূল পর্য্যন্ত বিনষ্ট করেছে!

সংস্কৃতের অনুযায়ী বাক্যরীতিও দুর্লভ নয়। যেমন,

> কুরুক্ষেত্রে ভীষণ-রণমুখে আপনাকে উপহারী করিয়াছিলেন বটে,

এখানে "উপহারী করিয়াছিলেন" সংস্কৃতে "উপহারীকৃতবান্"। দুই-এক-স্থানে ইংরাজী রীতি দেখা যায়। যেমন,

> জনরব রাজকন্যাকে নানারূপে ও নানাগুণে ভূষিত করে।

শর্ম্মিষ্ঠা-নাটক লিখিবার অব্যবহিত পরে মধুসূদন দুইখানি প্রহসন রচনা করেন। এই দুইখানি গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাট্যরচনার অন্যতম। ইহাতে সমসাময়িক দুই-পুরুষের চরিত্রগত সাধারণ দুর্ব্বলতার চিত্র আঁকা হইয়াছে। 'একেই কি বলে সভ্যতা'-র বিষয় নবলব্ধ ইংরেজি-শিক্ষাভিমানী যুবকদের প্রকাশ্য উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনাচার, আর 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'-র

বিষয় ধর্ম্মকঞ্চুকাবৃত বৃদ্ধদের গোপন লাম্পট্য। একেই-কি-বলে-সভ্যতায় মধুস্দন প্রকারান্তরে নিজের দলকেই তিরস্কার করিয়াছেন। জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার সভ্যদের আদর্শ নিজের ও বন্ধু-সহপাঠীদের মধ্য হইতেই তিনি পাইয়াছিলেন। জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার কথায় স্বভাবতই কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী সভার নাম মনে আসে। জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার প্রকাশ্য আদর্শ জাহির হইয়াছে কালীবাবুর কথায়,

> আজ্ঞে, আমাদের কলেজে থেকে কেবল ইংরেজি চর্চ্চা হয়েছিল, তা আমাদের জাতীয় ভাষা তো কিঞ্চিৎ জানা চাই, তাই এই সভাটি সংস্কৃতবিদ্যা আলোচনার জন্যে সংস্থাপন করেছি। আমরা প্রতি শনিবার এই সভায় একত্র হয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রের আন্দোলন করি।

কিন্তু আসল উদ্দেশ্য, সেকালের সংস্কারবাগীশ ইংরেজিনবীশের প্রকৃত মনোভাব, বাহির হইয়া পড়িয়াছে নববাবুর বক্তৃতায়,

> জেণ্টেলমেন, এখন এদেশ আমাদের পক্ষে যেন এক মস্ত জেলখানা; এই গৃহ কেবল আমাদের লিবারটী হল অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনতার দালান। এখানে যাঁর যে খুসী সে তাই কর। জেণ্টেলমেন, ইন্ দি নেম্ অব ফ্রীডম্, লেট অস্ এঞ্জয় আওরসেলভস্।

লেখকের ভাষ্য, সর্ব্বশেষে হরকামিনীর খেদোক্তি,

> বেহায়ারা আবার বলে কি যে, আমরা সায়েবদের মত সভ্য হয়েচি।

একেই-কি-বলে-সভ্যতায় কাহিনী বলিতে কিছু নাই। কিন্তু বুড়-সালিকের-ঘাড়ে-রোঁয়[১] ঠিক তাহা নয়। দুর্নিবার লাম্পট্যের তাড়নায় এক মুসলমান চাষার ও এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কাছে প্রবীণ জমিদার ভক্তপ্রসাদ বাবুর লাঞ্ছনা ইহার বিষয়। ইহা কোন বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে পরিকল্পিত বলিয়া মনে হয়। ভক্ত-প্রসাদের ভূমিকা উজ্জ্বলভাবে স্বাভাবিক। অর্থলোভ, কৃপণতা এবং লাম্পট্য নায়কের মনে যে বিচিত্র দ্বন্দ্বের তরঙ্গ তুলিয়াছিল তাহা প্রহসনটিতে বেশ রসায়িত হইয়াছে। গদাধর খানসামা হানিফের যুবতী স্ত্রীর প্রতি ভক্তপ্রসাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে ভক্তপ্রসাদ চিন্তায় পড়িল,

> মুসলমান! যবন! ম্লেচ্ছ? পরকালটাও কি নষ্ট করবো?

গদা নজির দিল,

> আপনি না আমাকে কতবার বলেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে গোয়ালাদের মেয়েদের নিয়ে কেলি কত্তেন!

[১] প্রহসনটির প্রথমে নামকরণ হইয়াছিল 'ভগ্ন শিবমন্দির'। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি লেখা একটি চিঠিতে এই নামের উল্লেখ আছে।

ভক্তপ্রসাদ তখন ভরসা পাইল,

> দীনবন্ধো, তুমিই যা কর। হাঁ স্ত্রীলোক—তাদের আবার জাত কি? তারা তো সাক্ষাৎ প্রকৃতিস্বরূপা, এমন তো আমাদের শাস্ত্রেও প্রমাণ পাওয়া যাচ্চে।

তাহার পর গদা যখন টাকার কথা তুলিল তখন ভক্তপ্রসাদ চম্‌কাইয়া উঠিল,

> "কু-ড়ি টা-কা! বলিস কি?

ভক্তপ্রসাদ বাবু ইংরেজি জানিত না এবং ইংরেজি শিক্ষা ও সামাজিক উদারতার প্রতি অত্যন্ত বিমুখ ছিল। কথার পিঠে "ক্লেবর" শুনিয়া ভক্তপ্রসাদ বিরক্ত হইয়াছিল,

> ও সকল বাপু আমাদের কাণে ভাল লাগে না। জহীন্ কিম্বা চালাক্ বললে আমরা বুঝতে পারি।

পুত্র অম্বিকাপ্রসাদকে সে কলিকাতায় ইংরেজি পড়াইতে পাঠাইয়াছে কিন্তু সদাই ভাবনা কোনদিন বা ছেলে অধর্ম্মাচরণ করিয়া বসে। ভক্তপ্রসাদের মতে অধর্ম্মাচরণ হইতেছে,—"এই দেব-ব্রাহ্মণের প্রতি অবহেলা, গঙ্গাস্নানের প্রতি ঘৃণা, এই সকল খৃষ্টিয়ানি মত" এবং সকল জাতির লোকের একত্র পংক্তি-ভোজন ইত্যাদি। শিবমন্দিরে অনাচার করিতে তাহার ধর্ম্মে বাধে না, কেননা "তা ভগ্নশিবে তো শিবত্ব নাই, তার ব্যবস্থাও নিয়েছি।"

প্রহসন-দুইটির ভাষা সহজ সরস বিশুদ্ধ কথ্যভাষা। জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার সভ্যবাবুদের কথায় বারো আনা ইংরেজি বুকনি। বুড়-সালিকের-ঘাড়ে-রোঁয় শুধু দুই জায়গায় ভক্তপ্রসাদের উক্তিতে পৌরাণিক উপমা পাওয়া গিয়াছে,

> ধনঞ্জয় অষ্টাদশ দিনে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমরে বধ করেন—আমি কি আর এক মাসে একটা তেলীর মেয়েকে বশ কত্যে পার্‌বো না?
>
> এমন কনক-পদ্মটি তুলতে পাল্লেম্ না হে। সসাগরা পৃথিবীকে জয় করে পার্থ কি অবশেষে প্রমীলার হস্তে পরাভূত হলেন।

সাধারণ কথাবার্ত্তায় এবং চিঠিপত্রে এইভাবে রামায়ণ-মহাভারতের উপমা ব্যবহার মধুসূদনের স্বভাবসিদ্ধ ছিল। "অত্যন্ত সাধারণ কথাবার্ত্তায় মাইকেল মহাভারত রামায়ণ হইতে এমন সুন্দর উপমা হঠাৎ আনিয়া ফেলিতেন যে শ্রোতৃবৃন্দ অবাক্ হইয়া যাইত।"[১] ফ্রান্স হইতে বিদ্যাসাগরকে মধুসূদন লিখিয়াছিলেন,

> আপনি এখন অভিমন্যুর মত মহাব্যূহ ভেদ করিয়া কৌরব-দলে প্রবেশ করিয়াছেন, আমার এমন শক্তি নাই যে আপনাকে সাহায্য প্রদান করি; অতএব আপনাকে স্ব-বলে শত্রুদলকে সংহার করিয়া বহির্গত হইতে হইবেক।

[১] বিপিনবিহারী গুপ্ত সঙ্কলিত 'পুরাতন-প্রসঙ্গ'-এ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের উক্তি।

বুড়-সালিকের-ঘাড়ে-রোঁ লিখিয়া মধুস্থদন সেকালের কলিকাতার বাঙ্গালী সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী দলকে চটাইয়াছিলেন। তাই এই চমৎকার প্রহসনটি অভিনীত হইবার সুযোগ পায় নাই। যাঁহারা একেই-কি-বলে-সভ্যতা পড়িয়া নব্য সমাজের গ্লানিচিত্রে উল্লসিত হইয়াছিলেন তাঁহারা এখন নিজেদের নিখুঁত ছবি দেখিয়া হতবাক্‌ হইলেন। নব্যতন্ত্রী ও প্রাচীনপন্থী দুই দলকেই ঘাঁটাইবার ফলে মধুস্থদনকে বেশ অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল।

বাঙ্গালা প্রহসনের আদর্শ ধরিয়া মধুস্থদনের বই-দুইটিকে নিখুঁত বলা চলে। সরসতা সূক্ষ্ম এবং উঁচুদরের না হইলেও বাস্তব মানবিকতার জন্য কার্য্যকর ও সফল হইয়াছে। পরবর্ত্তী প্রায় সকল প্রহসন এবং কোন কোন নাটক মধুস্থদনের প্রহসনের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই। এই প্রহসন দুইটিতে মধুস্থদন আগাগোড়া দেশি সামগ্রী লইয়া কারবার করিয়াছেন। এখনকার সংবাদপত্রীয় সমালোচনায় (ডি. গুপ্তের টনিকের বিধি "জীবিত মৎসের ঝোল"-এর মত) বই দুইটি "খাঁটি বাঙ্গালা সাহিত্য"।

রামনারায়ণের রত্নাবলী, নিজের শর্ম্মিষ্ঠা এবং দীনবন্ধুর নীলদর্পণ—এই তিনখানি নাটক মধুস্থদন ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। উমেশচন্দ্রের বিধবাবিবাহ নাটকেরও অনুবাদ করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল॥

১১

মধুস্থদনের প্রহসন-দুইটিতে নাট্যকারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার যে কারবার দেখা গেল তাহার অনুসরণ হইল দীনবন্ধু মিত্রের (১২৩৬-৮০) নাটক-প্রহসনে। কিন্তু দীনবন্ধুর হাতে বাঙ্গালা নাটকের গঠনকৌশলের কোন উন্নতি হয় নাই। তাঁহার একমাত্র কৃতিত্ব নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বিভিন্ন ভূমিকার ও উপাখ্যানের পরিকল্পনা। দীনবন্ধুর অভিজ্ঞতা ছিল প্রত্যক্ষ, এবং সাধারণ পল্লীজীবনের সাংসারিক সুখদুঃখের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ স্বভাবত গভীর ছিল। তাই অশিক্ষিত দরিদ্র লোকেরাই তাঁহার নাট্যরচনায় ভালো করিয়া ফুটিয়াছে। ব্যঙ্গরচনায় ছাড়া অন্যত্র দীনবন্ধু ভদ্রলোককে স্বাভাবিক করিয়া দেখাইতে পারেন নাই। ভদ্রলোকের আড়ষ্ট ভূমিকা ও কৃত্রিম ভাষা দীনবন্ধুর নাট্যরচনাকে বহু পরিমাণে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু ভদ্রঘরের সন্তান হইয়াও যাহারা খুব নীচে নামিয়া গিয়াছে—মাতাল, নেশাখোর, বুদ্ধিহীন, অসহায়—তাহাদের চরিত্রাঙ্কন তুচ্ছ হয় নাই।

দীনবন্ধুর কবিত্ব-সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ঠিকই বলিয়াছিলেন যে দীনবন্ধুর সহানুভূতি যত প্রবল ছিল কল্পনাশক্তি ততটা প্রখর ছিল না। তাই অভিজ্ঞতার অভাব তিনি কল্পনাশক্তির প্রাচুর্য্যদ্বারা পূরাইয়া লইতে পারেন নাই। যেখানে তাঁহার অভিজ্ঞতার অভাব হইয়াছে সেখানে তিনি পুঁথিগত আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন। এই কারণেই তাঁহার নাটকের মূল ভূমিকাগুলি স্বাভাবিক ও জীবন্ত হয় নাই। "তাঁহার চরিত্র-প্রণয়ন-প্রথা এই ছিল যে, জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চিত্রকরের ন্যায় চিত্র আঁকিতেন। এখানে জীবন্ত আদর্শ নাই, কাজেই সেই সর্ব্বব্যাপিনী সহানুভূতিও সেখানে নাই।"

দীনবন্ধুর নাট্যরচনার মধ্যে নীলদর্পণ এবং কমলে-কামিনী ছাড়া সবই প্রহসন বা প্রহসনকল্প নাটক। কমলে-কামিনীতে তবুও কিছু কৌতুকরসের যোগান আছে কিন্তু নীলদর্পণ নিষ্ঠুর করুণরসাত্মক বলিয়া ইহাতে একান্ত কৌতুকরসের দৃশ্য নাই। গ্রাম্যলোকের কথাবার্ত্তায় কৌতুকরসের চেষ্টা আছে সত্য কিন্তু তাহা কারুণ্যকেই উজ্জ্বলতর করিয়াছে। অবান্তর আখ্যানের প্রাধান্য ও প্রাচুর্য্যের জন্য দীনবন্ধুর নাটকের মূল প্লট খেই-হারা হইয়া নাট্যরসকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। তবে আখ্যানগুলি জীবন্ত, কেননা এগুলি নাট্যকারের সাক্ষাৎ-অভিজ্ঞতালব্ধ, এবং তাই ইহার উপরেই তাঁহার সহানুভূতি উচ্ছ্বসিত। এই বিষয়ে ডিকেন্‌সের সঙ্গে দীনবন্ধুর কিছু মিল আছে। নাট্যকারের প্রতিভা দীনবন্ধুর যতটা না থাকে, খানিকটা ঔপন্যাসিক-প্রতিভা ছিল। তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টিতে বৈঠকি উদ্দামতা খানিকটা ছিল, তবে উপযুক্ত পরিমাণে উদ্যম ও সাধনা ছিল না। এই জন্যই তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের পথ না ধরিয়া মধুসূদনের পথ ধরিয়াছিলেন। মধুসূদনের প্রহসন-দুইটি দীনবন্ধুর সাহিত্যরচনার পথ নির্দ্দেশ করিয়াছিল। জানাশোনা না থাকিলেও হানিফ তোরাপের সগোত্র, এবং সধবার-একদশী একেই-কি-বলে-সভ্যতা সূত্রের মহাভাষ্য।

সাহিত্যের সভায় দীনবন্ধুর প্রবেশ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্যরূপে। ইহা না হইলেই ভালো হইত। সাধুভাষার উৎকট গাম্ভীর্য্য, পয়ারের অনুপ্রাস এবং ত্রিপদীর চটুলতা দীনবন্ধুর নাট্যরচনাকে পীড়িত করিয়াছে। পয়ারকে নিন্দা করিলেও[১] পয়ারের মোহ দীনবন্ধু কখনো কাটাইতে পারেন নাই। এমন কি সধবার-একাদশীতে নিমচাঁদের উক্তি কয়-ছত্র পয়ারের পর তবে যবনিকা

[১] লীলাবতী দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পড়িয়াছে। মধুস্থদনের ছন্দ দীনবন্ধু বুঝিতে পারেন নাই, তাই সে অনুকরণ পয়ারের অপেক্ষাও ব্যর্থ।

দীনবন্ধুর প্রথম নাট্যরচনা 'নীলদর্পণং নাম নাটকম্' (ঢাকা ১৮৬০, দ্বি-স ১৮৭২, তৃ-স ১৮৭২) অনামি প্রকাশিত হইয়াছিল,—"নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর-প্রজানিকর-ক্ষেমঙ্করেণ কেনচিৎ পথিকেনাভিপ্রণীতম্।" উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নীলকরদের অত্যাচার বাঙ্গালা দেশে, বিশেষ করিয়া মধ্যবঙ্গে—দীনবন্ধুর দেশে, চাষীদের সর্ব্বরকমের সর্ব্বনাশ করিতেছিল স্থানীয় ইংরেজ শাসন-কর্ত্তাদের গোপন সহযোগিতায়। ইহার বিরুদ্ধে দেশীয় কাগজে আন্দোলন উঠিল এবং তাহা সাহিত্যেও ঢেউ তুলিল। এ বিষয়ে প্রথম রচনা হইতেছে গদ্যে-পদ্যে লেখা পুস্তিকা 'বাপরে বাপ! নীলকরের কি অত্যাচার' (১৮৫৬)।[১]

পুস্তিকাটি কতকটা নাটকের ছাঁদে, অর্থাৎ সংলাপের আকারে, লেখা। সংলাপ প্রধানত দুইজনের। একজন "কলিকাতা নিবাসী শ্যামচাঁদ ঘোষ নামক জনৈক কৃতবিদ্যা যুবা পুরুষ", আর একজন অবিনাশচন্দ্র ঘোষ। তাহা ছাড়া কয়েকজন গ্রাম্য লোক আছে। ঘটনাস্থল পাবনা জেলায় গোলোকপুর গ্রাম। গ্রাম যাঁহার জমিদারিভুক্ত তিনি

> শিবতুল্য মনুষ্য, প্রজার প্রতি কোন অত্যাচার নাই। তিনি কলিকাতাবাসী সরল লোক—কাহার ভালোতেও নাই, কাহার মন্দতেও নাই।

কিন্তু বিপদ হইয়াছে,

> নীলকর সাহেবরা সংপ্রতি কলিকাতা হইতে এখানে আসিয়া নীল ব্যবসা করণ হেতু কুটী করিয়াছেন—কাহার তো আর পৈত্রিক জমি জমা নাই, স্থতরাং কতকগুলিন লেটেল রাখিয়া জ্ঞানান্ধ শান্ত স্বভাব প্রজাবর্গের প্রতি ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক যথোচিত অত্যাচার করিয়া বলপূর্ব্বক তাহাদিগের জমাই জমির উপর নীল বুনিয়া যায়, তার পর তাহা প্রস্তুত হইলে সবলে কাটিয়া লয় যার জমি তাহার মতামতের প্রতি বিন্দুমাত্র লক্ষ করে না।

অবিনাশের কথা শুনিয়া শ্যামচাঁদ বাবু এই বলিয়া আশ্বাস দিলেন,

> নীলকরগুলো তাদের সঙ্গে ভাব করে এখানে যে যা ইচ্ছে তাই করছে, এবং বোনগাঁয়ে যে শ্যাল রাজা হয়ে একে মার্‌চে ওকে ধর্‌চে তাকে কাট্‌চে তাকি গভর্ণর প্রভৃতি সাহেবরা এতদিন জানতেন্। তাঁরা জান্‌লে কোন কালে এ আইন উঠে যেত। আজকাল চার্‌দিকে খবরের কাগজ হওয়াতে, সকল কথাই তাঁদের কাণে উঠ্‌ছে।...... এই এক সর্ব্বনেশে যুদ্ধ ঘটেছে বলেই কিছু

[১] ষোল পৃষ্ঠার পুস্তিকা। নামপত্র নাই। শেষে আছে Hindoo Patriot Press by Wooma Churn Dey. পুস্তিকাটির বিবরণ লণ্ডন স্কুল অব ওরিয়েণ্টাল এণ্ড আফ্রিকান ষ্টাডিজ্-এর অধ্যাপক শ্রীমান্ তারাপদ মুখোপাধ্যায় লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

হচ্চে না।……এখন জগদীশ্বর প্রসাদাৎ সমরানল নির্ব্বাণ হলেই ব্ল্যাক এ্যাক্‌ট জারী হয়। বিশেষতঃ যিনি এখন আমাদের গভর্ণর, তাঁকে সাক্ষাৎ শিব বল্লে হয়।

নীলকরদের অত্যাচার বিষয়ে তিনটি গানের পর দীর্ঘ বক্তৃতায় পুস্তিকার সমাপ্তি। বক্তৃতা শুরু এইভাবে,

হে দেশস্থ ভ্রাতৃবর্গ! বঙ্গীয় দীনহীন প্রজাপুঞ্জের এতাদৃশ যন্ত্রণা সন্দর্শন করিয়া তোমাদের পাষাণ সম সুকঠিন হৃদয়ে কি করুণা রসের আবির্ভাব হয় না?

পুস্তিকাটির গোড়ায় পাঁচটি গান আছে, "সারি" গানের ঢঙে। রাগরাগিণীরও উল্লেখ আছে। প্রথম গানটি এই,

নিলকরের কি অত্যাচার।
এই নীলে নিলে সকল নিলে এদের 'নলে বোঝা ভার॥
ও নিলের দাদন, বিষম বাঁদন, নাহিক নিস্তার,
বেচ্‌লে ভিটে না যায় মিটে, কিবে মিঠে সদ্ব্যাভার॥
ও জোর করে বিচ ছড়ায় আগে, ছাড়ায় কর্ম্ম আর,
হোলো না ধান, গেল যে মান, প্রাণ বাঁচান হোলো ভার॥
ও সুদে সুদে কেবা সোদে তিন পুরুষের ধার,
বেচ্‌লে পাটা, না যায় লেঠা, কতো বেটা গঙ্গা পার॥
হুড়্‌র হো, হুড়্‌র হো, হুড়্‌র হো হো হো॥

এই পুস্তিকাখানি দীনবন্ধুর রচনা মনে করিবার হেতু নাই। তবে দীনবন্ধু যে ইহা পড়িয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ করি না।

দীনবন্ধুর নাটকে সর্বপ্রথম দেশের শাসক-শাসিতের নিগূঢ় সম্বন্ধ, দেশের অর্থনৈতিক শোষণের কুৎসিত রূপ, সভ্যনামিক মানুষের বর্ব্বর অন্তর, উদ্ঘাটিত হইল। নীলদর্পণে সমগ্রদেশের মর্ম্মবেদনার প্রকাশ হওয়ায় দেশে যে সাড়া পড়িল তাহা ইতিপূর্ব্বে কখনো ঘটে নাই। ইহার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হইলে বিলাতেও এই আন্দোলনের ঢেউ গড়াইয়াছিল। ইংরেজি অনুবাদ করিয়াছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কিন্তু মূল গ্রন্থকারের মত তাঁহার নামও অপ্রকাশিত ছিল। ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন পাদরি লঙ। নীলকরদের অত্যাচার দমনে নীলদর্পণের মূল ও অনুবাদ বিশেষ কার্য্যকর হইয়াছিল। 'আঙ্কল্ টম্‌স্ ক্যাবিন', 'নিকোলাস্ নিক্‌ল্‌বি' ও 'অলিভার্ টুইস্‌ট্'-এর পাশে নীলদর্পণের স্থান পাপপ্রতিষেধক রচনা বলিয়া। দেশ-বিদেশের "পুণ্যবান্" সাহিত্যস্রষ্টার মধ্যে দীনবন্ধুও একজন।

নীলকরদের অত্যাচারে দেশের চাষীরা ঘোর বিপদ্‌গ্রস্ত। তাহাদের সর্ব্বস্ব গিয়াছে, এখন ঘরের লোক লইয়া টানাটানি পড়িয়াছে। বাড়ীতে সুন্দরী

বৌ-ঝি থাকিলে তাহাকে কুঠীয়ালের লালসা হইতে বাঁচান দায়। অত্যাচারিত গরীব প্রজাদের পক্ষ লইয়া সম্পন্ন গৃহস্থ গোলোকচন্দ্র বসুর মনস্বী জ্যেষ্ঠ পুত্র "স্বরপুর বৃকোদর" নবীনমাধব নীলকরদের অত্যাচারে বাধা দিতে লাগিল। কিন্তু অত্যাচারিতদিগকে সে বাঁচাইতে পারিলই না উপরন্তু নিজেদের সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিল। কুঠীয়ালদের ষড়যন্ত্রে পিতা জেলে আত্মহত্যা করিল, নিজে লাঠিয়ালের হাতে প্রাণ দিল, মাতা উন্মাদিনী হইয়া কনিষ্ঠ পুত্রবধূকে হত্যা করিয়া নিজে মরিল। ইহাই নীলদর্পণ-নাটকের কাহিনী-সূত্র।

নাটকের ভদ্র-ভূমিকাগুলি প্রায়ই ব্যর্থ। গোলোকচন্দ্র-নবীনমাধব-বিন্দুমাধব সাবিত্রী সৈরিন্ধ্রী-সরলতা—এমন কি সাধুচরণও—সংলাপের কৃত্রিমতায় ও পুঁথিগত ভাবের আড়ষ্টতায় স্বাভাবিক মানুষের মত হয় নাই। তবে ভাষা কৃত্রিম এবং ভাব আড়ষ্ট হইলেও ভূমিকাগুলি সবই বৈশিষ্ট্যবর্জ্জিত নয়। নবীনমাধবের একটি কথায় তাহার পিতামাতার ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য নিপুণভাবে প্রকটিত,

> পিতা আমার অতি নিরীহ, অতি সরল, অতি অকপটচিত্ত, বিবাদ বিসম্বাদ কারে বলে জানেন না, কখনও গ্রামের বাহির হন না, ফৌজদারির নামে কম্পিত হন,······মাতা আমার পিতার ন্যায় ভীতা নন, তাঁহার সাহস আছে, তিনি একেবারে হতাশ হন না, তিনি একাগ্রচিত্তে ভগবতীকে ডাকিতেছেন।

সাবিত্রীর স্বগতোক্তিতে গোলোকচন্দ্র মানুষটি আরও ফুটিয়াছে,

> কর্ত্তা আমার ঘরবাসী মানুষ, কখন গাঁ অন্তরে নিমন্ত্রণ খেতে যান না; ···তিনি যে বলেন আমার এড়োঘরে না শুলে ঘুম হয় না···।

ভদ্রেতর ভূমিকাগুলি জীবন্ত। গ্রাম্য মেয়ে-পুরুষের আচার-ব্যবহার-কথাবার্ত্তা ফোটোগ্রাফিক নিপুণতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। চাষাদের সরল উক্তির অপরোক্ষ কৌতুকরস ও কারুণ্য মনকে নাড়া দেয়। একটি কথায় লেখক তোরাপ-চরিত্রের অন্তঃস্থল উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। ছোট সাহেব ভূপতিত নবীনমাধবের উপর তলোয়ার মারিলে তোরাপ নবীনমাধবকে বাঁচাইতে হাত বাড়ায় এবং তাহাতে তাহার হাত উড়িয়া যায়। প্রতিশোধে তোরাপ সাহেবের নাক কামড়াইয়া লয়। নবীনের বাড়ীতে তোরাপ সেই প্রসঙ্গে বলিয়াছিল,

> বড়বাবু যদি আপনি পালাতি পাত্তেন সমিন্দির কান দুটো মুই ছিঁড়ে আন্তাম্, খোদার জীব পরাণে মাত্তাম না।

নীচ এবং তুচ্ছ ভূমিকায়ও মানবীয়তার আরোপ আছে। পদী ময়রাণী রোগ সাহেবের অতীত উপপত্নী এবং বর্ত্তমান কুটনী। সে অধঃপতনের শেষ

সীমায় পৌঁছিয়াছে, তবুও সম্ভ্রমবোধ হারায় নাই। পথে অকস্মাৎ নবীনমাধবের সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ায় সে লজ্জায় মরিয়া গেল,

ওমা কি লজ্জা! বড়বাবুকে মুখখান দেখালাম।

নীলকুঠীর দেওয়ান পাষণ্ড গোপীনাথের মনও কখনো কখনো নরম হয়। গোলোকচন্দ্রের মৃত্যুর পর নবীনের বাড়ীর কথা শুনিয়া সে বলিয়াছিল,

আমার মনেতে কিছু দুঃখ হয়েছে, মিথ্যা মোকদ্দমা ক'রে মানী মানুষটোরে নষ্ট কর্‌লাম।

নীলদর্পণের উপসংহারে মৃত্যুর ঘনঘটা নাটকটিব ট্রাজেডিকে অবাস্তব করিয়া দিয়াছে। গোলোকচন্দ্রের যে-স্বভাব নাটকে বর্ণিত তাহাতে তাহার পক্ষে আত্মহত্যা স্বাভাবিক নয়। ক্ষেত্রমণির মৃত্যু এবং সাবিত্রীর উন্মাদদশা যথেষ্ট শোকাবহ। তাহার সঙ্গে সরলার মৃত্যু টানিয়া না আনিলে ভালোই হইত।

নীলদর্পণ ঠিক নাটক নয়, নাট্যচিত্র। ইহাতে চারিত্রিক পরিণতি অথবা মানবজীবনের কোন মৌলিক সমস্যা কিংবা ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির চিত্তসংঘর্ষ আলিখিত হয় নাই। একটি বিশেষ সময়ে বিশেষ অবস্থায় পতিত কতকগুলি অসহায় মানুষের অত্যাচার-পীড়নের বাস্তব চিত্রের অতিরিক্ত ইহাতে কিছু নাই। গ্রাম্য-ভূমিকাগুলির মধ্যে মানবজীবনের যে অনাবৃত খণ্ডিত রূপটুকুর চকিত দর্শন পাই শুধু তাহাই সমসাময়িক ঘটনাশ্রিত ও সামাজিক-সমস্যামূলক নাট্যরচনাগুলি হইতে নীলদর্পণকে বিশিষ্ট করিয়াছে।

দীনবন্ধুর দ্বিতীয় নাট্যরচনা 'নবীনতপস্বিনী নাটক'-এ (কৃষ্ণনগর ১৮৬৩) দুইটি বিভিন্ন কাহিনী অতি আলগাভাবে গাঁথা হইয়াছে। জলধর-জগদম্বা-মালতীর কাহিনী প্রহসন ছাড়া কিছু নয়। মূল প্লট বিজয়-কামিনী উপাখ্যান কতকটা রূপকথা এবং কতকটা সত্য ঘটনা[১]। প্রথম যৌবনে দীনবন্ধু এই নামে একটি "রূপক" কবিতা অর্থাৎ ক্ষুদ্র উপাখ্যান কাব্য লিখিয়াছিলেন,[২] পরে তাহাই নবীনতপস্বিনীর মূল প্লটে রূপান্তরিত হয়। প্রথম কাহিনীটি মূল প্লটের পক্ষে নিতান্ত গৌণ হইলেও সমগ্র নাটকটির কৌতুকরসের চমৎকারিত্ব ইহারই উপর নির্ভর করিয়াছে। জলধর জগদম্বা ভূমিকা দুইটি শেক্‌স্‌পিয়রের 'মেরি ওয়াইভ্‌স্ অব্ উইণ্ডসর' হইতে গৃহীত, তবে ভূমিকা দুইটিকে দীনবন্ধু একটি প্রচলিত খোস-গল্পের ছাঁচে ঢালিয়াছেন। প্রহসন-অংশের ভাষা কথ্য এবং লঘু, কিন্তু অপর অংশের ভাষা—বিশেষ করিয়া পুরুষদের উক্তি—নিতান্ত

[১] বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, "রাজা রমণীমোহনের বৃত্তান্ত কতক প্রকৃত।"

[২] সংবাদপ্রভাকরে প্রথম প্রকাশিত, পরে 'পদ্যসংগ্রহ'-এ সংকলিত।

গুরুগম্ভীর ও কৃত্রিম। তাহার উপর মধ্যে মধ্যে মিত্র ও অমিত্রাক্ষর পয়ার থাকায় বিসদৃশতা বাড়িয়া গিয়াছে।

'সধবার একাদশী প্রহসন' রচিত হয় নবীনতপস্বিনীর পরেই, কিন্তু প্রকাশিত হয় 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো' প্রহসনের পর (১৮৬৬)।[১] সধবার-একাদশী একেই-কি-বলে-সভ্যতার অনুসরণে লেখা। নিমচাঁদ মধুসূদনেরই ক্যারিকেচার বলিয়া অনেকের ধারণা আছে। নিমচাঁদের সংলাপে মধুসূদনের প্রলাপোক্তির প্রতিধ্বনি থাকিতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিত্বের সাদৃশ্য নাই। নিমচাঁদের ভূমিকা প্রহসনটির সর্ব্বস্ব। নিমচাঁদ ইংরেজিতে সুশিক্ষিত এবং ভদ্রসন্তান হইয়া মগুপের চরম অধোগতি পাইয়াছে, কিন্তু সে পতিত হইলেও স্বর্গভ্রষ্ট। আত্মসম্মান সে বিসর্জ্জন দিয়াছে, মদের জন্য অপমান-গঞ্জনা সে অঙ্গভূষণ করিয়াছে, তবুও শিক্ষার গৌরবে সে চারিদিকের তুচ্ছতার ও মূঢ়তার মধ্যে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, সেখানে খোঁচা পৌঁছিলেই ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। ধনী মূর্খের উপর তাহার অসীম অবজ্ঞা। অটল শাসাইল,

> তোকে আমি আর বাড়ীতে আস্‌তে দেব না, বাবাকে বলে দেব, তুই আমাকে কুপরামর্শ দিয়েছিলি…।

নিমচাঁদ বলিল,

> তুই যদি কিছুমাত্র লেখাপড়া জান্‌তিস্‌, তোর কথায় আমি রাগ কত্তেম। তোর কথায় রাগ কল্লে মূর্খতার সম্মান করা হয়।

অটল মেঘনাদবধ কিনিয়াছে কিন্তু পড়িয়া তাহার ভালো লাগে নাই শুনিয়া নিমচাঁদ বলিয়াছিল,

> ওর ভালমন্দ তুমি বুঝ্‌বে কি ? তুমি পড়েছ দাতাকর্ণ, তোমার বাপ পড়েছে দাশরথি, তোমার ঠাকুরদাদা পড়েছে কাশীদাস।

নিমচাঁদ মগুপ ও চরিত্রহীন, তবুও সে ভদ্রলোকের উচিত-অনুচিত জ্ঞান নিঃশেষে হারায় নাই। গোকুলবাবুর মত লোক যাহারা নির্ব্বিবাদে রুটীন মাফিক ঘরসংসার করে এবং সুযোগ পাইলে অপরকে উপদেশ দিয়া পরিতোষ লাভ করে তাহাদের ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ জীবনের প্রতি নিমচাঁদের নিদারুণ অবজ্ঞা। মদের ঘোরে তাহার নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়, এবং এমনও মনে হয়, মদ ছাড়িয়া

[১] বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, "'সধবার একাদশী'.'বিয়েপাগলা বুড়ো'র পরে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু উহা তৎপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল।"

দিই। কিন্তু পরক্ষণেই স্বরাপান-নিবারণী সভার সভ্যদের ও গোকুলবাবুর কথা মনে পড়িয়া যায়, সে শিহরিয়া উঠে,

> এত কালের পর সভায় নাম লেখাব? গোকুলবাবু হবো?

নিমচাঁদের প্রলাপের মধ্যে এমন গভীর কারুণ্য আছে যাহাতে পাঠকের মন সমবেদনায় আর্দ্র হইয়া উঠে। যেমন,

> "So sweet was ne'er so fatal, I must weep,
> But they are cruel tears—
> কারণ, আমি এখন মনে কচ্চি আর খাব না, কিন্তু সেটা মনে করা মাত্র—পৃথিবীটে ঘোরে কি সূর্য্যটা ঘোরে? পৃথিবী ঘোরে—সূর্য্য ঘোরে না? না—এখন রাত্র হয়েছে—সূর্য্য মামা রোজার পর সন্ধ্যাকালে চাট্‌ি খেতে গেছেন, এখন ত পৃথিবীটা বন্ বন্ ক'রে ঘুর্‌চে—পৃথিবী ঘোরে—ঘোরে ঘুরুক।

নিমচাঁদের একটিমাত্র কথায় তাহার ব্যর্থ জীবনের বেদনা হাসির ছলে ডুকরিয়া উঠিয়াছে,

> প্রসন্নর বাড়ী? ডেপুটী বাবু, আমি তোমার পিনাল কোড, এতে সব ক্রাইম আছে, আমারে হাতে ধরে লও, নইলে বাবা পড়ে মরি।

গ্রাম্যতা ও রুচিবিকলতা সত্ত্বেও শুধু নিমচাঁদ ভূমিকার জন্যই সধবার-একাদশীর শ্রেষ্ঠত্ব কখনো অস্বীকৃত হইবে না।

'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো' (১৮৬৬) একটি বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে পরিকল্পিত। এমন ঘটনা এখনকার দিনেও বিরল নয়। বিধবা-কন্যা দৌহিত্র প্রভৃতি থাকা সত্ত্বেও পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে উৎসুক হইয়া গেঁয়ো এক বুড়ো ছেলেদের হাতে কেমন অপদস্থ হইয়াছিল তাহাই এই প্রহসনটিতে চিত্রিত হইয়াছে। কিছু কিছু অংশ মিত্রাক্ষর পদ্যে লেখা।

"অপরিমিত আয়াস-সহকারে লীলাবতী নাটক প্রকটন করিয়াছি"—উৎসর্গপত্রে দীনবন্ধুর এই সার্টিফিকেট সত্ত্বেও 'লীলাবতী নাটক'-কে (১৮৬৭) ভালো নাট্যরচনা বলা যায় না। নদেরচাঁদ-হেমচাঁদের মস্করা দৃশ্যগুলি না থাকিলে লীলাবতী সম্পূর্ণভাবেই ব্যর্থ হইত। দীনবন্ধুর কয়েকটি কাহিনীর বীজ রাজার বা ধনী ব্যক্তির পুত্রের নিরুদ্দেশ। নবীনতপস্বিনী ও কমলে-কামিনীর মত লীলাবতী-কাহিনীরও বীজ হইতেছে ধনী-সন্তানের নিরুদ্দেশ। লীলাবতী-কাহিনীর সারমর্ম্ম আত্মীয়স্বজনের মতের বিরুদ্ধে শিক্ষিত মেয়েকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অশিক্ষিত নেশাখোর কদাচারী কুলীন ছেলের সঙ্গে বিবাহের নির্ব্বন্ধ। লীলাবতীর পিতা হরবিলাসের বিবাহিত একমাত্র পুত্র

অরবিন্দ নিরুদ্দিষ্ট হওয়ায় তিনি ললিতমোহন নামক এক যুবককে পোষ্যপুত্রের মত পালন করিতেছিলেন। লীলাবতী ও ললিতমোহন পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। লীলাবতীর অযোগ্য বিবাহ এবং ললিতকুমারকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ সম্পন্ন হইবার আগেই অরবিন্দ আসিয়া পড়ে এবং ললিত-লীলাবতীর বিবাহ হয়।

লীলাবতীর মধ্যে জীবন্ত ভূমিকা হইতেছে তিনটি অপ্রধান পাত্র—হেমচাঁদ, নদেরচাঁদ এবং শ্রীনাথ। কিন্তু কৌতুকরসের প্রাচুর্য্যে এই ভূমিকাগুলি নাটকীয় বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। নায়ক-নায়িকার ভূমিকা অত্যন্ত কৃত্রিম, তাহার উপর সুদীর্ঘ পদ্য-উক্তি নিতান্ত বিসদৃশ। প্লটের উদ্দেশ্যমূলকতায় অপর ভূমিকাগুলিও স্বাভাবিক হইতে পারে নাই।

‘জামাই-বারিক’ (১৮৭২) বিশুদ্ধ প্রহসন। কলিকাতার কোন এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ঘরজামাই-পোষার প্রতি কটাক্ষ করিয়া এই প্রহসনের বিশিষ্ট অংশটি লেখা। দুই সতীনের ঝগড়া আখ্যানটিও বাস্তবঘটনাশ্রিত বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন। অভয়কুমারের খোঁজে কামিনীর বৃন্দাবনে গমন ও বৈষ্ণবী সাজার ব্যাপারে ‘কামিনীকুমার’ কাব্যের প্রভাব আছে। সধবার-একাদশীর মত এখানেও মূর্খ ডেপুটীর উপর শ্লেষ-বৃষ্টি। দীনবন্ধুর সুরধনী কাব্যের বিরুদ্ধ সমালোচক পাদরি লালবিহারী দে (১৮২৪-৯৪) জামাই-বারিকে ভোঁতারাম ভাট রূপে ব্যঙ্গচিত্রিত হইয়াছেন।

দীনবন্ধুর শেষ রচনা ‘কমলে-কামিনী নাটক’ (১৮৭৩)। কাছাড়ের ইতিহাসের কয়েকটি নাম মাত্র আশ্রয় করিয়া এই রোমান্টিক নাটকের আখ্যানবস্তু পরিকল্পিত। কাহিনী অনেকটা নবীনতপস্বিনীর মত। মণিপুররাজের প্রথম পত্নীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় পত্নীর চক্রান্তে অপহৃত হয়, এবং মাতা শোকে প্রাণত্যাগ করে। মণিপুরেরই এক প্রবীণ মহিলা তাহাকে কুড়াইয়া পাইয়া মানুষ করে। বড় হইয়া সে সেনাপতি সমরকেতুর আশ্রয়ে আসিয়া শিখণ্ডিবাহন নামে পরিচিত হইয়া রাজ্যের সহকারী সেনাপতি নিযুক্ত হয়। কাছাড়ের সিংহাসন লইয়া মণিপুরের রাজার সঙ্গে ব্রহ্মদেশের রাজার বিরোধ হইলে শিখণ্ডিবাহন ব্রহ্ম-সেনাপতিকে বন্দী করিয়া আনে। তাহাতে মণিপুর-রাজ সহজে জয়লাভ করে। এদিকে ব্রহ্ম-রাজকুমারী রণকল্যাণী ও শিখণ্ডিবাহন পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। রাজকুমারীর সখীর সহায়তায়

উভয়ের মিলন হইল কাছাড়ে রাসলীলা উপলক্ষ্যে, ব্রহ্মরাজ-শিবিরে। শিখণ্ডিবাহনের জন্ম সম্বন্ধে কাণাঘুঁষা শুনিয়া ব্রহ্ম-রাজ প্রথমে তাহাদের বিবাহে মত দেয় নাই। পরে শিখণ্ডিবাহনের শৌর্য্যে তাহার মন ফিরিয়া যায়। ইতিমধ্যে শিখণ্ডিবাহনের ললাটে রাজটীকা দেখিয়া মণিপুর-রাজের দ্বিতীয় মহিষী শিখণ্ডিবাহনকে অপহৃত সপত্নীপুত্র জানিয়া অনুতাপে পুড়িতেছিল, শেষে উন্মাদ হইয়া সব কথা বলিয়া দিল। শিখণ্ডিবাহন রণকল্যাণীর পাণিগ্রহণ করিয়া কাছাড়ের সিংহাসন অধিকার করিল।

কমলে-কামিনীর ভূমিকাগুলি অতিরোমান্টিক হইয়াছে, নাটকীয় হয় নাই। শুধু মণিপুর রাজকুমার মকরকেতনই স্বাভাবিক ভূমিকা। বক্কেশ্বরে পদ্মাবতী-নাটকের বিদূষকের প্রভাব আছে। বক্কেশ্বরের ভূমিকায় যে কৌতুকরসের সৃষ্টি তাহা আধুনিক রুচিসঙ্গত না হইলেও দীনবন্ধুর অপর অনুরূপ রচনা হইতে বিশুদ্ধতর।

দীনবন্ধুর নাট্যরচনাগুলি লইয়াই কলিকাতায় পাবলিক থিয়েটার বা সাধারণ নাট্যশালা জমিয়া উঠে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে এমন কি তাহার পূর্ব্ব হইতেও আমাদের দেশে নৃত্যগীতাভিনয়ের মধ্যে সঙই ছিল সব চেয়ে জনপ্রিয়। তাই প্রহসনজাতীয় নাট্যরচনাই অভিনয়ে সাধারণ দর্শককে আকৃষ্ট করিত। দীনবন্ধুর নাটকে কৌতুকরসই প্রধান, এবং এই কৌতুকরস সর্ব্বত্র ভাঁড়ামিতে পর্য্যবসিত নয়। তাই সাধারণ দর্শকের কাছে দীনবন্ধুর নাটকের অভিনয় আদরণীয় ছিল। তবে এখনকার দিনের মার্জ্জিত রুচিবোধে দীনবন্ধুর কৌতুকরসের উপভোগ্যতা নাই। দীনবন্ধুর রচনায় যদি কালাতিশায়িত্ব না থাকে তবে তাহা দোষের নয়। তিনি তাঁহার কালকে উপেক্ষা করেন নাই, তাঁহার রচনায় সে-কালের বাণী কিছু প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল তাহাই যথেষ্ট॥

১২

মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২) দীনবন্ধুর পর বাঙ্গালা নাটককে একটু নূতন পথে পরিচালিত করিলেন। কবিগান ও পাঁচালী রচনায়, সাময়িকপত্র পরিচালনায় এবং উপদেশাত্মক বক্তৃতায় মনোমোহন প্রাচীনপন্থী সাহিত্যিক সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। মনোমোহনও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্য। দীনবন্ধু ইংরেজিনবীশ ছিলেন বলিয়া গুরুর প্রভাবকে খানিকটা এড়াইতে পারিয়াছিলেন। মনোমোহন পুরাপূরি বাঙ্গালানবীশ ছিলেন বলিয়া তাঁহার

রচনায় গুরু-অনুগতি ঘনিষ্ঠ। মনোমোহন যখন নাটক-রচনায় হাত দিলেন তখন স্বভাবতই যাত্রা-পাঁচালী-কথকতার রীতি এড়াইয়া চলিতে পারিলেন না। তাঁহার নাট্যরচনা পূর্ব্বতন নাটগীতির সঙ্গে অধুনাতন নাটকের যোগাযোগ ঘটাইয়া জনসাধারণের আরো গ্রহণযোগ্য করিয়া তুলিল। মনোমোহনের পৌরাণিক নাটকের মধ্য দিয়া নাটকে পুরাতন যাত্রা-পাঁচালীর কারুণ্য ও ভক্তিভাব এবং কথকতার বাক্যবয়ন দেখা দিল নূতন সংস্থায় নূতনতর ভঙ্গিতে। গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকে এবং ব্রজমোহন রায়, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, মতিলাল রায় প্রভৃতির যাত্রা-পালায় মনোমোহনের আদর্শেরই অনুসরণ। মনোমোহনের গানের সুরও একান্তভাবে দেশি। এইভাবে মনোমোহনের নাট্যরচনা পুরাতন-নূতনের সন্ধিবন্ধন করিয়াছে, এবং বাঙ্গালা নাটকের ইতিহাসে আদি ও মধ্য যুগের মধ্যে সেতুসংযোগ করিয়াছে।

বিলাতি ষ্টেজের রঙীন অভিনবতা বাঙ্গালা নাটকের জনপ্রিয়তার প্রথম এবং প্রধান হেতু। কিন্তু ষ্টেজ খাড়া করিতে যে-পরিমাণ অর্থ ও সামর্থ্য আবশ্যক তাহা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সুলভ ছিল না। এই অসুবিধা এড়াইতে গিয়া নূতন যাত্রার সৃষ্টি হইল, যাহার নাম "গীতাভিনয়"। এই গীতাভিনয় নাটক-অভিনয়েরই মত, তবে কথকতার মত বক্তৃতা-বহুল এবং প্রাচীন যাত্রা-অনুসারে গীতপরিপূর্ণ। ষ্টেজের প্রয়োজন নাই। দৃশ্যপট প্রভৃতির ক্ষতি পূরণ হইল দীর্ঘ স্বগত-উক্তি অথবা প্রকাশ্য বক্তৃতার দ্বারা। ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে এই নূতন যাত্রা-পদ্ধতির—গীতাভিনয়ের—প্রবর্ত্তন। মনোমোহনের নাটকে অভিনেতব্য এবং গীতাভিনেতব্য নাট্যের সমন্বয় হইয়াছে,—প্লটের গঠনরীতি অভিনেতব্য নাটকের মত এবং দীর্ঘ বক্তৃতা ও গীতবাহুল্য গীতাভিনেতব্য যাত্রা-পালার মত। এইজন্য প্রথম হইতেই মনোমোহনের নাটকগুলি যাত্রা-পালা রূপেই বেশির ভাগ গীতাভিনীত হইত।[১] মনোমোহন

[১] "কয়েক মাস অতীত হইল, কোনও স্থলে উপর্য্যুপরি দুইদিন যাত্রা শুনিতে হইয়াছিল। এক দিন রামাভিষেক নাটকের যাত্রা—অপর দিন সতী নাটকের যাত্রা। এ যাত্রা শুনিয়া নূতনরূপ প্রীতিলাভ হইল। কারণ পূর্ব্বকালের যাত্রায় বালকদিগের বিকৃতস্বরে কথোপকথন বড়ই কর্ণজ্বালাকর হইত;—এ যাত্রায় সেরূপ হইল না। উক্ত উভয় নাটকেরই রঙ্গস্থলে অভিনয় পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম; বর্ত্তমান যাত্রাতেও অবিকল সেইরূপ অভিনয়ই দেখিলাম;—বৈলক্ষণ্যের মধ্যে এই যে, এ যাত্রাস্থলে সজ্জিত রঙ্গভূমি ছিল না, এবং মধ্যে মধ্যে গীত ছিল। কিন্তু ঐ গীতগুলি নাটকরচয়িতার স্বরচিত নহে, যাত্রাকারকেরা স্বকার্য্যের সুবিধার জন্য আপনারা রচনা করিয়া লইয়াছেন; এ নিমিত্ত নাটকের সহিত সেগুলির ভালরূপে মিশ খায় নাই। তদ্ভিন্ন তাহা সংখ্যাতেও অল্প। এই হেতু গীতপ্রিয়

নিজের হরিশ্চন্দ্র নাটককে গীতাভিনয়ে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। গ্রাম-অঞ্চলে ইহা প্রশংসার সহিত গীতাভিনীত হইয়াছিল। হরিশ্চন্দ্র নাটকে গান আছে আটটি, আর গীতাভিনয়ে ষোলটি। 'পার্থপরাজয়' একাধারে নাটক এবং গীতাভিনয়। ইহাতে গানের সংখ্যা উনত্রিশ। 'যদুবংশধ্বংস (১৮৭৮) গীতাভিনয়ের ছাব্বিশটি গান সবই মনোমোহনের রচনা, গদ্যাংশ হরচন্দ্র দেবের লেখা। পালাটি ভবানীপুরের সখের দলের জন্য লেখা হইয়াছিল।

মনোমোহনের নাটকগুলির অধিকাংশই পঞ্চাঙ্ক। বহুবাজার অবৈতনিক নাট্যালয়ে মনোমোহনের প্রথম তিনখানি পৌরাণিক নাটক প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। রামাভিষেক নাটক লইয়াই বহুবাজার নাট্যসমাজের উদ্বোধন, এবং সতী নাটক ও হরিশ্চন্দ্র নাটক এইখানে অভিনয়ের উদ্দেশ্যেই লেখা।

মনোমোহনের প্রথম নাট্যরচনা 'রামাভিষেক নাটক অথবা রামের অধিবাস ও বনবাস' (১৮৬৭) করুণরসাশ্রিত এবং গ্রাম্যতাবৰ্জ্জিত পৌরাণিক নাটক। নয়টি গান আছে। কিছু কিছু অংশ পদ্যে লিখিত। দ্বিতীয় রচনা 'প্রণয়পরীক্ষা নাটক'-এর (১৮৬৯) বিষয় কতকটা রামনারায়ণের নবনাটকের মত, অর্থাৎ বহু-বিবাহের দোষ ইহার উপপাদ্য। তবে প্রণয়পরীক্ষার প্লট রামনারায়ণের নাটকের মত অকিঞ্চিৎকর নয়। প্লটের গাঁথুনিতে মনোমোহনের কল্পনাচাতুর্য্যের পরিচয় আছে। শান্তবাবু বড়লোক জমিদার। প্রথম পত্নী মহামায়ার সন্তান না হওয়ায় তিনি সরলাকে বিবাহ করিয়াছেন। শান্তবাবু যথাসাধ্য দুই পত্নীর প্রতি সমভাব রাখিয়া চলেন, তবে মন অবশ্য ঝোঁকে শিক্ষিত গুণবতী সরলার দিকেই। স্বামীর ভালোবাসা পরীক্ষা করিবার জন্য মহামায়া শান্তবাবুকে বেদেনীর ঔষধ খাওয়াইল। ঔষধের প্রভাবে শান্তবাবুকে রাত্রিতে নিদ্রাচর হইয়া সরলার ঘরের দিকে পা বাড়াইতে দেখিয়া মহামায়ার সপত্নীবিদ্বেষ জ্বলিয়া উঠিল এবং সরলাকে গর্ভবতী জানিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। শান্তবাবুকে লেখা সরলার চিঠি শান্তবাবুর সুহৃৎ-সহচর সদারং-বাবুর নামিত খামে ভরিয়া মহামায়া শান্তবাবুর দৃষ্টিগোচরে রাখিয়া দিল। শান্তবাবু চিঠি পড়িয়া এবং মহামায়ার কথা শুনিয়া সরলাকে অবিশ্বাসিনী মনে করিল। আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে সরলা গৃহত্যাগ করিল। শান্তবাবুর ভগিনীপতি নটবর

যাত্রা-শ্রোতৃগণের পক্ষে তাদৃশ প্রীতিকর হয় নাই।" (কুপিতকৌশিক নাটক, "বিজ্ঞাপন", ২৫ বৈশাখ সংবৎ ১৯৩৫)।

নেশাখোর বটে কিন্তু সরলহৃদয় ভালোমানুষ। সরলাকে সে বড়ই শ্রদ্ধা করে এবং তাহার কথায় সে নেশাভাঙ ছাড়িয়া দিয়াছে। নটবর তাহাকে বুঝাইয়া শুঝাইয়া একস্থানে লুকাইয়া রাখিল। মহামায়ার উপর নটবরের সন্দেহ ছিল। দৈবক্রমে যে বেদেনীর কাছে মহামায়া ঔষধ লইয়াছিল তাহার দেখা পাইল। সে শান্তবাবুকে সব কথা জানাইলে শান্তবাবু সরলার জন্য শোকাকুল হইল। মহামায়া লজ্জায় ভয়ে জঙ্গলে পলাইয়া গেল এবং তাহাকে বাঘে মারিল। মরিবার আগে সে অপরাধ স্বীকার করিল। তাহার পর নটবর সরলাকে আনিয়া মধুরেণ সমাপয়েৎ করিয়া দিল। কাহিনীর মধ্যে তরলা-রসিকের আখ্যান অবান্তর।

প্রণয়পরীক্ষায় চরিত্রগুলি সবই যেন পুঁথি হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। শুধু নটবরের ভূমিকাতেই কিছু স্বাভাবিকতা দেখি। এই চরিত্রে দীনবন্ধুর লীলাবতী-নাটকের হেমচাঁদের ছায়া পড়িয়াছে। এইরূপ নেশাখোর পাগলাটে উন্নতহৃদয় শান্তরসাস্পদ ভূমিকার মধ্যস্থতায় নাটকীয় ঘটনার পরিচালনা মনোমোহনের এই নাটকেই প্রথম দেখা গেল।

প্রণয়পরীক্ষার প্রস্তাবনা সংস্কৃত নাটকের মত পদ্যে লেখা। নাটকের মূল অংশ কথ্য ও কথ্য-ঘেঁষা সরল গদ্যে লেখা। মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ উক্তি আছে, তবে তাহা পৌরাণিক নাটকগুলির মত অত বড় নয়। গান আছে তেরোটি। কয়েকটি ক্ষুদ্র ছড়া এবং কবিতাও আছে।

মনোমোহনের পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'সতী নাটক' (১৮৭৩, দ্বি-স ১৮৭৭)। বিষয় দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ কাহিনী। বিয়োগান্ত নাটক প্রাচীনপন্থী পাঠক-দর্শকদিগের পছন্দসই নয় বলিয়া গ্রন্থকার পরে 'হর-পার্ব্বতী মিলন' নামে একটি অতিরিক্ত অঙ্ক যোগ করিয়াছিলেন। "ইহা আধুনিক রুচির অনুমোদিত না হইলেও প্রাচীন রুচির বিশেষ অনুরোধে নাটক প্রচারের কিছুদিন পরে রচিত, অভিনীত ও সম্ভ্রান্ত অভিনেতাদের সুবিধার্থ কেবল কুড়িখানি মাত্র মুদ্রিত হইয়াছিল।" দ্বিতীয় সংস্করণে ইহাও পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল এই উদ্দেশ্যে—"বিয়োগান্ত-নাটক-প্রিয় মহাশয়েরা সে অংশটি বর্জ্জন এবং পুনর্মিলনানুরাগী মহাশয়েরা গ্রহণ পূর্ব্বক অভিনয় করিতে পারেন।" দ্বিতীয় সংস্করণে "দীর্ঘ উক্তি প্রায়ই খর্ব্ব" করা হইয়াছে।

শান্তে পাগলার ভূমিকা সতী-নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য। শান্তিরাম বাহিরে

গাঁজাখোর পাগল কিন্তু ভিতরে পরমহংস। সে তুচ্ছ ছড়া কাটিয়া উচ্চ কথা বলে। প্লট ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে তাহার দ্বারাই—শিবের নিষেধ সত্ত্বেও সতীকে দক্ষযজ্ঞের কথা বলিয়া দিয়া। অন্য ভূমিকাগুলি যথাসম্ভব স্বাভাবিক, বিশেষ করিয়া নারদ, অশ্লেষা ও মঘা। দক্ষের সংসার যেন বাঙ্গালীর ঘর-গৃহস্থালি।

সতী-নাটকের ভাষা প্রণয়পরীক্ষা হইতে সরলতর। দশটি গান আছে।

'হরিশ্চন্দ্র নাটক' (১৮৭৫) ষড়ঙ্ক। সতী-নাটকের মত ইহাও "বহুবাজারস্থ বঙ্গ নাট্যসমাজের অভিপ্রায়ানুসারে প্রণীত এবং প্রকাশিত", উপরন্তু "তদ্ব্যয়ানুকূল্যে মুদ্রিত"। দীর্ঘ উক্তিগুলি সম্পূর্ণভাবে যাত্রার ধরণের। এই পৌরাণিক কাহিনী লইয়া ইহার পূর্ব্বে আরো একটি নাটক লেখা হইয়াছিল, পার্ব্বতীচরণ তর্করত্নের 'হরিশ্চন্দ্র চরিত নাটক' (১৮৭৩)।[১] মনোমোহনের নাটক বাহির হইবার অব্যবহিত পরে এই কাহিনী অবলম্বনে রামনারায়ণের ধর্ম্মবিজয়-নাটক প্রকাশিত হয়। রামনারায়ণ প্রথমে তাঁহার নাটকের নাম দিয়াছিলেন 'হরিশ্চন্দ্র নাটক', কিন্তু মনোমোহনের বই বাহির হইলে বদলাইয়া 'ধর্ম্মবিজয় নাটক' রাখেন। পরে এই বিষয় লইয়া অনেক নাটক ও গীতাভিনয় লেখা হইয়াছিল। পৌরাণিক নাট্য-কাহিনী হিসাবে হরিশ্চন্দ্র-উপাখ্যানের সমাদর ছিল সীতানির্ব্বাসন ও অভিমন্যুবধ কাহিনীর পরেই।

হরিশ্চন্দ্র-নাটকে নবোন্মেষিত "জাতীয়" অনুভূতির রঙ লাগিয়াছে। এই আন্দোলনের সঙ্গে মনোমোহন প্রথম হইতেই ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। হরিশ্চন্দ্র-নাটকে মনোমোহন হিন্দুমেলায় গীত তাঁহার বিখ্যাত গান—"দিনের দিন সবে দীন, হয়ে পরাধীন"—অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। আরো এমনি একটি গান এই নাটকে আছে। তাহাতে করভারপ্রপীড়িত দেশের দুঃখ খাঁটি ঈশ্বরচন্দ্রীয় রীতিতে প্রকাশিত,

দে কর, দে কর, রব নিরন্তর ;—
সিন্ধু-বারি যথা শুষে দিনকর,
কর-দানে নর-নিকর কাতর,
আয়-কর শুনে গায় আসে জ্বর
লবণটুকু খাব, তাতেও লাগে কর!—
মাদকতা-কর-ছলে র'জ্যময়,
সে গরলে দগ্ধ ভারত নিশ্চয়!

করের দায় অঙ্গ জরজর।
শোণিত শোষণ করে শত কর,
রাজা নয় যেন বৈশ্বানর!......
অস্থিভেদী রথ্যা-কর কি দুষ্কর!
কত আর কব মুনিবর!
মদ্যের বিপণি নিত্য বৃদ্ধি হয় ;
হাহাকার রব নিরন্তর!

[১] চণ্ডকৌশিক নাটকের দুইটি অনুবাদ বাহির হইয়াছিল (১৮৬৯, ১৮৭৮)। শেষের অনুবাদটিতে—নাম 'কুপিতকৌশিক নাটক'—ত্রিশটি গান ছিল।

'পার্থপরাজয় নাটক অর্থাৎ বভ্রুবাহনের যুদ্ধে অর্জ্জুনের পরাভব' (১৮৮১) একাধারে নাটক এবং গীতাভিনয়। 'রাসলীলা নাটক'-ও (১৮৮৯) এই ধরণের। 'আনন্দময় নাটক' (১৮৯০) সামাজিক ষড়যন্ত্রমূলক পঞ্চাঙ্ক নাটক। ভৈরবীর ভূমিকা কাহিনীকে সমাধানের দিকে লইয়া গিয়াছে। 'নাগাশ্রমের অভিনয়' প্রহসন প্রথমে 'মধ্যস্থ' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, পরে (১৮৭৫) "বহু নূতন সংযোগ, পরিবর্ত্তন ও সংশোধনপূর্ব্বক মহর্ষি-খগেন্দ্র-ভক্ত শ্রীযুক্ত বাবু শিখীন্দ্রচন্দ্র নাগান্তক মহাশয়ের অনুমত্যনুসারে শ্রীকেঁড়েলচন্দ্র ঢাকেন্দ্র কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।" ইহাতে পূর্ব্ববঙ্গস্থিত কোন ব্রাহ্ম-আশ্রমের প্রতি কটাক্ষ আছে। গদ্যে-পদ্যে রচিত পঞ্চাঙ্ক 'সতীর অভিমান'-এর বিষয় সীতার পাতাল-প্রবেশ। নাটকটি 'নাট্যমন্দির' পত্রিকায় (১৩১৭-১৮) ক্রমশঃ বাহির হইয়াছিল ॥

১৩

পাইকপাড়ার রাজাদের পর বাঙ্গালা নাট্যাভিনয়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইলেন ঠাকুর-পরিবারের দুই তরফ—পাথুরিয়াঘাটার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও তাঁহার অনুজ সঙ্গীতকলাবিদ্ শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, এবং জোড়াসাঁকোর গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তদনুজ গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ইঁহাদের জ্যেষ্ঠতাতপুত্র দ্বিজেন্দ্র-নাথ ঠাকুর। রামনারায়ণ তর্করত্ন পাথুরিয়াঘাটা রঙ্গমঞ্চের প্রধান নাট্যকার ছিলেন, এবং জোড়াসাঁকো থিয়েটারের জন্যও বই লিখিয়াছিলেন। যতীন্দ্র-মোহন-শৌরীন্দ্রমোহন সংস্কৃত অনুবাদ-নাট্যের পক্ষপাতী ছিলেন। শৌরীন্দ্র-মোহন ঠাকুর 'মালবিকাগ্নিমিত্র' (১২৬৬) অনুবাদ করিয়াছিলেন, সম্ভবত কালিদাস সান্ন্যালের সহায়তায়।[১] যতীন্দ্রমোহন ইহা মধুসূদনের কাছে পাঠাইয়াছিলেন (১ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯) সংশোধন ও অভিমতের জন্য। নাটকটি অভিনীত হইয়াছিল। কালিদাস সান্ন্যালের 'মুক্তাবলী নাটিকা' (১৮৫৯, দ্বি-স ১৮৭৬) শৌরীন্দ্রমোহনের আনুকূল্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। বইটি রত্নাবলীর আদর্শে লেখা। কালিদাস সান্ন্যাল 'নলদময়ন্তী নাটক' (১৮৬৮) লিখিয়া-ছিলেন মধুসূদনের অনুসরণে। ইহার পূর্ব্বে এই নামে নাটক লিখিয়াছিলেন উমাচরণ দে (১৮৫৯) ও অভয়ানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৯)। যতীন্দ্র-মোহনের নামে প্রচলিত 'বিদ্যাসুন্দর নাটক'-এও (১৮৫৮?[২] দ্বি-স ১৮৬৫,

[১] অনেককাল পরে শৌরীন্দ্রমোহনের নামে 'রসাবিষ্কারবৃন্দক' (১২৮৭) বাহির হইয়াছিল।
[২] প্রথম সংস্করণ ২০০ কপি মাত্র ছাপা হইয়াছিল বিতরণের জন্য।

তৃ-স ১৮৭৫) কালিদাস সান্ন্যালের হাত আছে মনে করি। নলদময়ন্তী-নাটকের সঙ্গে বিদ্যাসুন্দর-নাটকের রচনারীতির বেশ মিল আছে। কালিদাস পরে 'বিদ্যাসুন্দর অভিনয়' (বর্দ্ধমান ১৮৮১) অর্থাৎ বিদ্যাসুন্দর-গীতাভিনয় লিখিয়াছিলেন। বিদ্যাসুন্দর-নাটকে কয়েকটি ভালো গান আছে। বইটি পাথুরিয়াঘাটা রঙ্গমঞ্চে বহুবার অভিনীত হইয়াছিল। 'বুঝ্‌লে কিনা!!' প্রহসন (১২৭৩) যতীন্দ্রমোহনের নামে চলে। কাহিনীর মূলে সত্য ঘটনা থাকা সম্ভব। যে লম্পট দলপতি বুঝলে-কিনার উদ্দিষ্ট তাহার হইয়া জবাব দিলেন ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় 'কিছু কিছু বুঝি' (১৮৬৭) লিখিয়া॥

১৪

গদ্য আখ্যায়িকা অবলম্বনে অনেকগুলি নাটক লেখা হইয়াছিল। তাহার মধ্যে অন্তত চারিখানি তারাশঙ্কর তর্করত্ন কৃত কাদম্বরীর অনুবাদ অবলম্বনে লেখা,—মণিমোহন সরকারের 'মহাশ্বেতা নাটক' (১২৬৬), নিমাইচাঁদ শীলের 'কাদম্বরী নাটক' (১৮৬৪), কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কাদম্বরী নাটক' (১৮৭৭) এবং গৌরসুন্দর চৌধুরীর 'কাদম্বরী গীতাভিনয়' (১২৮৫)। রামগতি ন্যায়রত্নের 'রোমাবলী' অবলম্বনে সূর্য্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিলেন সপ্তাঙ্ক 'রোমাবতী নাটক' (১৮৬৯)। বিদ্যাসাগরের সীতার-বনবাস লইয়া নাটক লিখিয়াছিলেন উমেশচন্দ্র মিত্র। পরবর্ত্তী কালে এই কাহিনী লইয়া অনেকেই নাটক-গীতাভিনয় লিখিয়াছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' দশাঙ্ক নাটকে রূপান্তরিত হইল হীরালাল মিত্রের দ্বারা (১৮৬৯)। বইটি বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল (জানুয়ারি ১৮৭৫)।

ইংরেজি আখ্যায়িকা অবলম্বনে লেখা দুইচারিখানি নাটকের সন্ধান পাইয়াছি। নিমাইচাঁদ শীলের 'চন্দ্রাবতী' (১৮৬৭) রেনল্‌ড্‌সের 'লাভ্‌স্‌ অব্‌ দি হারেম্‌' অবলম্বনে লেখা। কালীপদ ভট্টাচার্য্যের 'প্রভাবতী'-র (১৮৭১) প্লট স্কটের 'লেডি অব্‌ দি লেক্‌' হইতে নেওয়া। রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'চিত্তবিনোদ' (১৮৫৭?) 'দি ফেট্যাল্‌ কিউরিঅসিটি' নাটকের অনুবাদ।

আধুনিক এবং পুরানো কাব্যের বিষয়ও নাট্যরচনার বাহিরে রহিল না। মেঘনাদবধ অনেকেরই উপজীব্য হইল। 'মেঘনাদবধ' নাটকের মধ্যে প্রথম হইতেছে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের রচনাটি (১৮৬৭)। বইটি "পল্লীগ্রামে অভিনীত হইবে বলিয়া" যাত্রার মত, গীতিবহুল। পরে এই নামে নাটক লিখিয়া-

বিদ্যাসুন্দর নাটক।

এতেই বুঝা যাবে, যদি কোন ছলে কি কৌশলে এখানে আসতে পারেন, তা হলেই আমি পণে পরাস্ত হই, আর চিরকাল দাসী হয়ে তাঁর চরণে——

(হঠাৎ সুড়ঙ্গদ্বার দিয়া সুন্দরের প্রবেশ।)

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বিদ্যাসুন্দর নাটকের তৃতীয় সংস্করণের একটি পৃষ্ঠা

ছিলেন হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার (১৮৭৭), গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৭৯), অক্ষয়কুমার দে (দ্বি-স ১৮৮০), নফরচন্দ্র দত্ত (১৮৮০) ও রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮০)।

মণিমোহন সরকার অভিনেতাও ছিলেন। তাঁহার 'মহাশ্বেতা' ও 'উষানিরুদ্ধ' (১২৬৯) নাটক দুইখানি অভিনীত হইয়াছিল। নিমাইচাঁদ শীল (১৮৩৫-৯৩) হুগলী কলেজে বঙ্কিমচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন। আদিরসাল 'কামিনী গোপন ও যামিনী যাপন' (১৮৫৫) ইঁহার প্রথম প্রকাশিত রচনা। 'কাদম্বরী' (১৮৬৪) ও 'চন্দ্রাবতী'-র পর ইঁহার 'এঁরাই আবার বড় লোক !' প্রহসন (১৮৭৯) বাহির হইল। নাম প্রহসন কিন্তু সমাপ্তি ট্র্যাজিক, বিষয় মদ্যপানের শোচনীয় পরিণতি। তাহার পর 'ধ্রুবচরিত্র' (১৮৭২) ও 'তীর্থমহিমা নাটক' (১৮৭৩)। দীর্ঘ-উক্তির ও গানের বাহুল্য ধ্রুবচরিত্রকে গীতাভিনয়ের পর্য্যায়ে ফেলিয়াছে। তীর্থমহিমায় তারকেশ্বরের মোহন্তের কদর্য্য কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

একদা চুঁচুড়ায় পাবলিক ষ্টেজ স্থাপনের উদ্যোগ হইয়াছিল। নিমাইচাঁদের প্রথম নাট্যরচনা কাদম্বরী সেখানে অভিনীত হইবে বলিয়া লেখা হইয়াছিল। ষ্টেজ-পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। কলিকাতার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নিমাইচাঁদের নাটকগুলি অভিনীত হইয়াছিল॥

১৫

বাঙ্গালায় মহিলা-রচিত প্রথম নাটক হইতেছে "দ্বিজ তনয়া"-র 'উর্ব্বশী নাটক' (১৮৬৬)। লেখিকার নাম কামিনীসুন্দরী দেবী। সে সময়ে মহিলাদের রচনা বলিয়া যাহা প্রকাশিত হইত তাহার অধিকাংশই পুরুষের বেনামি লেখা। উর্ব্বশী-নাটক সম্বন্ধে সে অভিযোগ চলে না। এক সমসাময়িক সমালোচক লিখিয়াছিলেন,

> সম্প্রতিকার প্রকাশিত একখানি স্ত্রীরচনার প্রতি সাধারণের সন্দেহ হইয়াছে বলিয়া ইহা বক্তব্য যে প্রস্তাবিত পুস্তক প্রকৃত দ্বিজতনয়ার রচনা বটে ; তদ্বিষয়ে কলেজের কএকজন অধ্যাপক সাক্ষ্য দিয়াছেন, অতএব তাহার সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। [১]

জৈমিনীয়-সংহিতার দণ্ডিপর্ব্ব কাহিনী লইয়া চতুরঙ্ক উর্ব্বশী-নাটক লেখা। এই কাহিনী লইয়া পরে গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'পাণ্ডবগৌরব' লিখিয়াছিলেন। নয়টি

[১] রহস্যসন্দর্ভ তৃতীয় পর্ব্ব ৩১ খণ্ড পৃ ১১২।

গান ও পাঁচটি কবিতা আছে। নারী-সংলাপ মন্দ নয়। নমুনা হিসাবে শেষ গানটি উদ্ধৃত করিতেছি। রাজার উক্তি,

> কি কব মনেরি কথা, সকলি রহিল মনে।
> এমন হইবে শেষে, না জানি কখন জ্ঞানে ॥
> কি আর জানাব আমি, জানেন অন্তরযামী
> শুনিয়া তোমার বাণী, যে করে আমার প্রাণে।
> করেছিনু এক আশা, ঘটিল আর এক দশা,
> বিষম স্বপন ধনী, দেখালে অধীন জনে ॥

কামিনীসুন্দরীর অপর নাট্যরচনা হইতেছে 'ঊষা নাটক' (১৮৭১) এবং 'রামের বনবাস নাটক' (দ্বি-স ১৮৭৭)।

"কস্মিন্ হিন্দু মহিলা কর্ত্তৃক প্রণীত", বহুবিবাহের দোষ নির্দেশক, একাঙ্ক 'বল্লালী খাত নাটক' (১৮৬৭) আসলে নারীরচনা না হওয়াই সম্ভব। "শ্রীমতী নিতম্বিনী"-র 'অনূঢ়া যুবতী নাটক'-ও (ঢাকা ১৮৭২) তাহাই বলিয়া মনে হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে কাল্পনিক এবং ইতিহাসাশ্রিত রোমান্টিক নাটকের প্রচলন কিছু কম ছিল না। এই ধরণের কয়েকখানি বই পৌরাণিক-সামাজিক নাটকের তুলনায় মন্দ নয়।

প্রাণনাথ দত্তের (১২৪৭-৯৫) প্রথম রচনা 'প্রাণেশ্বর নাটক' (১৮৬৩) ষড়ঙ্ক, সংস্কৃত নাটকের ধরণে লেখা। কিছু কিছু পদ্য ও কয়েকটি গান আছে। দ্বিতীয় রচনা 'সঞ্জুক্তা-স্বয়ম্বর নাটক' (১৮৬৭) সপ্তাঙ্ক এবং সংস্কৃত-ধরণের। কাহিনী টডের রাজস্থান হইতে নেওয়া। লেখক ভূমিকায় বলিয়াছেন,

> এই গ্রন্থে ব্যবহৃত নামাদির অধিকাংশ পুরাবৃত্ত, কেবল সময় ও অভিধান সম্বন্ধে দুই একটি অনৈক্যতা আছে; সমর সিংহ পৃথ্বীরাজের ভগিনীকে সঞ্জুক্তা-হরণের পূর্ব্বে বিবাহ করেন, কিন্তু আমি ঐ বিবাহ পরে ঘটাইয়াছি।

নাটকটিতে দেশের পরাধীনতাবেদনার প্রস্ফুট প্রকাশ আছে এবং পরবর্ত্তী কালের মত "অনার্য্য ম্লেচ্ছ", "পাপিষ্ঠ যবন" ইত্যাদি নিরর্থ বাল্যচাপল্য নাই। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয়াভিনয়ে হেমচন্দ্রের বীরবাহু-কাব্যের নামপত্রের কবিতার চারি ছত্রের অনুকরণ আছে,

> আর কি আছে সে দিন, যবে চীন মহাচীন
> ভারত ভূমির নামে, সভয়েতে কাঁপিত।
> যবে দেশ দেশান্তরে, মানবে সম্ভ্রম ভরে,
> ভারতের যশঃরূপ, গীতাবলি গাইত ॥…

প্রেমধন অধিকারীর (সম্ভবত একমাত্র) রচনা 'চন্দ্রবিলাস নাটক' (১৮৬৬)

পঞ্চাঙ্ক এবং আকারে ছোট নয়। সংস্কৃতের ধরণে "নান্দী" গানের পর প্রস্তাবনা আছে। প্লট শিথিলগ্রন্থি। ভারতচন্দ্রের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। তবুও নাট্যকারের শক্তির পরিচয় আছে। নায়ক চন্দ্রশেখর এবং নায়িকা বিলাসবতী ছাড়া অপর ভূমিকা প্রায় সবই ফুটিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা জীবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী বিনায়ক। এই নির্লিপ্ত পরোপকারী ভূমিকাটিতে মনোমোহন বসুর ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের ভক্তিরসবহুল নাটকের কেন্দ্রীয় মহাপুরুষ ভূমিকার পূর্ব্বরূপ পাইতেছি। পঞ্চম অঙ্কে রাজার উক্তির ("তুমি যে সকল ঘটেই আছ দেখ্‌ছি, সকল পক্ষেই গাও") উত্তরে বিনায়ক বলিয়াছিল,

> কি করি মহারাজ আমার ঐ একটা কেমন দোষ, এ ভব ঘোরে ঘুরে কেমন বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ হয়ে গেছে, এর মধ্যে কে শত্রু কে মিত্র, কে আপনার কে পর, এ তো আমি আজো পর্য্যন্ত ঠাউরে উঠতে পারলেম না। যারে মিত্র বলে ধরি সে দেখি যে উল্‌টে ছোবল মারে, আবার যারে শত্রু বলে ছেড়ে যাই, সেই দেখি আমার ভালোর চেষ্টায় ফেরে, তাই মহারাজ সাত পাঁচ ভেবে এবার থেকে একেবারে টানা জাল ফেলেছি, সেই টানের মুখে যত রয় যত যায়।

নাটকটির সামান্য অংশ পদ্যে লেখা। গদ্য বেশ সরস এবং কথ্য। দুই-একটি বাউল ঢঙের ভালো গান আছে। যেমন,

> কি না বল হয় টাকায়।
> হেন কাজ নাইকো ধরায়, টাকায় যা না সাধা যায়।
> টাকাতে হাসায় কাঁদায়, ভেল্‌কি লাগায় সব কথায়॥
> টাকার জোরে আর কি বল, বাঘের বাপের শ্রাদ্ধ হয়।
> থাক্‌লে টাকা সবাই মানে, নৈলে কেবা কথা কয়॥
> পরের ছেলে টাকা পেলে, বাবা বল্‌তে আগে চায়।
> টাকার তরে সবাই পাগল, হায়রে টাকা হায়রে হায়॥

গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইন্দুপ্রভা নাটক' (১৮৬৮) মধুসূদনের পদ্মাবতীর অনুসরণে বাগবাজার নাট্যসমাজে অভিনয়ের জন্য লেখা। বইটি মধুসূদনকে উৎসর্গিত।

সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'কিন্নর-কামিনী নাটক' (ভাটপাড়া ১৮৭২) একাদশাঙ্ক। কাহিনী রজতগিরিনন্দিনীর মত। দুই একটি ভূমিকায় লেখকের দক্ষতার পরিচয় আছে। বৈরাগীর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের বৈরাগীর যেন পূর্ব্বাভাস আছে। রচনা সরল, সংলাপ শোভন। দশম অঙ্কে পুরী-যাত্রীদের দৃশ্য বেশ বাস্তব। "উপাঙ্ক" অর্থাৎ প্রস্তাবনা সংস্কৃত নাটকের মত।

আলোচ্য সময়ে লেখা ইতিহাসাশ্রিত ও বিশুদ্ধ রোমান্টিক অপর নাট্যরচনার কালানুক্রমিক উল্লেখ করিতেছি।

১৮৬৩ : জগদিন্দ্রনারায়ণ বসুর 'বিলাসবতী নাটক'।

১৮৬৬ : ত্রৈলোকানাথ দত্তের 'প্রেমাধীনী নাটক'।

১৮৬৮ : বনোয়ারীলাল রায়ের 'কুমুদ্বতী'; বিহারীলাল নন্দীর 'মেঘমালা নাটক'; কিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'বিপদই সম্পদের মূল'; অজ্ঞাতনামার 'হেমন্তকুমারী'।

১৮৬৯ : কেশবচন্দ্র সাধুর 'স্পর্শানন্দ নাটক'; বিহারীলাল সিংহের 'রসরঞ্জন'; বিপিনবিহারী দের 'জাহ্নবীবিলাস' ও 'মনোহারিণী নাটক' (১৮৭০)।

১৮৭০ : ক্ষেত্রমোহন কাঞ্জিলালের 'প্রমোদনাথ নাটক'; জয়নাথ দাসের 'জীবন উন্মাদিনী'; মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'হেমাঙ্গিনী নাটক', জগদ্বন্ধু ভদ্রের[১] 'দেবলদেবী', মতিলাল মজুমদারের 'অদ্ভুত নাটক'।

১৮৭১ : কৃষ্ণচন্দ্র মিত্রের 'জ্ঞানদারঞ্জন নাটক'; ধীরেশচন্দ্র দাস ঘোষের 'কুসুমকামিনী'।

১৮৭২ : তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়ের 'শশিপ্রভা নাটক', উপেন্দ্রচন্দ্র নাগের 'চমৎকার চম্পূ'; রামকালী ভট্টাচার্য্যের 'হিন্দু পরিবার'; প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রত্নবেদিকা'।

১৬

এই সময়ে সমাজচিত্রঘটিত নাট্যরচনা প্রচুর বাহির হইয়াছিল। পূর্ব্ব হইতেই কবিগান-পাঁচালী-বিদ্যাসুন্দরযাত্রার দ্বারা কলিকাতা-অঞ্চলের ভদ্রসমাজের সাহিত্যিক রুচি গঠিত হইয়াছিল। সেই কারণে সমাজ-কলঙ্ক এবং পারিবারিক ও ব্যক্তিগত কুৎসার চিত্র লোকে লুফিয়া লইল। আলোচ্য সময়ের প্রথম দিকে যে-সকল প্রহসন ও সমাজচিত্র-নাটক রচিত হইয়াছিল তাহার বেশির ভাগ কুৎসাঘটিত নয়, সেগুলির উদ্দেশ্য ছিল ভালো। কিন্তু পরবর্ত্তী কালের অধিকাংশ নাট্য-রচনা লোকরঞ্জনের জন্যই লেখা। বিষয়ের ও রচনার তুচ্ছতা সত্ত্বেও সমসাময়িক জীবনের খণ্ডচিত্র হিসাবে এই নাট্যরচনাগুলির কিঞ্চিৎ মূল্য স্বীকার করিতে হয়, যদিও সে মূল্য প্রধানত ঐতিহাসিক। এইজন্যই তখনকার সাহিত্যে প্রহসন যেমন উৎরাইয়াছিল নাটক তেমন নয়।

পাড়াগাঁয়ের দুরবস্থা ও দলাদলি লইয়া দুইখানি নাটক-প্রহসন বাহির হইয়াছিল ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে—হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'দলভঞ্জন নাটক' এবং রামনাথ ঘোষের 'পাড়া গাঞ্যে এ কি দায়'। দলভঞ্জনে কৌতুকরসের যোগান আছে বেশ। লেখক স্বগ্রাম নিবাধই-নিবাসী গোপালচন্দ্র দত্ত ও সাতকড়ি দত্তের[২] সাহায্য স্বীকার করিয়াছেন। হারাণচন্দ্রের দ্বিতীয় রচনা 'বঙ্গকামিনী

[১] ইঁহার অপর নাট্যরচনা 'বিজয়সিংহ' (গৌরপদতরঙ্গিণী দ্বি-স পৃ ৩৭৫ দ্রষ্টব্য)।

[২] কলিকাতা নর্ম্যাল স্কুলের শিক্ষক।

নাটক'-এ (১৮৬৮) পিতৃগৃহে অনূঢ় কন্যার দুর্গতির আর বিধবা কন্যার লাঞ্ছনার চিত্র আছে। প্লট তেমন সংহত নয়। এই সময়ে বাঙ্গালী মেয়ের দুরবস্থা আরো অন্তত দুইজন নাট্যকারকে বিষয় যোগাইয়াছিল,—বিপিনমোহন সেনগুপ্ত (১৮৬৮) এবং বটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৯)। জোড়াসাঁকো নাট্যশালার পক্ষে বিজ্ঞাপিত পুরস্কারের জন্য দুইজনেই 'হিন্দুমহিলা নাটক' লিখিয়াছিলেন। পুরস্কার পাইয়াছিলেন বিপিনমোহন।[১]

বেহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সপ্তাঙ্ক 'দুর্গোৎসব' নাটক (হুগলি ১৮৬৮) ব্রাহ্মভাবাপন্ন শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছে দুর্গোৎসবের উপযোগিতা প্রতিপাদনের জন্য লেখা। আখ্যানবস্তু বিশেষ কিছু নয়। তবে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ-পরিবারে দুর্গোৎসবের বেশ বর্ণনা আছে। ভাষা সরল। মাঝে মাঝে পয়ার ছত্র আছে। প্রধান পাত্র চন্দনবিলাস স্বার্থপর পাষণ্ড, তবুও সে পাঠকের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত নয়। বিদ্যাভূষণের মতে চন্দনবিলাস "বড় ভয়ানক লোক। ও ব্রাহ্মের কাছে ব্রাহ্ম, যবনের কাছে যবন, হিন্দুর কাছে হিন্দুর প্রশংসা করে খ্যাত হবার চেষ্টা পায়। কখন মোসাহেবি ও চিকিৎসাও কত্তে দেখা যায়।" নিজের বিষয়ে চন্দনবিলাসের গর্ব্ব,

> কত ছলে ফিরি আমি কেবা তাহা জানে,
> কভু পিরে সির্নি মানি কভু ব্রহ্মজ্ঞানে,
> কভু শচীদুলালে দেবতা হেন বাসি,
> কভু যীশুপ্রেমনীরে সদানন্দে ভাসি,...

নাটকখানি যখন লেখা হয় তখন পশ্চিমবঙ্গে ম্যালেরিয়ার প্রথম প্রকোপ এপিডেমিক রূপে দেখা দিয়াছে এবং সেই সঙ্গে কুইনাইনেরও প্রথম আবির্ভাব। তখনকার গ্রাম্যকবিরা কুইনাইনের গান বাঁধিত। এমন একটি গান দুর্গোৎসবে উদ্ধৃত হইয়াছে। সেটি এই,

> এসেছে যমের যম কুইনাইন,
> হল স্বগুণে সে শাদা গুঁড় অল্প কালে সব চিন।
> চিরতা করিত বটে জ্বরে কিছু উপকার,
> সারিবে কি না সারিবে ছিল না স্থিরতা তার,
> গুলঞ্চনাটার ফল,
> ইদানীং হল বিফল,
> লক্ষ্মীবিলাসের লক্ষ্মী ছেড়ে গেছে অনেক কাল।

[১] বিপিনমোহনের বইয়ে পরীক্ষকদের রিপোর্ট (তারিখ ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৭) ছাপা আছে। পরীক্ষক ছিলেন প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।

একস্থানে হিন্দু মেলার কথা আছে—

> নূতন খপরের মধ্যে এবার চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিন রাজা নরসিংহ রায়ের চিৎপুরের বাগানে হিন্দুদিগের একটি জাতীয় বিধান মেলা হয়ে গেছে। তাতে বড় সমারোহ হয়েছিল।

দুর্গোৎসব ফরমায়েসি রচনা। পূর্ব্বাভাসে লেখক বলিয়াছেন,

> দিনাজপুরের রাজকর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু হরেকৃষ্ণ খাসনবীস মহাশয়ের যত্ন ও উৎসাহে এই নাটকখানি প্রণীত হইল। কিছু দিন পূর্ব্বে এজুকেশন গেজেটে এই পুস্তক রচনা করিবার জন্য বিজ্ঞাপন দেন। আমি সেই বিজ্ঞাপন দেখিয়া এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন পূর্ব্বক তাঁহার নিকট প্রেরণ করি। এ বিষয়ে আর যে কএক খানি পুস্তক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে আমার পুস্তকখানি অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগৃহীত হওয়াতে আমি পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছি।

বেশ্যানুরক্তি বিষয়ে দুইখানি নাট্যরচনা উল্লেখযোগ্য। প্রসন্নকুমার পালের 'বেশ্যাসক্তি নিবর্ত্তক নাটক' (১৮৬০-৬২) ও রাধামাধব হালদারের 'বেশ্যানুরক্তি বিষম বিপত্তি' (১৮৬৩)। প্রসন্নকুমারের পঞ্চাঙ্ক নাটকে সেকালের এই প্রসিদ্ধ গানটি উদ্ধৃত হইয়াছে,

> মদন-আগুন জ্বলছে দ্বিগুণ, কি গুণ কল্লে ঐ বিদেশী
> ইচ্ছা করে উহার করে প্রাণ সোঁপে সই হইগে দাসী।
> দারুণ কটাক্ষ-বাণে, অস্থির করেছে প্রাণে,
> মনে না ধৈরজ মানে, মন হয়েছে তাই উদাসী॥

সেকালে পানদোষের প্রাবল্য কোন কোন ধনিগৃহের শুদ্ধান্তঃপুরকেও স্পর্শ করিয়াছিল। এইরূপ কোন পারিবারিক কুৎসা লইয়া ক্ষেত্রমোহন ঘটক 'কামিনী নাটক' (১২৭৫) লিখিয়াছিলেন। উপসংহারে উমেশচন্দ্রের বিধবা-বিবাহের ছায়া আছে। কামিনীর ভূমিকায় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর মডেল-ভগিনীর পূর্ব্বাভাস দেখা যায়।

জ্ঞানধন বিদ্যালঙ্কারের 'সুধা না গরল ?'-এ (১৮৭০) সধবার-একাদশীর প্রভাব আছে। জাতীয়-মেলায় অভিনয়ের উদ্দেশ্যে ইহা লেখা হইয়াছিল।[১] কলিকাতা-অঞ্চলে শিক্ষিত সমাজে মদ্যপায়িতার ও লাম্পট্যের চিত্র ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছে। উপসংহার বিধবাবিবাহ নাটকের মত। লেখকের ইংরেজি ও সংস্কৃত সাহিত্যে অভিজ্ঞতার পরিচয় বেশ আছে। রচনাভঙ্গি

[১] নাম-পৃষ্ঠার চারি ধারে এই চারি পাদ পয়ার আছে, "জাতীয় মেলা চরণে অর্পিলাম নাটক। দেশহিতে সাধুগণে রেখ দেবি মানস।"

সরল ও সরস, ক্বচিৎ গ্রাম্যতার স্পর্শ আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রতি লেখকের কটাক্ষ উপভোগ্য।

রাজে[ন্দ্র]। যে বেশী মুখস্ত কর্ত্তে পারে সেই universityতে shine কর্ত্তে পারে। ওতে solid knowledge এর তত দরকার নেই। গং মুখস্ত কর্ত্তে পার্ল্লেই পাস। একজন European gentleman সেদিন just remark করেছেন্।

অবি[নাশ]। কি remark করেছেন্।

রাজে। তিনি বলেন্, যে Calcutta university আর Bryant & May's safety match সমান। 'Ignites only on the box', যেটি বাক্সের উপর টান্‌বে সেটি জ্বল্‌বে, আর যেটি বাক্সের উপর টান্‌বে না সেটি জ্বল্‌বে না। এও সেই রকম। যিনি গং মুখস্ত করে এগজামিনের সময়ে লিখ্‌তে পার্ব্বেন্ তিনিই পাস হবেন; আর যিনি পার্ব্বেন্ না তাঁর ফেল হবার সম্ভাবনা।

বিভিন্ন সাময়িক ঘটনা অথবা পারিবারিক ও ব্যক্তিগত কুৎসা-ঘটিত ছোট ছোট প্রহসন-নামিত পুস্তিকা সস্তা ছাপাখানা হইতে অজস্র বাহির হইয়াছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে। এই নিতান্ত তুচ্ছ ও অধিকাংশ জঘন্য রচনাগুলিকে কালের সম্মার্জনী করে দূর করিয়া দিয়াছে। ক্বচিৎ দুই চারিখানা এদিকে ওদিকে পুরাতন কাগজপত্রের বাণ্ডিলের মধ্যে অনবধানবশত রহিয়া গিয়াছে। এগুলির সাহিত্যমূল্য কিছুই নাই। এগুলির মূল্য যদি কিছু থাকে তো প্রধানত সাহিত্যকুতুকীর এবং ঐতিহাসিকের কাছে। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে "বাস্তবতা" প্রবেশ করিয়াছিল এই-ধরণের রচনার মধ্য দিয়াই। সেই বাস্তবতার নিদর্শন বলিয়া এই পুস্তিকাগুলি ইতিহাসের পাদটীকায় স্থান পাইতেও পারে।

বিধবাবিবাহ-বিষয়ক নাটকের প্রসঙ্গে এই ধরণের কয়েকটি নাট্যপুস্তিকার নাম করিয়াছি। অপর রচনার মধ্যে প্রাচীনতর কয়েকটির সন্ধান দিতেছি। এই-ধরণের বহু রচনার নামকরণ বুড়-শালিকের-ঘাড়ে রোঁর অনুকরণে প্রচলিত প্রবাদবাক্য দিয়া। যেমন, ভুবনেশ্বর লাহিড়ির 'গুলি হাড়কালি নাটক' (১৮৬২), ব্রজমাধব শীলের 'পরের ধনে বরের বাপ, না বিইয়ে কানায়ের মা' (১৮৬৩), রামকৃষ্ণ সেনের 'হুড়কো বৌএর বিষম জ্বালা' (১৮৬৩), ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কোনের মা কাঁদে আর টাকার পুঁটলি বাঁধে' (১৮৬৩), বিশ্বম্ভর দত্তের 'চোর বিদ্যা বড় বিদ্যা' (১৮৬৪), হরিমোহন কর্ম্মকারের 'ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে' (১৮৬৪), ইত্যাদি।

ঢাকার হরিশ্চন্দ্র মিত্র (১৮৩৪-১৮৭২) স্বনামে ও বেনামিতে গদ্য-পদ্য

প্রচুর লিখিয়াছিলেন। ইঁহার সব বই ঢাকায় ছাপা। ইনি বিধবাবিবাহ বিষয়ে দুইটি প্রহসন লিখিয়াছিলেন, 'ম্যাও ধরবে কে?' এবং 'শুভস্য শীঘ্রং' (১৮৬২)। 'জানকী নাটক'-এ (১৮৬৩) মেঘনাদবধের ছায়া আছে। স্বনামে অপর নাট্যরচনা—'জয়দ্রথবধ' (১৮৬৪), 'আগমনী' (১৮৭০), 'প্রহ্লাদ নাটক' (১৮৭২), ও 'হতভাগ্য শিক্ষক' (১৮৭২)। 'ঘর থাক্‌তে বাবুই ভেজে' (১৮৭২) ইঁহারই রচনা বলিয়া মনে করি। ইঁহার অনেকগুলি পুস্তিকা "ব্যোমচাঁদ বাঙ্গাল" এই ছদ্মনামে প্রকাশিত হইয়াছিল।[১]

আলোচ্য সময়ে লেখা আরো কয়েকটি প্রহসন-পুস্তিকা ও ছোট-বড় নাট্যরচনার উল্লেখ করিতেছি।

১৮৬২ : ভুবনমোহন চক্রবর্ত্তীর 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি', কুশদেব পালের দুইখণ্ড 'আইন সংযুক্ত কাদম্বরী নাটক'; কুঞ্জবিহারী দের 'কলঙ্কভঞ্জন নাটক'।

১৮৬৩ : অজ্ঞাতনামার 'কি মজার গুড্‌ফ্রাইডে'; মহেন্দ্রনাথ বসুর 'স্ত্রীলোক-সাধ্য নাটক'; কালাচাঁদ শর্ম্মা ও বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ের 'একেই কি বলে বাবুগিরি? নামক নাটিকা'।

১৮৬৪ : দ্বারকানাথ মিত্রের 'মূষলং কুলনাশনং'।

১৮৬৫ : ক্ষেত্রমোহন চক্রবর্ত্তীর 'চক্ষুঃস্থির নাটক'।

১৮৬৬ : যদুনাথ তর্করত্নের 'দুর্ভিক্ষ দমন নাটক'।

১৮৬৭ : নবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বারুণী-বিলাস নাটক'; যদুনাথ ঘোষের 'হেমলতা'।

? : অজ্ঞাতনামার 'তারপর কি নাটক'; অজ্ঞাতনামার 'একেই বলে ঘোর কলি নাটক'।

১৮৬৮ : গোপালচন্দ্র সেন গুপ্তের 'বিমাতা মনোরঞ্জন'; অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতি নাটক'; বনমালী চট্টোপাধ্যায়ের 'বরের কাশীযাত্রা', অজ্ঞাতনামার 'হেমন্তকুমারী'।

১৮৬৯ : অজ্ঞাতনামার 'বাহবা চৌদ্দ আইন'; তারিণীচরণ দাসের 'বেশ্যা-বিবরণ'।

১৮৭০ : বিপিনবিহারী দের 'একাদশীর পারণ';[২] জীবনকৃষ্ণ সেনের 'ফাল্‌তো ঝগড়া'; হীরালাল দত্ত ও অন্নদাপ্রসাদ ঘোষের 'কলিকালের গুড়ুক ফোঁকা নাটক'; চন্দ্রকান্ত শিকদারের 'কি মজার শনিবার'; কেদারনাথ ঘোষের 'জ্ঞানদায়িনী'।

১৮৭১ : অজ্ঞাতনামার 'সাক্ষ্যাৎ দর্পণ',[৩] অজ্ঞাতনামার 'গিরিবালা'; অক্ষয়কুমার সাধুর 'রতনেই রতন চেনে'; দ্বারকানাথ দত্তের 'বাঙ্গালার ভাবি-মঙ্গল'; মহেশচন্দ্র দাস দের 'কুলপ্রদীপ নাটক'।

১৮৭২ : প্রিয়লাল দত্ত ও ললিতমোহন শীলের 'ভারত দর্পণ'; হরিগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'দারগা মশাই'; রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'এই এক রকম'; অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দেশাচার' (শ্রীরামপুর), অক্ষয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমাজ রহস্য'; দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী'; অজ্ঞাতনামার 'লোভে পাপ পাপে মৃত্যু'।

[১] "মুন্‌শী নামদার"-এর এই পুস্তিকাগুলি সম্ভবত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের রচনা,—'দুই সতীনের ঝগড়া' (১৮৬৭), 'কলির বৌ হাড়জ্বালানী' (১৮৬৮), 'কলির বৌ ঘরভাঙ্গানী' (১৮৭৯), 'ননদভাজের ঝগড়া' (১৮৬৯), 'ভ্যালারে মোর বাপ' (১৮৭৬), ইত্যাদি। বছর দশেক পরে ঢাকার হরিহর নন্দী ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের রচনাগুলি নিজনামে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

[২] সধবার একাদশীর পরিশিষ্টের মত। নিমচাঁদ এখানে সুধাচাঁদ হইয়াছে।

[৩] বিহারীলাল গুপ্তকে উপহৃত। গ্রেট ন্যাশন্যালে অভিনীত (১৮৭৫)।

১৭

বাঙ্গালা নাটকের উদ্ভব প্রাচীন যাত্রা হইতে হয় নাই, সংস্কৃত ও ইংরেজি নাটকের মিলিত আদর্শেই বাঙ্গালা নাটকের উৎপত্তি। কিন্তু একটি বিষয়ে বাঙ্গালা নাটক প্রাচীন যাত্রার কাছে ঋণী। বাঙ্গালা নাটকে গানের অপরিহার্য্যতা পুরানো যাত্রা হইতেই আসিয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু হইতে কলিকাতা অঞ্চলে প্রাচীন যাত্রা-পদ্ধতিতে একটা পরিবর্ত্তন আসিতেছিল। কৃষ্ণলীলা-চৈতন্যলীলা-দেবীলীলার স্থানে দক্ষযজ্ঞ-ধ্রুবচরিত্র-কমলেকামিনী-নলদময়ন্তী-শ্রীবৎসচিন্তা ইত্যাদি পৌরাণিক উপাখ্যান এবং বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীর মত অপৌরাণিক আদিরসসিক্ত আখ্যায়িকা অধিক আদরণীয় হইতেছিল। সেই সঙ্গে নাচগানের বাহুল্য এবং সঙের ও ভাঁড়ামির আবশ্যিকতা দেখা দিল। গোবিন্দ অধিকারী, বদন অধিকারী ও রাধা-কৃষ্ণ বৈরাগী প্রভৃতির দলে প্রাচীন যাত্রা-পদ্ধতি অনেকটা অবিকৃত ছিল। মহেশ চক্রবর্ত্তী, বৌ মাষ্টার, ঝোড়ো, উমেশ মিত্র, মদন মাষ্টার, লোকা ধোপা ইত্যাদির দলে নবোদ্ভূত নাটকের প্রভাব পড়ায় যাত্রার রূপ কিছু বদল হইল। ইতিমধ্যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রঙ্গমঞ্চে নাটকের উদ্দীপ্ত অভিনয় শহরবাসীর চক্ষু ধাঁধাইয়া দিয়াছিল এবং তাহার ফলে পাড়ায় পাড়ায় শখের থিয়েটারের উদ্যম উঠিতেছিল। রঙ্গমঞ্চের ব্যয়বাহুল্য অধিকাংশ শখের দলের সাধ্যায়ত্ত ছিল না বলিয়া ষ্টেজ ব্যতিরেকেই নাটকের অভিনয় হইতে লাগিল। এইভাবে আর্থিক কারণে নাট্যাভিনয় ও গীতাভিনয় পরস্পর কাছাকাছি আসিয়া পড়িল। যাত্রা ও থিয়েটারের এইরূপে মিলন ঘটাইয়া যেসকল শখের দল ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল তাহার মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় হইতেছে ভবানীপুরে উমেশ মিত্রের দল, মধ্য কলিকাতায় আরপুলি গলির দল ও সিমুলিয়ার "সকের যাত্রা কোম্পানী"। শখের দলে তখনকার সুপরিচিত নাটকগুলিই কাটছাঁট করিয়া এবং অতিরিক্ত গান যোগ করিয়া অভিনীত হইত। মনোমোহন বসুর নাটকগুলিতে গান বেশি থাকায় এবং ভক্তিরসপূর্ণ হওয়ায় এগুলি সরাসরি গীতাভিনয়ের সমধিক উপযোগী ছিল।

প্রথমে যে প্রসিদ্ধ নাটকগুলি ভাঙ্গিয়া গীতাভিনয় অর্থাৎ গীতিবহুল যাত্রা-পালার রূপ দেওয়ার চেষ্টা হইল তাহার মধ্যে সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য হইতেছে রাম-নারায়ণের রত্নাবলী অবলম্বনে হরিমোহন (কর্ম্মকার) রায়ের 'রত্নাবলী গীতাভিনয়' (১৮৬৫)। অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শকুন্তলা গীতাভিনয়'ও এই বছরে

বাহির হইয়াছিল। অন্নদাপ্রসাদের অপর গীতাভিনয় হইতেছে 'উষাহরণ' (১৮৭৪)। পূর্ণচন্দ্র শর্ম্মার 'শ্রীবৎসরাজার উপাখ্যান নাটক'-এ (১৮৬৬) প্রাচীন যাত্রার আদর্শ বজায় আছে। ইহাতে "অঙ্ক" বিভাগ নাই। এই সময়ে রচিত অপর গীতাভিনয়ের ও গীতাভিনয়িক-নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে তিনকড়ি ঘোষালের 'সাবিত্রী সত্যবান্ গীতাভিনয়' (১৮৬৭), যাদবচন্দ্র বিদ্যা-রত্নের' 'কিচকবধ নাটক' (শ্রীরামপুর ১২৭৪), অজ্ঞাতনামা লেখকের 'চণ্ড-কৌশিক' (১৮৬৯), শ্রীশচন্দ্র রায় চৌধুরীর 'লক্ষ্মণ বর্জ্জন নাটক' (১৮৭০) ও হরিশ্চন্দ্র মিত্রের 'আগমনী' (ঢাকা ১৮৭০)।

হরিমোহন (কর্ম্মকার) রায়ের অপর নাট্যরচনা হইতেছে ষড়ঙ্ক 'শ্রীবৎস-চিন্তা' (১২৭৩), ত্র্যঙ্ক 'জানকী-বিলাপ' (১২৭৪), পঞ্চাঙ্ক 'ইন্দুমতী নাটক' (১৮৭৯), 'মাগসর্ব্বস্ব' প্রহসন (১৮৭০) ও ত্র্যঙ্ক 'পর্ব্বত-কুসুম' গীতিকা (১২৮৫)। শ্রীবৎস-চিন্তা সিমুলিয়া শখের দলের জন্য লেখা এবং তাহাদের দ্বারা প্রকাশিত। রঘুবংশের অজ-ইন্দুমতী কাহিনী ইন্দুমতী-নাটকের বিষয়। "যোড়া-সাঁকো নাট্যসমাজাধ্যক্ষ মহোদয়গণের অনুরোধে" ইহা রচিত হইয়াছিল। কুমারসম্ভবের মদনভস্ম ও শিববিবাহ কাহিনী লইয়া পর্ব্বত-কুসুম লেখা। ইহাও "যোড়াসাঁকো নাট্যসমাজের অভিনয়ের জন্য" ছাপা হইয়াছিল। 'জানকী-বিলাপ' গীতাভিনয়ে কিছু নূতনত্ব আনিল। রত্নাবলী-গীতাভিনয়ে যেমন নাটক যাত্রা-পালার দিকে আগাইয়া গেল, জানকী-বিলাপে তেমনি যাত্রা নাটকের কাছাকাছি উঠিয়া আসিল। জানকী-বিলাপ আদ্যন্ত গানে বাঁধা, গদ্যাংশ একেবারেই নাই। প্রাচীন যাত্রাতে এই রকমই ছিল। যাত্রার বাঁধা পালাতে গদ্য ছিল না, অভিনয়ে গদ্য ব্যবহৃত হইত উপস্থিতমত। হরিমোহন জানকী-বিলাপকে "গীতিকা" আখ্যা দিয়াছেন। ইহার দ্বিতীয় "গীতিকা" 'মানিনী'-র (১২৮১) বিষয় রাধার মানভঞ্জন। বইটির ভূমিকায় হরিমোহন বাঙ্গালা গীতিনাট্যের গোড়ার কথা বলিয়াছেন।

> "অপারা" অর্থাৎ বিশুদ্ধ গীতিকা, এপর্য্যন্ত কেহই প্রণয়ন করেন নাই। বহুদিবস হইল আমি জানকী-বিলাপ নামে একখানি গীতিকা রচনা করি। স্বর্গীয় বাবু শ্যামাচরণ

[১] হরিমোহনের কবিতার বই হইতেছে 'ইসফ জেলেখা' (১২৬২), 'ক্যোমার জিলম্যানের মনোহর উপাখ্যান' (১২৬২), কুমারসম্ভবের অনুবাদ (১২৬৫), এবং 'বিশুদ্ধ প্রেম অর্থাৎ স্বভাব ও কবিতাদেবীর নিরমল প্রেম বর্ণন' (১৮৬৪)। শেষের বইটি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে উৎসর্গিত, মঙ্গলাচরণ অমিত্রাক্ষরে।

মল্লিক মহাশয় নিজব্যয়ে সমধিক উৎসাহের সহিত উক্ত গীতিকার অভিনয় করিয়াছিলেন। ফলতঃ তৎকালে জানকী-বিলাপখানি কথঞ্চিৎ "অপারার" আদর্শ স্বরূপ হইয়াছিল। প্রায় দশ বারো বৎসর অতীত হইল, উক্তরূপ গীতিকার অভিনয়ে আর কেহই যত্নবান হন নাই। ১২৮১ সালের আশ্বিন মাসে, প্রধান জাতীয় নাট্যশালার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন নিউগী—"সতী কি কলঙ্কিনী" নামে একখানি গীতিকার অভিনয় করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেখানিও "জানকী-বিলাপের" কথঞ্চিৎ আদর্শস্বরূপ। তথায় ভুবন বাবুকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করি যে তিনি গীতিকার অভিনয়ে সমধিক যত্নবান হইয়াছিলেন। "সতী কি কলঙ্কিনী" যদিও বিশুদ্ধ "অপারা" নহে, তথাচ অভিনয় মন্দ হয় নাই, দর্শকগণের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

বাঙ্গালা "গীতিকা" বা গীতিনাট্যের মূলে ইংরেজি অপেরার ছায়া যতটা না থাক্ যাত্রার প্রভাবই বেশি। বক্তৃতা-বিহীন যাত্রা এবং গীতিকার মধ্যে প্রভেদ কেবল নাচগানের ঢঙে এবং রঙ্গমঞ্চ থাকা-না-থাকায়।

গীতাভিনয় বা আধুনিক যাত্রার মূলে পাঁচালীর প্রভাবও কম নয়। এই প্রভাব আছে আখ্যানবস্তুতে আর গানের সুরে। তাহা ছাড়া দীর্ঘ বক্তৃতায় কথকতার প্রভাবও রহিয়াছে। তবে নাটকাভিনয়ই যে গীতাভিনয়ের মূল উৎস তাহার একটা প্রমাণ এই যে আধুনিক যাত্রার পুরানো লেখকেরা সকলেই নাট্যকার ছিলেন এবং তাঁহারা যাত্রা-পালায় নাটকের আদর্শই অনুসরণ করিয়াছিলেন। মনোমোহন বসুর নাটকগুলিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় যাত্রা-পালার ধরণে অনেকগুলি পৌরাণিক নাটক ও কয়েকখানি প্রহসন লিখিয়াছিলেন। হুতোম-প্যাঁচার-নক্‌শার উত্তরে 'আপনার মুখ আপনি দেখ' (১৮৬৩) লিখিয়া ইনি সাহিত্যক্ষেত্রে দেখা দেন। এই সালে ইঁহার ক্ষুদ্র প্রহসনও বাহির হয়—'কোনের মা কাঁদে আর টাকার পুঁটুলি বাঁধে'। ইঁহার দ্বিতীয় প্রহসন 'কিছু কিছু বুঝি' (১৮৭৬) 'বুঝলে-কিনা'-র উত্তর। ভোলানাথ আর অন্তত তিনখানি প্রহসন লিখিয়াছিলেন,— 'আকাট মূর্খ' (১৮৭৩), 'মোহন্তের চক্রভ্রমণ' (১৮৭৪) এবং 'ভ্যালারে মোর বাপ' (১৮৭৬)। ভোলানাথের প্রথম পৌরাণিক নাটক 'প্রভাস মিলন নাটক'-এর (১৮৭০) দ্বিতীয় সংস্করণের (১২৮১) শেষে কয়েকটি "কীর্ত্তনাঙ্গ ঢপ" গান আছে। নাটকে কীর্ত্তন-গান দেওয়া বোধ হয় এই প্রথম।[১] তাহার পর বাহির হইল 'মৈথিলী মিলন' (১৮৭১) ও 'নলদময়ন্তী নাটক' (১৮৭৪)। নলদময়ন্তীর সমাদর হইয়াছিল। এক বছরে (১৮৭৫) ভোলানাথের অন্ততপক্ষে

[১] অভিনয় করাইবার সময় বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় এই গানগুলি ব্যবহার করিয়াছিলেন।

আটটি নাট্যরচনা প্রকাশিত হইয়াছিল,—ব্রজলীলাঘটিত 'কৃষ্ণান্বেষণ', 'কলঙ্ক-ভঞ্জন' ও 'মানভিক্ষা', এবং পৌরাণিক 'ধ্রুবযোগাখ্যান', 'দুর্ব্বাসার পারণ', 'রামের রাজ্যপ্রাপ্তি' (দ্বি-স ১৮৭৬, চ-স ১৮৮২), 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' (দ্বি-স ১৮৭৭) ও 'বামনভিক্ষা'। 'সীতার বনবাস' ও 'নিকুঞ্জ কানন' বাহির হয় ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে।[১]

ভোলানাথের অনুবর্ত্তী কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবাহুল্যে বটতলার প্রধান নাট্যকার ছিলেন। ইঁহার 'বিদ্যাসুন্দর যাত্রা'-য় (১৮৭৮) গোপাল উড়ের গান আছে। কেদারনাথের প্রথম নাট্যরচনা পঞ্চাঙ্ক 'চিত্রাঙ্গিণী নাটক'-এ (১৮৭২) মাঝে মাঝে অমিত্রাক্ষর ও মিত্রাক্ষর পদ্য আছে। রচনা হরচন্দ্র ঘোষের লেখার মত কঠিন সাধুভাষা এবং ব্যর্থ। পরে সহজ করিয়া 'চিত্রাঙ্গিণী মিলন' (১৮৭৮) লিখিয়াছিলেন। চিত্রাঙ্গিণী নাটকের সমাদর না হওয়ায় 'বাঙ্গালী বাবু' (১২৮২) প্রহসনের ভূমিকায় পাঠকদের বলা হইয়াছে, "প্রথমবারে বিশুদ্ধস্বভাবা রাজকন্যার হাত ধরে এসেছিলুম বলে, আপনি এরিস্‌টাইডিসের প্রতি এথিনিয়ানদের ব্যবহার করেছিলেন।" অপর নাট্য-রচনা,—'সীতার বনবাস নাটক' (১২৮৩), ঐ গীতাভিনয় (১৮৭৭, দ্বি-স ১৮৭৯), 'দ্রৌপদীবিলাপ নাটক' (দ্বি-স ১৮৮০), 'রামবনবাস নাটক' (তৃ-স ১৮৭৮), ঐ যাত্রা (তৃ-স ঐ), 'সাবিত্রীসত্যবান নাটক' (তৃ-স ১৮৭৯), 'রামবিলাপ নাটক' (১৮৭৬), 'লঙ্কেশ্বর বিজয়' (ঐ), 'রাম-অভিষেক নাটক' (তৃ-স ১৮৮১), 'দুর্য্যোধনের দর্পচূর্ণ' (১৮৭৭), 'কাদম্বরী নাটক' (ঐ), 'গোলে বকায়লি' (১৮৭৮), 'গৌরীমিলন' (ঐ), 'জরাসন্ধ-বধ' (ঐ), 'সাবিত্রীসত্যবান' (ঐ) 'হরিশ্চন্দ্র নাটক' (ঐ), 'অভিমন্যুবধ যাত্রা' (ঐ) 'রম্ভাবতী নাটক' (ঐ), রাবণের দিগ্‌বিজয়' (ঐ), 'রামের রাজ্যাভিষেক' (ঐ), 'ভরতবিলাপ যাত্রা' (চ-স ১৮৮১), 'জানকী পরিণয় ও ভৃগুরামের দর্পচূর্ণ' (১৮৭৯), 'দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ যাত্রা' (ঐ), 'লক্ষ্মণবর্জ্জণ' (১৮৮০)।

বটতলার এক বড় প্রকাশক মহেশচন্দ্র দাস দের নামে বহু কবিতার বই,

১ ভোলানাথ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম দুই স্কন্ধ অনুবাদ করিয়াছিলেন (১৮৭২) এবং এই কবিতাপুস্তকগুলি লিখিয়াছিলেন,—'প্রভাসমিলন পদ্য', তিন খণ্ড 'প্রভাসযজ্ঞ' (প্রথম খণ্ড ১৮৬৯), 'চিত্তরঞ্জন পাঁচালী', 'আড়া-আড়ি তরজা' (১৮৭৪) ও 'সন্ন্যাসীর উপাখ্যান'। শেষের বইটি পার্নেলের হার্মিটের অনুবাদ (হরিমোহন গুপ্তের রচনার সংস্করণ ?)। 'জোচ্চোরের বাড়ীর ফলার' (১৮৭২) নিতান্ত ছোট গদ্য নক্‌শা।

পাঁচালী ও নাটক-প্রহসন-যাত্রা বাহির হইয়াছিল। ইনি সম্ভবত অপরের লেখা কিনিয়া লইয়া নিজের নামে ছাপাইতেন। ইঁহার লেখা বা লেখানো নাট্যরচনা কয়েকখানির নাম,—'কুলপ্রদীপ নাটক' (১৮৭১), 'দক্ষযজ্ঞ নাটক বা সতীলীলা' (প-স ১৮৮২), 'মহীরাবণ বধ' (১৮৭৬), 'প্রহ্লাদ চরিত্র নাটক, 'তরণীসেন বধ' (দ্বি-স ১৮৮০), 'বিজয়বসন্ত যাত্রা' (১৮৮১)।

ঊনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকের শেষের দিকে সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় যাত্রা-পালার বিষয় ছিল অভিমন্যুবধ কাহিনী, এবং তাহার পর দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ও রামবনবাস। এই সময়ে কলিকাতা নিবাসী যাত্রা-নাট্যকারদের মধ্যে রচনার বাহুল্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তিনকড়ি বিশ্বাস। ইঁহার প্রথম রচনা হইতেছে 'কামিনীকুমার' কাব্যের নাট্যরূপ (১৮৭৬)[১]। ইঁহার এই যাত্রা পালাগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে,—'অভিমন্যুবধ' (প-স ১৮৮০), 'শুম্ভনিশুম্ভবধ' (১৮৭৮), 'দক্ষযজ্ঞ' (ঐ), 'অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদ' (ঐ), 'সীতার বনবাস' (তৃ-স ১৮৮০), 'মেঘনাদবধ' (দ্বি-স ১৮৮০), 'রামবনবাস' (চ-স ১৮৮০), ঐ দ্বিতীয় বই (১৮৮০), 'সাবিত্রীসত্যবান' (ঐ), 'পাঞ্চালীর বস্ত্রহরণ' (ঐ), 'লক্ষণের শক্তিশেল' (ঐ), 'সীতার পাতাল প্রবেশ' (ঐ), 'বভ্রুবাহনের যুদ্ধ' (ঐ), 'জয়দ্রথবধ' (১৮৮০), 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' (তৃ-স ১৮৮১), 'ভরতবিলাপ নাটক' (১২৯১)।

গীতাভিনয়-যাত্রাকে যাঁহারা কলিকাতার বাহিরে দেশের জনসাধারণের চিত্তরঞ্জনের ও লোকশিক্ষার একটি প্রধান উপায় করিয়া তুলিলেন তাঁহারা প্রথমে ছিলেন পাঁচালী-রচয়িতা ও পাঁচালী-গায়ক। ইঁহারা প্রচুর পরিমাণে কথকতার বক্তৃতা ও পাঁচালীর পৌরাণিকপ্রসঙ্গ ঢুকাইয়া এবং পল্লীগীতির সরল সুর গানে যোগ করিয়া গীতাভিনয়কে ইহার একদা সুপরিচিত পরিবর্দ্ধিত রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন ব্রজমোহন রায় ও মতিলাল রায়।

[১] বিনোদবিহারী শীলও 'কামিনীকুমার নাটক' (দ্বি-স ১২৯৪) লিখিয়াছিলেন (১৮৮৪)। ভূমিকায় ইনি লিখিয়াছেন, "বহুদিবস অতীত হইল, বটতলাস্থ পুস্তকবিক্রেতাগণ যে কামিনীকুমার নামক অশ্লীলতাপূর্ণ কাব্যখানি মুদ্রিত করিয়া বিক্রয় করিতেছিলেন, যাহা অশ্লীলতানিবারণী সভার সভ্যগণ বিচারালয়ে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিয়া উক্ত পুস্তকের বিক্রয় নিবারণ করিয়াছিলেন।" "দৈবসূত্রে সেই পুস্তকখানি প্রাপ্ত হইয়া" লেখক নাটকখানি রচনা করিয়াছিলেন। অশ্লীল ও রুচিবিরুদ্ধ অংশ বাদ দিয়া লেখক বইটিকে নরনারী সকলের পাঠ্যযোগ্য করিয়াছেন।

ব্রজমোহন রায় (১২৩৮-১২৮২) প্রথমে পাঁচালীর দল চালাইতেন, পরে যাত্রার দল খোলেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার প্রথম যাত্রা-পালা দুইটি বাহির হইয়াছিল,—'অভিমন্যুবধ' ও 'রামাভিষেক'। ইঁহার অপর নিজস্ব রচনা হইতেছে 'সাবিত্রীসত্যবান', 'শতস্কন্ধ রাবণবধ', 'দানববিজয়', ও 'কংসবধ'। এই পালাগুলির গানরচনায় বিশেষত্ব আছে। কৌতুকরসের প্রবাহও অমলিন। পাঁচালীর ধরণের ছড়া-কাটাকাটি আছে। দানববিজয়ে ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষরের সামান্য ব্যবহার আছে।

যাত্রার দল করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন মতিলাল রায় (১৮৪৩-১৯১১)। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে ইনি "নবদ্বীপ বঙ্গগীতাভিনয় সম্প্রদায়" সংস্থাপন করেন। পালা নিজেই লিখিতেন। মতিলালের গীতাভিনয়-গুলি সার্থক নাট্যরচনা নয়, তবে ইঁহার সুকণ্ঠের গান ও "বক্তৃতা" পাঁচালী ও কথকতার মিশ্রণে সহজেই সেকালের লোকের মনোহরণ করিয়াছিল। মতিলালের যাত্রাপালায় ব্রজমোহন রায়ের রচনা-পারিপাট্য ও কৌশল নাই। কিন্তু মতিলালের গানে দাশরথি রায়ের সরল ভক্তিরসাত্মতা এবং বক্তৃতায় কথকতার দীর্ঘ আড়ম্বর ছিল। প্রথমটি সকলের উপভোগ্য, দ্বিতীয়টি বর্ষীয়ানদের চিন্তাগম্য। পৌরাণিক পাণ্ডিত্যের বহর এবং গুরুভার রচনা-রীতির জন্য মতিলালের গীতাভিনয়গুলি এখনকার দিনে একেবারে অচল। মনে হয় মতিলাল পণ্ডিতদের দ্বারা তাঁহার রচনা সংশোধন করিয়া লইতেন, তাই তাঁহার গদ্যরচনা অত নীরস ও প্রাণহীন। এই গুরুভারই গীতাভিনয়ের ভবিষ্যৎ নষ্ট করিয়াছিল। তাহার পর গীতাভিনয় আর তেমন করিয়া জমে নাই।

মতিলাল এই গীতাভিনয়গুলি লিখিয়াছিলেন,—'সীতাহরণ' (রচনা ১৮৭৩, প্রকাশ ১৮৭৮), 'ভরতাগমন' (রচনা ১২৮৪, প্রকাশ ১৮৮৮), 'বিজয়চণ্ডী' [১] (১৮৮১), 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' (ঐ), 'পাণ্ডব-নির্ব্বাসন' (১৩১১), 'নিমাই-সন্ন্যাস', 'ভীষ্মের শরশয্যা' (চ-স ১৩১৮), 'রামরাজা' (দ্বি-স ১৩১১), 'কর্ণবধ', 'লক্ষ্মণভোজন', 'ব্রজলীলা' (তৃ-স ১৩১৮), 'যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক' (১৩০৭), 'গয়াসুরের হরিপাদপদ্মলাভ', 'শ্রীক্ষেত্রমাহাত্ম্য', 'রামবিদায়', 'রাবণবধ', 'যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞ' (রচনা ১৩০১, প্রকাশ ১৩১৮), ইত্যাদি। 'মহালীলা',

[১] হরিনাথ মজুমদারের 'বিজয়বসন্ত' অবলম্বনে।

'সীতা-অন্বেষণ', 'রামপরিণয়' ও 'সুবচনীর মাহাত্ম্য' তাঁহার জীবৎকালে প্রকাশিত হইয়াছিল কিনা জানা নাই। 'তরণীসেনবধ', 'রামবনবাস' এবং 'কালীয়সর্পদমন' বোধ হয় শেষ পর্য্যন্ত ছাপা হয় নাই। মতিলালের মৃত্যুর পর তাঁহার দল চালাইয়াছিলেন জ্যেষ্ঠ পুত্র ধর্ম্মদাস। ইনিও কয়েকখানি গীতাভিনয় রচনা করিয়াছিলেন,—'কবচ-সংহার', 'শ্রীকৃষ্ণের গুরুদক্ষিণা,' ইত্যাদি।

মতিলালের অনুপ্রাসবহুল গানের একটি নিদর্শন 'ব্রজলীলা' হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

আজ সর্ব্ব গর্ব্ব তোর করিব মর্দ্দণ।
প্রাণ'ত অন্ত ভ্রান্ত তোর একান্ত কৃতান্ত দর্শন,
আজ এখনি করিব ও মুখ মৃত্তিকায় ঘর্ষণ।
অমরের সনে তোরা হলি যে সমরে জয়,
তাও'ত অমরের বলে বুঝ নাকি দুরাশয়,
আর না সয়, শত্রু নাশ হয়, ন সংশয়, ন সংশয়,
আজ বর্ম্ম-চর্ম্ম-ধরা দেহ করিবে ধরা স্পর্শন ॥ [১]

যাত্রার দলের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বিশেষ বিশেষ সুর বা গীতপদ্ধতি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে লেখা একটি বৃহৎ যাত্রা-পালায় সমসাময়িক বিভিন্ন যাত্রার দলের সুরের উল্লেখ পাই। বইটির নাম 'পাণ্ডববিলাপ নাটক', রচয়িতা গোহালবেড়ে নিবাসী অক্ষয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়। সমাচারচন্দ্রিকা প্রেসে ছাপা, সালের উল্লেখ নাই। মহারাণী স্বর্ণময়ীকে উপহৃত। পত্রসংখ্যা ১৪৬। আট অঙ্কে বিভক্ত। মনোমোহন বসুর আদর্শ অনুকৃত। অনেকগুলি গান আছে। গানগুলি কোন্ দলের কি গানের সুরে গাহিতে হইবে তাহার নির্দেশ আছে। যেমন,

১নং গীত। মাষ্টারদের শুর। "নির্ব্বাণ মন আগুণ আর কেন জ্বালাতে এলে"।
২নং গীত। জুড়িতে গাবে। মতিরায়ের শুর। "আমার বক্ষেরি ধন মকরাক্ষ অমূল্য রতন"।
৪নং গীত। বালকে গাবে। আশুবাবুর দলের শুর। "ওরে বলব কি দুরাচার রাবণ কুমার"।
৫নং গীত। জুড়িতে গাবে। সখের দলের শুর। "হায়রে দারুণ বিধি লিখেছে ললাটে"।
৮নং গীত। বালকে গাবে। কালী হালদারের শুর। "প্রাণান্ত হয় প্রাণকান্ত তোমার বনগমন শুনে"।
৯নং গীত। বালকে গাবে। ৺দাশুরায়ের শুর কিন্তু অন্তরায় ঢোয়া হবে। "এই কথাটি পাল, আজ রেখে গোপাল, গোপালের গোপাল লয়ে যা শ্রীদাম"।
১০নং গীত। জুড়িতে গাবে। পূর্ব্বকালের যাত্রাওয়ালাদের শুর। "চিরদিন সমান কখন না যায়"।
১১নং গীত। বালকে গাবে। বহুমাষ্টারদের হরিশ্চন্দ্র যাত্রার গীতের শুর।

১২নং গীত। জুড়িতে গাবে। মাষ্টারদের ধ্রুবচরিত্রের শুর। "এ কি অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হ'লো"।
২০নং গীত। বালকে গাবে। জোড়াসাঁকোর রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের শুর। বাবু ঈশানচন্দ্র ঘোষালের সকের দলের এই শুর ছিল। "ওহে বিপদভঞ্জন"।
২২নং গীত। জুড়িতে গাবে। ব্রজরায়ের দলের সরজিনী পালার শুর।
২৩নং গীত। বালকে গাবে। নবীন ডাক্তারের দলের সীতার পাতাল প্রবেশের শুর।
২৪নং গীত। জুড়িতে গাবে। ৺মহেশ চক্রবর্ত্তির দলের শুর।
২৬নং গীত। জুড়িতে গাবে। বৌমাষ্টারদের রাম বনবাস পালার শুর। "হায় কি বিসাদ হ'লরে গুণের রাম গেল বনে"।
২৮নং গীত। জুড়িতে গাবে। মতিরায়ের দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ পালার শুর। "কোথায় তোদের সখা হরি"।

বিভিন্ন যাত্রার দলের এই উল্লেখের জন্যই বইটির মূল্য।

কথকতার ধরণের দীর্ঘবক্তৃতা-সমন্বিত নাটক-গীতাভিনয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আরো কয়েকখানির কথা বলি। দ্বারকানাথ সরকারের 'সৈরিন্ধ্রি নাটক'-এর (১৮৭৫) প্রথম খণ্ড গদ্যে লেখা, দ্বিতীয় খণ্ড অমিত্রাক্ষর পদ্যে। প্রথম খণ্ডের শেষে নাটকের মধ্যে প্রবিষ্ট "গর্ভাঙ্ক"রূপে একটি প্রহসন সন্নিবিষ্ট আছে। পরিশেষে লেখক আশ্বাস দিয়াছেন, "এই নাটক অভিনয় বা পাঠ উভয় প্রকারে সাধারণের সন্তোষবর্দ্ধন করে এই উদ্দেশ্যে রচিত হইল। অভিনয়ের পক্ষে যে যে 'অধিক' বোধ হইবে তাহা আমি সংক্ষেপ করিয়া দিতে স্বীকার আছি।" ঈশ্বরচন্দ্র সরকারের 'রাম-বনবাস নাটক'-এ (১২৮৩) যাত্রা-কথকতা-নাটকের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা আছে। দীর্ঘ স্বগতোক্তির খাতে কাহিনী প্রবহমাণ। গানগুলি ছোট ছোট, কৃত্তিবাসের দুই-চারি-ছয় ছত্র পয়ার বা ত্রিপদী। ভূমিকাগুলির মধ্যে "কালকেতু পেখেরা" এবং তাহার পত্নী "ফুলনরা" আছে। ভাষা সাধু, ক্রিয়াপদ কথ্য। গ্রন্থশেষে লেখকের পুনশ্চ,—"এই রাম-বনবাস নাটক সংসারপ্রচলিত ভাষায় প্রণীত করা গেল, সর্ব্বসাধারণ জনগণ হিতার্থে অনায়াসে ইহার মূল রস আস্বাদন করিতে পারিবেন, অন্যান্য নাটক অতি কটু অর্থ প্রণীত আছে, সর্ব্বসাধারণ জনগণের পক্ষে বোধগম্য করা দুরূহ সুকঠিন, একারণ আমি এই নাটক সংসারপ্রচলিত ভাষায় লিখিলাম।" ইঁহার অপর যাত্রা-পালা হইতেছে ব্রজলীলাবিষয়ক, 'কুটীলার দর্পচূর্ণ' (১৮৭৬)। শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গিরিবালা নাটক'-এর বিষয় শিবপার্ব্বতীর কাহিনী। গদ্য সংলাপ সংক্ষিপ্ত, প্রাচীন ধরণের গান ও ছড়া প্রচুর। বইটি পাঁচালী হইতে যাত্রার অভিব্যক্তির একটি ভালো নিদর্শন।

ছোট নাটক-প্রহসন ও যাত্রা-পালার মধ্যে ব্যবধান প্রায়ই উল্লেখযোগ্য ছিল না। এখানে এইরকম কতকগুলি রচনার কালানুক্রমে উল্লেখ করিতেছি।

১৮৭৩ঃ হরিনাথ মজুমদারের 'অক্রুরসংবাদ'; বেণীমাধব ঘোষের 'ঋষি-চরিত' (ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনী), 'ভ্রান্তিরহস্য' (১৮৬৮) ও শেক্‌স্‌পিয়রের কমেডি অব্‌ এররস্‌ অবলম্বনে 'ভ্রমকৌতুক' (১৮৭৩)।

১৮৭৪ ঃ আশুতোষ চক্রবর্ত্তীর 'লক্ষ্মণবর্জন'।

১৮৭৫ ঃ শ্যামাচরণ দাসের 'কুরুক্ষেত্রোপাখ্যান', নগেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষের 'সীতান্বেষণ' ও 'আর্য্যবালক' (১৮৮১), অজ্ঞাতনামার 'সত্যবতী' (আদ্যন্ত অমিত্রাক্ষর)।

১৮৭৬ ঃ যদুগোপাল বসুর 'সুভদ্রাহরণ'; হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়ের 'ভরতমিলন', 'মহন্তপক্ষে ভূতো নন্দী' (১৮৭৪) ও 'বীরেন্দ্রবিনাশ' (১৮৭৫); প্রাণচন্দ্র দাসের 'অভিমন্যুবধ', 'ভরতসমাগম' (১৮৭৮), 'হিড়িম্বাবধ' (ঐ), 'কৃষ্ণকালী' (ঐ), 'জয়দ্রথবধ' (১৮৮০) ও 'নলদময়ন্তী' (ঐ); নন্দলাল রায়ের

'সীতাহরণ' (দ্বি-স), 'বিদেশিনীবিলাপ' (১৮৭৮, কৃষ্ণলীলা), 'মদনভস্ম' (ঐ), 'সীতার বনবাস' (১৮৮০) ও 'ধ্রুবচরিত্র নাটক' (দ্বি-স ১২৯৩)[১], বিনোদবিহারী শীলের 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', কুঞ্জবিহারী বসুর 'ধর্ম্মক্ষেত্র', 'রামনবমী' (১২৯৯), 'শত্রুসিংহ নাটক' (১২৮৩) ও 'শকুন্তলা' (১২৯৬)।

১৮৭৭ : আশুতোষ ঘোষের 'অঙ্গদ রায়বার', ব্রজনাথ দের 'বিদ্যাসুন্দরের গীতাভিনয়'; পার্ব্বতীচরণ ভট্টাচার্য্যের 'সীতার পুনঃ পরীক্ষা', 'রামবিবাহ' ও প্রহসন 'কুলীনকুমারী' (তৃ-স ১২৯৬); গোপালচন্দ্র মিত্রের 'পারিজাত হরণ', 'রাবণের অনন্তশয্যা' (১৮৭৮), 'সীতার অগ্নিপরীক্ষা' (ঐ) ও 'চন্দ্রকান্ত নাটক' (চ-স ১২৯৪)।

১৮৭৮ : জহরিলাল শীলের 'রাবণবধ' (১৮৭৮), অক্ষয়কুমার দের 'অভিমন্যুবধ যাত্রা' (দ্বি-স), 'মেঘনাদবধ নাটক' (দ্বি-স ১৮৮০) ও 'তরণীসেনবধ যাত্রা', রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মহাশ্বেতা তাপসীবেশ'; রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শারদকুসুম' (নাট্যগীতি), ঈশ্বরচন্দ্র বিশ্বাসের 'রামনির্ব্বাসন গীতাভিনয়', গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'অভিমন্যুবধ যাত্রা', দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্যচৌধুরীর 'বৈদেহী-নির্ব্বাসন', হরচন্দ্র দেবের 'যদুবংশধ্বংস', অঘোরচন্দ্র ঘোষের 'সীতাহরণ যাত্রা', 'বালীবধ' (১৮৭৯), 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' (১৮৮০), 'রামবনবাস' (ঐ), 'রাবণবধ' (ঐ) ও 'কীচকবধ নাটক' (দ্বি-স ১২৯১)।

১৮৭৯ : যোগীন্দ্রনাথ তর্কচূড়ামণির 'কাননকথা', রাসবিহারী শীলের 'উত্তরাবিলাপ', কাশীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মায়ামৃগ', নফরচন্দ্র দত্তের 'অভিমন্যুবধ যাত্রা' (দ্বি-স), 'হরিশ্চন্দ্র যাত্রা' (দ্বি-স ১৮৮০), 'বিজয়বসন্ত যাত্রা' (১৮৮১), 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' (ঐ) ও ভরতবিলাপ' (ঐ); কানাইলাল সেনের 'অভিমন্যুবধ যাত্রা'।

১৮৮০ : জীবনকৃষ্ণ সেনের[২] 'বৈদেহীহরণ', 'পারুলকুঞ্জ' (১৮৮২), 'কমলে কামিনী' (১৮৮৩) ইত্যাদি, কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় "বিদ্যাপতি"-র 'দ্রৌপদীবস্ত্রহরণ যাত্রা', 'হরিশ্চন্দ্র নাটক', 'জানকীপরীক্ষা', 'তরণীসেনবধ', 'পাদকরা বাবা' (প্রহসন) ও 'বিজয়বসন্ত যাত্রা' (১৮৮১)[৩], কুঞ্জবিহারী মিত্রের 'শ্যামসোহাগিনী'; কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিষাদ প্রতিমা', বিনোদবিহারী মল্লিকের 'যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক', গোপালচন্দ্র সিংহের 'অপূর্ব্বমিলন' ও 'লবকুশ-বিজয়', ইত্যাদি।

পরবর্ত্তী কালে পাই,—রসিকচন্দ্র রায়ের ছাত্র নগেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষের 'সীতান্বেষণ নাটক' (১৮৮২); হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মদনভস্ম নাটক' (১২৮৯), ধনঞ্জয় সরকারের 'রামবনবাস নাটক' (১২৯০), উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'সমুদ্রমন্থন গীতাভিনয়' (১২৯১), চাঁদগোপাল গোস্বামীর 'নিমাই-সন্নাস বা চৈতন্যলীলা গীতাভিনয়' (১২৯১), তারাপদ ভট্টাচার্য্যের 'হরিশ্চন্দ্র নাটক' (১২৯৩), গৌরসুন্দর চৌধুরীর 'সীতার বনবাস যাত্রা' (চ-স ১৩১৭)।

[১] ধ্রুবচরিত্রের শেষে লেখক আত্মপরিচয় দিয়াছেন এইভাবে,

দ্বিজ নন্দলাল রায় ভড়ায় নিবাস।
ধ্রুবের সমাধি কথা করিল প্রকাশ॥

[২] প্রথম রচনা 'ফালতো ঝক্ড়া' (১৮৭০) প্রহসন। জীবনকৃষ্ণের নিবাস ছিল নিতাড়া গ্রামে। ইনি ন্যাশনাল ও ষ্টার থিয়েটারে ভালো অভিনেতা ছিলেন। কমলে-কামিনী ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল। কমলে-কামিনী ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষরে লেখা এবং গানসর্ব্বস্ব। গানে সুর দিয়াছিলেন রামতারণ সান্ন্যাল। বইটি তাঁহাকেই উৎসর্গিত।

[৩] "ব্রহ্মাবধূত সদানন্দ কৃষ্ণধন বিদ্যাপতি প্রণীত" 'মহেন্দ্রমিলন গীতাভিনয়'-এর চোরবাগান নাট্য-সমাজ কর্ত্তৃক অভিনীত একবিংশ অভিনয়ের প্রোগ্রাম অর্থাৎ সঙ্গীতমালা ১৩০৫ সালে ছাপা। কৃষ্ণধন নাট্যসমাজের ডিরেক্টর ছিলেন। মহেন্দ্রমিলনের বিষয় পাণ্ডবদের রাজ্যলাভ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নবীন কবিতার অভ্যুদয়

১

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কবিতার বড়ই দুরবস্থা গিয়াছে। পুরানো রামায়ণ-মহাভারত-গৌরীমঙ্গল ইত্যাদির কথা ছাড়িয়াই দিলাম, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের সর্ব্বগ্রাসী প্রভাব প্রায় সব কবিতারচনাকেই মালিনী-মাসীর অনুমোদিত আদিরসের খাতে প্রবাহিত করিয়াছিল। ইংরেজি অনুবাদের মধ্য দিয়া যে ফারসী-আরবী-উর্দু প্রণয়কাহিনী দুইচারিটি রচিত হইল তাহাও প্রায় সেই ধরণের। কবি-গান ও হাফ-আখ্ড়াইয়ে কেবলি গীতবাদ্যের কোলাহল ও তানের মর্ম্মান্তিক নিপীড়ন। প্রাণ বলিতে যাহা কিছু ছিল নিধুবাবু শ্রীধর কথক প্রভৃতির টপ্পা গানে। টপ্পা গান সাধারণত চারিছত্রের হইত।

প্রথম ইংরেজি-শিক্ষিত যে বাঙ্গালী ইংরেজিতে কবিতা লিখিবার সাহস দেখাইয়াছিলেন[১] সেই কাশীপ্রসাদ ঘোষ (১৮০৯-৭৩) বাঙ্গালায় অনেকগুলি টপ্পা গান লিখিয়াছিলেন। ইঁহার একটি বড় আকারের গান নমুনা রূপে উদ্ধৃত করিতেছি।

যামিনী কামিনী হয়, উভয়ে মিলন।
একদা বিরাজি, করে সুখ বিতরণ॥
গগনেতে শশধর, নাচে কামিনী অধর,
অমিয় বরিষে তার মধুর বচন॥
দেখ দুই সুখতারা, তাহার নয়নতারা,
নিবিড় চিকুর তার, সম নবঘন।
যেমন বিশ্বের শোভা, খঞ্জনের মনোলোভা,
তার ওষ্ঠ হেরে ভোলে, তেমতি নয়ন॥
শশীর অমিয় তরে, যেমন চকোর করে,
প্রেমসুধা পানাশয়ে পুরুষ তেমন॥[২]

কাশীপ্রসাদ হিন্দু কলেজের প্রথম ছাত্রদের মধ্যে একজন।

কাশীপ্রসাদের সময়ে যাঁহারা কবিতা বা গান লিখিতেন তাঁহাদের মধ্যে তাঁহার মতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন কলিকাতার রাধামোহন সেন। ইনি পদ্যে একখানি

[১] ইঁহার ইংরেজি কবিতার বই *Minstrel* (১৮৩০)।

[২] প্রীতিগীতি (অবিনাশচন্দ্র ঘোষ সংগৃহীত ১৩০৫) ২১০৯।

সঙ্গীতের বই লিখিয়াছিলেন—'সঙ্গীত তরঙ্গ' (১২২৫), চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্যের 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী'-র পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন (১৮২৬) এবং বহু টপ্পা গান রচনা করিয়াছিলেন। ইনি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের একখানি যাহাকে বলে "ক্রিটিকাল এডিশন" বাহির করিয়াছিলেন (১২৪০)। রাধামোহনের মন্তব্য অবশ্য সবই পদ্যে। পুরানো কাব্য সম্পাদন করা বাঙ্গালায় এইই প্রথম।

রাধামোহনের টপ্পা গানের একটি নমুনা,

> প্রাণনাথে নিশিনাথে সই সমান যে গণিলে।
> কার কিবা গুণাগুণ কিসে কি বুঝিলে ॥
> সুধাংশুদর্শন ছলে, বিচ্ছেদসাগর উথলে,
> স্রোত বহে নয়নযুগলে।
> সে সিন্ধু শুকায় নাথে বারেক হেরিলে ॥[১]

২

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাঙ্গালা সাহিত্যে খোলা হাওয়ার বাতায়ন খুলিয়া দিল সাময়িকপত্র। সাময়িকপত্রকে আশ্রয় করিয়া বাঙ্গালা গদ্য-ভাষা আপনার পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইতে শিখিল। বাঙ্গালা পদ্যও নূতন পথের ইশারা পাইল। যাঁহার রচনায় এই ইশারা জাগিল তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-৫৯)। এ ইশারা কালের ইঙ্গিত। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এ ইশারা অনুসরণ করিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, তাই তিনি নূতন কবিতার পথ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। কিন্তু পুরানো কবিতার পুনরাবৃত্তিতে যে নূতন কবিতার রস জাগিতে ও রঙ ধরিতে পারে না তাহা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কবিতারচনা ঈশ্বরগুপ্তের সখের ব্যাপার ছিল না, ইহাতে তাঁহার অন্তরের টান ছিল। তিনি কবিতা ভালোবাসিতেন, কবিতারচনা তাঁহার অতি সহজেই আসিত, এবং যদিও সংবাদপত্রসেবা তাঁহার পেশা ছিল তথাপি গদ্য রচনায় তাঁহার লেখনীর গতি অবাধ অকুণ্ঠিত ও মনোরম ছিল না। এক কথায় কবি ঈশ্বরগুপ্ত গদ্য লিখিতে পারিতেন না। তাঁহার কবিতাপ্রীতির আর একটা বড় প্রমাণ আছে। তিনি কবি তৈয়ারি করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্কুল-কলেজের ছাত্রদের নবীন পদ্য-রচনা ছাপিবার জন্য তাঁহার পত্রিকা 'সংবাদপ্রভাকর' সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিত। আধুনিক কালে ভারতবর্ষে কবিতা-স্কুলের বা কবি-গোষ্ঠীর প্রথম প্রবর্ত্তক বলিয়া ঈশ্বরগুপ্তের নাম স্মরণ করিতে

[১] প্রীতিগীতি ২১০৮।

হইবে। ঈশ্বরগুপ্ত কবি-গোষ্ঠী তৈয়ারি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ অধিকারী, দীনবন্ধু মিত্র ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—তাঁহার এই চারি মুখ্য শিষ্যের মধ্যে একমাত্র রঙ্গলালই কবিতার সরণি শেষ অবধি আঁকড়াইয়া ছিলেন। দ্বারকানাথ অল্পবয়সে মারা যান। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের পথ ধরেন, দীনবন্ধু নাটক-প্রহসনের।

ঈশ্বরগুপ্ত সংবাদপ্রভাকরের সম্পাদক, প্রধান লেখক এবং প্রায়ই একমাত্র লেখক ছিলেন। সংবাদপ্রভাকরকে আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরগুপ্ত যখন দেখা দিলেন (১৮৩১), তাহার অল্প কিছুকাল পরেই বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি গুরুতর ঘটনা ঘটিল, আদালত-কালেক্‌টরির কাজে সাধারণ বিষয়ব্যবহারে ফারসীর চলন রহিত হইয়া বাঙ্গালার ব্যবহার চলিত হইল। উচ্চ আদালতে ও রাজকার্য্যে ফারসীর পরিবর্ত্তে ইংরেজি কায়েম হইল। এই কারণে বাঙ্গালা শিখিবার বাঙ্গালা লিখিবার যেন হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়। ইহার জন্য ঈশ্বরগুপ্ত প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি সংস্কৃত জানিতেন, ফারসীও কাজচলা-গোছ জানা ছিল, বাঙ্গালায় খুবই ভালো দখল। ইংরেজি জানিতেন সামান্যই। যেটুকু জানিতেন তাহা তাঁহার মানসিক সংস্কারমুক্তির পক্ষে কার্য্যকর হইয়াছিল কিন্তু অভিনব সাহিত্যবোধের উন্মেষ করিতে পারে নাই। এ কথা সত্য যে ঈশ্বরগুপ্ত তাঁহার অনেক শিক্ষিত সমসাময়িকের মত ভারতচন্দ্রের অনুসরণে কবিতায় আদিরসের ভিয়ান চড়ান নাই। একথাও সমানভাবে সত্য যে তিনি কবি ও কবিতার বিচারে মুড়ি-মিছরির পার্থক্য সর্ব্বদা করিতে পারেন নাই। পাণিনির মতই তিনি যেন একসূত্রে "শ্বানং যুবানং মঘবানমাহ"।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সাহিত্যসাধনায় আধুনিকতার প্রকাশ দেখি তাঁহার ইতিহাসচেতনায়। এ চেতনা অনেকটাই অবোধ এবং অস্ফুট, তবুও এ বস্তু তাঁহার আগে আর কোন লেখকের রচনায় বা চেষ্টায় দেখা যায় নাই। এই ইতিহাসচেতনাই তাঁহাকে রামপ্রসাদ-ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবির এবং লালু-নন্দলাল প্রভৃতি কবিওয়ালার জীবনী ও রচনার সংগ্রহে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে গবেষণার প্রচেষ্টা এই প্রথম। মাসপয়লার সংবাদপ্রভাকরে তিনি পুরানো কবি ও কবিওয়ালাদের যে পরিচয় ও রচনা উদ্ধার করিয়া ছাপাইয়াছিলেন তাহা তাঁহার বোধ করি সব চেয়ে সার্থক কাজ। রামপ্রসাদের 'কালীকীর্তন' তিনিই আবিষ্কার ও প্রকাশ করেন (১৮৩৩)। ভারতচন্দ্রের বহু

লুপ্ত রচনাকে তিনিই উদ্ধার করিয়াছেন, এবং ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অনেক অংশে তাঁহারই সংগ্রহের ফল।

ঈশ্বরগুপ্তের এই ইতিহাসচেতনার মূলে ছিল তাঁহার অবিসংবাদিত দেশপ্রেম। সেই সঙ্গে ছিল মজ্জাগত কবিতাপ্রীতি। যে আন্তর প্রেরণার বশে তিনি প্রাচীন কবিদের পুনরুজ্জীবন করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন তাহারই বলে তিনি নবীন কবিদের স্থষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন। এই হিসাবেই তাঁহার যুগসন্ধির কবি নামের সার্থকতা। ঈশ্বরগুপ্ত পুরানো কবিতাকে বিদায় দিয়া নূতন কবিতাকে স্বাগত করিয়াছিলেন এমন কথা বলি না, তাঁহার রচনায় সন্ধিযুগের বাণী উচ্চারিত এমন দাবিও করি না। কিন্তু নূতন-পুরাতন দুই যুগকে তিনি একসঙ্গে ধরিতে চাহিয়াছিলেন,—এইখানেই তাঁহার অনন্যতা।

ঈশ্বরগুপ্তের রচনা সংবাদপ্রভাকরে প্রকাশিত হইত। তাঁহার জীবৎকালে অথবা মৃত্যুর পরে যেসব রচনা পুস্তিকা কিংবা গ্রন্থ আকারে বাহির হইয়াছে তাহা সবই পুনর্মুদ্রণ।[১] 'প্রবোধপ্রভাকর' গদ্যেপদ্যে লেখা। বিষয় নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা। 'হিতহার'এর দ্বিতীয় অংশ হিতোপদেশের অনুবাদ। 'বোধেন্দুবিকাস' প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদ। ঈশ্বরগুপ্ত কবিগানও অনেক লিখিয়াছিলেন। সেগুলি পুরাপুরি ফরমায়েসি রচনা। সেগুলির সম্বন্ধে কবির কোন মমতা ছিল বলিয়া মনে হয় না। সেগুলি সব সংগৃহীতও হয় নাই।

ঈশ্বরগুপ্তের মনের ঝোঁক ছিল লোকসঙ্গীতের উপর, বিশেষ করিয়া গ্রাম্য ছড়া ও লোকগীতছন্দের উপর। যেসব কবিতায় ঈশ্বরগুপ্তের নিজস্বতার পরিচয় সব চেয়ে বেশি সেখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে লোকগীতের রীতি ও রূপ—হাপু গানের, কর্ত্তাভজা গানের, ছেলেভুলানো ছড়ার। কিছু উদাহরণ দিই তাঁহার প্রায় সর্ব্বশেষের রচনা বোধেন্দুবিকাস হইতে।

দ্বিজ নরেশচন্দ্র বা নরচন্দ্রের একটি বাউলধরণের গান বিশ তিরিশ বছর

[১] 'কালীকীর্তন' (১২৪০), 'ভারতচন্দ্র রায়ের জীবনবৃত্তান্ত' (১২৬২), 'প্রবোধপ্রভাকর' (চৈত্র ১২৬৪), 'হিতপ্রভাকর' (চৈত্র ১২৬৭), 'বোধেন্দুবিকাস' (১২৭০)। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কবির অনুজ রামচন্দ্র গুপ্ত ঈশ্বরগুপ্তের কবিতাবলীর সঙ্কলন খণ্ডও প্রকাশ করিতে থাকেন। ১২৯২-৯৩ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একটি সংগ্রহ প্রকাশ করেন। ১৩০৬ সালে বসুমতী কার্য্যালয় হইতে এবং ১৩০৭ সালে মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের সম্পাদনায় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সব গ্রন্থাবলীতে সংগৃহীত হয় নাই এমন কবিতার সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়।

আগেও ভিখারী বৈষ্ণবদের মুখে খুব শোনা যাইত। গানটির আরম্ভ,—"মম সুখোদয় হবে গো উদয় যে দিনে জননী জানি সমুদয়"। এই গানটিকে মনে রাখিয়া ঈশ্বরগুপ্ত লিখিয়াছিলেন,

দিন্ দুপুরে চাঁদ উঠেছে রাত পোয়ানো ভার
হোলো পুন্নিমেতে আমাবস্যা, তেরো-পহর্ অন্ধকার।
এসে বেন্দাবনে বলে গেল, বামী বোষ্টমী
একাদশীর দিনে হবে, জন্ম-অষ্টমী
আর্ ভাদ্দর্ মাসের্ সাতই পোষে, চড়ক্ পূজার দিন এবার্।
সেই ময়্রা মাগী মোরে গেল, মেরে বুকে শূল
বামুন্গুলো ওসুদ নিয়ে মাথায় বোচ্চে চুল,
কাল্ বিষ্টিজলে ছিষ্টি ভেসে, পুড়ে হোলো ছারেখার।
ঐ সুজ্জি মামা পুব্ব্ দিগে, অস্তে চলে যায়,
উত্ত্র-দখিন্ কোণ্ থেকে আজ, বাতাস লাগ চে গায়
সেই রাজার বাড়ির্ টাটু ঘোড়া, শিং উঠেছে দুটো তার।
ঐ কলু রামী, ধোপা শামী, হাস্তেছে কেমন্
এক বাপের্ পেটেতে এরা, জন্মেছে কজন্
কাল্ কামরূপেতে কাক্ মরেছে, কাশীধামে হাহাকার॥

"আয় রৌদ্র হেনে ছাগল দেব মেনে, ছন্দ" অবলম্বনে দম্ভের বক্তৃতা,

এই হাত ছাড়্য়ে, গোপ বুক্ চাড়্য়ে।
মৃত্যু বাড় বাড়্য়ে, ধেয়ে কোক্ ভাড়্য়ে।...

"ধিন্তাধিনা পাকা নোনা ছন্দ",

নোড়্বো না তো, লোড়্বো সুখে পোড়্বো রুকে, চোড়্বো বুকে।
শত্রু যদি, আসে ঝুঁকে থাবড়া কোসে, মার্ব বুকে।
জোম্কে আমি, বোলবো যবে চোম্কে যাবে, দেবতা সবে।
ধোম্কে দেব, উচ্চ রবে সূর্য্য শশী, থোম্কে রবে।
তুচ্ছ লোকে, উচ্চ বলে পুচ্ছ ধরে, কুচ্ছ ছলে।
রঙ্গ দেখে, অঙ্গ জ্বলে দণ্ড দেব, ভণ্ড দলে।...

বোধেন্দুবিকাসের প্রস্তাবনায় নটীর এই গানটি হাপু-গানের ছন্দে লেখা,

ও কথা, আর্ বোলো না, আর্ বোলো না, বলছ বঁধু, কিসের ঝোঁকে ?
এ বড়, হাসির্ কথা, হাসির্ কথা, হাস্বে লোকে, হাস্বে লোকে।
বল হে, জ্বোল্বো কত, বোল্বো কত, বোল্তে হোলো, মনের্ দুখে, মনের্ দুখে।
এ বড় অনাসৃষ্টি, বিষম সৃষ্টি, সুধাবৃষ্টি, সাপের মুখে, সাপের মুখে।

গানটির প্রথম দুই কলি রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। নাটক হিসাবে ব্যর্থ এই রচনাটিকে কাটছাঁট করিয়া একদা গুণেন্দ্রনাথ

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তাঁহাদের বন্ধু অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী অভিনয় করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

বিষয়বস্তু অনুসারে ঈশ্বরগুপ্তের কবিতাবলী তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়,—(ক) পারমার্থিক-নৈতিক, (খ) সামাজিক, এবং (গ) প্রেমরসাত্মক। প্রথম শ্রেণীর কবিতাই সংখ্যায় বেশি। কবি ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন, নাস্তিকতার উপর তাঁহার বড়ই আক্রোশ। 'নিগুর্ণ ঈশ্বর' কবিতার শেষ চারি ছত্রে গুপ্তের ঈশ্বর-নির্ভরতাব সরল প্রকাশ,

আছি গুপ্ত পরিশেষে গুপ্ত হব ভবে।
বল দেখি সে সময়ে গুপ্ত কোথা রবে ?
গুপ্ত হয়ে যখন মুদিব আমি আঁখি
তখন এ গুপ্ত-সুতে কিসে দিবে ফাঁকি॥

'সব ভরপুর' আর 'সব হায় ফাঁক' কবিতা দুইটিতে কবি জীবনে প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ যাচাই করিয়াছেন কতকটা যেন রামমোহন রায়ের জীবন-আদর্শে—সংসার-সুখ মিথ্যা নয়, ইন্দ্রিয়ের ভোগ মায়া নয়। প্রথম কবিতায় শুষ্ক বৈরাগ্য-প্রবণকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন,

আশাই অতুল্য ভোগ কর্ম্ম হয় যশোযোগ
এতো নহে পাপরোগ আরাধ্য সাধুর,
সুখের এ কর্ম্মভূমি পুত্র মিত্র নহে উমি
এ সব তাজিয়া তুমি হইবে ফতুব।

দ্বিতীয় কবিতায় ভোগাসক্ত, আত্মতৃপ্ত ধর্ম্মধ্বজী ধনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,

মিথ্যাসুখে সদা রত শত শত অনুগত
গৌরব করিয়া কত গোঁফে দেও পাক,
পোষাকের দাম মোটা জুতা পায়ে এড়িওটা
কপাল জুড়িয়া ফোঁটা শোভা করে নাক।
নারীর কোমল গাত্র মদনের সুরাপাত্র
তাহার উপর মাত্র নয়নের তাক,
বসনে বিচিত্র সাজ কাবায় রঙ্গিল কাজ
শিরে দিয়ে বাঁকা তাজ ঢেকে রাগ টাক।
স্নেহ করে পরিজন সদাই সন্তুষ্ট মন
সুদে সুদে বাড়ে ধন কত লাক লাক,
রাখিয়াছে বাপ দাদা ধপ্ ধপ্ বর্ণ সাদা
সারি সারি তোড়া বাঁধা শোভা থাকে থাক।

কবির মন্তব্য পাই 'কিছু কিছু নয়'-এ,

কারে বল সুচতুর তুমি বটে বাহাদুর
যত দেখ ভরপুর ভরপুর নয়,
সুখলাভ করিবার বস্তু নয় পরিবার
দুখে কাল হরিবার হেতু সমুদয়।
হিসাবের পথ সোজা ঠিকে কেন দেহ গোঁজা
সহজেই যায় বোঝা ভার বোঝা নয়
ভব-ভ্রম পরিহরি মুখে বল হরি হরি
কৃতান্তকুঞ্জরহরি হরি দয়াময়॥

'তত্ত্ব' নামক দীর্ঘ কবিতাটিতে সংসারে-সমাজে কপটতা, ধর্ম্মে দলাদলি, মানুষের জ্ঞানহীনতা ও সমভাবের অভাব বর্ণনা করিয়া কবি ক্লান্তি অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার মন চাহিয়াছে বনে গিয়া পশুপক্ষীর সঙ্গ। কেননা তাহারা

কুল মান জাতি ধর্ম্ম নাহি জান কোন কর্ম্ম
নাহি থাক দলাদলি ঘোঁটে
পরকাল নাহি মান রাজপীড়া নাহি জান
তাই খাও যখন যা জোটে।
নাহি জান জুয়াখেলা নাহি জান গুরুচেলা
নাহি জান মন্ত্র পূজা স্তব
নাহি জান তোষামোদ উমেদারী অনুরোধ
কেবল শিখেছ নিজ রব।...
নাহি দেও রাজকর রাজারে না কর ডর
ঠেকনিকো রাজনীতি-দায়
দেওনি হাটের কড়ি খাওনি গুরুর ছড়ি
নাহি জান ব্যয় আর আয়।

প্রচারকদের ধর্ম্মপ্রচার ও ক্ষমতালোভীদের ধর্ম্মযুদ্ধের দোহাই উপলক্ষ্য করিয়া কবি খাঁটি কথাটি বলিয়াছেন,

ধর্ম্মযুদ্ধে যুদ্ধ করি পরস্পর অস্ত্র ধরি
কাটাকাটি এতে ওতে তাতে
প্রকৃতিরে হাসাতেছে পৃথিবীরে ভাসাতেছে
স্বজাতির শোণিতের স্রোতে।
ধর্ম্মের আচার্য্য যারা এই তো ধার্ম্মিক তারা
বুঝিলাম ধর্ম্ম-আচরণে
দেখে শুনে সাধু যত বিরলে হাসিছে কত
তুমিও হাসিছ মনে মনে।

সকল ধর্ম্ম ছাড়ে যেই তোমারেই পায় সেই
অনুকূল হও তুমি তায়
অহঙ্কার অভিমান যতক্ষণ বলবান
ততক্ষণ তোমারে কি পায় ?

দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ সামাজিক কবিতাগুলির উপর ঈশ্বরগুপ্তের কবিযশ আজ পর্য্যন্ত নির্ভর করিয়া আসিয়াছে। এই কবিতাগুলিতে লেখকের সাময়িক-পত্রসেবিতার পরিচয় প্রকট এবং সেই কারণে এই সব কবিতার কোন কোনটি[১] ফরমায়েসি ধরণের রচনা বলিয়া অবিশ্রদ্ধ ও বিরস মনে হয়। অনেকগুলিতে জীবনস্বাচ্ছন্দ্যের উপর, সুখাদ্য ও সুপেয়ের প্রতি, ঈশ্বরগুপ্তের ঝোঁক অভিব্যক্ত। পাঁটা তপ্‌সে মাছ আনারস পিঠা-পুলি হইতে আরম্ভ করিয়া বিলাতি খানা পর্য্যন্ত বাদ যায় নাই। বিলাতি খানার আকর্ষণে তিনি পাদ্‌রি ডাফের কাছে দীক্ষিত হইতেও গররাজি নহেন,

যা থাকে কপালে ভাই টেবিলেতে খাব
ডুবিয়া ডবের টবে চ্যাপেলেতে যাব।
কাঁটা ছুরি কাজ নাই কেটে যাবে বাবা
দুই হাতে পেট ভরে খাব থাবা থাবা।
পাতরে খাব না ভাত গোটু হেল কালো
হোটেলে টোটেল নাশ সে বরং ভালো।
পুরিবে সকল আশ ভেব না রে লোভ
এখনি সাহেব সেজে রাখিব না ক্ষোভ ॥

'বড়দিন', 'স্নানযাত্রা' প্রভৃতি কবিতায় কলিকাতার বিচিত্র সমাজচিত্র সরসভাবে অঙ্কিত। এই কবিতাগুলিই হুতোম-প্যাঁচার-নক্‌শার প্রেরণা যোগাইয়াছিল। বড়দিনে ইংরেজ-টোলা, ফিরিঙ্গি-টোলা ও বাবু-টোলার বর্ণনা,

ইচ্ছা করে ধন্না পাড়ি রান্নাঘরে ঢুকে
কুক্ হয়ে মুখখানি লুক্ করি সুখে।...
ভেড় হয়ে তুড়ি মারে টপ্‌পা গীত গেয়ে
গোচে গাচে বাবু হয় পচা শাল চেয়ে।
কোনরূপে পিত্তি রক্ষা এঁটো কাঁটা খেয়ে
শুদ্ধ হন ধেনো গাঙে বেনো জলে নেয়ে।
এ বি পড়া ডবি ছেলে প্রতি ঘরে ঘরে
সাজায়েছে গাঁদা-গাদা ডেক্‌সের উপরে।

[১] বিধবাবিবাহ বিষয়ক কবিতাগুলি এই ধরণের।

স্নানযাত্রার বাস্তববর্ণনা,

লোচন গিয়াছে ঘর লক্ষ্মীর হয়েছে জ্বর
নৈকা চড়ি আমরা সবাই
লিতাই লারাণ ওই লৈতুন ইয়ার কই
ললসিস লবীন লবাই।...
এসে বাড়ী যত রাঁড়ী কাঁকে করি কেলে হাঁড়ি
হাতে পাখা কাঁটাল মাথায়
কথা কয় ইলি বিলি মুখেতে পানের খিলি
গাল বেয়ে পিক পড়ে গায়।

৩

ইংরেজি বিদ্যার অভাবে অধিকতর শক্তিশালী হইয়াও গুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যাহা করিতে পারেন নাই তাহা ইংরেজি বিদ্যার বলে শিষ্য রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৩৪-৯৪) সম্পন্ন করিলেন। ইংরেজি কাহিনী-কাব্যের রোমানস্‌-রসের যোগান দিয়া রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৩৪-৯৪) বাঙ্গালা সাহিত্যের মুখ ফিরাইলেন নবযুগের দিকে। অবাস্তব কাল্পনিক পরিবেশে স্থূল প্রণয়লীলার স্থানে তিনি ঐতিহাসিক পটভূমিকায় দেশপ্রেমকে গ্রহণ করিলেন কাব্যের বিষয় রূপে। ইংরেজি-শিক্ষিতের অবচেতনায় পরাধীনতার বেদনা যে অস্বস্তি জাগাইয়াছিল তাহাতে কথঞ্চিৎ প্রলেপ যোগাইল টডের রাজস্থান-কাহিনী। রাজপুত-বীরত্বের গল্পে বাঙ্গালীর দেশগৌরববোধ খাড়া হইবার অবলম্বন পাইল। ইংরেজি-শিক্ষিত প্রথম বাঙ্গালা কবি রঙ্গলালও তাই টডের ভাণ্ডার হইতে কাব্যের বিষয় নির্ব্বাচন করিলেন। শেক্‌স্‌পিয়র-স্কট-বায়রনের কবিতার ছায়া রঙ্গলালের রচনায় কিছু কিছু আছে, তবে টমাস মূরের ছায়া গাঢ়তর। রঙ্গলালের নব-রোমান্টিক কবিত্ব প্রত্যূষান্ধকারে অকালজাগ্রত একবিহঙ্গের অস্ফুট কাকলির ন্যায় অপূর্ণকণ্ঠ এবং দ্বিধাগ্রস্ত। রঙ্গলালের বাণী যাঁহাদের অন্তরের মৌন স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল সেই নবপ্রবুদ্ধ ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙ্গালীর ভবিষ্যতের আশা তখনো তেমনি অস্ফুট তেমনি সংশয়বিজড়িত ছিল। পদ্মিনী-উপাখ্যানে শিক্ষিত বাঙ্গালী আপনার চিত্তের নিগূঢ় অনুভূতিকে কতকটা বাঙ্ময় দেখিয়া আশ্বস্ত হইল। রঙ্গলালের রচনার কাব্যিক মূল্য বেশি নয়। কিন্তু তাহার দ্বারা "নিশীথিনীর মৌন যবনিকা" অপসারণের প্রথম সঙ্কেত ধ্বনিত হইয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে তাহার বিশিষ্ট মূল্য আছে। কাব্যরঙ্গভূমিতে মধুসূদনের প্রবেশের পূর্ব্বে রঙ্গলাল নান্দী গাহিয়াছিলেন।

রঙ্গলালের কাব্য রসে-ভাবে নবীন হইলেও প্রবীণসভার অভ্যর্থনা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। কেননা তাহার ভাষা ও রূপ ছিল পুরাতন। রঙ্গলাল ইংরেজি জানিতেন, বাঙ্গালা আরো ভালো জানিতেন এবং সংস্কৃতে অজ্ঞ ছিলেন না। ইস্কুলে বেশি দূর পড়িবার সুযোগ পান নাই, তাঁহার পড়াশোনা বেশির ভাগ ঘরে বসিয়া। হিন্দু কলেজে দীর্ঘকাল ধরিয়া ইংরেজি-মাত্র শিখিলে তিনি তাঁহার খ্যাতনামা সমসাময়িকদের মত ইংরেজিনবীশ হইতেন। সে সৌভাগ্য হয় নাই বলিয়া রঙ্গলাল বাঙ্গালায়-সংস্কৃতে প্রবীণ হইয়া ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আওতায় বাঙ্গালা কবিতার চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইংরেজি কাব্যসাহিত্যের রস হইতে তিনি বঞ্চিত হন নাই, এবং ইহাই তাঁহার কাব্যকলাকে শেষ অবধি বাঁচাইয়া গিয়াছে ঈশ্বরগুপ্তের নকলনবীশি হইতে। তবে তাঁহার প্রথমজীবনের কাব্যপ্রচেষ্টায় প্রাচীন পন্থারই অনুসরণ দেখি গান-কবিগান-পাঁচালীতে।[১]

ঈশ্বরগুপ্তের বিশেষ স্নেহভাজন শিষ্য ও সহকারী রঙ্গলাল সংবাদ-প্রভাকরের নিয়মিত লেখক ছিলেন। রঙ্গলাল নিজেও একাধিক সাময়িক-পত্রের সম্পাদক অথবা সহকারী সম্পাদকের কাজ করিয়াছিলেন। স্ব-সম্পাদিত 'সংবাদ-রসসাগর'-এ (১৮৫০-৫৩) রঙ্গলালের গদ্যপদ্য রচনা বাহির হইত। ঈশ্বরগুপ্তের প্রভাব রঙ্গলালের রচনাপদ্ধতিতে যে কতটা গাঢ় ছিল তাহা বীটন সোসাইটিতে পঠিত 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' (১২৫৯) হইতে জানিতে পারি। ইহাতে রঙ্গলালের ভাষানির্ব্বিশেষে সাহিত্য-রসবোধের এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি প্রবল অনুরাগের পরিচয় আছে।[২] বীটন সোসাইটির পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনে হরচন্দ্র দত্ত ইংরেজি কবিতার সঙ্গে তুলনা করিয়া বাঙ্গালা কবিতার নিন্দা করেন। ইহারই প্রতিবাদে রঙ্গলালের প্রবন্ধ। পূর্ব্বপক্ষের প্রতি রঙ্গলালের অম্লমধুর কটাক্ষ উপভোগ্য,

> বিপক্ষ মহাশয় কহিয়াছিলেন, কেশের সহিত সর্পের তুলনা অতি ভয়ানক, তবেই বলিতে হইল, তিনি বেণী শব্দের অর্থাবগত নহেন, হিন্দু কামিনীগণ কালসর্পাকারে বিনোদ বেণী বিনাইয়া থাকেন, প্রিয় সখা কি তাহা দেখেন নাই, অহো দেখিয়াছেন বই কি? তবে বুঝি ইংরাজী বিদ্যাপ্রভাবে তেঁহ খাট খাট রাঙ্গা চুলের প্রিয় হইয়া থাকিবেন।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ' বাহির হইলে

[১] কাঞ্চীকাবেরীর পঞ্চম সর্গে একটি পাদটীকায় রঙ্গলাল তাঁহার প্রথমজীবনের লুপ্ত রচনা উষা-অনিরুদ্ধ পাঁচালী হইতে একটি গান উদ্ধৃত করিয়াছেন। 'কাশীযাত্রা' লেখা হইয়াছিল বিশ বৎসর বয়সে।

[২] দশ বছর পরে রঙ্গলালের আর একটি প্রবন্ধপুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছিল, 'শরীরসাধনী বিদ্যার গুণোৎকীর্তন' (১৮৬৯)।

রঙ্গলাল সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। ইহাতে 'ভেক মূষিকের যুদ্ধ' বাহির হইয়াছিল। কবিতাটির ভূমিকায় রঙ্গলাল বিদেশি সাহিত্য হইতে ঋণগ্রহণ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহা আমাদের নবীন কবিতার প্রথম লেখকের উপযুক্ত।

> অনেকে কহেন, ইউরোপীয় কবির ভাব এতদ্দেশীর ভাষাসমূহে সংগ্রহ করা অসম্ভব কার্য্য, কিন্তু আমরা এ কথা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করি না। মানুষের মানসিক ভাবনিচয় সর্ব্বদেশে একই প্রকার, তবে দেশ কাল পাত্র ভেদে তাহার কথঞ্চিৎ বিপর্য্যয় হইবার সম্ভাবনা।...এতদ্দেশীয় লোকেরা অধুনা ইউরোপীয় ফল মূল শাক শস্যাদি গ্রহণ স্বদেশীয় রুচি অনুসারে করিতেছেন স্বদেশীর নিয়মে পাক করিয়া গ্রহণ করিতেছেন তাহাতে শরীরের মাত্র পোষণ হয়, কিন্তু ইউরোপীয় অশনে মানসের পোষণত আবশ্যক, এতাবতা, আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই, ইউরোপীয় উপাদেয় মানসিক ভোজ্য, কবিতা প্রভৃতি কি এতদ্দেশীয় জনগণের রুচি অনুসারে এতদ্দেশীয় নিয়মে প্রস্তুত করা যাইতে পারে না?

রঙ্গলাল পার্নেলের ও গোল্ডস্মিথের 'হার্মিট' কাব্যদ্বয় অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইহা সংবাদ-প্রভাকরে বাহির হইয়াছিল (১২৬৫)।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে রঙ্গলালের গভীর অনুরাগ ছিল, এবং তিনি প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাও অল্পস্বল্প করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের লেখা সুপ্রসিদ্ধ উড়িয়া প্রত্নস্থাপত্যের গ্রন্থের অনেক উপাদান যোগাইয়াছিলেন রঙ্গলাল। উড়িষ্যায় প্রাপ্ত একাধিক প্রত্নলিপির পাঠও ইনি উদ্ধার করিয়াছিলেন। উড়িয়া সাহিত্যে রঙ্গলালের গভীর অনুরাগ ছিল। দীন কৃষ্ণদাস, উপেন্দ্র ভঞ্জ প্রভৃতি পুরানো উড়িয়া কবিদের পরিচয় তিনিই প্রথম প্রকাশ করিয়াছিলেন।[১] রঙ্গলালের কাব্যের বিষয়নির্ব্বাচনে তাঁহার ইতিহাসপ্রীতির পরিচয় রহিয়াছে।

'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮, দ্বি-স ১৮৬৫) আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম কাব্য। বিষয় চিতোরের পতন, টডের রাজস্থান-কাহিনী হইতে গৃহীত। ইতিহাসলব্ধ বিষয়বস্তু, নিসর্গবর্ণনা এবং রোমান্টিক দেশপ্রেম মামুলি কবিতার জীর্ণ আধারে নূতন রস ঢালিয়া দিল। পূর্ব্বতন কবিতারীতিতে প্রকৃতির প্রকাশ ছিল শুধু বর্ণনার বাঁধা খাতে এবং গতানুগতিক উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষায়। কবিচিন্তা-অনিরপেক্ষ প্রকৃতিবর্ণনা এই প্রথম পাওয়া গেল। এইরূপ নিসর্গবর্ণনা দিয়া পদ্মিনী-উপাখ্যানের আরম্ভ,

> আহা এইরূপ শোভা অতি অপরূপ!
> উথলয় ভাবুক জনের ভাব[২] কূপ!

[১] রহস্যসন্দর্ভ (১৮৬৪)।

[২] পরিবর্ত্তিত পাঠ 'ভাবুকের বিভাবনা' (দ্বি-স)।

সরসী সরিৎ সিন্ধু শেখর সুন্দর।
গহন গহ্বর বন নির্ঝর নিকর॥
দিনকর নিশাকর নক্ষত্রমণ্ডল।
মেঘমাঝে তড়িতের চমক উজ্জ্বল॥...

স্কটের মিন্‌স্ট্রেলের অনুকরণে রঙ্গলাল চারণের মুখে কাব্যকাহিনী বর্ণন করিয়াছেন।

কাব্যটি বর্ণনাত্মক এবং ঘটনাবহুল। উপমা-রূপক-অনুপ্রাস-যমক ইত্যাদি কাব্যকলার পসার প্রায় সবই আছে। তবে উৎকট নয়। মাঝে মাঝে বৈচিত্র্যও আছে। যেমন,

কি হইল হায় হায়! কোথা সব মহাকায়,
তেজঃপূত রাজপুতগণ?
প্রভাতে উঠিয়ে তারা, যুঝিয়ে দিবস সারা,
প্রদোষেতে মুদিল নয়ন॥
কে ভাঙ্গিবে সেই ঘুম? ঘোর কালানল ধুম
ঘেরিয়াছে পলকের দ্বার।
মুদিয়াছে হৃদপদ্ম বীরত্ব মধুর সদ্ম
নাহি তাহে শ্বাসের সঞ্চার।

দুই-এক জায়গায় মধুসূদনের ভঙ্গি অনুভূত হয়। যেমন, "প্রবোধ-চন্দনে স্বীয় মন-পুষ্প মাখ", "তুই লো নিদয়া অতি সূর্পণখা সমা।" মধুসূদন রঙ্গলালের বাল্যবন্ধু ছিলেন, সুতরাং পদ্মিনী-উপাখ্যানে তাঁহার সংশোধন থাকা বিচিত্র নয়।

ছন্দ গতানুগতিক, পয়ার-ত্রিপদী মালঝাঁপ ইত্যাদি। শুধু নূতনত্ব আছে পয়ারের বিলম্বনে। যেমন,

দুর্গের দ্বিতীয় দ্বারে মহীপতি আসি দেন বার।
বসিল ঘেরিয়া তাঁরে তারাকারে এগার কুমার॥
সেই দিন রাজা তথা পরিহরি ছত্রসিংহাসনে।
রাজ্য-পাটে যথাবিধি বরিলেন প্রথম নন্দনে॥

কোথাও ভনিতা নাই, কিন্তু ভনিতার মোহ রঙ্গলাল একেবারে কাটাইয়া উঠিতেও পারেন নাই। তাই মাঝে মাঝে "কবি কহে" ঢুকাইয়া দিয়াছেন।

পাঠ্যপুস্তকে উদ্ধৃতির জন্য পদ্মিনী-উপাখ্যানের সর্ব্বাধিক পরিচিত অংশ "ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি রাজার উৎসাহ বাক্য" মূরের 'Glories of Brien the Brave' এবং 'From Life Without Freedom' কবিতার অনুসরণে লেখা।

"কোন মূঢ় চিত্রকরে পদ্মদেহ চিত্র করে" ইত্যাদি অংশ শেক্স্পিয়রের 'কিঙ্ জন'-এর (চতুর্থ অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য) 'To gild refined gold' ইত্যাদি ছয় ছত্রের ভাবানুবাদ।

রচনাকাল হিসাবে রঙ্গলালের পদ্মিনী-উপাখ্যান এবং রামনারায়ণের কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব সমসাময়িক। পদ্মিনীর রচনার মূলেও ছিল কালীচন্দ্র রায় চৌধুরীর উৎসাহ।

রঙ্গলালের দ্বিতীয় কাব্য 'কর্ম্মদেবী' (১৮৬২) প্রকাশের পূর্ব্বেই মধুসূদন নবীন কবিতায় যুগান্তর ঘটাইয়াছেন। সে কথা রঙ্গলাল কর্ম্মদেবীর ভূমিকায় বলিয়াছেন: "পদ্মিনী-প্রকাশের পর গত বৎসর-ত্রয় মধ্যে আমাদের দেশীয় ভাষায় ভাবিতা বিমলানন্দদায়িনী কবিতার প্রতি কথঞ্চিৎ দেশীয় লোকের অনুরাগ জন্মিয়াছে; কোন কোন প্রচুর মানসিক শক্তিশালী বন্ধু যাহারা প্রথমোদ্যমে ইংলণ্ডীয় ভাষায় কবিতা রচনা অভ্যাস করিতেন, তাঁহারা অধুনা মাতৃভাষায় উত্তমোত্তম কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন,…"। পদ্মিনী-উপাখ্যান সর্গবন্ধ নয়, কিন্তু অতঃপর সেকেলে ছন্দোবৈচিত্র্য ত্যাগ করিয়া রঙ্গলাল মধুসূদনের অনুসরণে তাহার পরবর্ত্তী কাব্যগুলিকে সর্গে বাঁধিয়াছেন।

কর্ম্মদেবীর চারি-সর্গময় কাহিনীসূত্রও রাজপুত-ইতিহাস হইতে নেওয়া। যশল্মীরের অন্তর্গত পুগল প্রদেশে ভট্টিজাতির অধিপতি অনঙ্গদেবের পুত্র সাধু হইতেছে কাব্যের নায়ক। সে সাহসী বীর, স্বদেশনিষ্ঠ।

> কারু প্রতি ক্ষমা নাই, হউক আপন ভাই,
> সমুচিত শিক্ষা দিব তারে।
> অন্যায় না সহ্য হয়, মিথ্যাবাদ নাহি সয়,
> সত্যের পরীক্ষা তরবারে॥

বিপাশার তীরে জালন্ধরের নিকটে এক বিরাট মুসলমান বণিক্‌বাহিনী আসিয়া ছাউনী করিয়াছে শুনিয়াই সাধু অতর্কিতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিল। বণিক্-দলপতি অনুযোগ করিয়া সাধুকে বলিল, আমরা দুরভিসন্ধি লইয়া তোমাদের দেশে আসি নাই,

> হিন্দুস্থান শান্তিস্থান সংবাদ-শ্রবণে।
> এসেছি তোমার দেশে বাণিজ্য-কারণে॥
> সুখের বাণিজ্যে হয় দেশের উন্নতি।
> বণিকের ধনবৃদ্ধি তাহার সংহতি॥

সাধু উত্তর করিল, একথা হয়ত সত্য, কিন্তু এ দেশ যাহারা লুট করিয়া অধিকার

করিয়াছে, তোমরা তো তাহাদেরই স্বধর্ম্মী। তাহা ছাড়া বিদেশী বণিকদের উপর আমাদের আর আস্থা নাই, কেননা

একরূপ বাণিজ্যছলে কত জাতি এসে।
করিলেক প্রভুত্বস্থাপন নানাদেশে।

সাধু আরও বলিল, আমাদের দেশে যে ধন আছে তাহাই যথেষ্ট, বহির্বাণিজ্যের আবশ্যক নাই, "স্বধনে স্বদেশ ধনী হোক, এই চাই"। তাহাদের প্রত্যেকের জন্য এক একটি ঘোড়া দিয়া আর সব ঘোড়া-উট নিজের ব্যবহারের জন্য লইয়া সাধু বণিকদিগকে দেশে চলিয়া যাইতে আদেশ করিল।

মুসলমান বণিকদিগকে দেশে পাঠাইয়া দিয়া সাধু ঔরিণ্ট নগরে গিয়া হাজির হইল। সেখানে গোহিল রাজপুতদিগের নেতা মাণিকদেব রায়ের অধিকার। সাধুর আগমনবার্ত্তা পাইয়া মাণিকদেব তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। মাণিকদেবের কন্যা ষোড়শী সুন্দরী কর্ম্মদেবীর বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল মন্দোরের রাঠোর ভূপতির পুত্র অরণ্যকমলের সহিত। পিতৃগৃহে অতিথি সাধুকে গোপনে দেখিয়া কর্ম্মদেবীর অনুরাগ জন্মিল। সাধুও অন্তঃপুরপ্রাচীরপ্রান্ত হইতে মূর্চ্ছাগত কর্ম্মদেবীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল। পরদিন রঙ্গভূমিতে বাহুবলের প্রতিযোগিতায় সাধুর জয় হইলে কর্ম্মদেবী তাহাকে জয়মাল্য পাঠাইল। সাধু সেই মালা পাইয়া সভায় বলিল, এই মালা আমি মাথায় জড়াইতে পারি, কণ্ঠে গ্রহণ করিতে পারি না, কেননা পিতা বর্ত্তমানে তাঁহার অগোচরে কন্যার স্বয়ংবর অনুচিত।

কর্ম্মদেবীর মুখ চাহিয়া মাণিকদেব বিবাহে সম্মতি দিতে বাধ্য হইলেন। আসন্নবিপৎপাতের আশঙ্কার মধ্যে বিবাহ হইয়া গেল। কন্যাকে লইয়া বর দেশে চলিল। বিবাহের সংবাদ পাইবামাত্র অরণ্যকমল সাধুকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলে সাধু তাহা স্বীকার করিল। অরণ্যকমলের সঙ্গে অনেক সৈন্য, সাধুর সঙ্গে কয়েকজন সহচর মাত্র। খবর পাইয়া মাণিকদেব তাঁহার সাহায্যার্থে চারি হাজার সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মনস্বী সাধু শুধু পঞ্চাশ জন রাখিয়া যোদ্ধাদের ফিরাইয়া দিল। চন্দনা নদীর দুই তীরে দুই দল সমবেত হইল। বীরের মনোভাব লইয়া অরণ্যকমল সাধুকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিল। সাধু রাজি হইল না। দুই দলে যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধে অরণ্যকমলের "প্রতিহারী" (second) মিহিরজ সাধুর "প্রতিহারী" জয়তরঙ্গের হাতে মারা পড়িল, এবং অরণ্যকমল কর্ত্তৃক সাধু নিহত হইল। স্বামীর মৃত্যুসংবাদ পাইয়া কর্ম্মদেবী

মূর্চ্ছিত হইল। মূর্চ্ছান্তে সাধুর কৃপাণ লইয়া নিজের বামবাহু ছেদন করিয়া তাহা ভ্রাতার হাতে দিয়া কহিল,

আমাদের কুল-কবিবরে দিও
এই হস্ত রতন-মণ্ডিত।
সতীত্বের সঙ্গীত-আখ্যানে ভাই,
গান যেন দাসীর চরিত ॥

তাহার পর বলিল, আমার ডান হাত কাটিয়া লইয়া

এই হস্ত পাঠাইও আমার
হৃদয়নাথ-পিতার নিকটে।
জানিবেন এই কথা তিনি ভাই,
বধূ তাঁর স্বত-যোগ্য বটে ॥
পিতা স্থানে দাসীর এ শেষ ভিক্ষা,
সাধু-সহ দহি কলেবর
এই স্থানে সরসী খনন করি,
নাম দেন কর্ম্ম-সরোবর ॥

দুহিতার প্রার্থনা অনুসারে মাণিকদেব সেখানে রম্য সরোবর খনন করিয়া তাহার তীরে কর্ম্মদেবীর প্রস্তরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

মাণিকদেবের রাজধানীতে সাধুর মল্লযুদ্ধ এবং অরণ্যকমলের সহিত সাধুর দ্বন্দ্বযুদ্ধ ইংরেজি রোমান্সের নাইটদের দ্বন্দ্বযুদ্ধের মত। কর্ম্মদেবীর সহিত সাধুর প্রথমমিলন-বর্ণনায় মূর-বায়রন অপেক্ষা ভারতচন্দ্রের প্রভাবই বেশি পড়িয়াছে। মধুসূদনের রীতির ছাপ দেখি "যথা" দিয়া উপমা-উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগে। যেমন,

যথা ধারাপাত-কালে
কেতকী-কলিকা মুগ্ধ থাকে পুষ্পজালে ॥

দুইএক স্থানে সংস্কৃতের মত শোনায়। যেমন, "মাগুণে শ্রুতিং দেহি," "সর্ব্বথা পুত্রত্ব অর্হে দুহিতা-সুতকে"।

কর্ম্মদেবী পদ্মিনী-উপাখ্যানের অপেক্ষা বেশি বর্ণনাময়। ভাষা পূর্ব্বের মতই, তবে অলঙ্কারে মধুসূদনের অনুসরণপ্রচেষ্টা আছে। নিম্নোদ্ধৃত ছত্রগুলি রঙ্গলালের কবিতাকর্ম্মের ভালো নিদর্শন।

মানস-মাঝারে প্রেম-নির্ঝর উথলে।
কি সাধ্য নয়ন-পথে প্রবাহ নিকলে ॥
লজ্জা তার দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে তটে।
ফিরে যায় প্রেম-স্রোত মনের নিকটে ॥
লুকাইতে লাজভয়ে নয়নের জ্বালা।
তাই বুঝি অধোমুখে রহে কুলবালা ॥

রঙ্গলালের দেশপ্রেমের আদর্শ কর্ম্মদেবীতে স্পষ্টতর হইয়াছে। সাধুর ভূমিকা এই আদর্শে গড়া। বিদেশি বণিকের কাছে দেশের সোনা বিকাইয়া গিয়াছে বলিয়াই আমাদের যে এই দুর্দ্দশা তাহা তিনি সাধুকে দিয়া স্পষ্ট করিয়া বলাইয়াছেন। রঙ্গলালের সময়ে কলিকাতা-অঞ্চলে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ব্যবসা ও চাকুরি করিয়া কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া "নূতন বড়লোক" হইয়াছে। এই "নূতন বড়লোক"-দের ক্ষুদ্র অভিমানকে আঘাত দিয়া রঙ্গলাল লিখিয়াছেন,

> একেবারে সদ্ভাব-অভাব হিন্দুস্থানে।
> জাতি, জ্ঞাতি, বন্ধু বলি কে কাহারে মানে ?
> স্বল্প-ধন-অভিমানে ফুলে উঠে কায়।
> কেবা ছোট কেবা বড় জানা নাহি যায় ॥

বাঙ্গালীর পৌরুষহীনতাও তাঁহাকে ক্লিষ্ট করিত। তাই তিনি বাঙ্গালী শিশুর খেলনার কথায় বলিয়াছেন,

> পুতুলে পুতুলে বিয়া, বহু-বহু কেলী।
> নিতান্ত কৈশোরে যত বাল-বালা মেলি ॥
> কিরূপে পৌরুষ-পথে যাইবে বালক।
> তামাক-খাকুয়া বুড়া, প্রিয়-খেলনক !
> পশ্চিমের প্রজাপুঞ্জ পুরুষার্থ চায়।
> সেই মত দেখহ শিশুর খেলনায় ॥

রঙ্গলালের প্রতিভায় কল্পনার স্ফূর্ত্তি ছিল কিছু কিন্তু দীপ্তি ছিল না। তিনি স্বকীয় কাব্যকলার উপাদান নিজস্ব ভাষা তৈয়ারি করিতে পারেন নাই, সুতরাং তাঁহার প্রতিভা নিজের পথ কাটিয়া লইতে পারে নাই। কর্ম্মদেবীতে রঙ্গলালের যেটুকু স্বকীয়তা পাই ততটুকুও পরবর্ত্তী কাব্য দুইটিতে পাই না। তৃতীয় কাব্য 'শূরসুন্দরী'-র (১৮৬৮) মঙ্গলাচরণরূপে "কবিতাশক্তির প্রতি" বলিয়া যে কবিতাটি আছে তাহাতে বুঝি যে এ বিষয়ে রঙ্গলাল অনবহিত ছিলেন না। প্রকৃতিকে রঙ্গলাল যে অনেকটা মামুলি নজরেই দেখিতেন তাহার প্রকাশ আছে এই কবিতাটিতে।

শূরসুন্দরীর কাহিনীও রাজপুত-ইতিহাস যোগাইয়াছে। রানা প্রতাপের প্রতি আকবরের বিদ্বেষ এতটা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে তিনি যে-কোন উপায়ে প্রতাপকে জব্দ করিতে উদ্যত হইলেন। বিকানের-রাজভ্রাতা পৃথ্বীসিংহ প্রতাপের ভাই শক্তসিংহের জামাতা ও আকবরের অন্যতম সভাকবি ছিলেন। ইঁহার পত্নীর সৌন্দর্য্যের খ্যাতি শুনিয়া নওরোজের উৎসবে ভাগুর-জায়া

বিকানের-রানীর সহায়তায় তাঁহাকে আকবর করায়ত্ত করিতে উদ্যত হইলেন। মহিষী যোধাবাইয়ের বিরুদ্ধতায় এবং সতীর তেজস্বিতায় আকবর নিতান্ত অপদস্থ হইয়া এই অঙ্গীকার করিয়া রেহাই পাইলেন যে ছলে-বলে-কৌশলে আর কখনো তিনি রাজপুত-নারীকে নিজপুরে আনিবেন না। ইহাই শূরসুন্দরীর কাহিনী।

কাব্যটি একেবারে বর্ণনাময়। আকবরের প্রাসাদের এবং অন্তঃপুরের বর্ণনা কাব্যে প্রধান স্থান লইয়াছে।

শূরসুন্দরীতে চারিটি গান ও একটি দেবীস্তোত্র আছে। এইরূপ স্তোত্র রঙ্গলালের অপর কাব্যগুলিতেও পাই।

উড়িষ্যার ইতিহাসের এক রোমান্টিক কাহিনী 'কাঞ্চীকাবেরী'-র (১৮৭৯) বিষয়। নেত্র-বাসুদেবের পরে কপিলেন্দ্রদেব উড়িষ্যার রাজা হন। ইঁহার বিশ পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ পুরুষোত্তম ছিলেন উপপত্নীর সন্তান। পুত্রদের পরস্পর বিদ্বেষ দেখিয়া রাজার ভাবনা হইল কাহাকে রাজ্য দিয়া যাই। জগন্নাথদেব স্বপ্নে প্রত্যাদেশ দিলেন, পর দিন সন্ধ্যারতির সময়ে যে পুত্র তাঁহার পিছনে থাকিয়া লুটানো উত্তরীয়ের প্রান্ত ধারণ করিয়া অনুসরণ করিবে রাজ্য তাহারই প্রাপ্য। এই দৈবাদেশ পাইয়া রাজা পুরুষোত্তমকে যুবরাজ করিলেন। ভাইয়েরা পুরুষোত্তমের অনিষ্টচেষ্টা করিতে লাগিল। দৈবশক্তিতে বলীয়ান্ পুরুষোত্তম অটল রহিল। শেষে হতাশ হইয়া তাহারা দেশত্যাগী হইল, এবং কপিলেন্দ্রদেবের মৃত্যু হইলে পুরুষোত্তমদেব রাজা হইলেন। কাঞ্চী-রাজকন্যা পদ্মাবতীর সহিত তাঁহার বিবাহ স্থির হইল। কাঞ্চীর রাজা পাত্র দেখিতে আসিলেন। তখন রথযাত্রা। চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে রথের আগে আগে রাজা পথ ঝাঁটাইয়া গেলেন। তাই দেখিয়া কাঞ্চী-রাজ ভাবিলেন, এ-তো চাঁড়ালের কাজ। চাঁড়ালের হাতে মেয়ে দিতে রাজি হইলেন না। অবমানিত পুরুষোত্তমদেব দেবতার নামে শপথ করিলেন যে তিন বছর তিন মাস তিন দিনের ভিতরে তিনি কাঞ্চী-রাজকে যুদ্ধে হারাইয়া তাঁহার কন্যাকে আনিয়া চাঁড়ালের হাতে সমর্পণ করিবেন। যথাসময়ে রাজা যুদ্ধযাত্রা করিলেন। সহায় হইয়া আগে আগে চলিলেন জগন্নাথ-বলরাম রাজপুত অশ্বারোহীরূপে। পথে আনন্দপুর গ্রামে পসারিনী মাণিকা গোয়ালিনীর কাছে তাঁহারা দধি-দুগ্ধ-ঘোল খাইয়া মূল্যের বদলে একটি আংটি দিয়া কহিলেন, পিছনে সৈন্য-সামন্ত আসিতেছে, তাহাদের সেনাপতির হাতে

এইটি দিলে তোমাকে যথেষ্ট দাম দিবে। রাজা সৈন্যসামন্ত লইয়া সেখানে পৌঁছিলে মাণিকা তাঁহাকে অঙ্গুরী দেখাইয়া মূল্য চাহিল। রাজা বুঝিলেন যে জগন্নাথ-বলরাম আগুয়ান চলিয়াছেন। রাজা মাণিকাকে বহুমানে ও ভূমি-দানে পুরস্কৃত করিয়া ধাবিত হইলেন। যুদ্ধ জিতিয়া রাজা কাঞ্চীরাজ-কুলের ইষ্ট গণেশমূর্ত্তি এবং রাজকন্যা পদ্মাবতীকে লইয়া নিজ রাজধানীতে ফিরিলেন। কিছু দিন যায়। রাজা একদিন পদ্মাবতীকে ক্ষণিকের তরে দেখিয়া ফেলিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার মন মজিয়া গেল। অথচ তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে পদ্মাবতীকে চণ্ডালের হাতে সমর্পণ করিবেন। এই সমস্যার সমাধান করিয়া দিলেন মন্ত্রী। রথযাত্রায় জগন্নাথের রথ বাহির হইয়াছে, রাজা ঝাড়ুদার হইয়া আগে আগে চলিয়াছেন। এমন সময় মন্ত্রী পদ্মাবতীকে আনিয়া রাজার হাতে হাত মিলাইয়া দিলেন, চণ্ডালের হাতে রাজকন্যাকে সমর্পণ করা হইল। এই পুরুষোত্তম-পদ্মাবতীর পুত্রই বিখ্যাত গজপতি প্রতাপরুদ্র।

কাহিনী রঙ্গলালের নিজস্ব নয়। তিনি অনুসরণ করিয়াছিলেন পুরুষোত্তম-দাসের প্রাচীন উড়িয়া কাব্য। পুরুষোত্তমদাসের কাব্যের রচনাকাল জানা নাই, তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর পরবর্ত্তী হইবে না, সম্ভবতঃ সপ্তদশ অথবা ষোড়শ শতাব্দীর। ছত্রসংখ্যায় দুইটি কাব্য প্রায় সমান-সমান। রঙ্গলাল কাব্যটিকে সাত সর্গে ভাগ করিয়াছেন। প্রথম ও পঞ্চম সর্গ সম্পূর্ণভাবে এবং তৃতীয় ও সপ্তম সর্গ অংশত মৌলিক। চতুর্থ সর্গ ঘনিষ্ঠভাবে মূলানুগত। এই মূলানুগতির কিছু উদাহরণ দিই।

কৃষ্ণ রাউত মাণিকাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

রঙ্গলাল

কহ গো গোয়ালিনি, কিবা তব নাম ?
কোথায় জনক, আর শ্বশুরের ধাম ?
শ্বশুরের ঘরে কিবা, থাক বাপ-ঘরে ?
কতকাল বেচা কেনা, এই পথোপরে ?
তর্ক এত তক্র বেচি, বচনেতে ছন্দ
নহে'ত ননন্দ শ্বশ্রূ, তাহে নিরানন্দ ?
জান ভাল স্বজাতির ব্যবসা কৌশল
পোয়াতে করহ সের ঢেলে দিয়ে জল।

পুরুষোত্তম

কহ আগো গোপালুণি নাম তুম্ভ কিস
কেউঁ গ্রাম ঝিঅ তুম্ভে বিভা কেউঁ দিশ।
শাশুঘরে খটি অছ কি না বাপঘরে
কেতে দিণ্‌ দধি আণি বিকিণ দাণ্ডরে।
তরক যে বিকা কিণা মাণ টিকি ছন্দ
দেখিণ পারন্তি টিকি শাশু যে নণন্দ।
অলপ করিণ তুম্ভে ঘরঠারু আণি
বহুত হেবা পাইঁ পুরাঅ টিকি পাণি।

কাহিনীতে রঙ্গলাল স্বাধীনতা অবলম্বন করেন নাই, তবে কোন কোন প্রসঙ্গ ছোট করিয়াছেন, যেমন ভাইদের দ্বারা পুরুষোত্তমের নির্য্যাতন। কাহিনীটিকে আধুনিক করিবার জন্য রঙ্গলাল প্রথমে ঐতিহাসিক ভূমিকা একটু দিয়াছেন, পদ্মাবতীর বিস্তৃত রূপবর্ণনা করিয়াছেন (তৃতীয় সর্গ) এবং কাঞ্চীর যুদ্ধবর্ণনাকে রাজপুত-কাহিনীর ছাচে ফেলিয়াছেন। মূলের যুদ্ধবর্ণনায় স্বাভাবিকতা আছে। মূলে আছে, কাঞ্চীর রাজা পরাজিত হইলে তাঁহার ইষ্টদেব গণপতি কালিআ ধবলা রাউতের সঙ্গে যুদ্ধে নামে। আধুনিকতার খাতিরে রঙ্গলাল এটুকু বর্জ্জন করিয়াছেন।

মূলের ভক্তিরস স্বভাবতই বাঙ্গালায় ফিকা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই সঙ্গে মূলের খানিকটা কাব্যরসও। মূলে অছে, পুরুষোত্তম ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন নিজের জন্য ততটা নয় যতটা জগন্নাথের প্রতি কাঞ্চীরাজের বিদ্রূপের জন্য। রঙ্গলাল এটুকু বদলাইয়া আধুনিক করিয়াছেন কিন্তু ভালো করেন নাই,—কালিআ ধবলা রাউতের যুদ্ধ করার অর্থ রহিল না।

পুরুষোত্তম

নন্দিঘোষ রথে ছেরা পঅঁরা দেখিলা, চণ্ডালকর্ম বোলিণ নিন্দা করি গলা।
পুরুষোত্তম রায়ে যে শুনি এহি বাণী, লাঙ্গ মাড়ন্তে যেমনে গর্জে কাল ফণী।
বাতে রম্ভাপত্র প্রায়ে কোপে কম্পে কায়ে, সতে যেবে জগন্নাথে মু তাঙ্কর রায়ে।
শ্রীজগন্নাথঙ্কু সে দেবতা ন বোইলা, আম্ভে ছেরা খটিলাকু চাণ্ডাল কহিলা।
জেমাকু জে আণি থিলা মোতে দেবা পাইঁ, আম্ভকু চণ্ডাল বোলি নিলা বাহুড়াই।
যেবে জগন্নাথঙ্কু মু করি থিবি সেবা, তাকু জিণি ঝিঅ তার চাণ্ডালকু দেবা।
যেবে শ্রীভুজরে শঙ্খচক্র বহিছন্তি, ওড়িশারে রাজাপণ মোতে দেইছন্তি।
যেবে নীলচক্র পরে উড়ু অছি নেত, তেবে সে মো গুহারি শুনিবে জগন্নাথ।
তিনি দিন তিনি মাস তিনি বরষরে, অবধি কটকাই সে কাঞ্চিকাবেরিরে।

রঙ্গলাল

মোরে কুবচন, বলিল দুর্জ্জন, তাহে কিছু নাহি ক্ষতি
এত অহঙ্কার ঠাকুর আমার, গালি দেয় নষ্টমতি ?
যিনি নিরাকার, কি আকার তাঁর ? সাকার কল্পনা-সার
সাধকের হিত, তাহে সমাহিত, কহে বেদ বার বার।...
কালবিষধর, গরল প্রখর, কাঞ্চীরাজ নিন্দাবাদ
সহিত অন্তর, তনু জর জর, হায় হায় কি প্রমাদ।
অর্পিতে আমায়, নিজ দুহিতায়, এনেছিল সঙ্গে লয়ে
আমারে না দিল, চণ্ডাল বলিল, মানমদে মত্ত হয়ে।
আমার এ পণ, শুন সভাজন, সত্য যদি জগৎপতি
সত্য যদি তাঁর, চরণে আমার, থাকে ভক্তি রতি মতি।
সত্য হৃদি তাঁর, কৃপায় আমার, উড়িষ্যার এই পদ
তবে এই মোর, প্রতিজ্ঞা কঠোর, দধীচি অস্থি আপদ।
সংবৎসর তিন, ত্রিমাস ত্রিদিন, ভিতরে সে দুরাচারে
সমরে জিনিয়া, চণ্ডালে আনিয়া, দিব তার তনয়ারে।[১]

এই ভাবে মূলের নাটকীয়তা প্রায়ই বাঙ্গালা কাব্যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

কাঞ্চীকাবেরীর বিষয় বেশ রোমান্টিক। তাহার উপর ভক্তিরসের প্রবাহ থাকায় অধিকতর হৃদয়গ্রাহী। ভাষা সরলতর এবং ছন্দপ্রবাহ সুললিত। "শৃঙ্খলে উঠিছে অগ্নি ইরম্মদাকারে" ইত্যাদি মধুসূদন-অনুকরণ নাই বলিলেই হয়। "হায়রে ইংরাজরাজ, করিলি গর্হিতকাজ" রবীন্দ্রনাথেরই ছত্র স্মরণ করাইয়া দেয়।

রঙ্গলাল কালিদাসের কুমারসম্ভবের অনুবাদ করিয়াছিলেন (১৮৭২)।[২] দুইশত সংস্কৃত উদ্ভট কবিতাও অনুবাদ করিয়াছিলেন 'নীতিকুসুমাঞ্জলি' নামে। ইহার কতকগুলি বঙ্গদর্শনে (১২৮২) বাহির হইয়াছিল। রহস্যসন্দর্ভে রঙ্গলালের অনেক খুচরা কবিতা বাহির হইয়াছিল। তাহার মধ্যে কয়েকটি ইংরেজির অনুবাদ। যেমন, 'প্রভাত-সঙ্গীত' (ওয়াট্ হইতে), 'নদী ও কালের সমতা' (কূপার হইতে), 'আদিম নরদম্পতীর প্রাতরুপাসনা' (মিল্টন হইতে)। নবকৃষ্ণ ঘোষের ("রামশর্ম্মা") কয়েকটি ইংরেজি কবিতার অনুবাদও রঙ্গলাল করিয়াছিলেন॥[৩]

[১] তৃতীয় সর্গ।

[২] কুমারসম্ভবের পূর্ব্বতন অনুবাদকারী হইতেছেন হরিমোহন কর্ম্মকার (১২৬৫) এবং প্যারীমোহন সেনগুপ্ত (১৮৬১)।

[৩] নারায়ণে (আশ্বিন ও কার্ত্তিক ১৩২৩) প্রকাশিত 'দুর্গাস্তোত্র' ও 'বিরহ-বিলাপ' দ্রষ্টব্য।

৪

আত্মসচেতনতা মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রতিভার গুণ ও দোষ দুইই। একদিকে যেমন ইহা তাঁহার রচনায় প্রবলতা দিয়া কাব্যে নবীনতার পথ বাঁধিয়া দিয়াছিল, অপর দিকে তেমনি তাঁহার কবিবুদ্ধিকে অনুশীলনের বিষয়ে অমনোযোগী করিয়াছিল। বিদেশি কাব্যের রসে মাতাল হইয়া মধুসূদন তাঁহার পরিবেশকে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। বিলাত ও বিলাতির প্রতি তাঁহার দুর্দ্দমনীয় মোহের উল্টা পিঠই ছিল দেশি মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতি অবজ্ঞা। তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল যে তাঁহার জীবনের সার্থকতা সমুদ্রের ওপারে অপেক্ষা করিতেছে, সেখানে পৌঁছিলেই ইংরেজি কবির দলে আসন পাওয়া দুষ্কর হইবে না। ইংরেজি সাহিত্যের মধ্য দিয়া বিলাতের যে রোমান্টিক ছবি বাঙ্গালী ছাত্রের কল্পনাকে স্বপ্নসুষমায় ভরিয়া তোলে তাহা কিশোর মধুসূদনের চিত্তকে রঙীন মাদকতায় উত্তেজিত করিয়াছিল। কলিকাতা হইতে বঙ্গোপসাগরের দিকে জাহাজ চলিতে দেখিলে সেই জাহাজ একদিন ইংলণ্ডের উপকূলে গিয়া পৌঁছিবে ভাবিয়া তিনি কল্পনায় সেই জাহাজের অনুসরণ করিতেন। খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রতি মধুসূদনের বিশেষ কোন টান ছিল না, বরং দেশের ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি তাঁহার সহৃদয় প্রীতিই ছিল। শুধু সাহেব হইবেন এবং বিলাত যাওয়া সহজ হইবে এই ভাবিয়াই তিনি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টান হওয়া মধুসূদনের জীবনের প্রধান ভুল নয়, ইহা তাঁহার উৎকেন্দ্রিক জীবনের বোধ করি একমাত্র শুভ সংঘটন। কেন না ইহার জন্যই তাঁহার ছন্নছাড়া প্রতিভা অন্যথা-অসুলভ শিক্ষা ও অনুশীলনের সুযোগ পাইয়া কিছু কালের জন্যও সাহিত্যসৃষ্টিতে সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। খ্রীষ্টান হইলেন কিন্তু বিলাত যাওয়া ঘটিল না—অদৃষ্টের এই পরিহাস তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের পক্ষে যতই মর্ম্মান্তিক হোক, তাঁহার সাহিত্যজীবনে কল্যাণের হেতু হইয়াছিল। খ্রীষ্টান হইয়াছিলেন বলিয়া মধুসূদন প্রথমে বিশপ্‌স্ কলেজে ছাত্র হিসাবে, পরে মাদ্রাজে স্কুল-শিক্ষকরূপে গ্রীক-লাটিন-সংস্কৃত প্রভৃতি ক্লাসিকাল ভাষা ও সাহিত্য ভালো করিয়া পড়িবার সুযোগ যদি না পাইতেন তবে শর্ম্মিষ্ঠা-পদ্মাবতী-কৃষ্ণকুমারী নাটকের ও তিলোত্তমাসম্ভব-মেঘনাদবধ-বীরাঙ্গনা কাব্যের কবিকে আমরা বোধ করি পাইতাম না। কৈশোরে মধুসূদনের দুইটি প্রবলতর বাসনা ছিল—বিলাত গিয়া পাকা সাহেব হওয়া আর ইংরেজি কবিদের মধ্যে পরিগণিত হওয়া। বিলাত যাইতে না পারায় প্রথম বাসনা গোড়ার দিকে ব্যর্থ হইল। মাদ্রাজে

থাকিয়া তিনি ইংরেজিতে *Captive Ladie, Visions of the Past* প্রভৃতি কবিতা রচনা করিলেন (১৮৪৮-৪৯)। তাহা প্রশংসিত হইল, কিন্তু সে প্রশংসা আশানুরূপ হয় নাই। সুতরাং তাঁহার দ্বিতীয় বাসনাও মিটিল না। তাহার পর দীর্ঘকাল পরে কেমন করিয়া যে মধুসূদনের দৃষ্টি বাঙ্গালা রচনার দিকে আকৃষ্ট হইল তাহা তাঁহার নাটকের প্রসঙ্গে বলিয়াছি। পদ্মাবতী-নাটক লিখিবার সময় মধুসূদন বাঙ্গালায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ লইয়া পরীক্ষা করিলেন, তাহার পর বাঙ্গালায় নবীন কবিতার রূপ দিতে ব্যাপৃত হইলেন। কিন্তু পাঁচ বৎসরের মধ্যেই (১৮৫৮-৬২) তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টির প্রধান পর্ব্ব চুকিয়া গেল। ইহার পর শুধু একবার প্রতিভাস্ফুরণ হইয়াছিল—১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে। এই সময়ে লেখা চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ রচনা নাও যদি হয় তবে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা আন্তরিক রচনা তো বটেই। ইহার পরে শুধু পাই কয়েকটি ফরমাইসি গোছের কবিতা ও গদ্যে হেক্টর-বধ আখ্যায়িকা এবং মায়াকানন নাটক। মায়াকানন প্রকাশিত হইবার আগেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

বাঙ্গালায় নাটক ও কাব্য রচনা করিতে মধুসূদন যে অন্তরের জরুরি তাগিদ বা কোন বিশেষ প্রেরণা অনুভব করিয়াছিলেন তাহা নয়। বাঙ্গালা নাট্যের হীনতা দেখিয়া তাঁহার রসজ্ঞ শিল্পী মানস পীড়া বোধ করিয়াছিল এবং তিনি নাটকরচনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাহাও অনেকটা বাহাদুরির লোভে এবং জেদের বশে। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে যেন বাজি রাখিয়া মধুসূদন বাঙ্গালায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ চালাইতে ঝোঁক ধরিয়াছিলেন। এই ঝোঁকের ফল বাঙ্গালা কবিতায় যুগান্তর-ঘটনা। ভাবে ও ভাষায় বাঙ্গালা নূতন কবিতার সহিত পুরানো কবিতার বেশ পার্থক্য আছে অস্বীকার করি না, কিন্তু তাহাতে নূতন-পুরাতনের মধ্যে যোগসূত্র সর্ব্বত্র বিচ্ছিন্ন নয়। শুধু পয়ারের বাঁধভাঙ্গাই প্রাচীন ও নবীন কাব্যের মধ্যে সুস্পষ্ট সীমা-রেখা টানিয়া দিয়াছে। চৌদ্দ-অক্ষরের বিরাম-যতি এবং অন্ত্য মিল উপেক্ষা করিয়া মধুসূদন পয়ারকে প্রবহমাণতায় মুক্তি দিলেন।

অমিত্রাক্ষর বিদেশি প্রভাবজাত কিন্তু বিদেশি বস্তু নয়, আসলে ইহা পয়ারই। তফাতের মধ্যে এই যে পুরানো পয়ারে যেমন দুই চরণে (অর্থাৎ আটাশ অক্ষরে) শেষ যতি পড়ে, অমিত্রাক্ষর পয়ারে তেমন নয়, এখানে শম

যত-খুশি চরণের পর যে-কোন পূর্ণ যতিতে (অর্থাৎ প্রথম আট বা শেষ ছয় অক্ষরের পরে) অথবা অর্দ্ধ যতিতে (অর্থাৎ প্রথম অর্দ্ধে চার ও শেষ অর্দ্ধে তিন অক্ষরের পরে) হইতে পারে। পয়ারে মিলের বন্ধনীতে দুই চরণের মধ্যে বাক্য শেষ করিতেই হয়। পয়ারের এই দুই-চরণের নিগড় ভাঙ্গিয়া মধুসূদন ছন্দের ওসার বাড়াইয়া বাক্য-প্রসারের অবকাশ দিলেন,—ইহাই অমিত্রাক্ষর ছন্দের মূল রহস্য। বস্তুত মিল না থাকাটাই বড় কথা নয়, যতিসংখ্যার উপচয় অর্থাৎ ছন্দের প্রবহমাণতাই অমিত্রাক্ষরের বৈশিষ্ট্য।

কালে কালে অনুকরণের ঘর্ষণে কবিতার জৌলুস কমিয়া যায়, এবং বহু-ব্যবহৃত কবিতার ভাষায় ও রীতিতে মন টানিবার চমক দিবার শক্তি লোপ পায়। এই সাধারণী তুচ্ছতা হইতে উদ্ধার করিয়া যাঁহারা কবিতার ভাষায় নবশক্তি ও রীতিতে নবলাবণ্য দিয়াছেন তাঁহারা শুধুই অসামান্য প্রতিভাশালী নহেন, তাঁহারা ভিন্ন-সাহিত্যের রসপিপাসুও। একদা সংস্কৃতবিশারদ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী প্রাচীন পাঁচালী কাব্যকে সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রায় তিন শতাব্দী পরে ফারসীনবীশ ভারতচন্দ্র রায় পিষ্টপেষিত কাব্যরীতিকে রসবান্ করিয়াছিলেন। এখন ইউরোপীয় সাহিত্যের সাতসমুদ্রের কাণ্ডারী, প্রাচীন আলঙ্কারিকের ভাষায় "অষ্টাদশভাষাবারবিলাসিনীভুজঙ্গ" মধুসূদন বাঙ্গালা কবিতায় আধুনিক যুগের নবীন সাজ চড়াইলেন। এ যোগ্যতা ও শক্তি তখন আর কাহারো ছিল না। মধুসূদনের কবিকর্ম্মে বিদেশি সাহিত্যের যে প্রভাবচিহ্ন দেখা যায় তাহা সজ্ঞান অনুকরণ নয়। হোমর-ভর্জিল-দান্তের সঙ্গে নয়, কিন্তু ওবিদ-পেত্রার্কা-তাস্‌সো-মিল্‌টনের সঙ্গে মধুসূদনের কবিধর্ম্মের যে খানিকটা স্বাজাত্য ছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না। দৈবের যে অলঙ্ঘনীয়তা গ্রীক ট্রাজেডির বৈশিষ্ট্য তাহা মধুসূদনের জীবনের মধ্যেও অনুভূত হইয়াছিল। তাই তাঁহার কাব্যে এবং নাটকে প্রাক্তনের অনিবার্য্যতার উপর প্লটের ভারকেন্দ্র নির্ভর করিয়াছে।

তিলোত্তমাসম্ভবে দেবতারা শুধু দৈববশে সুন্দ-উপসুন্দরের নিকট পরাজিত।

> বিধির এ লীলা যুগে যুগে পিতামহ
> এইরূপে বিড়ম্বেন অমরের কুল,···

গ্রীক দেবতাদের মত তিলোত্তমাসম্ভবের দেবতারাও—"বিধাতার অধীন, তাঁহার পদাশ্রিত।" শক্রনিপাত হইলে ইন্দ্র বলিতেছেন, আমার অরি যমালয়ে গিয়াছে "অকালে কপালদোষে"। মেঘনাদবধে রাবণ পরমমাহেশ্বর হইয়াও

অদৃষ্টের ফল খণ্ডাইতে পারে নাই। স্বয়ং শিব বলিয়াছেন, "হায়, দেবি, দেব কি মানব, কার হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি?" রাম বলিয়াছেন, "কেমনে লঙ্ঘিব দৈবের নির্ব্বন্ধ, ভাই?" রাবণ বলিয়াছে, "বিধির বিধি কে পারে খণ্ডাতে?" কবিও সায় দিয়াছেন, "প্রাক্তনের গতি, হায়, কার সাধ্য রোধে?"

মেঘনাদবধ কাব্যের কোন কোন চরিত্রে হোমরের ইলিয়দ মহাকাব্যের কিছু ছায়াপাত আছে। উপমা-উৎপ্রেক্ষাও কিছু কিছু হোমরের মহাকাব্য হইতে গৃহীত। মেঘনাদবধের উপসংহার ইলিয়দের উপসংহারের আদর্শে পরিকল্পিত। কয়েকটি বিশেষণ শব্দও গ্রীকের অনুবাদ। তিলোত্তমাসম্ভবে দুই-একটি বিশেষণ শব্দে এবং কচিৎ দেবদেবীর চরিত্রে হোমরের প্রভাব আছে। মোটামুটি এই পর্য্যন্তই মধুসূদনের কাব্যে হোমরের তথা গ্রীক সাহিত্যের প্রভাব।

মেঘনাদবধে ইতালীয় কবিদের মধ্যে দান্তের এবং তাস্‌সোর প্রভাব লক্ষণীয়। দান্তের 'দিভিনা কোম্‌মেদিয়া'-র কল্পনা মেঘনাদবধে অনুকৃত হইয়াছে প্রেতপুরীর বর্ণনায়। তাস্‌সো-র 'জেরুসালেম্‌মে লিবেরাতা'র প্রভাব একটু বেশি। মেঘনাদবধের কয়েকটি বর্ণনার মূল পাই তাস্‌সোর কাব্যে। প্রমীলা চরিত্রে ক্লোরিন্দার ছায়া পড়িয়াছে।

মিল্‌টনের 'প্যারাডাইজ্‌ লষ্ট' হইতে মধুসূদন সোজাসুজি কিছু গ্রহণ করেন নাই। দান্তের ও তাস্‌সোর কাছে মিল্‌টন ঋণী ছিলেন। মধুসূদনও সেই মহাজনের খাতক। প্রধানত এই সূত্রে দুই কবির যোগাযোগ।

মধুসূদনের কাব্যের বিষয় দেশি, পরিকল্পনাও যতদূর সম্ভব দেশি। বাঙ্গালা রচনায় হাত দিবার পূর্ব্বে মধুসূদন পুনরায় ভালো করিয়া সংস্কৃত সাহিত্য, বিশেষ করিয়া কালিদাসের নাটক ও কাব্য, পাঠ করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার রচনায় কালিদাসের ছত্রের অনুবাদ দুর্লভ নয়। নাটক হইতে উদাহরণ পূর্ব্বে দিয়াছি। এখন তিলোত্তমাসম্ভব ও মেঘনাদবধ হইতে দিতেছি। তিলোত্তমাসম্ভবের "হে বিভো জগৎযোনি, অযোনি আপনি" গৃহীত হইয়াছে রঘুবংশ-কুমারসম্ভব হইতে, "জগদ্‌যোনিরযোনিস্ত্বং"। মেঘদূতের "যাচ্‌ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা" তিলোত্তমাসম্ভবে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে "ধিক সে যাচ্‌ঞা—ফলবতী নীচ কাছে"। "একপ্রাণ দুইজন বাগর্থ যেমতি" রঘুবংশের প্রথম শ্লোকের অনুবাদ। মেঘদূতের "বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেষস্য বিষ্ণোঃ" মেঘনাদবধে ভাষান্তরিত হইয়াছে "শিখিপুচ্ছ-চূড়া যেন মাধবের শিরে"। "চলিছে প্রতাপ

অগ্রে, শব্দ তার পরে, তদনু পরাগরাশি” হইতেছে রঘুবংশের অনুবাদ, “প্রতাপোঽগ্রে ততঃ শব্দঃ পরাগস্তদনন্তরম্”। মধুসূদনের প্রথম কাব্য দুইটির নামেও সংস্কৃতের অনুসরণ—‘কুমারসম্ভব’ হইতে ‘তিলোত্তমাসম্ভব’, এবং মাঘের ‘শিশুপালবধ’ ও ভট্টির ‘রাবণবধ’ হইতে ‘মেঘনাদবধ’।

বাল্যকাল হইতে মধুসূদন রামায়ণ-মহাভারতের রসে মুগ্ধ ছিলেন। পরবর্ত্তী জীবনে বিদেশি প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যের বিচিত্রমধুর রস পান করিয়াও তিনি ভারতীয় মহাকাব্য-কাহিনীর মোহ কাটাইতে পারেন নাই। মহাকাব্য দুইটির কেন্দ্রীয় ট্রাজিক চরিত্র—সীতা ও দুর্য্যোধন—তাঁহার কবি-কল্পনায় দীর্ঘতর প্রতিবিম্ব ফেলিয়াছিল। কবির নিজের জীবনের ব্যর্থতাও তো এইরকমই। সীতার সম্বন্ধে চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীতে যাহা বলিয়াছেন তাহা তাঁহার অন্তরের কথা, “অনুক্ষণ মনে মোর পড়ে তব কথা বৈদেহি!”

হৃদয়পাশে বন্দিনী হইয়া যে নারী অদৃষ্টের নির্য্যাতন সহিতেছে সেই নারীই মধুসূদনের কাব্য-নাটকের নায়িকা। নাটকগুলিতে শর্ম্মিষ্ঠা-দেবযানী-পদ্মাবতী-কৃষ্ণকুমারী-বিলাসবতী, তিলোত্তমাসম্ভবে আপন রূপমুগ্ধ তিলোত্তমা, মেঘনাদবধে সীতা-প্রমীলা, ব্রজাঙ্গনায় রাধা, এবং বীরাঙ্গনায় সব কয়টি নায়িকা অদৃষ্টের ফাঁসে অথবা প্রেমের পাশে বন্দিনী। ইহার মধ্যে দুইটি নারী সবার উপরে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে—ভাগ্যবঞ্চিতা সীতা, আর বল্লভবঞ্চিতা রাধা। সমসাময়িক শিক্ষিতসমাজের ভিন্নরুচি সত্ত্বেও মধুসূদনের কল্পনাকে বার বার নাড়া দিয়াছে বিরহ-বিধুর রাধা এবং যমুনাতীর ও কদম্বতল। শুধু ব্রজাঙ্গনা কাব্যে নয়, অন্যত্রও কবির চিত্ত ব্রজবধূর বিরহছায়ামেদুর। মধুসূদন উৎপ্রেক্ষায় ব্রজলীলার যত ব্যবহার করিয়াছেন অত আর কোন বিষয়ে নয়। তিলোত্তমা-সম্ভবে পাই অন্তত আটটি, মেঘনাদবধেও প্রায় তাই।

‘ব্রজাঙ্গনা’ ও ‘বীরাঙ্গনা’ এই দুই “অঙ্গনা” কাব্যে দুই ভিন্নজাতীয় ও ভিন্নদেশীয় নারী-হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ। ব্রজাঙ্গনায় বাঙ্গালা সাহিত্যের চির-কালের একমাত্র বিরহিণীর একতান, বীরাঙ্গনায় সংস্কৃত সাহিত্যের দূরকালের বিদেশিনীর ছায়াবহ মনস্বিনীদের নানা অনুরাগ।

সাহিত্যে যাঁহারা যুগপ্রবর্ত্তক তাঁহারা ভাবকল্পনার উপযোগী ভাষা নিজেরাই গড়েন। সমৃদ্ধ সাহিত্য হইলে এই কাজ সহজসাধ্য। কিন্তু মধুসূদনের ভাবকল্পনা তখনকার পক্ষে এতই অপরিচিত এবং তাহার আধার অমিত্রাক্ষর ছন্দ এতই অভিনব যে মধুসূদনকে তাঁহার কাব্যের ভাষা গড়িয়া লইতে

হইল। বাঙ্গালায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ চালাইবার পক্ষে প্রধান বাধা ছিল প্রচলিত যুক্তব্যঞ্জনহীন তদ্ভব শব্দের তরলতা এবং যুক্তক্রিয়াপদের বাচালতা। মধ্যে মধ্যে যুক্তব্যঞ্জনধ্বনির দোলা না থাকিলে সাধারণ পয়ারের মতই অমিত্রাক্ষর দুর্ব্বল বৈচিত্র্যহীনতায় পর্য্যবসিত হইবে, এই ভাবিয়া মধুসূদনকে আভিধানিক শব্দের যথেষ্ট ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। কিন্তু যেখানে ভাব প্রসন্ন, যেখানে রস বীর হইতে করুণে অবতীর্ণ, সেখানে কবি যুক্তব্যঞ্জনধ্বনিবহুল নিরেট শব্দের পরিবর্ত্তে স্বরধ্বনিবহুল কোমল শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন তিলোত্তমাসম্ভব প্রথম সর্গে,

হায় রে যে কল্পতরু নন্দনকাননে
মন্দাকিনী তটিনীর স্বর্ণতটে শোভে
প্রভাময়, কে ফেলে তুলে সে তরুপতি
মরুভূমে? কাহার না ফাটে বুক দেখি
এ মিহিরে ডুবিতে এ তিমির-সাগরে!

অথবা মেঘনাদবধ ষষ্ঠ সর্গে,

কিম্বা যথা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা রথী,
মারি সুপ্ত পঞ্চ শিশু পাণ্ডব-শিবিরে
নিশীথে বাহিরি, গেলা মনোরথগতি,
হরষে তরাসে ব্যগ্র, দুর্য্যোধন যথা
ভগ্ন-উরু কুরুরাজ কুরুক্ষেত্র-রণে!

যুক্তক্রিয়াপদ বাঙ্গালা ভাষার একটি বড় বিশেষত্ব। ইহাতে ভাষা যেমন কোমল হইয়াছে, তেমনি শ্লথবন্ধও হইয়াছে। এমন শ্লথবন্ধতা ওজস্বী অমিত্রাক্ষরে অচল বলিয়া মধুসূদন অত নামধাতুর পদ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নামধাতুর ব্যবহার সাধুভাষায় এখন খুব কম বটে, কোন কোন উপভাষায় এখনো নামধাতুর যথেচ্ছ ব্যবহার আছে। মধুসূদনের কাব্যে নামধাতুর ব্যবহার যে সর্ব্বদাই শোভন এমন বলি না। কিন্তু একথা মানিতে হয় যে মধুসূদনের কাব্যের অনেক সমালোচক যাহা তাঁহার ভাষার প্রধান দোষ মনে করেন তাহা প্রধান গুণই। "সিন্ধু যথা দ্বন্দ্বি বায়ু সহ"—এখানে "দ্বন্দ্ব করিয়া" লিখিলে বোঝা সহজ হইত কিন্তু ঝঙ্কার থাকিত না। স্বরবাহুল্য এড়াইবার জন্যই মধুসূদন "ব্রজ", "বৃন্দ" ইত্যাদি সমষ্টিবাচক তৎসম শব্দ দিয়া বহুবচনের পদ তৈয়ারি করিয়াছেন। তবে ইহার বাড়াবাড়িও আছে,—"মাসবংশরাজা," "বায়ুকুলরাজা," "পাতাকুল"।

মধুসূদনের কাব্যের ভাষার একটি প্রধান মুদ্রাদোষ হইতেছে দূরান্বয় ও দুরন্বয়। যেমন,

সুগ্রীব সুমতি
জাগেন আপনি তথা, বীরদল সাথে
বিন্ধ্য-শৃঙ্গবৃন্দ যথা—অটল সংগ্রামে।

অথবা,

ইন্দুবদনা ইন্দিরা
বসেন বিষাদে দেবী, বসেন যেমতি—
বিজয়া দশমী যবে বিরহের সাথে
প্রভাতয়ে গৌড়গৃহে—উমা চন্দ্রাননা!

যতির প্রয়োজনে বিশেষণ পদ বিশেষ্যের পরে বসে। যেমন, "হর্ষে মগ্ন বঙ্গ যবে পাইয়া মায়েরে চিরবাঞ্ছা!" অথবা, "কূলে তার চণ্ডীর দেউল স্বর্ণময়"।

আগে "যথা," "যেমতি" অথবা শেষে "যেন" দিয়া উপমা-উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগ হইয়াছে, এবং প্রায়ই ইহার সহিত "আহা," "মরি," "হায়রে" ইত্যাদি বিস্ময়সূচক শব্দ আছে। পর পর একাধিক উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার হইয়াছে "কিম্বা" অথবা "কিম্বা যথা" আগে রাখিয়া। উৎপ্রেক্ষাই মধুসূদনের প্রধান অলঙ্কার। মধুসূদনের উৎপেক্ষার অধিকাংশ রামায়ণ-মহাভারত-কাহিনী-সম্পর্কিত অথবা সংস্কৃত বা গ্রীক সাহিত্য হইতে গৃহীত। তাঁহার মৌলিক উৎপ্রেক্ষাগুলিও চমৎকার। যেমন,

মহাশোকে চক্রবাকী অবাক হইয়া,
আইলো তরুবর কোলে ভাসি নেত্রনীরে,
একাকিনী—বিরহিণী—বিষণ্ণবদনা,
বিধবা দুহিতা যেন জনকের গেহে। [তিলোত্তমাসম্ভব]

অতি মন্দগতি,
চলিল বিমান শূন্য-পথে, যথা ভাসে
অম্বর-সাগরে স্বর্ণবর্ণ মেঘবর,
যবে অস্তাচলচূড়া উপরে দাঁড়ায়ে
কমলিনী পানে ফিরে চাহেন ভাস্কর
কমলিনী-সখা। [মেঘনাদবধ]

হায় রে যেমতি
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্য কথা, [ঐ]

সংস্কৃতকবিপ্রসিদ্ধ আদিরসাত্মক উপমা-উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার কবির সুহৃৎ-

সমালোচক রাজনারায়ণ বসুর ভালো লাগে নাই। তাহাতে মধুসূদন একটি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন: In the present work (অর্থাৎ মেঘনাদবধে) you will see nothing in the shape of "Erotic Similes", no silly allusions to the loves of the Lotus and the Moon; nothing about fixed lightnings and not a single reference to the "incestuous love of Radha."[১]

ভারতচন্দ্রীয় অলঙ্কারের একটি সুন্দর উদাহরণ হইতেছে,

> দাড়িম্বে কদম্বে হৈল বিষম বিবাদ:
> উভয়ে চাহিল আসি করিবারে বাস
> উরস-আনন্দ-বনে, সে সব দেখিয়া
> মেরুশৃঙ্গাকারে গড়িলেন দেবশিল্পী
> পীন কুচযুগ। [তিলোত্তমাসম্ভব]

তিলোত্তমাসম্ভব রচনাকালে অমিত্রাক্ষর ছন্দে মধুসূদনের হাত পাকে নাই, তাই যতিদোষের বাহুল্য। দ্বিতীয় সংস্করণে ছন্দ অনেকটা মার্জ্জিত হইলেও যতিদোষ একেবারে যায় নাই। যেমন, "গড়ে নিগড় রমণ বাঁধিতে বাসবে।" "বেড়িল বাসব-হৃৎ-সরসীপদ্মিনীরে," "সরস্বতী ভারতী আদেশিলা পবনে"।

তিলোত্তমাসম্ভব আকারে "epicling" (অর্থাৎ মহাকাব্যিকা) এবং প্রকারে শিক্ষানবীশি খসড়া হইলেও ইহাতে মাঝে মাঝে গীতিকাব্যের ঝঙ্কার আছে। চতুর্থ সর্গে তিলোত্তমার অভিসারে লিরিকের সুর শোনা যায়। "প্রেম্ণি জাতে রসজ্ঞা" নববধূ যেমন রাতারাতি প্রৌঢ়যুবতী হইয়া উঠে, তিলোত্তমাও তেমনি কাব্যের কয় ছত্রে "মুকুলিকা বালিকাবয়সী" কিশোরী হইতে অকস্মাৎ তরুণী "বিজয়িনী"-তে বিকশিত।

[১] বিজ্ঞ এবং সাহিত্যরসবেত্তা হইলেও "ব্রাহ্ম" মনোভাবের জন্য রাজনারায়ণ রাধাকৃষ্ণ-কাহিনীর প্রতি—বিশেষ করিয়া রাধার উপর—বিরূপ ছিলেন। ব্রজাঙ্গনা প্রকাশিত হইলে মধুসূদন রাজনারায়ণকে বারবার লিখিয়াছিলেন তাঁহার অভিমত জানাইতে। রাজনারায়ণের তুষ্ণীম্ভাবে অধীর হইয়া শেষে মধুসূদন লিখিয়াছিলেন: I think you are rather cold towards the poor lady of Braja. Poor man! When you sit down to read poetry, leave aside all religious bias. Besides, Mrs. Radha is not such a bad woman after all. রাজনারায়ণের নির্ব্বন্ধেই কি মেঘনাদবধে ব্রজলীলাঘটিত উৎপ্রেক্ষায় মধুসূদন "রাধা" নামের পরিবর্ত্তে "গোপী", "ব্রজবধূ", "ব্রজবালা" ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত "নির্দ্দোষ" শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন?

প্রবেশিলা কুঞ্জবনে কুঞ্জরগামিনী
তিলোত্তমা, প্রবেশয়ে বাসরে যেমতি
শরমে, ভয়ে কাতরা নবকুলবধূ
লজ্জাশীলা। মৃদুগতি চলিলা সুন্দরী
মুহুর্মুহুঃ চারিদিকে চাহি, চাহে যথা
অজানিত ফুলবনে কুরঙ্গিণী,

সরোবরের জলদর্পণে প্রতিবিম্বিত আপন রূপ দেখিয়া তিলোত্তমা মুগ্ধ হইল, কিশোরীর লজ্জা গেল ভাঙ্গিয়া। তাহার পরে তিলোত্তমার রূপে খরযৌবনের যে দীপ্তি ফুটিল তাহাতে রবীন্দ্রনাথের "বিজয়িনী"-র পূর্ব্বাভাস।

ধীরে ধীরে পুনঃ ধনী মরালগামিনী
চলিলা কাননপথে। কত স্বর্ণলতা
মুকুলিতা সাধিল ধরিয়া পা দুখানি
থাকিতে তাদের সাথে!

তিলোত্তমা মধুসূদন-কাব্যের উপেক্ষিতা। কবি এই রূপসী প্রতিমাকে গড়িয়াই বিসর্জ্জন দিয়াছেন। কাব্যের পরিসমাপ্তি তাই নিতান্ত আকস্মিক।

মেঘনাদবধের তুলনায় তিলোত্তমাসম্ভবের ভাষা বন্ধুর। তবুও আভিধানিক শব্দের বাহুল্যহীনতা এবং রচনাভঙ্গির আয়োজনহীন সরলতা তিলোত্তমাসম্ভবের ভাষায় এমন খানিকটা অকৃত্রিমতার শ্রী অর্পণ করিয়াছে যাহা পরবর্ত্তী কাব্যটিতে পাই না।

তিলোত্তমাসম্ভব (১৮৬০) লেখা হইয়াছিল শর্ম্মিষ্ঠা-নাটকের পরে এবং পদ্মাবতী-নাটকের সঙ্গে সঙ্গে। ইহার প্রথম দুই সর্গ বিবিধার্থসংগ্রহে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। তারাচরণ শীকদারের ভদ্রার্জ্জুন-নাটক (পৃ ৮-৯) হইতে মধুসূদন এই কাব্যকাহিনীর আভাস পাইয়াছিলেন। কাহিনীভাগ যৎসামান্য। ব্রহ্মা (বা বিশ্বকর্ম্মা) যেমন বিশ্বের তাবৎ সৌন্দর্য্য হইতে তিল তিল লইয়া তিলোত্তমার সৃষ্টি করিয়াছিলেন মধুসূদনও তেমনি দেশি-বিদেশি কাব্য হইতে উপাদান চয়ন করিয়া এই কাব্যটি গড়িয়াছিলেন, এবং সমস্ত দোষত্রুটি সত্ত্বেও কবি তাঁহার ঈপ্সিত ছন্দঃপ্রবাহ ও ধ্বনিঝঙ্কার তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যেমন,

সে অঞ্চল ইন্দ্রাণীর পীনস্তনোপরে
ভাতে যথা কামকেতু যবে কামসখা
বসন্ত, হিমান্তে, তারে উড়ায়ে কৌতুকে।

তিলোত্তমাসম্ভব বর্ণনাময় এবং ভাবপ্রধান কাব্য। ঘটনা যেটুকু আছে

তাহা নগণ্য, এবং কাহিনী নিতান্ত শ্লথগতি। দেব-ভূমিকাগুলি মোটামুটি দেশি সাজই পরিয়াছে। ষষ্ঠী-মনসা-সুবচনীর মত বাঙ্গালার মেয়েলি ব্রতকথার দেবীরাও কাব্যে স্থান পাইয়াছেন। ভক্তি, আরাধনা প্রভৃতি দেবী কবির নিজস্ব কল্পনা। নিদ্রা ও স্বপ্ন দেবীদ্বয় গ্রীক ছাঁচে গড়া। দেবদূতী এবং দৈববাণীও তাহাই। ব্রহ্মার ভূমিকায় গ্রীক দেবরাজ জেউসের আদল আছে। হোমরের জেউসের মত মধুসূদনের ব্রহ্মা যথেচ্ছাচারী রাজা, দেবতারা তাঁহার প্রজা। বিশ্বকর্ম্মা কতকটা যেন হোমরের হেফাইস্‌তোসের মত সূক্ষ্মশিল্পী।

কিসেব কারণে
কেন হেন করেন চতুরানন, কহ,
কে পারে বুঝিতে ? রাজা যাহা ইচ্ছা, করে,
প্রজার কি উচিত বিবাদে রাজাসহ ?

প্রথম দুই সর্গের প্রারম্ভে বীণাপাণির উদ্বোধন হোমরের অনুকরণ। বীণাপাণির বিশেষণ "শ্বেতভুজা"-ও গ্রীকের অনুবাদ, "লেউকোলেনোস্"। কয়েকটি উৎপ্রেক্ষা ইলিয়দ হইতে নেওয়া। যেমন,

যথা প্রলয়ের কালে, রুদ্রের নিশ্বাস
বাতময়, উথলিলে জলে সমাকুল,
প্রবল তরঙ্গজল, অতিক্রমি তীর,
বসুধার কুন্তল হইতে লয় কাড়ি
সুবর্ণকুসুমলতামণ্ডিত মুকুট,

ইহার মূল পাই ইলিয়দে (৪. ৪২২-২৮),

"হোস্ দ্' হোৎ' এন্ আইগাইলোই পোলুএখেই কুমা থালাস্‌সেস্…"। এখানে দ্রষ্টব্য যে, মধুসূদন হোমরের উৎপ্রেক্ষা দেশি সাজে প্রকাশ করিয়াছেন।

পূর্ব্বতন অলঙ্কাররীতির প্রভাব কদাচিৎ দেখা দিয়াছে। যেমন, যমকের প্রয়োগ,

মহাকোলাহলে চলে জীবনতরঙ্গ
জীবনতরঙ্গ যথা পবনতাড়নে।

শর্ম্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী এবং তিলোত্তমা লিখিয়া মধুসূদন তাঁহার কবিজীবনের শিক্ষানবীশি পর্ব্ব শেষ করিলেন। দ্বিতীয় পর্ব্বের আরম্ভ ব্রজাঙ্গনা কাব্যে। প্রথম পর্ব্বে কবিকল্পনা ছিল পৌরাণিক রোমান্টিক, এবং ইহার মধ্যে মানবিকতা নাই বলিলেই হয়। দ্বিতীয় পর্ব্বে মানবিকতা দেখা দিয়াছে এবং বিরহ-বিষাদের সুর প্রবল হইয়াছে। ব্রজাঙ্গনা-কৃষ্ণকুমারী-মেঘনাদবধ-বীরাঙ্গনা সকলগুলিরই সাধারণ রস করুণ। কিছু কম দেড় বৎসরের মধ্যে এগুলি লেখা হইয়াছিল।

এই স্বল্প সময়ের মধ্যে কবি-শক্তির যে বিকাশ দেখা গেল তাহাতে নিজের সম্বন্ধে কবির নর্মোক্তি সত্য প্রতিপন্ন হইল : You may take my word for it, friend Raj, that I shall come out like a tremendous comet and no mistake. চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী যদিও কিছু কাল পরে লেখা হইয়াছিল তথাপি সনেট রচনার হাতেখড়ি মধুসূদন এই সময়েই করিয়াছিলেন। মেঘনাদবধের তৃতীয় সর্গ যখন লেখা হইতেছে তখনই তিনি প্রথম সনেটটি লিখিয়াছিলেন।

১৮৬০ এপ্রিলের মাঝামাঝি, যখন তিলোত্তমাসম্ভব ও পদ্মাবতী বাহির হয় নাই এবং "রাধাবিরহ" সবেমাত্র প্রেসে গিয়াছে, মধুসূদন মেঘনাদবধ রচনা শুরু করিলেন। কাব্যটি দুই দফায় বাহির হইল (১৮৬১), প্রথম খণ্ডে প্রথম পাঁচ সর্গ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে শেষ চারি সর্গ। ইতিপূর্ব্বে ব্রজাঙ্গনা প্রকাশিত হইয়াছিল।

রামায়ণকাহিনীর প্রতি কবির ঝোঁক ছিল বাল্যাবধি। বাল্যে পড়া কৃত্তিবাসের কাব্যের ভালোমানুষ বৈষ্ণবপ্রকৃতি রাম তাঁহার চিত্ত অধিকার করিতে পারে নাই। ইন্দ্রজিতের নিধনকাহিনী তাঁহার কল্পনাকে উত্তেজিত করিত, এবং মনে হয় তাঁহার বালকচিত্তের সমবেদনা সবটুকু পড়িয়াছিল রাক্ষসদের উপর। বড় বয়সে বাল্মীকির কাব্য পড়িয়া তিনি রাক্ষসদের বীরোচিত প্রাণবান্ মহিমা অনুভব করিলেন। তাই তাঁহার কাছে রাবণের বীরপুত্র মেঘনাদ "was a fine fellow", রাবণ নিজে "a grand fellow", এবং তাই রাবণের প্রবল ব্যক্তিত্ব তাঁহার কবিকল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছিল। "I hate Ram and his rabble"—মধুসূদনের এই কথা ধরিয়া অনেকেই মনে করেন যে রামের উপর মধুসূদনের বিদ্বেষ ছিল তাই তিনি রামকে কাব্যের নায়ক তো করেন নাই উপরন্তু রাম-চরিত্রের অবমাননা করিয়াছেন। এ ধারণা ঠিক নয়। বাল্মীকির মত মধুসূদনও রামকে মানুষ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন, অবতার রূপে নয়। সত্য বটে যে লঙ্কায় যুদ্ধরত রামকে কবি উপেক্ষা করিয়াছেন বলিলে কম বলা হয়, অবজ্ঞা করিয়াছেন, এবং রামকে যতটুকু খাতির করিয়াছেন তাহাও বন্দিনী সীতার মুখ চাহিয়া। কিন্তু ইহা বাল্মীকির মহাকাব্যে বর্ণিত রাম-চরিত্রের দৌর্ব্বল্যের জন্য নয়, সে কেবল রামের বানর-বাহিনীর দরুন। পশু বানর-সেনার হাতে অতিমর্ত্ত্য রাক্ষস-বাহিনীর পরাজয় মধুসূদনের ভালো লাগে নাই। রাজনারায়ণকে লেখা একটি চিঠিতে মেঘনাদবধ-রচনার

সময়ে এ বিষয়ে মধুস্থদনের মনোভাবের ইঙ্গিত পাই : He (অর্থাৎ ইন্দ্রজিৎ) was a noble fellow and but for that scoundrel Bivishan would have kicked the monkey-army into the Sea. By the bye, if the father of our Poetry had given Ram human companions I could have made a regular Iliad of the death of Meghnad. তৃতীয় সর্গ রচনার কালে এক চিঠিতে তিনি লিখিয়াছিলেন : The subject is truly heroic; only the Monkeys spoil the joke—but I shall look to them. স্থতরাং মধুস্থদন যে লিখিয়াছেন : I despise Ram and his rabble, তাহার আসল মানে হইতেছে,—I despise Ram because of his rabble.

স্থতরাং যখন মধুস্থদন তাঁহার দ্বিতীয় মহাকাব্য—নিজের ভাষায় "epicling" —রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন তখন তাঁহার প্রিয় বীর ইন্দ্রজিতের ট্রাজিক কাহিনী স্বতই মনে জাগিল। বাল্যে কৃত্তিবাসের কাব্য পাঠকালে ইন্দ্রজিতের কাহিনীর পৃষ্ঠাগুলিতে নিশ্চয়ই তাঁহার অনেক অশ্রু বর্ষিত হইয়াছিল। আর এখন জাতিচ্যুত সমাজবহিষ্কৃত সাংসারিক নানা দুর্ভোগগ্রস্ত কবি তাঁহার রচনার পাণ্ডুলিপির উপরও অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিলেন। একথা তিনি বারবার রাজনারায়ণকে লিখিয়াছিলেন। ষষ্ঠ সর্গ শেষ করিয়া লিখিয়াছিলেন : It cost me many a tear to kill him. ইহার কিছুকাল পরে লিখিয়াছিলেন : I can tell you have to shed many a tear for the glorious Rakhases, for poor Lakshmana, for Promila. I never thought I was such a fellow for the pathetic. স্থতরাং "গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত" —কবির এই পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও মেঘনাদবধ বীররসাত্মক কাব্য হয় নাই। মধুস্থদন "হিরোইক্ এপিক্" রূপে কাব্যের পরিকল্পনা করেন নাই। এই সময় তিনি রাজনারায়ণকে লিখিয়াছিলেন : I am going to celebrate the death of my favourite Indrajit. Do not be frightened, my dear fellow, I won't trouble my readers with *vira ras*. Let me write a few Epiclings and thus acquire a pucca fist. কিন্তু হাত পাকিবার পূর্ব্বেই কাব্যজীবনে সন্ধ্যা নামিয়া আসিল, বীররসের কাব্য আর লেখা হইল না।

মধুস্থদনের কাব্যগুরু ছিলেন বাল্মীকি, ব্যাস, হোমর, ভর্জিল, কালিদাস,

দান্তে, তাস্‌সো এবং মিল্‌টন। ইঁহাদের সকলেরই রচনার কমবেশি সাক্ষাৎ অথবা পরোক্ষ প্রভাব মেঘনাদবধের উপর পড়িয়াছে। বাল্মীকি ও হোমরের প্রভাব সর্ব্বাধিক।

রামায়ণ হইতে আখ্যানবস্তু গ্রহণ করিলেও মধুসূদন তাঁহার কাব্যে ইন্দ্রজিৎ-নিধনকাহিনী যথেষ্ট বদলাইয়া লইয়াছেন। অল্প কিছু অংশ রামায়ণ হইতে যথাযথভাবে গৃহীত। যেমন ষষ্ঠ সর্গে বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিতের ভর্ৎসনা। ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর পর রাবণের বিলাপও কতকটা বাল্মীকির অনুযায়ী। তবে তাঁহার রাম অনেকটাই বাঙ্গালী রাম। মধুসূদনের রাম কাঁদুনে হইয়াছেন কৃত্তিবাসের প্রভাবে। রামের অবতারত্বের ইঙ্গিত বাল্মীকির বীররসকে কিছু তরল করিয়াছিল। তাহা কৃত্তিবাসের হাতে—অর্থাৎ বাঙ্গালা রামায়ণে—একেবারে জল হইয়া গিয়াছে। এই জলীয় বীররসকে খানিকটা গাঢ় করিবার জন্যই মধুসূদন রাবণ-ইন্দ্রজিতের পালায় ঝোঁক দিয়াছেন।

ভারতীয় এবং গ্রীক উভয় সাহিত্যের মহাকাব্য-রসিক ছিলেন মধুসূদন। রামায়ণ-মহাভারত কাহিনী তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিত,[১] ইলিয়দ-ওদেসির কাহিনী তাহার কল্পনাকে উত্তেজিত করিত। রামায়ণ-কাহিনীর মহৎ ও স্নিগ্ধ কবিত্বের উপর ইলিয়দ-কাহিনীর কঠিন ও দীপ্ত শৌর্য্যের রঙ ফলাইয়া নূতন কাব্য-কল্পনার প্রচেষ্টা মেঘনাদবধ। মেঘনাদবধে গ্রীক মহাকাব্যের প্রভাব যথেষ্ট আছে এবং বাল্মীকির কাহিনী যথাযথভাবে অনুসৃত হয় নাই, তবুও কাব্যটির ভারতীয় রূপ, এমন কি বাঙ্গালী ভাব বিশেষ নষ্ট হয় নাই। যখন মেঘনাদবধের প্রথম সর্গ লেখা শেষ হইয়াছে কি হয় নাই তখন মধুসূদন রাজনারায়ণকে তাঁহার কাব্যের পরিকল্পনা বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা কাব্যের পরিণত রূপের দ্বারা অতিক্রান্ত হয় নাই। মধুসূদন লিখিয়াছিলেন : It is my ambition to engraft the exquisite graces of the Greek mythology on our own ; in the present poem, I mean to give free scope to my inventing Powers (such as they are) and to borrow as little as I can from Valmiki. Do not let this startle you. You shan't have to complain again of the un-Hindu character of the

[১] I love the grand mythology of our ancestors. It is full of poetry. [রাজনারায়ণকে লেখা ১৫ জুন ১৮৬০ তারিখের চিঠি]

Poem. I shall not borrow Greek stories but write, rather try to write, as a Greek would have done. কিন্তু গ্রীক্‌দের মত করিয়া লেখা মধুসূদনের পক্ষে কেন কাহারো পক্ষে সম্ভব নয়।

মেঘনাদবধের অধিকাংশ চরিত্র হোমরের সৃষ্ট চরিত্রের অনুযায়ী। শিব-উমা যেন জেউস-হেরা। মহামায়াকে স্বতন্ত্র দেবী কল্পনা মধুসূদনের নিজস্ব। ইনি হোমরের আথেনার অনুরূপ। ইলিয়দের আবেস মেঘনাদবধের স্কন্দ। মেঘনাদের পরিণাম হেক্‌তোরের পরিণামের মত। মেঘনাদের মৃত্যুতে রাবণের ব্যবহার কতকটা পাত্রোক্লোসের মৃত্যুতে আখিল্লেওসের এবং কতকটা হেক্‌তোরের মৃত্যুর পর প্রিয়ামোসের প্রচেষ্টার অনুরূপ। প্রমীলা কতকটা হেক্‌তোরের স্ত্রী আন্দ্রোমাখের এবং কতকটা তাস্‌সোর কাব্যের রণরঙ্গিণী ক্লোরিন্দার মত। সর্ব্বোপরি গ্রীক সাহিত্যের দৈবনির্ব্বন্ধবাদ সমগ্র কাব্যটিকে ঘিরিয়া আছে।

মেঘনাদবধের কোন কোন ঘটনাও গ্রীক ও লাটিন কাব্যের আদর্শে পরিকল্পিত। ইলিয়দে যেমন দেবদেবীরা ছদ্মবেশে আসিয়া গ্রীক অথবা ত্রোয়ানদিগকে পরামর্শ দিতেছে, মেঘনাদবধেও তেমনি। মেঘনাদবধের দ্বিতীয় সর্গে উমার প্রসাধন এবং শিবকে ভুলাইয়া তাঁহাকে রাবণের বিরুদ্ধে লইবার চেষ্টা ইলিয়দের চতুর্দ্দশ সর্গে বর্ণিত হেরার প্রচেষ্টা মনে করাইয়া দেয়। হোমরের মহাকাব্যে দেবী থেতিস্ দেবশিল্পী হেফাইস্‌তোস্‌কে দিয়া দিব্য অস্ত্র গড়াইয়া পুত্র আখিল্লেওস্‌কে দিলেন হেক্‌তোরকে বধ করিবার জন্য। মধুসূদনের কাব্যে ইন্দ্র মহামায়ার নিকট হইতে দিব্য অস্ত্র লইয়া দেবদূত গন্ধর্ব্ব চিত্ররথকে দিয়া লক্ষ্মণের নিকট পাঠাইয়া দিলেন ইন্দ্রজিৎ-বধের জন্য। ইলিয়দে দেবতারা প্রথমে কেহ গ্রীক, কেহ বা ত্রোয়ানদের পক্ষাবলম্বন করিয়া অলক্ষ্যে যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন, পরে জেউস তাঁহাদিগকে ক্ষান্ত করেন। মেঘনাদবধে দেবতারা পুত্রশোকাতুর দুর্জ্জয় রাবণের আক্রমণ হইতে রামকে বাঁচাইবার জন্য তাঁহার পক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, শেষে বিষ্ণুর আদেশে গরুড় তাঁহাদের তেজ হরণ করায় তাঁহারা যুদ্ধে বিরত হন। মেঘনাদবধের অষ্টম সর্গে বর্ণিত রামচন্দ্রের নরকভ্রমণ ও পরলোকে পিতৃদর্শন ভর্জ্জিলের এনেইদ হইতে গৃহীত। মেঘনাদবধের শেষ সর্গে ইন্দ্রজিতের সৎকার ইলিয়দের শেষ সর্গে বর্ণিত হেক্‌তোরের সৎকার-ব্যাপারের সম্পূর্ণ অনুরূপ।

মেঘনাদবধের কতকগুলি উৎপ্রেক্ষা ইলিয়দ হইতে নেওয়া। যেমন,

হায়রে যেমতি
স্বর্ণচূড় শস্য ক্ষত কৃষীবলদলে,
পড়ে ক্ষেত্রে, পড়িয়াছে রাক্ষসনিকর, [মেঘনাদবধ প্রথম সর্গ] ;

হোই দ্' হোস্ ৎ' আমেতেরেস্ এনাস্তিওই আল্লেলোইসিন্
ওগ্মোন্ এলাউনোসিন্,··· [ইলিয়দ একাদশ সর্গ]।

কিন্তু মায়াময়ী মায়া, বাহু প্রসরণে,
ফেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি
খেদান্ মশকবৃন্দে সুপ্তসুত হতে
করপদ্মসঞ্চালনে ! [মেঘনাদবধ ষষ্ঠ সর্গ] ;

হে দে তোসোন্ মেন্ এএর্গেন্ আপো খ্রোওস্, হোস্ হোতে মেতের্
পাইদোস্ এএর্গেই মুইআন্, হোথ্' হেদেই লেক্সেতাই হুপ্নোই
[ইলিয়দ চতুর্থ সর্গ]।

কয়েকটি বিশেষণ শব্দ এবং বাক্যাংশও গ্রীকের অনুবাদ। "শ্বেতভুজা"—"লেউকোলেনোস্", "দেবাকৃতি" (সৌমিত্রি)—"থেওএইদেস্" (আলেক্‌সান্দ্রোস্), "দেবকুলপ্রিয়" (রাম)—"দিইফিলোস্" (হেক্‌তোর্), "ভয়ঙ্করী শূলছায়া"—"দোলিখোস্কিওন এংখোস্," ইত্যাদি।

মধুসূদনের ইচ্ছা ছিল কাব্যটি দশ সর্গে সমাপ্ত হয়, কিন্তু শেষ অবধি তিনি নবম সর্গেই থামিয়া গিয়াছিলেন। ইহাই সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র অনুসারে "মহাকাব্য"-এর ন্যূনতম সংখ্যা। কাহিনীর পক্ষে দুইটি সর্গ অবান্তর। তাহার মধ্যে চতুর্থ সর্গকে বাদ দেওয়া চলে না, তাহাতে কবির লিরিক ক্ষমতার প্রকাশ। তবে অষ্টম সর্গ বাদ দিলে খুব ক্ষতি হইত না।

মধুসূদনের বিরুদ্ধে একটা প্রধান অভিযোগ, তিনি মেঘনাদবধে এত বেশি আভিধানিক সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন যে ভাষার ঠাট কৃত্রিমতার কাছ ঘেঁষিয়াছে। এই অভিযোগ সবটা মানা যায় না। সত্য বটে, শব্দাড়ম্বর সর্ব্বত্র কাব্যের মাধুর্য্য বাড়ায় নাই, কিন্তু অনেক স্থানেই শব্দচ্ছটা চিত্র ও ভাবকে মূর্ত্ত ও গাঢ়বন্ধ এবং ভাষাকে দীপ্ত করিয়াছে। "যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোর্ম্মি-আঘাতে"—ছত্রটি গোড়ার দিকে মেঘনাদবধের বিরুদ্ধ-সমালোচনার একটি প্রধান লক্ষ্য ছিল। (মেঘনাদবধের প্যারডি জগবন্ধু ভদ্রের 'ছুছুন্দরী-বধ কাব্য' কবিতায় ছত্রটি অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছিল।) কিন্তু মেঘনাদবধের নির্ম্মমতম সমালোচক বালক রবীন্দ্রনাথও ছত্রটির প্রশংসা করিয়াছিলেন,

"ছত্রটিতে ভাবের অনুযায়ী কথা বসিয়াছে, ঠিক বোধ হইতেছে যেন তরঙ্গ বার-বার আসিয়া তটভাগে আঘাত করিতেছে।"[১]

মেঘনাদবধ রচনাকালে মধুসূদন অভিধান দেখিয়া শব্দচয়ন করিতেন বলিয়া অনেকের ধারণা আছে। মধুসূদন নিজেই একথার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন রাজনারায়ণকে লেখা একটি চিঠিতে: I am not a good scholar. The thoughts and images bring out words with themselves,—words that I never thought I knew.

সরল ভাষায় প্রসাদগুণসম্পন্ন ছত্রও মেঘনাদবধে মাঝে মাঝে আছে, তাহাতে ধ্বনিবৈচিত্র্য আসিয়াছে। যেমন, "অনন্ত বসন্ত জাগে যৌবন-উদ্যানে।"

মেঘনাদবধ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের মাঝখানে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬১) বাহির হয়। বইটি লেখা হয় তিলোত্তমাসম্ভবের পরেই (১৮৫৯-৬০)। তিলোত্তমা-সম্ভব লিখিবার সময়েই কবির কল্পনায় যে বিরহিণী রাধার ছবি ভাসিতেছিল তাহা বুঝিতে পারি উৎপ্রেক্ষাগুলি হইতে। তিলোত্তমাসম্ভব শেষ করিয়া মধুসূদন এই রাধাবিরহ কবিতাগুলিতে হাত দেন। মেঘনাদবধ রচনা যখন সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে তখন "রাধা-বিরহ" ছাপিতে গিয়াছে।[২] রাধা-বিরহ পরিকল্পিত ব্রজাঙ্গনা কাব্যের প্রথম সর্গ মাত্র। উদ্যম যে প্রথম সর্গেই নিঃশেষিত হইয়া গেল তাহার কারণ বোধ করি রাজনারায়ণ-প্রমুখ পিউরিটান বন্ধুদের অনুমোদনাভাব। এই কারণেই মেঘনাদবধে যে-সকল কৃষ্ণলীলার উৎপ্রেক্ষা আছে তাহাতে রাধার নামগন্ধ নাই। তবে বিরহিণী রাধা কবির মন হইতে যে কখনই মুছিয়া যায় নাই তাহার প্রমাণ চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী।

ব্রজাঙ্গনা প্রায় বৎসরাধিক কাল মুদ্রাযন্ত্রের কবলে ছিল। মধূসূদন রাজ-নারায়ণকে এ প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন, "By the Bye রাধার বিরহ is in the press. Somehow or other, I feel backward to publish it." এই দ্বিধার প্রধান হেতু হইতেছে পুরাতন কাব্যবিষয়ের অনুশীলনে কবির স্বাভাবিক সঙ্কোচ। ভাবে-ভাষায়-ছন্দে প্রাচীন পদাবলীর সহিত ব্রজাঙ্গনার আকাশ-পাতাল প্রভেদ। কিন্তু এ কথা মানিতে হয় যে মধুসূদনের কবিতাগুলিতে

[১] ভারতী ১২৮৪ ভাদ্র। সুদীর্ঘ সমালোচনাটি শ্রাবণ হইতে পৌষ এবং ফাল্গুন এই পাঁচ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা আর পুনর্মুদ্রিত হয় নাই।

[২] রাজনারায়ণকে লেখা চিঠি (২৪ জুন ১৮৬০) দ্রষ্টব্য। চিঠিতে মধুসূদন ব্রজাঙ্গনা কাব্যকে "রাধার বিরহ" বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছিলেন।

পদকর্ত্তাদের ভক্তিনিষ্ঠা ও বিশ্বাস না থাকিলেও যথাসম্ভব আন্তরিকতা আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যশোর অঞ্চলের দুই মধুসূদন বৈষ্ণব-কবিতায় নূতন রঙ ধরাইলেন। মধুসূদন কান কীর্ত্তন-গানে নূতন রস সঞ্চার করিলেন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত পদাবলীতে নূতন রূপ দিলেন।[১]

ব্রজাঙ্গনার ভাষা সহজ, যেমনটি উচিত। ভাব বস্তুগত, যেমন মধুসূদনের অপর সব কাব্যে। সব চেয়ে লক্ষণীয় হইল ছন্দ। ব্রজাঙ্গনার ছন্দে মধুসূদন যে স্বাধীনতা দেখাইয়াছেন,—যতি-সংখ্যায়, ছত্র-সংখ্যায়, মিলে এবং মাত্রাবৃত্তের ব্যবহারে—সে স্বাধীনতা অমিত্রাক্ষর পয়ার-প্রবর্ত্তনের অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বাঙ্গালায় প্রথম "ওড্" অর্থাৎ অসমচরণ লিরিক কবিতা বলিয়াও ব্রজাঙ্গনার ঐতিহাসিক মূল্য আছে। ছন্দোবৈচিত্র্যের কিছু উদাহরণ দিই।

যতি-সংখ্যার ও মিলের স্বাধীনতা,

হে মহি, এ অবোধ পরাণ
কেমনে করিব স্থির, কহ গো আমারে,
বসন্তরাজ বিহনে।
কেমনে বাঁচ গো তুমি—কি ভাবিয়া মনে—
শেখাও সে সব রাধিকারে !
মধু কহে, হে সুন্দরি, থাক হে ধৈরজ ধরি,
কালে মধু বসুধারে করে মধুদান।

ছত্র-সংখ্যার স্বাধীনতা,

কেনে এত ফুল তুলিলি, স্বজনি—
ভরিয়া ডালা ?
মেঘাবৃত হলে, পরে কি রজনী
তারার মালা ?
আর কি যতনে, কুসুম রতনে
ব্রজের বালা ?

মাত্রাবৃত্তের ব্যবহার,

সখিরে,—
বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে।
পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল,
উছলে সুরবে জল,
চল লো বনে।
চল লো, জুড়াব আঁখি, দেখি ব্রজরমণে !

[১] মাইকেল ব্রজাঙ্গনার কাব্যের কবিতায় "মধু" ভনিতা লাগাইয়াছেন, আর মধু কান তাঁহার "ঢপ-কীর্ত্তন" পদাবলীর ভনিতায় "সূদন" ব্যবহার করিয়াছেন। দুই ভনিতা মিলিয়া "মধুসূদন"।

ব্রজাঙ্গনায় কবিচিন্তার আন্তরিকতার পরিমাণ পাই "মলয়-মারুত"-এর শেষ কয় ছত্রে। কবির চিত্ত-রাধা মলয়-দূতকে দিয়া বার্ত্তা পাঠাইতেছে দূরপ্রবাসী প্রিয়ের কাছে,

উত্তরিবে যবে যথা রাধিকারমণ,
মোর দূত হয়ে
কহিও গোকুল কাঁদে হারাইয়া শ্যামচাঁদে—
রাধার রোদন ধ্বনি দিও তাঁরে লয়ে,
আর কথা আমি নারী শরমে কহিতে নারি।
মধু কহে, ব্রজাঙ্গনে, আমি দিব কয়ে॥

ওবিদের 'হেরোইদায়্' কাব্যের অনুকরণে মধুসূদন 'বীরাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬২) রচনা করিয়াছিলেন। ওবিদের কাব্যে একুশটি পত্র আছে (তাহার মধ্যে শেষের ছয়টি ওবিদের লেখা নয় বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ সন্দেহ করেন)। মধুসূদনেরও ইচ্ছা ছিল একবিংশ-পত্রাত্মক কাব্য লিখিবেন, কিন্তু শেষ অবধি এগারোটির বেশি সম্পূর্ণ হয় নাই। পরে কয়েকটি পত্রের সূচনা করিয়াছিলেন, শেষ করিতে পারেন নাই।

ওবিদের সঙ্গে মধুসূদনের একটা বড় মিল ছিল। ওবিদ যেমন "only when writing in the person of a woman...that he allows himself any approach to tenderness," মধুসূদনও তেমনি নারীচরিত্র-বর্ণনায় তাঁহার লিরিক ক্ষমতাটুকু উজাড় করিয়া দিয়াছেন। তিলোত্তমা-প্রমীলা-সীতা-রাধা, এবং বীরাঙ্গনার নায়িকাগুলি ইহার প্রমাণ। বীরাঙ্গনার ভাব যেমন আবেগময়, ভাষা তেমনি সরল এবং ছন্দও নিরর্গল। সর্ব্বোপরি আছে নাটকীয়তা। আসলে বীরাঙ্গনার অধিকাংশ কবিতাকে ভাণিকা কাব্য বা (dramatic monologue) বলিলে ভুল হয় না। 'সোমের প্রতি তারা,' 'দশরথের প্রতি কেকয়ী,' এবং 'নীলধ্বজের প্রতি জনা'—এই তিনটি কবিতায় নাট্যরস বিশেষভাবে জমিয়া উঠিয়াছে। তবে ভাগবতে কৃষ্ণের প্রতি রুক্মিণীর যে পত্র আছে, যাহার প্রথম শ্লোক হইতেছে

শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে
নির্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঽঙ্গতাপম্।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং
ত্বয়্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে॥

তাহার তুলনায় কিন্তু 'দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী' তেমন জমে নাই।

'পুরুরবার প্রতি উর্ব্বশী'-তে কালিদাসের নাটকের প্রতিধ্বনি স্বাভাবিক-ভাবেই আসিয়া গিয়াছে। যেমন,

মোহেনান্তর্বরতনুরিয়ং মুচ্যমানা বিভাতি
গঙ্গারোধঃপতনকলুষা গচ্ছতীব প্রসাদম্।

এই শ্লোকার্দ্ধের অনুবাদ,

দেখ নিরখিয়া,
এ বরাঙ্গ বররুচি রিচ্যমান এবে
মোহান্তে! ভাঙ্গিলে পাড়, মলিনসলিলা
হয়ে ক্ষণ, এইরূপে বহেন জাহ্নবী
আবার প্রসাদে, শুভে!

পদ্মাবতী নাটকে ইহার গদ্যানুবাদ আছে।[১]

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে মেঘনাদবধ-রচনাকালেই (১৮৬০) মধুসূদনের বাঙ্গালায় সনেট লিখিবার প্রবৃত্তি হয়। প্রথম যে সনেটটি তিনি রচনা করিয়াছিলেন তাহা রাজনারায়ণ বসুকে চিঠিতে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এই কবিতারই পরিবর্ত্তিত রূপ চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর 'বঙ্গভাষা'। একটিমাত্র সনেট লিখিয়াই কবি তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাই সেই চিঠিতে লিখিয়াছিলেন: In my humble opinion, if cultivated by men of genius, our sonnet in time would rival the Italian.

'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' (১৮৬৬)[২] লেখা হইয়াছিল ফ্রান্সে, ভের্সাই শহরে। সেই সুদূর সাগর-পারের দেশে যখন ঘরছাড়া কবির চিত্তে "মন-কেমনের হাওয়ার পাকে অনেক স্মৃতি" ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল তখনই এই সনেটগুলির জন্ম (১৮৬৫)। দেশের আকাশ-বাতাস-গন্ধ-স্পর্শের জন্য ব্যাকুল মধুসূদনের মনোবেদনার রেশ চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর মধ্যে ঝঙ্কৃত।

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী মধুসূদনের সব চেয়ে অকপট রচনা। এই কবিতাগুলিতে কবির আত্মপ্রকাশ সব চেয়ে বেশি। মধুসূদনের চতুর্দ্দশপদীতে ইতালীয় বা ইংরেজি সনেটের সব লক্ষণ না থাকে না থাকুক কিন্তু এগুলির মধ্যে কবিতার যে একটি বিশেষ রূপ সৃষ্ট হইয়াছে তাহার মূল্য কম নয়। সনেটই নবীন বাঙ্গালা কবিতায় মধুসূদনের সফলতম রূপসৃষ্টি।

[১] আগে দ্রষ্টব্য।

[২] বই বাহির হইবার কিছু আগে দুইটি কবিতা, 'কবতক্ষ নদ' ও 'সায়ঙ্কাল' রহস্যসন্দর্ভে (২য় পর্ব ২১ সংখ্যা পৃ ১৩৬) ছাপা হইয়াছিল।

কাব্যজীবনের সমাপ্তির ক্ষোভ কতকগুলি কবিতায় প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। মধুকরের সঙ্গে নিজের অবস্থা তুলনা করিয়া কবি বলিতেছেন,

> গৃহচ্যুত করি তোরে, লুটি লয় বলে,
> পর জন পরে তোর শ্রমের সঙ্গতি!

তিনটি কবিতা বিরহিণী সীতাকে উদ্দেশ করিয়া লেখা, এবং আরো তিনটিতে সীতাদেবীর উল্লেখ আছে। 'শকুন্তলা' কবিতাটি ভাবে ও ভাষায় রসঘন। কবি বলিতেছেন, শকুন্তলা চিরন্তন কাব্যসুন্দরী, কণ্বের আশ্রমে তরুণী শকুন্তলার যে সৌন্দর্য্য তাহার তুলনা নাই, কিন্তু তাহাও ম্লান হইয়া গিয়াছে তাহার তপঃকৃশা বিরহিণী মূর্ত্তির পরিণতিতে।

> নন্দনের পিকধ্বনি সুমধুর গলে;
> পারিজাত-কুসুমের পরিমল শ্বাসে,
> মানস-কমল-রুচি বদন-কমলে,
> অধরে অমৃত-সুধা; সৌদামিনী হাসে;
> কিন্তু ও মৃগাক্ষি হতে যবে গলি, ঝলে
> অশ্রুধারা, ধৈর্য্য ধরে কে মর্ত্ত্যে, আকাশে?

'কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া' কবিতাটি নানা কারণে মূল্যবান্। প্রথমে কবির প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা,

> চাঁড়ালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে!
> করি ভস্মরাশি ফেল কর্ম্মনাশা-জলে!

শেষে তীব্র পরিহাস,

> দূর করি নন্দঘোষে, ভজ শ্যামে, রাধে,
> ও বেটা নিকটে এলে ঢাকো মুখ মানে।

প্রশ্ন হইতেছে, কোন পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া মধুসূদনের এত বিতৃষ্ণা এত ক্রোধ? বইখানি নিশ্চয়ই বাঙ্গালায় লেখা, এবং এমন কোন বই যাহা বিলাতে কবির হাতে পৌঁছিয়াছিল এবং যাহার ভূমিকায় এমন কথা আছে যাহা কবিকে বিচলিত করিতে পারে। লেখকের বা বইয়ের নাম উল্লিখিত হয় নাই, ইহা হইতে ধরিয়া লইতে পারি লেখক পদস্থ এবং কবির পরিচিত ব্যক্তি। এই সব সূত্র মিলাইয়া দেখিলে যে একটিমাত্র বইয়ের কথা মনে পড়ে তাহা হইতেছে 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'। ইহার ভূমিকায় মধুসূদনের মত লেখক যাঁহারা ভাষায় সংস্কৃতের অথবা চলিত ভাষার নিয়ম পুরাপূরি না মানিয়া নিজস্ব রীতিতে লিখিতেছেন তাঁহাদের প্রতি বিদ্বিষ্ট কটাক্ষ আছে। এই কটাক্ষের

উদ্দিষ্ট যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাহাও সুস্পষ্ট বোঝা যায়। বইয়ের প্রথমেই অমিত্রাক্ষরের প্যারডি।

শেষ কবিতা 'সমাপ্তে'-র সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। কবি বুঝিয়াছেন যে অদৃষ্ট আর তাঁহাকে কাব্যসৃষ্টির সুযোগ দিবে না, কাব্যলোকের ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়িয়া এবার তাঁহাকে গহন সংসারারণ্যে অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে। তাই তিনি কাব্যলক্ষ্মীর নিকট অশ্রুসিক্ত বিদায় লইতেছেন,

বিসর্জ্জিব আজি, মা গো, বিস্মৃতির জলে
(হৃদয়-মণ্ডপ, হায়, অন্ধকার করি !)
ও প্রতিমা ! নিবাইল, দেখ, হোমানলে
মনঃকুণ্ডে অশ্রুধারা মনোদুখে ঝরি !

বিদায়ের শেষক্ষণে কবি যে বর মাগিয়া লইতেছেন তাহাতে তাঁহার স্বদেশ-প্রীতির অসামান্য প্রকাশ,

এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে,—
জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ—ভারত-রতনে !

এ কথা এমন করিয়া ইহার পূর্ব্বে আর কেহ বলে নাই।

পেত্রার্কের (১৩০৪-৭৪) সনেটের বাহ্যিক গঠন অনুসারে মধুসূদন চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী লিখেন নাই, যদিও সর্ব্বসমেত ১০২ কবিতার মধ্যে তেতাল্লিশটিতে পেত্রার্কের অনুযায়ী অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ আছে (কখ কখ কখ কখ+গঘ গঘ গঘ)। মধুসূদন এবিষয়ে মিল্টনেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। মিল্টনের অষ্টকে দুইটি মিল, মধুসূদনেরও তাই। মিল্টনের ষট্‌কে দুইটি বা তিনটি মিল, মধুসূদনও তাহাই করিয়াছেন। চতুর্দ্দশপদী কবিতাগুলির মধ্যে পাঁচটির ষট্‌কে পাই তিনটি মিল,[১] একটিতে অষ্টক-ষট্‌ক মিলিয়া তিনটি মিল,[২] আর বাকি ছিয়ানব্বইটি কবিতার ষট্‌কে দুইটি করিয়া মিল।

মধুসূদনের অন্যান্য কবিতার মধ্যে 'আত্ম-বিলাপ' [৩] এবং 'বঙ্গভূমির প্রতি' [৪]

[১] 'বঙ্গভাষা' (৩) ও 'কাশীরাম দাস' (৬): গঘ গঘ ঙঙ। 'কমলে কামিনী' (৪) ও 'কৃত্তিবাস' (৭): গঘঙ গঘঙ। 'জয়দেব' (৮): গঘঘগঙঙ।

[২] নামহীন কবিতা (১১): কখ খর্ক কখ কখ কগ কগ কক।

[৩] কবিতাটি মধুসূদন রাজনারায়ণকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। রাজনারায়ণ ইহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (আশ্বিন ১৭৮৩ শকাব্দ) ছাপাইয়া দিয়াছিলেন।

[৪] সোমপ্রকাশে (জুন ১৮৬২) প্রথম প্রকাশিত। বোধ হয় মাইকেল কবিতাটি বিদ্যাসাগরকে পাঠাইয়াছিলেন।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আত্মবিলাপে নবীন বাঙ্গালা কাব্যে কবি-আত্মকথা প্রথম শোনা গেল। মধুসূদনের বিদ্যালয়পাঠ্য কবিতাগুলিতে আর কিছু না হোক, ভাষা-সারল্যের সঙ্গে ছন্দ-মসৃণতা আছে।

আমাদের দেশে শ্রেষ্ঠ লেখকগণের প্রতিভার সঙ্গে চন্দ্র-সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কের উপমা দেওয়ার রেওয়াজ আছে। ভারতবর্ষ চিরকালই কল্পনায় অকৃপণ। অতিশয়োক্তি আমাদের মৌলিক এবং প্রধান অলঙ্কার—সাহিত্যে এবং জীবনে। সুতরাং এরকম উপমার সার্থকতা নাই। তুলনা যদি দিতেই হয় তবে বলিব যে মধুসূদনের প্রতিভার উপমান সূর্য্য বা চন্দ্র বা অত্যুজ্জ্বল কোন গ্রহ-নক্ষত্র নয়, তাহা উল্কা। চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহ-নক্ষত্রের নির্দ্দিষ্ট ভ্রমণপথ আছে, তাহাদের মণ্ডলের উদয়-অস্ত ও দীপ্তির হ্রাস-বৃদ্ধি আছে। অনুদয়ের তমোগর্ভ হইতে উদিত হইয়া তাহারা ক্রমবর্দ্ধমান ঔজ্জ্বল্য লইয়া আমাদের গোচরে উদিত হইয়া পরে ক্রমবিলীয়মান দীপ্তিতে নবাভ্যুদয়ের আশা লইয়া অস্তময়নের গাঢ়তমিস্রায় অবলুপ্ত হইয়া যায়। উল্কার জীবনে উদয়-অস্ত, দীপ্তিতে হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। অকস্মাতের এক সংঘাতে সে তীব্রতম রশ্মি লইয়া আবির্ভূত হইয়া অকস্মাতের অপর এক সংঘর্ষে নিঃশেষে বিলীন হইয়া যায়। যেটুকু সময় দৃষ্টিগোচর থাকে তাহাতে তাহার প্রখর উজ্জ্বলতা নয়ন ধাঁধিয়া দেয়, আমরা ভালো করিয়া ঠাহর করিতে পারি না। নির্ব্বাপিত হইয়া গেলে তবেই তাহার যথার্থ পরিচয় ধরা পড়ে। মধুসূদনের প্রতিভা সেইরকমই ছিল। কবির জীবৎকালে তাঁহার সৃষ্টির মর্ম্মগ্রাহী বেশি ছিল না। সেকালের সাহিত্য-ব্যবসায়ীরা প্রধানত ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, মধুসূদনের ব্যঙ্গোক্তিতে "barren rascals," যাঁহাদের ওরিজিনালিটি ছিল না এবং যাঁহারা সাহিত্য বিচার করিতেন সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে পাঠ মিলাইয়া। অপর দল ইংরেজিনবীশ, যাঁহাদের সম্বন্ধে মধুসূদন লিখিয়াছিলেন, "the poor devils don't know Bengali enough to understand what they read!" ইঁহারা নবীন কবিতার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন না, কেননা নবীন কবিতার মধ্যে ইংরেজি সাহিত্যের প্রতিধ্বনি বিরল ছিল না। মধুসূদন প্রধানত ইঁহাদেরই সমর্থন পাইয়াছিলেন। প্রাচীনপন্থীদের সমর্থন মিলিয়াছিল কিছু বিলম্বে, তাঁহারা অমিত্রাক্ষরের শক্তি ও মাধুর্য্য সহজে ধরিতে পারেন নাই। সাধারণ পাঠকদের মধ্যেও যে মধুসূদনের কাব্যের অনুরাগী ছিল না এমন নয়। তাহা না হইলে প্রাচীন ছাঁদের কবিতার বাজার অত শীঘ্র নামিয়া যাইত না।

মধুস্থদন বাঙ্গালায় নূতন কবিতার স্রষ্টা, কিন্তু তাঁহার রচনার সহিত বাঙ্গালা কবিতার পূর্ব্বাপর-ধারাবাহিকতা নাই। তাঁহার রচনা রসের দিক হইতে একেবারে স্বতন্ত্র ও অনুর্ব্বর, কিন্তু রূপের দিক দিয়া—সনেটের নির্ম্মাণরীতিতে এবং ছন্দে—তাহা সফল এবং ধারাবাহী। মধুস্থদনের প্রতিভার পরিচয় যতটুকু সাহিত্যে প্রকাশ পাইয়াছে তাহার তুলনায় সম্ভাবনা ছিল অনেক বেশি। যে "মহাকাব্য" রচনার জন্য pucca fist-এর অপেক্ষায় ছিলেন সে "মহাকাব্য" তিনি কখনই লিখিতে পারিতেন না, যেহেতু মহাকাব্যের দিন কবে চলিয়া গিয়াছে। মধুস্থদনের কবিজীবনের যৌবনে দৃষ্টি ছিল বাহিরের দিকে, তাই তিনি বাহিরের বস্তু সংগ্রহ করিয়া কাব্যনির্ম্মাণে লাগিয়াছিলেন, এবং তাই তাঁহার পক্ষে সব চেয়ে সুবিধাজনক ছিল "মহাকাব্য", যাহাতে অনেক কিছু কবিকর্ম্ম লাগাইতে পারা যায়। দৃষ্টি যদি প্রথম হইতেই অন্তরের দিকে পড়িত, তাহা হইলে বোধকরি কাব্যকলায় তাঁহার সৃষ্টি সার্থকতর হইত। তবুও তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা যথেষ্ট।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গতানুগতিক কবিতা

১

মাইকেল মধুসূদন দত্তের নূতন কবিতা প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেও অনেক দিন ধরিয়া ঈশ্বরগুপ্তীয় পদ্যরীতির মক্‌শ চলিয়াছিল। এ পদ্যের রসজ্ঞ পাঠক বড় ছিল না, তবে অভ্যস্ত পদ্যরীতির প্রতি আস্থা সাধারণ পাঠকের—বিশেষ করিয়া প্রাচীনপন্থী প্রবীণ পাঠকদের—ছিলই। সুতরাং বাহবা দিবার লোকের কখনো অভাব হয় নাই। এই সব রচনার উপযোগিতাও কিছু ছিল। নীতিমূলক ও উপদেশাত্মক রচনাগুলি প্রায়ই পাঠ্যপুস্তকে স্থান পাইত। এইধরণের কবিতা-লেখকেরা অনেকেই শিক্ষক এবং ফারসীনবীশ ছিলেন। বাঙ্গালী খ্রীষ্টান লেখকেরাও।গান ও পদ্য লিখিতেন; ইঁহাদের মধ্যে নাম করিতে পারি এই কয়জনের—শ্রীরামপুরের বিশ্বম্ভর দত্ত, ঢাকার জয়নারায়ণ, কলিকাতার বিপ্রচরণ চক্রবর্ত্তী (সংস্কৃত কলেজে পড়া) এবং হারাণচন্দ্র রাহা। মুসলমান খ্রীষ্টান পদ্যলেখক ছিলেন শিমুয়েল পীর বক্‌স ও মুনসী আজি বারী। রাধামাধব মিত্র (১৮২৫-১৯২১) ঈশ্বরগুপ্তের একজন প্রধান অনুগামী ছিলেন। ইনি কিছুকাল মাসিক-প্রভাকর সম্পাদনাও করিয়াছিলেন।[১] আলোকনাথ ন্যায়ভূষণের সহযোগিতায় ইনি আরব্য-উপন্যাসের গদ্য অনুবাদ করিয়াছিলেন (১৮৭৬)। রাধামাধব শীলস্ ফ্রী কলেজে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন অনেক দিন ধরিয়া। হিন্দু কলেজের (পরে হিন্দু স্কুলের) শিক্ষক এবং সুলভ-পত্রিকার সম্পাদক দ্বারিকানাথ রায় অনেকগুলি বই লিখিয়াছিলেন। ইঁহার প্রথম আখ্যায়িকা-কাব্য 'বিল্বমঙ্গল নাটক'এ[২] (চুঁচুড়া, ১৮৪৫) বিল্বমঙ্গলের কাহিনী আছে।[৩] দ্বারিকানাথ বটতলার প্রকাশকদের বই সংশোধন করিয়া দিতেন।[৪]

[১] ইঁহার রচনাবলী, 'বিধবামনোরঞ্জন' নাটক, আদিরসাত্মক আখ্যায়িকা কাব্য 'স্ত্রীলোকের দর্পচূর্ণ' (১৮৬৩), পাঠ্য গ্রন্থ 'বোধেন্দূদয়' (১৮৬৩) ও পাঁচখণ্ড 'কবিতাবলী' (১৮৬৮-৭৩)।

[২] এই বইয়ে কবির আত্মপরিচয় কিছু আছে। তাঁহার নিবাস ছিল গরিফা। বইটির রচনাকাল ১৭৭২ শকাব্দ (=১৮৪০)।

[৩] অপর রচনা 'রাসরসামৃত' (দ্বি-স ১৮৫৪), গদ্য আখ্যায়িকা 'সুশীল মন্ত্রী' (১৮৬৫), 'সীতা-হরণ কাব্য' (১৮৫৭), 'প্রকৃতি প্রেম' (প্রথম খণ্ড ১৮৬২), 'প্রকৃত সুখ' (১৮৬৩)—দশ সর্গে লেখা অমিত্রাক্ষর কাব্য, ইত্যাদি।

[৪] ইসলামি বাংলা সাহিত্য, পৃ ১১৮, ১১৯ ও ১৩৬ দ্রষ্টব্য।

'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'র (১২৭০-৮৬) নিঃস্ব নিষ্কাম নির্ভীক সম্পাদক হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-৯৬)[১] "কাঙ্গাল" ও "ফিকিরচাঁদ" ভনিতায় বহু পারমার্থিক সঙ্গীত রচনা করিয়া একদা বাউল-গানে দেশকে মাতাইয়াছিলেন। ইনিও ঈশ্বরগুপ্তের শিষ্য। ইঁহার প্রথম রচনাগুলি সংবাদপ্রভাকরেই বাহির হইয়াছিল।[২] হরিনাথের গদ্য রচনা 'বিজয় বসন্ত' (১৮৫৯, চ-স ১৮৬৯) একটি প্রচলিত রূপকথাকে জনপ্রিয় করিয়াছিল।[৩]

সংবাদপ্রভাকরের লেখক কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (১৮৩৭-১৯০৬) সংস্কৃত জানিতেন, ফারসী আরো ভালো করিয়া জানিতেন। ঢাকায় থাকিয়া ইনি হরিশ্চন্দ্র মিত্র ও প্রসন্নকুমার সেনের সহযোগিতায় 'কবিতাকুসুমাবলী' নামে একটি পদ্যপ্রধান মাসিক পত্রিকা চালাইয়াছিলেন (১৮৬০)। ঢাকায় আরো দুইএকটি পত্রের সম্পাদক অথবা সহযোগী সম্পাদকরূপেও কাজ করিয়াছিলেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি যশোরে ফিরিয়া আসেন এবং স্কুলে হেডপণ্ডিতের কার্য্য গ্রহণ করেন। এখানে বৎসরখানেকের মত একটি বাঙ্গালা-সংস্কৃত দ্বিভাষিক পত্রিকা (নাম 'দ্বৈভাষিকী') প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'সদ্ভাবশতক' "অর্থাৎ সদ্ভাবপূর্ণ কবিতা-কলাপ" (ঢাকা ১৮৬১)[৪] বইটির অধিকাংশ কবিতা সূফী কবি সাদী ও হাফেজের ফারসী কবিতার ভাবানুবাদ। প্রথম সংস্করণের ভূমিকারূপে 'কবিতা পাঠের উপকার' নামে যে প্রবন্ধটি ছিল তাহা ইংরেজি শিক্ষার সেই নব অনুরাগের দিনে বাঙ্গালা কবিতার প্রতি শিক্ষিত ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের বিরাগ দেখিয়াই কৃষ্ণচন্দ্র লিখিয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান বক্তব্য, "বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুদ্ধিবৃত্তির তীক্ষ্ণতা সম্পাদনার্থ বিজ্ঞান বিদ্যার যেরূপ

[১] ইঁহার জীবনী জলধর সেন কৃত দুই খণ্ড 'কাঙ্গাল হরিনাথ'-এ (১৩২০-২১) দ্রষ্টব্য।

[২] পদ্য গ্রন্থ, পৌরাণিক মহাপুরুষের কাহিনী 'চারুচরিত্র' (১৮৬৩), বিদ্যালয়পাঠ্য 'পদ্য পুণ্ডরীক' ও 'কবিতাকৌমুদী'; গীতাভিনয়, 'অক্রুর-সংবাদ' (১৮৭৩) ও 'সাবিত্রী নাটিকা' (১৮৭৪)।

[৩] অপর গদ্য রচনা, 'চিত্তচপলা' উপন্যাস (১৮৭৬) ও একাধিক খণ্ডে চিন্তামূলক রচনা 'ব্রহ্মাণ্ডবেদ'।

[৪] প্রথম সংস্করণে বইটি যথার্থই "শতক" ছিল। পরবর্তী সংস্করণে কবিতাসংখ্যা বাড়িয়া পঞ্চমে দাঁড়ায় ১৩৬ (ছয়টি গান সমেত)। দুই-একটি কবিতা ছিল হরিশ্চন্দ্র মিত্রের রচনা। কয়েকটি কবিতা প্রথমে সংবাদপ্রভাকরে বাহির হইয়াছিল, অনেকগুলি কবিতাকুসুমাবলীতে। প্রথম সংস্করণের নামপৃষ্ঠায় কবিতাপাঠের লাভ সম্বন্ধে ছয় ছত্র পয়ার ছিল।

সদ্ভাবশতক।

অর্থাৎ

সদ্ভাবপূর্ণ কবিতাকলাপ।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

প্রণীত।

না করিলে রসনায় রস আস্বাদন।
মধুর কষায় আদি নাযায় যেমন॥
কাব্যকলা পাঠ নাকরিলে সেইমত।
কে বুঝিতে পারে তাতে আছে রস॥
ভক্তির কুরূপ হেতু তুচ্ছ জ্ঞান হয়
কিন্তু তাহে সুধা যেন। অনন্ত

১৭৮২ শক।

ঢাকা বাঙ্গালাযন্ত্রে মুদ্রিত।

মূল্য ।৶০ আনা।

আবশ্যক, অন্তঃকরণের ঔৎকর্ষ বর্দ্ধনার্থ সদ্ভাবভূষণা-কবিতাকলাপের চর্চ্চাও সেইরূপ প্রয়োজনীয়।”

সদ্ভাবশতকের কবিতার মালমশলা প্রধানত হাফেজের ‘দিওয়ান’ হইতে নেওয়া। যেগুলি পূরাপূরি হাফেজের কবিতার মর্ম্মানুবাদ সেগুলিতে অনেক সময় হাফেজের ভনিতা আছে। যেমন,

জীবিতেশ! মম দুখ কবে হবে শেষ?
করুণা করিয়া নাথ! কহ সবিশেষ।
আগত বিরহ, গত মিলন সময়
আবার কি বিনিময় হবে প্রেমময়?
বিচ্ছেদের বিচ্ছেদের আশায় আশায়
জীবনের খেলা বুঝি শেষ হয়ে যায়।
কি করি কাহারে বলি মনের বেদন
কে আছে মিলন সহ করে সংমিলন।
বিরহ-বারিধি-নীরে জীবনের তরি
ডুবিল ডুবিল আহা! প্রাণে মরি মরি।
কেঁদোনা হাফেজ বল কি ফল রোদনে?
কমল কোথায় আছে কণ্টক বিহনে?

কোন কোন কবিতায় মূলের আন্তরিকতা সঞ্চারিত হইয়াছে। যেমন,

প্রেমিক পতঙ্গ-প্রেম, প্রেম বটে সেই,
প্রাণ ছাড়ে প্রিয় হেতু মুখে বাক্য নেই।
অলির প্রণয় নাহি প্রেম বলে গণি,
স্বধু তার সারমাত্র গুন্‌গুন্ ধ্বনি!

কয়েকটি মিলছুট কবিতা আছে সংস্কৃত মাত্রাছন্দে লেখা। যেমন আর্য্যায় লেখা কবিতাটির উপক্রম,

ভো রাজন্ গর্ব্ব পরিহর।
স্মর স্মর পূর্ব্ব ভূপগণ কাহিনী।
তব রূপ নরেশ কত,
শাসিত সাগরাম্বর-ধরা।
সম্পদ-মদ-মত্ততায়,
ভাবিত তৃণতুল্য অখিল বিশ্বপুর।
সে সব ভূপ কোথায়?
কই বা সে পদ-মত্ত-মত্ততা?

কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বিতীয় বই আত্মজীবনী, নাম ‘রা-সের ইতিবৃত্ত’ (ঢাকা ১৮৬৮)। বইটিতে অনেক কথা খোলাখুলি বলিয়াছেন তাই নিজের নাম ঢাকিয়া গিয়াছেন। তৃতীয় বই ‘মোহনভোগ’ (ঢাকা ১৮৭১) মহাভারতের নহুষ-

কাহিনী লইয়া লেখা। চতুর্থ বই প্রবন্ধাবলী 'কৈবল্যতত্ত্ব' (কুমারখালী ১৮৮২)। প্রবন্ধগুলির অধিকাংশ "কাঙ্গাল" হরিনাথের গ্রামবার্ত্তায় প্রথমে বাহির হয়। হরিনাথের সঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কিছু বৈষয়িক বিরোধ হইয়াছিল। সেই কারণে হরিনাথ ব্রাহ্ম-বিরোধী হইয়া পড়েন। কৃষ্ণচন্দ্রের প্রবন্ধগুলিতে সুর আরো চড়া, হাফেজের ভূতপূর্ব্ব শিষ্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই।

সংবাদ-প্রভাকরের লেখক, কৃষ্ণচন্দ্র মিত্রের সহযোগী, ঢাকা-নিবাসী হরিশ্চন্দ্র মিত্রের (১৮৩৪-১৮৭২) নাট্যরচনার কথা আগে বলিয়াছি। ইনি পদ্যও লিখিয়াছিলেন প্রচুর, কয়েকখানি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাও চালাইয়াছিলেন—'কবিতাকুসুমাবলী' (১৮৬১-৬৩), 'অবকাশরঞ্জিকা' (১৮৬২), 'ঢাকা-দর্পণ' (১৮৬১), 'কাব্যপ্রকাশ' (১৮৬৪) ও 'মিত্র-প্রকাশ' (১৮৭০)।[১]

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় (১৮৪৩-?) গান ও পাঁচালী লিখিয়া কিছু নাম করিয়াছিলেন।[২] গদ্যরচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে ছোট জীবনী 'হরিদাস সাধু' (১২৯১)। অনুজ ত্রৈলোক্যনাথের সহযোগিতায় রঙ্গলাল 'বিশ্বকোষ'-এর প্রথম দুই সংখ্যা বাহির করিয়াছিলেন। (রাহুতা ১৮৮৫)। তাহার পর ইহার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন নগেন্দ্রনাথ বসু।

পুরানো-ধরণের অপর গদ্যগ্রন্থের মধ্যে এই কয়েকখানিরও নাম করা যায়—গোবিন্দরাম দাসের 'সতীরঞ্জন' (১৮৪৮); রামরত্ন দাস সরকারের 'মানবদেহরতন' (১৮৬৪), পাঁচালী-রচয়িতা রসিকচন্দ্র রায়ের 'বিজ্ঞান-সাধুরঞ্জন' (শ্রীরামপুর ১৮৫৫), 'মনোদীক্ষা-সুধাতরঙ্গিণী' (১৮৬১)—আধ্যাত্মিক কবিতার ও গানের চটি বই,[৩] 'নবরসাঙ্কুর' (১৮৭৩)—বৈষ্ণব-অলঙ্কারের বই, 'হরিভক্তিচন্দ্রিকা' (১৮৭৪)—একাধারে পাঁচালী ও কথকতার বই, 'শকুন্তলার বনবিহার' (১৮৭৫), ও একদা বহুপঠিত আদিরসাল 'জীবনতারা' (১৮৬৯); রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের[৪] 'শৈশবজ্ঞানচন্দ্রিকা' (দ্বি-স ১৮৬৭), 'সীতার বনবাস' (১৮৬৮), 'কুলীনকীর্ত্তন' (১৮৭৪) ও 'সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত' (১৮৭৫); ভোলানাথ চক্রবর্ত্তীর 'সাবিত্রীচরিত কাব্য' (১৮৬৮); নরনারায়ণ রায়ের 'শ্রীবৎস-চরিত' (যশোহর ১৮৭০), দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের[৫] 'বিবিধ-দর্শন কাব্য' (১২৭২) ও 'কমল-কলিকা কাব্য' (১৮৭৫); যাদবানন্দ

[১] ইঁহার পদ্যগ্রন্থ হইতেছে তিন খণ্ড 'কবিতাকৌমুদী' (ঢাকা ১৮৬৩-৭০), 'বীরবাক্যাবলী' (ঢাকা ১৮৬৪, দ্বি-স ১৮৭৩), রামায়ণ বালকাণ্ডের অনুবাদ (ঢাকা ১৮৬৯), 'কবিরহস্য' (ঢাকা ১৮৭০), 'কবিতাবলী' (ঢাকা ১৮৭২), 'কীচকবধ কাব্য' (ঢাকা ১৮৬১, দ্বি-স ১৮৭৮) ইত্যাদি। 'বিধবা-বঙ্গাঙ্গনা' (ঢাকা ১৮৬৩) ও 'নির্ব্বাসিতা সীতা' (ঢাকা দ্বি-স ১৮৭১) গদ্য রচনা।

[২] পদ্যগ্রন্থ 'চিত্তচৈতন্যোদয়' (১৮৬৭) এবং 'বৈরাগ্য বিপিনবিহার' (১২৮৫)।

[৩] রসিকচন্দ্র রায়ের পাঁচালি প্রথম ভাগে (১২৯৭) সঙ্কলিত।

[৪] ইনি বহুবিবাহনিষেধ আন্দোলনে বিদ্যাসাগরের সহায়তা করিয়াছিলেন 'বল্লালি-সংশোধনী' (১৮৬৮) ও 'কৌলীন্য-সংশোধন' (দ্বি-স ১৮৭১) লিখিয়া। ইঁহার সব বইই ঢাকার ছাপা হইয়াছিল।

[৫] অপর রচনা 'জ্ঞানপ্রভা' (১৩১১) উপন্যাস।

রায়ের 'সীতা নির্ব্বাসন' (ঢাকা ১৮৭০), 'রাধাবিলাপলহরী' (ঐ) ও 'পদ্যপুষ্পাঞ্জলি' (ঐ); ভুবনমোহন ঘোষের 'গান্ধারী বিলাপ' (ভবানীপুর ১৮৭০) ও 'পদ্যসার' (১৮৭২) ; রামকমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'লবণবধ কাব্য' (বহরমপুর ১৮৭০); মদনমোহন মিত্রের 'কবিতাকদম্ব' (১৮৭০) ও 'পদ্যসোপান' (ঐ); জয়গোপাল গোস্বামীর 'চারুগাথা' (১৮৭১), দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'সুললিত কাব্য' (১৮৭১)[১] ; চন্দ্রকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রসাবলী কাব্য' (১৮৭২); কিশোরীলাল রায়ের 'নলদময়ন্তী কাব্য' (১৮৭২), শ্রীনাথ চন্দের 'সদ্ভাবকুসুম' (১৮৭২) ও 'কাব্যকৌমুদী' (১৮৭৭); উপেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরীর 'রামবনবাস কাব্য' (মুর্শিদাবাদ ১৮৭২) ও 'বীরাবলী কাব্য' (১৮৭৭); অনাথবন্ধু রায়ের 'বৈদেহীবৈধব্য' (ঢাকা ১৮৭৩), ইত্যাদি। ১২৭৫ সালে বা তাহার পূর্ব্বে এই কাব্যগুলি বাহির হইয়াছিল—'প্রিয়কাব্য', 'মুকুন্দবিলাপ কাব্য', 'বাঙ্গালা কাব্য' ও 'নলচরিত কাব্য'। এগুলির নাম মাত্র জানা আছে।

সরল শিশুপাঠ্য কবিতাপুস্তকের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের তিন ভাগ 'পদ্যপাঠ' (১৮৬৮-৬৯) এবং নাট্যকার মনোমোহন বসুর 'পদ্যমালা' (১৮৭০)।

সূর্য্যকুমার সেনগুপ্তের 'চিত্তসন্তোষিণী'র (১৮৭০) কয়েকটি কবিতায় ছড়ার ছন্দ অবলম্বিত হইয়াছে। 'সেকালের আক্ষেপ' কবিতায় হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার পূর্ব্বাভাস মিলে। যেমন,

বিদ্যা গেল, বুদ্ধি গেল, লোপ হয়েছে জ্ঞান।
পৈতে ছিঁড়ে এখন হুকুম কাঠীন্ গুলি আন্॥
অন্দরেতে জুতো সেলাই হয়েছে বিধান।
হিঁদুর নারী শিল্প শিখে, বিবী বেতন পান॥

২

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া যাঁহারা ঐতিহাসিক ও রোমান্টিক পদ্য-আখ্যায়িকা লিখিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী হইতেছেন বনোয়ারীলাল রায়। ইনি সংবাদ-প্রভাকরের একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। রামনারায়ণের মালতীমাধব-নাটকের গানগুলি ইঁহারই রচনা। বনোয়ারীলালের পদ্যগ্রন্থ হইতেছে 'কোকিলদূত'-এর অনুবাদ (১৮৬১), কৃষ্ণলীলা কাব্য 'দ্বারকাকেলি-বিলাস' (১৮৬৩), আখ্যায়িকা 'যোজনগন্ধা' (১৮৫৮), 'জয়াবতী' (হাওড়া ১৮৬৫) এবং 'কুমুদ্বতী নাটক' (১৮৬৮)। জয়াবতী পদ্মিনী-উপাখ্যানের অনুসরণে "'রোম্যান্স অব হিষ্টরি' ও চিরাগত-সুপ্রসিদ্ধ জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়া" লেখা। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের গদ্য-আখ্যায়িকা 'জয়াবতীর উপাখ্যান' বাহির হইয়াছিল দুই বৎসর পূর্ব্বে। আখ্যায়িকার নায়িকা জয়াবতী চিতোরের রাজা রত্নসেনের কন্যা, নায়ক জয়পাল মুলতানের যুবরাজ। এখানেও সুলতান আলাউদ্দীন প্রতিবাদী। তবে কাহিনী বিষাদান্ত নয়।

[১] কাব্যখানির কিছু আদর হইয়াছিল দেশপ্রীতি-উদ্দীপনার জন্য।

অনেক রকম ছন্দের প্রয়োগ আছে, এমন কি সংস্কৃত ছন্দেরও। যেমন, ইন্দ্রবজ্রা,

পাঠান ভেসে অতিকোপ-নীরে।
অশ্‌লীল ভাষে কয় হিন্দু বীরে ॥
কাহার দর্পে দিস্ গালি নানা।
তোদের আছে বল ভাল জানা ॥

ললিতমোহন ঘোষের 'অচলবাসিনী'তেও (চুঁচুড়া ১২৮১) রঙ্গলালের অনুকরণ আছে। বইটি গল্পকাহিনী অথবা উপন্যাস নয়।

চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতভ্রমণ কাব্য'এ (১৮৬৫) রঙ্গলালের ও মধুসূদনের প্রভাব আছে যথাক্রমে ভাবে ও ছন্দে। ঈশানচন্দ্র বসুর চারি-সর্গাত্মক 'চিত্তবিনোদন কাব্য' (বর্দ্ধমান ১৮৬৮)[১] ভারতভ্রমণেরই মত। ইহাতে মধুসূদনের প্রভাব খুব স্পষ্ট। লেখক ভূমিকায় বলিয়াছেন, "জননী ভারতভূমির দুরবস্থা কীর্ত্তনের দ্বারা সর্ব্বসাধারণের করুণাসঞ্চয়ের উদ্দেশ্যেই আমি এই অভিনব পরিচ্ছেদ দ্বারা সকরুণবাদী চিত্তবিনোদকে সমাজনেপথ্যে অবতারিত করিলাম" ॥

৩

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুজ গণেশচন্দ্রও (?-১৮৬৬) ঈশ্বরগুপ্তীয় কবিতাকার ছিলেন। ইঁহার লেখা সংবাদ-প্রভাকরে বাহির হইত। রঙ্গলাল ও গণেশচন্দ্র বাল্যে-যৌবনে খিদিরপুরে মধুসূদনের প্রতিবেশী ও বাল্যবন্ধু ছিলেন। গণেশ-চন্দ্রের প্রথম কবিতার বই 'চিত্তসন্তোষিণী'র (১৮৬৩) ছন্দে ব্রজাঙ্গনা কাব্যের অনুসরণ ব্যর্থ হয় নাই। যেমন,

নট-নাগর হে!
দোলিবে কি আজ তুমি নাগরদোলায়?
পাকে পাকে দিব ফেলে তুলিব তোমায়;
বাছি বাছি সমতুলে,
বসাইব সখী দলে
যুগে যুগে সকল ঝোলায়।...
সখি রে কি হেরি! ওকি নীলগিরি! কি জলধর?
কর অনুভব সেইদিকে তব, নয়ন রাখি;
সে অঙ্গ দোলায়, নয়ন হেলায়, প্রসারে কর,
যেতে যেতে ছুটে, ঝোঁকে ঝোঁকে উঠে, মানস পাখী।

[১] অপর রচনা 'নীতিকবিতাবলী' (১৮৮০)।

গণেশচন্দ্র আরো দুইখানি কবিতার বই বাহির করিয়াছিলেন, 'ঋতুদর্পণ' (১৮৬৪) ও 'কৃষ্ণবিলাস' (১৮৬৪)। গণেশচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল কালিদাসের ঋতুসংহারের মত বাঙ্গালাদেশের ষড়্ঋতুবর্ণন কাব্য লেখেন। প্রকাশিত বইটিতে শুধু "বসন্ত" ও "নিদাঘ-ঋতুসহ মানব স্বভাব বর্ণন" আছে। কাব্যটি একেবারে ঈশ্বরগুপ্তের ভাবে-ভাষায় লেখা। কলিকাতার সাহেবদের ও সাহেবি-ভাবাপন্ন বাবুদের প্রতি কটাক্ষ আছে। সেকালের শহর-মফঃস্বলের সমাজ-সংসারের টুকিটাকি বর্ণনা ঐতিহাসিকের কাজে লাগিবে। যেমন সেকালের কলিকাতার অবস্থাপন্ন বাড়ির মেয়েদের কেশবেশ-আচরণ বর্ণনা,

কেশ বেশ অলঙ্কার, সদা লয়ে অহঙ্কার
স্বীয় বশে সংসার শাসন,
সূচিকর্ম্মে অনুরক্ত, বিলাতী বিবীর ভক্ত
প্রিয়কর ইংরেজী বাসন।
চিকুর বিন্যাস কত, বিবীয়ানা বেণী মত
বাঁধা-মন-সন্তুষ্ট ফিরাঙ্গী,
বেদিয়া মনোরঞ্জন, ফরাসী মানভঞ্জন,
এলো-মন-সন্তুষ্ট তেলাঙ্গী,
ভিক্টোরিয়া কানঢাকা, মন-রাখা মানঢাকা,
একবেণী ওলেন্দা কবরী,
এইরূপ কতমত, বেশ ভূষা অবিরত,
পতি অনুগতা বিদ্যাধরী,
স্বামী মতে অভিমত, আমোদ প্রমোদে রত,
হাস্য ভাষ বিরহ-বিজনে,
গদ্য পদ্য পাঠে মন, সভাতার প্রকরণ,
সমীহাবিহীন মান্য জনে,

মধুসূদনের প্রভাব পাই শুধু "অনুষ্ঠান"এ বাণীর আহ্বানে। তাহাও অবশ্য মিত্রাক্ষরে॥

৪

অমিত্রাক্ষরের মাধুর্য্য ও শক্তি যাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না তাঁহারা কেহ কেহ মধুসূদনকে পাশ কাটাইয়া সংস্কৃত ছন্দ আমদানি করিতে তৎপর হইলেন। তাঁহাদের প্রয়াস ক্বচিৎ সাময়িক বাহবা পাইলেও একেবারে ব্যর্থ হইয়াছিল। আধুনিক কালে সংস্কৃত ছন্দ বাঙ্গালা কাব্যে ব্যাপকভাবে চালাইতে প্রথম চেষ্টা করিয়াছিলেন ভুবনমোহন রায়চৌধুরী। ইঁহার 'ছন্দঃকুসুম' (১৮৬৪) সংস্কৃত ছন্দোমঞ্জরীর বাঙ্গালা ভাষ্যের মত। প্রত্যেক

ছন্দের উদাহরণ সংস্কৃতে এবং বাঙ্গালায়, এবং সেগুলির দ্বারা "শ্রীকৃষ্ণের মানভিক্ষোপন্যাস ও যুগলমিলন" বর্ণিত। ছন্দঃকুসুমের অব্যবহিত পরে লেখা হইয়াছিল প্রথম খণ্ড 'পাণ্ডবচরিত কাব্য', তবে ছাপা হইয়াছিল অনেক বছর পরে (১৮৭৭) রমেশচন্দ্র দত্তের আগ্রহে। লেখকের উদ্দেশ্য, "আদৌ সংস্কৃতছন্দঃসকল সাধুভাষায় ব্যবহারের উপযোগিতা-প্রদর্শন, দ্বিতীয়তঃ হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ বৈষম্যে সংস্কৃতভাষার সহিত তদ্‌গর্ভজাতা প্রাকৃত ভাষার ভেদভাব নিবারণে পুনর্মিলন সম্পাদন"। স্রগ্ধরা করকাগতি মন্দাক্রান্তা বসন্ত-তিলক উপজাতি মেঘবিস্ফূর্জ্জিতা বংশস্থবিল মণিমালা তূণক ছায়া শোভা মালিনী শিখরিণী শার্দূললসিত কুসুমিতলতাবেল্লিত অনুষ্টুপ্ বেগবতী চিত্রলেখা তোটক অসম্বাধা হারিণী ও চমৎকারিণী—এই বাইশ ছন্দে পাণ্ডবচরিতের বাইশ সর্গ রচিত। দুইটি উদাহরণ দিতেছি।

মন্দাক্রান্তা,

ক্রোড়ে পৃষ্ঠে কখন লইয়া মস্তকে স্বন্ধদেশে,
বালক্রীড়া সতত করিতে পঞ্চ পুত্রের সঙ্গে।
শূন্য স্নেহে কঠিনহৃদয়ে বর্জ্জিয়া সে সবাকে
গুপ্তস্থানে গমন করিলে কেমনে হে মহাত্মন্॥

বসন্ততিলক,

রাজা সভাসদ তথা যত পৌরবর্গে
বার্ত্তা শুনে চমকিয়া চলিলেন সর্ব্বে।
স্ত্রীপুত্র সংহতি লয়ে নগরীর লোকে
হৃষ্টান্তরে গতি করে ঋষিদর্শনার্থে॥

বাঙ্গালার মত, অর্থাৎ দীর্ঘস্বর হ্রস্ব করিয়া, পড়িলে শেষ শ্লোকটি পয়ারের মত শুনাইবে, শুধু একটু খটকা থাকিবে প্রথম দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের শেষ অক্ষরে।

'কাব্যমঞ্জরী' (১৮৬৮)-প্রণেতা বলদেব পালিত (১৮৩৫-১৯০০) তিন সর্গে 'ভর্ত্তৃহরি কাব্য' (১৮৭২) লিখিয়াছিলেন আদ্যন্ত সংস্কৃত ছন্দে। ভর্ত্তৃহরির ভাষা বিভক্তিহীন সংস্কৃত। নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকটির তৃতীয় ছত্রে ক্রিয়াপদ দুইটি ছাড়া কোন বাঙ্গালা শব্দ নাই, এবং সে দুইটির উচ্চারণও বাঙ্গালার মত নয়।

ইতস্ততশ্চলিত শূণ্ড ভীষণ,
প্রচণ্ড বজ্রোপম বৃংহিতধ্বনি,
বিরাজিছে তোরণ পার্শ্ব শোভিয়া
প্রভিন্ন যূথ প্রতিবন্ধ শৃঙ্খলে।

সংস্কৃত ছন্দে লেখা কাব্যটির অসাফল্যে বলদেব পরবর্ত্তী রচনা 'কর্ণার্জ্জুন কাব্য'এ (প্রথম খণ্ড ১৮৭৫) প্রধানত মিত্রাক্ষর বাঙ্গালা ছন্দই অবলম্বন করিলেন, কেবল সর্গান্তিক দুই-তিনটি শ্লোকে এবং পঞ্চম সর্গে সূর্য্যের স্তোত্রে সংস্কৃত পঞ্চচামর ছন্দ ব্যবহার করিলেন। ভূমিকায় বলদেব লিখিয়াছেন,

> সংস্কৃত কাব্যে যে সমস্ত সুললিত ছন্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, বাঙ্গালা পদ্যে সেই সমস্ত ছন্দ প্রয়োগ করিতে পারিলে অবশ্যই তাহার কিছু না কিছু সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু এতদ্দেশে স্বরবর্ণের লঘুত্ব বা গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পাঠ করিবার প্রথা না থাকাতে, ঐ সকল ছন্দ সর্ব্বসাধারণের নিকট সমাদৃত হয় না। আমার "ভর্ত্তৃহরি কাব্যই" ইহার দৃষ্টান্তস্থল। সেই কারণবশতঃ আমি ঐ প্রকার রচনায় আর প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইলাম না। কেবল পঞ্চম সর্গে সূর্য্যের স্তোত্র এবং প্রতি সর্গের শেষে ২।৩টী কবিতামাত্র সংস্কৃতচ্ছন্দে লিখিয়াই ক্ষান্ত থাকিলাম।

অজ্ঞাতনামা লেখকের 'ললিতকবিতাবলী'তে (১৮৭০) ও 'কাব্যমালা'য় (১৮৭১) সংস্কৃত ছন্দের ব্যবহার দেখি। কেহ কেহ বই দুইটিও বলদেব পালিতের লেখা বলিয়া মনে করেন।

মহেশচন্দ্র শর্ম্মার ত্রয়োদশ-সর্গাত্মক 'নিবাতকবচবধ' (১৮৬৯) সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রানুযায়ী "বাঙ্গালা মহাকাব্য"। লেখকের আদর্শ ভারবি ও মাঘ। ছন্দ প্রধানত পয়ার। অন্য ছন্দের ব্যবহারে কিছু নূতনত্ব আছে। যেমন,

> এইরূপে ধনঞ্জয়ে সুস্থ করি মাতলি
> বাজি-পৃষ্ঠে কশা হানে দেবলোকে যাইতে।
> জয়-আনন্দেই বুঝি তুরঙ্গম-আবলি,
> উড়িল গরুড়-সম অতি লঘু গতিতে॥

বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অষ্ট-স্কন্ধাত্মক 'শক্তিসম্ভব কাব্য'এ (১৮৭০) মহিষাসুরবধ-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ছন্দ মিত্রাক্ষর পয়ার, তবে অমিত্রাক্ষরের মত স্বাধীনযতি। গ্রন্থকারের "পূর্ব্বাভায" হইতে জানা যায় যে তাঁহার আগে আর একজন লেখক কাব্যে এই রকম "মিশ্ররীতি, অর্থাৎ মিত্রাক্ষর অথচ অমিত্রাক্ষরের ন্যায় রচনার রীতি" অবলম্বন করিয়াছিলেন।

হরিচরণ চক্রবর্ত্তীর তিন-সর্গাত্মক প্রথম খণ্ড 'ভদ্রোদ্বাহ কাব্য'এ (১৮৭১) শ্রীবৎস-চিন্তার উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। ছন্দ পয়ার ও একাবলী। পয়ারে কচিৎ স্বাধীনযতি দেখা যায়। আভিধানিক শব্দের ব্যবহারে এবং উপমা-উৎপ্রেক্ষায় মধুসূদনের প্রভাব আছে।

'পিশাচোদ্ধার' (১২৭০)-প্রণেতা নবীনচন্দ্র দাস, তাঁহার 'অযোগ্য-বিবাহ'

(১৮৬৮) ও 'কালিদাসের বিদ্যালাভ কাব্য'এ (১৮৭৬, দ্বি-স ১৮৯১) সর্গবন্ধ আশ্রয় করিলেও প্রাচীন পন্থারই অবিকল অনুসরণ করিয়াছিলেন। অযোগ্য-বিবাহের মুদ্রণে মাইকেল মধুসূদন দত্ত অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া লেখক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। নবীনচন্দ্রের[১] অপর কবিতার বই 'ব্রহ্মশক্তি বিবরণ'এ (১২৯৬) ব্রাহ্মের দৃষ্টিতে জয়দেবের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। নবীনচন্দ্র মিশন রো-স্থিত জন টমাসের আপিসে কাজ করিতেন। জন টমাস ও তাঁহার অনুজ উইলিয়ম টমাস ব্রহ্মশক্তি-বিবরণ ছাপিতে অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন ॥

৫

সমসাময়িক অনেক কবিতাকার মধুসূদনের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের রচনাশক্তি বিশেষ কিছু না থাকিলেও ছন্দের দিক দিয়া সমসাময়িক কবিতাকর্ম্মকে কতকটা স্পন্দিত করিয়াছিলেন। মেঘনাদবধের অনুকরণ হইয়াছিল সব চেয়ে বেশি, এবং সবচেয়ে ব্যর্থ। চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর অনুকরণ সর্ব্বদা ব্যর্থ হয় নাই।

মেঘনাদবধের প্রথম অনুকরণ হইতেছে দীননাথ ধরের (১২৪৬-?)[২] প্রথম খণ্ড 'কংশবিনাশ কাব্য' (১৮৬১)। চারি সর্গে লেখা কাব্যটি আদ্যোপান্ত সনাতন পয়ার ছন্দে লেখা। অন্যথা মেঘনাদবধের অন্ধ অনুকরণ আছে। যেমন, "প্রভাতিল রাতি এবে উদিল মিহির," "চল মাতঃ শ্বেতভুজা স্থানান্তরে যাই," "হায়রে কুরঙ্গ যথা কিরাতেরি ভয়ে," ইত্যাদি। নিদ্রা-স্বপ্ন-মায়া-আরাধনা প্রভৃতি দেবী-চরিত্রের কল্পনাও মধুসূদনের কাছে ঋণ। এমন কি নামধাতুর প্রয়োগেও লেখক পশ্চাৎপদ হন নাই। রচনা একেবারে ব্যর্থ।

মিত্রাক্ষর রচনাগুলি যেমন তেমন হোক অমিত্রাক্ষর "কাব্য"-গুলি ছেলেমানুষি ছাড়া আর কিছু নয়। অনেকগুলি আবার ছেলেমানুষেরই রচনা। যেমন, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দময়ন্তীবিলাপ কাব্য' (১৮৬৮) ও 'সম্বরণ-

পিতার নাম ব্রজনাথ। নিবাস নবদ্বীপের পূর্ব্বে শ্রীনগর পরগনায় কুজরবাগী গ্রামে।

[২] দীননাথের অপর বই হইতেছে দুইটি ছোট কাব্য—'প্রসূতি বিয়োগে তন্দ্রা সুত' এবং 'ত্রিশূল' (১৮৮৩), বল্লালচরিতের বঙ্গানুবাদ, এবং নিত্যানন্দের অনুচর উদ্ধারণ দত্তের জীবনী। 'ঊষাচরিত' (১৮৭৭) হইতেছে ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের জীবনী।

বিজয় কাব্য' (১৮৬৯)। ভারতচন্দ্র সরকারের[১] 'মদন-ভস্ম' প্রথম খণ্ডে (ঢাকা ১৮৬৬) পয়ার ছাড়া অন্য ছন্দেও অমিত্রাক্ষর-পদ্ধতি খাটানো হইয়াছে। যেমন,

বিভ্রম বিলাস নেত্রে সোহাগের গদ গদ
স্বরে-স্মিতময়মুখে—হায় সে কটাক্ষ স্মিত
হানিল হললোপম, ভব বিরহিণীকুলে।

গিরিশচন্দ্র বসুর সাত সর্গ 'স্বর্গভ্রষ্ট কাব্য' (১৮৬৯)[২] মিল্‌টনের মহাকাব্যের ভাবানুবাদ। মিল্‌টনের ভাব ও মধুসূদনের ভাষা চরম দুর্গতি পাইয়াছে এই রচনাটিতে। উৎকট রচনার একটু নমুনা,

তোষামোদ প্রিয় সেই স্বর্গের অধীপ,
তাতেই উন্নতি দেখ কিঙ্কলুক পায়,
পরাজিত বর্করাট বরুড় বরুত্রে
হয়েছে এখন,

ইহার অনেককাল আগে গিরিশচন্দ্র ইংরেজি হইতে হোমরের ইলিয়দের প্রথম সর্গ বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন (১৮৩৭)।

এই বইটির সঙ্গে উল্লেখযোগ্য হইতেছে গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ষোড়শ-সর্গময় সুবৃহৎ 'ভার্গববিজয় কাব্য' (রচনা ১৮৭২, প্রকাশ ১৮৭৭)। সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারে লেখক একেবারে নিরঙ্কুশ। ভালোর মধ্যে এইটুকু যে উপসংহারে সমসাময়িক বাঙ্গালী কবিদের নাম এবং বাঙ্গালা ভাষার বন্দনা আছে।

ব্রজনাথ মিত্রের 'কাদম্বরী কাব্য'এ (১৮৬৯) মধুসূদনের অনুকরণ প্রায় আক্ষরিক। তিন সর্গে লেখা কাব্যটির বিষয় বাণভট্টের বর্ণিত কাহিনী নয়, ইহাতে "দ্বাপরকে ধর্ম্মরাজ, বারুণীর কন্যাকে কাদম্বরী করিয়া, তাহার সহিত কলির বিবাহ, অনন্তর তাহাদের রাজ্যাধিকার পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে।" রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'দানবদলন কাব্য'এর (১৮৭৩) বিষয় শুম্ভনিশুম্ভবধ-কাহিনী।[৩] অজ্ঞাতনামার 'যাদবনন্দিনী কাব্য'এ (১৮৮০) সুভদ্রাহরণ-কাহিনীর বর্ণনা আছে। মধুসূদনের অনুকরণ নিতান্ত মন্দ হয় নাই। কাব্যটি রোমান্টিক। তিনটি গান আছে, তাহার একটি বেন্ জন্‌সনের অনুবাদ। মিত্রাক্ষরে লেখা

[১] ইঁহার 'জানকী-প্রসঙ্গ' (ঢাকা ১৮৭৪) ছোট বই, অমিত্রাক্ষরে লেখা, মেঘনাদবধের চতুর্থ সর্গের অনুসরণ।

[২] নামপৃষ্ঠায় লেখকের নাম নাই। গ্রন্থনামের শীর্ষে আছে "Bose's Works Part I"। লেখক বোধ করি খ্রীষ্টান ছিলেন। হিন্দুধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মসমাজ দুইই তিনি ভালো চোখে দেখেন নাই।

[৩] আর্য্যদর্শনে রামচন্দ্রের কবিতা বাহির হইত।

অপর "কাব্য"এর মধ্যে নাম করিতে হয় অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অভিমন্যুবধ' (১৮৬৮) ও শ্যামাচরণ শ্রীমানীর 'সিংহলবিজয়' (১৮৭৫) ॥

৬

মধুসূদনের একাধিক কাব্য অনুকরণ করিয়াছিলেন রজনীনাথ চট্টোপাধ্যায়। ইঁহার 'রাধাবিলাপ' (১৮৭২) ব্রজাঙ্গনার অনুকরণ, 'বঙ্গাঙ্গনা কাব্য' (বরিশাল ১৮৭৬) বীরাঙ্গনার। অপর রচনা—'প্রবাসীবিলাপ' (ময়মনসিংহ ১৮৭৮) ও 'ভারতে উষা' (১৮৮৪)। ব্রজাঙ্গনার অপর অনুকরণের মধ্যে অন্তত তিনখানি বাহির হইয়াছিল ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে—সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'রাধিকাবিলাপ', শ্রীকণ্ঠ সরকারের 'ব্রজেশ্বরী কাব্য' এবং নরনারায়ণ রায়ের 'গোপাঙ্গনা কাব্য'। বীরাঙ্গনার অনুকরণে "কাব্য" লেখা হইয়াছিল—রামকুমার নন্দীর 'বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর', প্রসন্নকুমার নাগের 'রাজপুতাঙ্গনা', গুরুনাথ সেনগুপ্তের 'বীরোত্তর' (১৮৮৩), যাদবানন্দ রায়ের 'বীরসুন্দরী' (১৮৮৪), অম্বিকাচরণ গুপ্তের 'পত্রাষ্টক' (১৮৮৫), ইত্যাদি।

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর প্রথম অনুকরণ 'কবিতাবলী' (১৮৬৭)-রচয়িতা রামদাস সেনের (১৮৪৫-৮৭) 'চতুর্দ্দশপদী কবিতামালা' (১৮৬৭)। রামদাস বঙ্গদর্শনে পুরাতত্ত্ববিষয়ক নিবন্ধ লিখিতেন। রাধানাথ রায়ের 'কবিতাবলী'তে (দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৭৩) এবং রাজকৃষ্ণ রায়ের 'বঙ্গভূষণ'এ (১৮৭৩) মধুসূদনের চতুর্দ্দশপদীর অনুকরণ আছে।

মেঘনাদবধের প্যারডি জগবন্ধু ভদ্রের (১৮৪২-?) 'ছুছুন্দরীবধ কাব্য' নামক কবিতা। ইঁহার 'ভারতের হীনাবস্থা' (১৮৬৬) মিত্রাক্ষরে লেখা, 'তপতী-উদ্ধার' অমিত্রাক্ষরে। 'দেবলদেবী' (বহরমপুর ১৮৭০) নাটক। শিক্ষিত সমাজে বৈষ্ণব গীতি-কবিতা পরিবেশন করিয়াছিলেন জগবন্ধু সর্ব্বপ্রথম 'মহাজনপদাবলী সংগ্রহ' (প্রথম ভাগ প্রথম সংখ্যা, কুমারখালী ১৮৭৪, দ্বিতীয় সংখ্যা ১৮৭৫) ও 'ব্রজগাথা' (১৮৭৪) প্রকাশ করিয়া। ইনি নিজেও বৈষ্ণবপদাবলী লিখিয়াছিলেন। 'গৌরপদতরঙ্গিণী'-র (১৩১০) সঙ্কলন ইঁহার বড় কাজ ॥

৭

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৫-৮৬) বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধু এবং বঙ্গদর্শনের বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। ইঁহার কবিতা যাহাকে বলে "সাধু" এবং নীতিগর্ভ। ইঁহার কবিতার বই—রূপক কাব্য 'যৌবনোদ্যান' (১৮৬৮), 'মিত্রবিলাপ ও অন্যান্য কবিতাবলী' (১৮৬৯), 'কাব্যকলাপ' (১৮৭০), 'কবিতামালা' (১৮৭৭) ইত্যাদি। একদা সমাদৃত মিত্রবিলাপ টেনিসনের বিখ্যাত শোচক-কাব্য 'ইন্ মেমোরিয়াম্'এর অনুসরণে লেখা। রাজকৃষ্ণের লেখায় মাঝে মাঝে চলনসই কবিত্ব আছে। যেমন, 'নিশাকালে বিহঙ্গমরব'এর শেষ দুই স্তবক,

চন্দ্রকরে যেমন কাননে,
যেখানে আলোক হাসে, অন্ধকার তার পাশে,
সেইরূপ সুখ দুঃখ মানব জীবনে ;
আমাদের সুখের সহিত
চিরকাল যন্ত্রণা মিশ্রিত,
মধুর সঙ্গীতালাপ বিষের জ্বলনে।

এ সংসার-সরসীর জলে,
এক বৃন্তে পুষ্পদ্বয়, ফুটে সুখ দুঃখময়,
কেহ না তুলিতে পারে একটি কমলে,
একের আশায় নীরে গিয়া
উঠে হাতে দুইটি জড়িয়া
ভ্রমে উভয়ের হার পরে লোকে গলে।

রাজকৃষ্ণ মেঘদূতের অনুবাদ করিয়াছিলেন (১৮৮২) এবং স্বগ্রামের জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়া গদ্যে 'রাজবালা' আখ্যায়িকা (১৮৭০) লিখিয়াছিলেন। রাজকৃষ্ণের তথ্যগর্ভ যুক্তিপ্রতিষ্ঠ প্রবন্ধগুলি বঙ্গদর্শনের মূল্যবৃদ্ধি করিয়াছিল। এগুলি 'নানা প্রবন্ধ' নামে সঙ্কলিত (১৮৮৫)। বিদ্যাপতির কবিতা ও জীবনী লইয়া রাজকৃষ্ণ সার্থক গবেষণা করিয়াছিলেন॥

৮

আধুনিক কালে বাঙ্গালী মহিলা কবি প্রথম দেখা দিয়াছিলেন সংবাদ-প্রভাকরের পৃষ্ঠায়, কিন্তু তাঁহাদের নাম ছাপা হইত না বলিয়া ঠিকমত ধরিবার উপায় নাই। মহিলার লেখা প্রথম বই কৃষ্ণকামিনী দাসীর 'চিত্ত-বিলাসিনী' (১৮৫৬)। 'কবিতামালা' (১৮৬৫) অজ্ঞাতনামা লেখিকার। তাহার পর কৈলাসবাসিনী দেবীর 'বিশ্বশোভা' (১৮৬৯), অন্নদাসুন্দরী দেবীর 'অবলাবিলাপ' (১৮৭২), ইন্দুমতী দাসীর 'দুঃখমালা' (১৮৭৪), অজ্ঞাতনাম্নীর 'কুসুমমালিকা' (১৮৭১), বিরাজমোহিনী দাসীর 'কবিতাহার' (১৮৭৬), ভুবনমোহিনী দেবীর 'স্বপ্নদর্শনে অভিজ্ঞান' (১৮৭৮), নবীনকালী দেবীর 'শ্মশানভ্রমণ' (ভবানীপুর ১৮৭৯), কামিনীসুন্দরী দাসীর 'কল্পনাকুসুম' (১৮৮১), ইত্যাদি। মুসলমান মহিলার লেখা প্রথম বাঙ্গালা বই, ফৈজুন্নিসা চৌধুরাণীর 'রূপ-জালাল' (ঢাকা ১৮৭৬) গদ্যে-পদ্যে লেখা প্রণয়মূলক আখ্যায়িকা॥

৯

ইংরেজি হইতে অনূদিত কাব্য কয়েকটির উল্লেখ আগে করিয়াছি। অনেক দিন ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়-পাঠ্য ছিল বলিয়া পার্নেলের 'হার্মিট্' অনেকেই বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন। সর্ব্বাগ্রে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, তাহার পর অপরে। যেমন, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ও অদ্ভুত-রামায়ণ ইত্যাদির অনুবাদক হরিমোহন গুপ্তের 'সন্ন্যাসীর উপাখ্যান' (১৮৫৯)[১], লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর 'সন্ন্যাসী অথবা সুখলাভ বিষয়ক রূপক' (দ্বি-স ১৮৬৪) এবং ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'সন্ন্যাসীর উপাখ্যান' (১৮৭০)। গোল্ড্স্মিথের 'হার্মিট' অনুবাদ প্রথমে করিয়াছিলেন রঙ্গলাল, তাহার পর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 'প্রমোদকামিনী' (১৮৭১) নামে। পোপের 'এসে অন্ ম্যান্'এর অনুবাদ হইতেছে কালীমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'মানবতত্ত্ব' (১৮৭২) এবং দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়ের 'মানবতত্ত্ব কাব্য' (বরাহনগর ১৮৭৫)। রাখালদাস সেনগুপ্তের 'শেষ বন্দীর গান' (১৮৭৫) স্কটের 'লে অব দি লাষ্ট মিন্‌ষ্ট্রেল্'এর অনুবাদ। অজ্ঞাতনামা লেখকের 'পরী ও স্বর্গ (১৮৭৬)

[১] প্রথমে 'তপস্বী' নামে অরুণোদয়ে বাহির হইয়াছিল। গোবিন্দচন্দ্র শীলের 'সন্ন্যাসীর উপাখ্যান' (প্রথম খণ্ড ১৮৫৭) এবং কেদারনাথ দত্তের 'সন্ন্যাসী'-ও (১৮৬৪ ?) উল্লেখযোগ্য।

মূরের 'লাল্লা রুখ্'-এর অনুবাদ। সুরেশচন্দ্র মিত্রের 'পদ্যকুসুমাবলি'তে (১৮৭৬) গোল্ড্স্মিথের 'ডেজার্টেড্ ভিলেজ্', গ্রের 'এলিজি' ও কূপারের 'ভার্সেস বাই আলেকজাণ্ডার সেল্কার্ক' অনূদিত আছে। মহিমচন্দ্র গুপ্তের 'সুখধাম বিনাশ' (প্রথম খণ্ড, ময়মনসিংহ ১২৮৯) 'প্যারাডাইজ্ লষ্ট'-এর অনুবাদ। ইংরেজি হইতে অনূদিত কবিতার বইয়ের মধ্যে মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কাব্যমঞ্জরী' (১৮৭৭) এবং বনমালী ঘোষের 'কবি উপাখ্যান' (ঐ) উল্লেখযোগ্য।

সংস্কৃত কাব্যের কয়েকটি অনুবাদের কথা আগে বলিয়াছি।[১] আরো কয়েকটি—হরিমোহন কর্ম্মকারের 'কুমারসম্ভব' (১২৬৫),[২] শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'অজবিলাপ' (১৮৬৭ ; রঘুবংশ অষ্টম সর্গ অবলম্বনে), রাধারমণ অধিকারীর 'দগ্ধমদন' (১৮৭৭ ; কুমারসম্ভব অবলম্বনে), ইত্যাদি॥

[১] পৃ ২০ দ্রষ্টব্য।

[২] ইহাই বোধকরি কালিদাসের কাব্যের প্রথম বঙ্গানুবাদ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উপন্যাসের সূত্রপাত

১

গদ্যে, পদ্যে অথবা গদ্যে-পদ্যে লেখা গল্পকাহিনী-আখ্যায়িকা সকল দেশের পুরাতন সাহিত্যে প্রচলিত ছিল। পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে এইসকল আখ্যায়িকা সাধারণত দেবতামাহাত্ম্যখ্যাপক কাব্যেই পাওয়া যায়। ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম হইতেছে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আরাকান-রাজসভার আশ্রয়ে রচিত রোমান্টিক আখ্যায়িকাগুলি। দীর্ঘকাল ধরিয়া এই ধারা মুসলমানদিগের মধ্যে চলিয়া আসিলেও সাধারণ সাহিত্যে গৃহীত হয় নাই। মুসলমান কবিদের হাতেও রোমান্‌স্‌গুলির বিশুদ্ধতা রক্ষিত হয় নাই। কাহিনীর মধ্যে অনেক সময় আধ্যাত্মিক রূপকের অর্থ ভরিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন বাঙ্গালার নবাব কার্য্যত স্বাধীন হইয়াছে, বিশেষ করিয়া তখন হইতে ভাগীরথীতীরে শহর-অঞ্চলে ধনী পরিবারে নবাব-দরবারের উজ্জ্বল বিলাসিতার নিরর্থ অনুসরণ শুরু হয়। অনতিবিলম্বে বিলাতি বণিকের সঙ্গে কারবার করিয়া অথবা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আনুকূল্য করিয়া কয়েকটি বাঙ্গালী পরিবার ধনী হইল এবং ভাগীরথীর ভাটিতে নূতন নাগরিক "সভ্যতা"র পত্তন করিতে করিতে অবশেষে কলিকাতায় আসিয়া স্থিত হইল। এই নব-ধনীদের সভাকবি ভারতচন্দ্র। তাঁহার প্রভাবে (মধুসূদনের ভাষায়) যে "vile school of poetry" গড়িয়া উঠিল তাহার প্রকোপে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে অনেক দিন ধরিয়া নবীন কবিতার অঙ্কুর গজাইতে পারে নাই। কিন্তু ভূত হইয়াও প্রাচীন কবিতা আর বেশি দিন ভর করিয়া রহিতে পারিল না। উদীয়মান গদ্যরীতির কাছে আদিরসাত্মক পদ্যরীতি পদে পদে হার মানিতে লাগিল। সাধারণ পাঠকের রুচি গদ্যকাহিনীতে শোধরাইবার সুযোগ পাইল।

"নভেল" বা উপন্যাসের আবির্ভাব সাহিত্যের ইতিহাসে আধুনিক ঘটনা। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সভ্য মানুষের সংস্কৃতি একটি বিশেষ পর্য্যায়ে ওঠে নাই ততদিন উপন্যাসের সম্ভাবনা হয় নাই। পাশ্চাত্য দেশে যখন ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি জাগ্রত হইল—অর্থাৎ মানুষ আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাস ছাড়িয়া ঐতিহাসিক ঘটনাপরম্পরায় অথবা প্রত্যক্ষ ও আন্বীক্ষিক জ্ঞানে লব্ধ আধি-

ভৌতিক কার্য্যকারণের উপর আস্থাবান্ হইল—তখনই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে আধুনিক দৃগ ভঙ্গির উদয়। তদনুযায়ী সাহিত্যসৃষ্টিও নূতন রূপ লইল, নভেলে। দেবদেবী যক্ষরক্ষ রাজারানী ছাড়িয়া সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের জীবনের বর্ণহীন কাহিনীতে পাঠকের কৌতূহল জাগিল। টাইপ বা অতিব্যক্তির এবং হীরো বা অতিমানবের স্থান লইল সাধারণ লোক, যে বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের বা শ্রেণীর মুখপাত্র নয়, যে নিজেরই প্রতিনিধি।

সাহিত্য-ইতিহাসে এই দৃক্‌কোণ-পরিবর্ত্তনের আভাস ইংরেজি সাহিত্যে রোমান্টিক আন্দোলনের আগেই দেখা গিয়াছিল। তবে কবিতায় কোল্‌রিজ-ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-বায়ন্-শেলি-কীট্‌স্ ও পদ্যে-গদ্যে স্কট এই নব-রোমান্টিকতাকে জমাইয়া তুলিয়াছিলেন। এই নব-রোমান্টিকতার রস আর পঞ্চতন্ত্র জাতক কথাসরিৎসাগর বেতালপঞ্চবিংশতি আরব্য-উপন্যাস রবিন্‌সন ক্রুসো প্রভৃতি গল্প-উপকথার রস এক নয়। উপকথা শিশুমানসের রোমান্‌স্। বয়স হইলেও মানুষের শিশুত্ব কখনোই সম্পূর্ণরূপে ঘোচে না বলিয়া উপকথার মহার্ঘ্যতা কখনো কমে না। উপকথায় রূপেরই প্রাধান্য রসের নয়, রস যেটুকু আছে সেটুকু একান্ত-ভাবে রূপকেই আশ্রয় করিয়া। উপকথায় বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার বাধ্যবাধকতা নাই। কল্পনা সেখানে বাস্তবের অনুগত নয়, বাস্তবই কল্পনার অনুগত। তাই অভিজ্ঞতার কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ সেখানে শিথিল। উপন্যাসের রস তেমন নয়। এখানে কল্পনা যতই কমনীয় হোক তাহাকে বাস্তবের সম্ভাব্যতা মানিয়া চলিতেই হইবে। তবে উপকথার আর উপন্যাসের মাঝামাঝি আমরা যে ঐতিহাসিক রোমান্‌স্ পাই তাহাতে কাহিনীর কালগত সুদূরতা আখ্যানবস্তুর সম্ভাব্যতার দৃঢ়বন্ধন খানিকটা শিথিল করে বলিয়া সেখানে কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে সংঘর্ষ এড়ানো যায়। ঐতিহাসিক রোমান্‌স্ তাই উপকথা ও উপন্যাসের মাঝের জিনিষ। এখানে রূপের আর রসের প্রাধান্য সমান সমান।

এই প্রসঙ্গে রোমান্টিকতা (রোমান্টিসিজ্‌ম্) কথাটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সভ্যতার ইতিহাসে মানুষের চিদ্‌বৃত্তিপ্রকাশের তিনটি স্তর—রোমান্টিক, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক। রোমান্টিক কল্পনা চলে কালানুক্রম ও বাস্তব-কার্য্যকারণপরম্পরাকে পাশ কাটাইয়া, ঐতিহাসিক বিবেচনা হয় কালানুক্রম ধরিয়া, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ খাটে বাস্তব-কার্য্যকারণপরম্পরার উপর নির্ভর করিয়া। ঐতিহাসিক বিবেচনা ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মধ্যে তফাৎ কম। কেন না কালানুক্রমিকতার উপরেই কার্য্যকারণবোধ নির্ভর করে। রোমান্টিকতা

কালাতিশায়ী। রোমান্টিক ঈপ্সা হইতেছে অনির্ব্বচনীয় ইষ্টের উদ্দেশে ইমোশনের অভিসার। এই ঈপ্সা চিত্তের সৃজনী অথবা গ্রহণী বৃত্তির দ্বারা উদ্বুদ্ধ। কবি যখন কাব্য রচনা করেন ঔপন্যাসিক যখন উপন্যাস লেখেন তখন চিত্তের সৃজনী বৃত্তি ক্রিয়াশীল। আর পাঠক যখন সেই কাব্য বা উপন্যাস পড়িয়া রস পান তখন চিত্তের গ্রহণী বৃত্তি কাজ করে। গ্রহণী বৃত্তিও একরকম সৃজনী বৃত্তি, তবে তাহা নূতন পথে চলে না, পুরানো পথে নূতন করিয়া চলে।

বাস্তব-দৃষ্টির সঙ্গে রোমান্টিক-দৃষ্টির পার্থক্য কালগত। বাস্তব বর্ত্তমান কালের বিষয়। বস্তুর প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতা, তাহার সাক্ষাৎ প্রতিক্রিয়াই বাস্তব-দৃষ্টিগোচর। রোমান্টিক-দৃষ্টির বিষয়ও সম্পূর্ণভাবে বস্তুগত এবং প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত হইতে পারে, কিন্তু সে দৃষ্টি বাস্তব-দৃষ্টির মত সাক্ষাৎ ও স্বচ্ছ নয়, তাহা কালাতীত ভাবনার ইমোশনের রঙে রঞ্জিত হইয়া ভবিষ্যতের পানে প্রসারিত। সুতরাং সাহিত্যে রিয়ালিজ্‌ম্-রোমান্টিসিজ্‌মের মৌলিক বিরোধের কথা উঠিতে পারে না। সাহিত্যসৃষ্টির ধাতই রোমান্টিক। তবে তাহাতে সাহিত্যস্রষ্টার জীবনদৃষ্টির যতটুকু থাকে তাহাতে বাস্তবের পরিমাণ লইয়াই রিয়ালিজ্‌মের ও রোমান্টিসিজ্‌মের মাত্রা নির্দ্ধারণ করা চলে।

সুতরাং ইংরেজি সাহিত্যে যেমন বাঙ্গালা সাহিত্যেও তেমনি, রোমান্টিকতা উপন্যাসের পক্ষে অপরিহার্য্য। আধুনিক কালে সাহিত্যে যাহা আমরা রিয়ালিজ্‌ম্ বা বাস্তবতা বলি তাহা রোমান্টিকতার পরিণাম মাত্র। সাহিত্যে বাস্তবতার সঙ্গে রোমান্টিকতার কোন বিরোধ নাই। বিষয়বস্তুর বাস্তব বিচার-বিশ্লেষণ তখনই সাহিত্যের সামগ্রী হইয়া উঠে যখন তাহা রসপরিণতি লাভ করে। নতুবা তাহা বিজ্ঞানের বিষয় হইয়াই থাকিবে। বিষয়বস্তুকে রস-পরিণতি দিতে পারে শুধু কবিকল্পনা অর্থাৎ রোমান্টিক দৃগ্‌ভঙ্গি। অবশ্য এখানে কল্পনার রোমান্টিকতার সঙ্গে যে অনেকখানি বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি মিশিয়া থাকে সেকথা স্বীকার করি, কিন্তু রোমান্টিকতার আবরণকেও তো উপেক্ষা করা যায় না। তিক্ত বটিকার মিষ্ট-মোড়কের মত তাহাই বিষয়বস্তুকে রসবান্ করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বাঙ্গালা উপন্যাসের উৎপত্তি না হইবার হেতু প্রধানত তিনটি—(১) গদ্যরীতি তখনও পরিণত রসবাহী রূপ পায় নাই, (২) ইংরেজি নভেলের সহিত পরিচয় তখনো গাঢ় হয় নাই, এবং (৩) পূর্ব্বরাগ অর্থাৎ বিবাহের পূর্ব্বে অনূঢ়ার প্রেম এবং অনুরাগ অর্থাৎ বিবাহিতা (বিধবা)

যুবতীর প্রেম তখনও সমাজচেতনায় অভ্যস্ত হয় নাই। বিবাহিতার প্রেম সম্ভব হইল বিধবাবিবাহ আইন পাস হইবার পর হইতে। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস—রোমান্‌স্ নয়—বিষবৃক্ষই তাহার প্রমাণ। পূর্ব্বরাগঘটিত রোমান্‌স্—অনূঢ়ার প্রেম—বাঙ্গালী-জীবনে তখন অসম্ভব ছিল, তাই ইতিহাসের দূর-পটভূমিকার আশ্রয় ছাড়া উপায় ছিল না॥

২

ইংরেজির আদর্শে বাঙ্গালা উপন্যাসের সৃষ্টি হইয়াছে সে কথা ঠিক, এবং গদ্যরীতি প্রতিষ্ঠা বাঙ্গালা উপন্যাসকে সম্ভাবিত করিয়াছিল তাহাও ঠিক। কিন্তু পুরানো সাহিত্যের ঊষর ভূমিতেও যে উপন্যাসের অঙ্কুর দেখা দিতেছিল তাহার প্রমাণ পাইয়াছি ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের একটি অপ্রকাশিত পুথিতে। এটি একটি বৃহৎকায় 'গৌরীমঙ্গল' কাব্যে সঙ্কলিত আখ্যায়িকা হইলেও সম্পূর্ণ পৃথক্ রচনা। নাম 'মধুমল্লিকাবিলাস'।[১] লেখক মধুসূদন চক্রবর্ত্তী নিজের বিবাহ-কাহিনী এই ছোট আখ্যায়িকা কাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন। স্ত্রীর নাম মল্লিকা। রচনাটিতে গার্হস্থ্য উপন্যাসের লক্ষণ বিদ্যমান। পদ্যে লেখা হইলেও বইটি উপন্যাসই, তাই একটু বিস্তৃত পরিচয় দিতেছি।

লেখক ও তাঁহার পত্নী পূর্ব্বজন্মে ছিলেন ইন্দ্রসভায় গন্ধর্ব্ব। তাঁহার পত্নীর উপর এক বিদ্যাধর অত্যাচার করে। গন্ধর্ব্ব তাহার নির্দ্দোষ পত্নীকে শাস্তি দেয়। সেই পাপে পদ্মলোচন গন্ধর্ব্বের জন্ম হইল নরলোকে।

হরিনারায়ণ চক্রবর্ত্তী মনোহরপুরে ঘর
এক দুহিতার পরে হৈল তিনটী কুঙর।
জ্যেষ্ঠ পুত্র গুরুপ্রসাদ মধ্যম বিপ্রদাস
কনিষ্ঠ গন্ধর্ব্ব হৈল হরগৌরীদাস।
অষ্টম গর্ভেতে জন্ম কি বলিব আর
পূর্ব্বপাপে নীলকান্তি হইল প্রচার।
বেদের বিচারে পদ্মলোচন রহে নাম
লোকাচারে মধুসূদন কৈল অনুপাম।

কয়বৎসর পরে গন্ধর্ব্বপত্নী পদ্মাবতীর জন্ম হইল। তিনিও অষ্টম গর্ভের সন্তান। এবং তাঁহারও রঙ কালো।

মধুসূদন পণ্ডিত সেনহাট গ্রামে
তিন পুত্র তাহার হইল ক্রমে ক্রমে।

[১] পুথিখানি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী এম্-এ কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

যদুনাথ জ্যেষ্ঠ তার মধ্যম ঈশ্বর
কনিষ্ঠ মহন্ত নাম এ তিন কুঙর।
দুই গত ষড় গর্ভে পদ্মার উৎপত্তি
শুভক্ষণে জন্মিল হইল নীলকান্তি।
বেদের বিচারে পদ্মাবতী রাখে নাম
লোকাচারে মল্লিকা করিল অনুপাম।

মধুসূদনের বয়স যখন আঠারো আর মল্লিকার বয়স যখন সাত তখন দুইজনের মধ্যে বিবাহের কথা উঠিল। মধুসূদনের মেজদাদার জামাই তিতুরাম ছিল মল্লিকার খুড়া। তিনিই শ্বশুরবাড়িতে থাকার সময় এ সম্বন্ধ আনিলেন। তিন দিন পরে তিতুরাম কলিকাতায় গেলেন এবং বিবাহসম্বন্ধের পয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিলেন। বাড়িতে ফিরিয়া সম্বন্ধের কথা তুলিলে মেয়ের মা কথা দিল কিন্তু পিতা ও অপরে খুশি হইল না।

বরের কলঙ্ক রটালে ঠাই ঠাই
শুনিঞা সভার মনে বরে ভায় নাঞি।
মল্লিকার তাত মধু দুঃখ পায়্যা মনে
বলে ছিছি ছারকপালায় বেটী দিব কেনে।

ভাবী জামাই মধুসূদনকে নিন্দা করার পাপে ভাবী শ্বশুর মধুসূদন শীঘ্রই মারা পড়িল। শুনিয়া ভাবী জামাই হায় হায় করিতে লাগিল এই বলিয়া

পিতা করে নান্দিমুখ শ্বশুর করে দান
তবেত বিবাহের বড় বাড়এ সম্মান।

শ্রাদ্ধশান্তি চুকিয়া গেলে কিছুদিন পরে মল্লিকার মা বড় ছেলের কাছে বিবাহের কথা তুলিল। যদু অমত করিয়া বলিল, বর সুবিধার নয়

পাগল বিভোল ভোলা শুনি পরস্পরে
কেমন করিয়া মাতা ভগ্নী দিব তারে।
চক্ষু টেরা বলে সভে দেই টিটকারি
না বুঝে সম্বন্ধ কৈল নির্ব্বাহিতে নারি।
যদ্যপি জননী তোর জামাতা যোগ্য হয়
পদ্মফুলের মাঝে যেন পাদকুড়া পোক রয়।

মা উত্তর করিল,

কানাকুজা হয় যদি বাক্য আছে মোর।

ছেলে মানিল না

যদু কহে যদ্যপি জামাই বর্ত্তী তারে
দেশে দেশে কলঙ্ক রটাবে নারী নরে।

মা বিচলিত হইয়া বলিল, তুমি নিজে গিয়া বরকে দেখিয়া আইস।

নয়ন থাকিতে কেনে শুনহ শ্রবণে
নিরখিয়া দেখহ পাইবে বিবরণে।

যদু রাজি হইল। মা মেয়েকে কোলে তুলিয়া লইয়া কাঁদিতে লাগিল,

হায় গো অভাগীর বাছা এই ছিল কপালে
কাণা খোঁড়া কুচ্ছিত বর তোমারে ঘটালে।
আমি কি করিব বাছা কপাল তোমার
দুঃখের উপরে দুঃখ সহ্য কি আমার।

বাড়ির মেয়েরাও বর দেখিতে চাহিল।

পড়শীর কাছে কন্যা কহে পরস্পর
সত্য কি ঘটিল মোর কাণা খোঁড়া বর।
কহেন সুন্দরী এহা কেমনেতে জানি
পরাপর তোমার বাপের ঘরে শুনি।
যতজন পুরবাসী একত্র মেলিয়া
বলে দূর কর দরিদ্রেরে দিব নাই মেয়া।
যদ্যপি সে ধার্য্য হয় নিন্দা নাক্রি থাকে
আঁখি ভরি দেখিয়া মল্লিকা দিব তাকে।

এ কথা বরের কানে যথাসময়ে গেল। মধুসূদনের মনে দুঃখ হইল, কৌতূহলও জাগিল।

শাশুড়ী সম্বন্ধী মেলি সকলে
কাণা বলে মোর নাম রটালে।
এতেক লাঞ্ছনা ছিল কপালে
এ দুখ আমার যাবে না মলে।
এতেক লাঞ্ছনা যাহার জন্যে
দেখিব সে জন কেমন কন্যে।

মধুসূদনকে সেনহাট আনা হইল। বর দেখিয়া সকলে পছন্দ করিল। খাওয়া-দাওয়ার পর কন্যা দেখিতে মধুসূদনের বাসনা হইল।

জ্যেষ্ঠ কন্যা আদরমণি তাহারে ডাকিয়া আনি
কহিলেন সব বিবরণ
আইলাম যেই জন্যে দেখাহ মল্লিকা কন্যে
তবে আমি জাই নিকেতন।
আদর পরিহাস্য করি কয় শুন বর মহাশয়
দরশন করিবে যদি তুমি
সঙ্গেতে চল আমার বাঞ্ছা পুরাব তোমার
দেখাব মল্লিকা নামে ভগ্নী।

মোহন পণ্ডিতের দ্বারে তথায় বস্যায়া বরে
মল্লিকা আনি করায় প্রদক্ষিণ
প্রদক্ষিণ হয়ে যার ভাব তার বুঝা ভার
কন্যার মায়া বড়ই কঠিন।

মেয়ে দেখিয়া পছন্দ খুবই হইল, মুখে মধুস্‌দনের অন্যরকম কথা।

অন্তরে ইচ্ছুক অতি বাহিরে না জাগে
ছলা করি কহে তিতুর পুরবাসী আগে।
বর বলে বৃদ্ধ মেয়ায় বিয়ায় কাজ নাই।
গয়নাগাঠী দেও ফিরে দেশে চলে যাই।
দেখিলাম সৌধার্য্য বটে তোমাদের কন্যে
এতেক লাঞ্ছনা মোর এ নারীর জন্যে।

সকলে হাসিয়া উঠিল।

টীটকারি দিয়া বরে কহে সর্ব্বজন
বুঝিব তোমার বাপে যাহ নিকেতন।

মধুস্‌দন বাড়ি ফিরিলে সকলে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,

ভাল করে দেখিলে ভায়্যা দেখিতে বটে ভাল
কতেক তোমার নিন্দা সত্য করি বল।

উত্তরে

বর কয় সে মেয়ে নয় মোর যোগ্য নারী
গবরা গেঁড়া মেয়ে লম্বা তার দাড়ি।
খেদে বলে খাঁদা সেটা পিচড়া মাথা তায়
কুচ্ছিত বরণ হেরে অঙ্গ জ্বলে যায়।

শুনিয়া

মাতায় বলে মাগনা পেয়ে ঘটালে সে নারীরে
বস্ত্র অলঙ্কার দ্রব্য আন গিয়া ফিরে।

মল্লিকাদের বাড়িতে বর লইয়া মতান্তর ঘটিল।

কেহ বলে ভাল বর কোন নিন্দা নাই
কেহ বলে দরিদ্রেরে বেটি দিতে নাই।
কেহ বলে গজচক্ষে দেখিতে না পায়
কেহ বলে বাক্য দিলে দেহ গিয়া তায়।

মেয়ের মা বলিল, বাড়ির কর্তা তিতুরামের যাহা মত তাহাই হইবে।

যদু ও শিবু তিতুরামের মত ফিরাইতে কলিকাতায় গেল। শিবু তিতুর কাছে বরের বিবিধ দোষ দেখাইয়া বলিল,

চাক্ষুষেতে না দেখিলে
ঘটকের কথায় ভুলে
ব্রাহ্মণেরে বাক্য দিলে
বৃদ্ধবসে হইলে বাতুল।

তিতুরাম বলিল, ব্রাহ্মণকে বাক্য দিয়াছি এখন উপায় কি। তাহা ছাড়া

শুনেছি লোকের ঠাঞি
বরের কোন নিন্দা নাই
কেবল তোমরা দুভাই
নিন্দা কর কেমন বিচার।

তিতুর কথায় শিবু রাগিয়া গেল।

জত কহে তিতুরাম
শিবু ক্রোধে কম্পবান
রাখহ তোমার মান
না থাকিব তব পরিবারে।

যৌথ সংসার ভাঙ্গিয়া যায় দেখিয়া তিতু নরম হইল। বলিল, তাহাদের বলিব কি? শিবু যুক্তি দিল, বল গিয়া যে আগে কানা বলিয়া জানিতাম না তাই কথা দিয়াছিলাম।

ইতিমধ্যে মধুস্থদনের বাপ মা কলিকাতায় আসিয়াছে। ভুবনকে তাহারা তিতুর কাছে পাঠাইল বিবাহের কথাবার্ত্তা কহিতে। ভুবন ফিরিয়া আসিয়া সম্বন্ধ ভাঙ্গার কথা জানাইল। বরের পিতামাতা ক্রুদ্ধ হইয়া ভুবনকে সেনহাটে পাঠাইতে চাহিল গয়নাগাঁঠি ফিরাইয়া আনিতে। ভুবন যাইবার সময় করিতে পারিতেছে না, শিবু-যদুর ভাই হরি বাড়ি আসিয়া

তর্জ্জন গর্জ্জন করি কহে পুরজনে
সম্মত না করিয়া সম্বন্ধ কৈলে কেনে।
ফের করিয়া দেহ ফিরে হুকুম কর্ত্তার
দিয়াছিল যত দ্রব্য বস্ত্র অলঙ্কার।

শুনিয়া সকলে কাঁদিতে লাগিল। মল্লিকার মা তখন

পড়িলে ব্রাহ্মণের কোপে কেন্দে কেন্দে বলে
না জানি কি ঘটে মোর ঝিয়ের কপালে।

কিছু গ্রাহ্য না করিয়া,

ডঙ্কা মারে ডিঙ্গরা হরি নাহি করে ডর
বস্ত্র অলঙ্কার মল্লিকার খসায় সত্বর।
মহাশোক মল্লিকার ডাড় হোলো দুহাথ
রচে হরগৌরীর দাস মল্লিকার নাথ ॥

অতঃপর মল্লিকার খেদ ও হরগৌরীর কাছে মধুসূদনের অন্তরের বেদনা জ্ঞাপন। পুথির বাকি পাতাগুলি না থাকায় কেমন করিয়া ভাঙ্গা সম্বন্ধ আবার জোড়া লাগিল তাহা জানা গেল না। যেটুকু পাইয়াছি নিতান্ত অপরিণত হইলেও তাহাতে গার্হস্থ্য উপন্যাসের অসন্দিগ্ধ বীজ বর্ত্তমান ॥

৩

বাঙ্গালা উপন্যাসের মূল খুঁজিতে গেলে তিনটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ধারার সন্ধান পাই। প্রথম ধারা হইতেছে লোকরঞ্জক নক্‌শা, যাহাতে টাইপ-বিশেষের অল্পবিস্তর স্বরূপ-চিত্রণ আছে। যেমন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বড়ায়ি চণ্ডী-মঙ্গলের ভাঁড়ুদত্ত ভারতচন্দ্রের হীরা প্যারীচাঁদের ঠকচাচা। এই ধারা যাহা বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী' এবং 'ইন্দিরা'কে স্পর্শ করিয়াছে তাহার পরিণতি নাটক-প্রহসনে। কোন কোন আখ্যায়িকায় বা গল্পেও এই ধারার অনুসরণ পাই। যেমন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত (১৮৫৫) "চরিতদর্শীর কথিত উপাখ্যান"।

দ্বিতীয় ধারা হইতেছে অদ্ভুতরসাত্মক উপকথা, আদিরসাত্মক পুরানো রোমান্টিক আখ্যায়িকা এবং নীতিমূলক কাহিনী। উইলিয়ম কেরির সঙ্কলন 'ইতিহাসমালা'র (১৮১২) কয়েকটি গল্পে এই ধারার সূত্রপাত। পরিণতি পাই এই বইগুলিতে—রামগতি ন্যায়রত্নের 'রোমাবতী' (? ১৮৬২), রামসদয় ভট্টাচার্য্যের 'অদ্ভুত উপন্যাস' (১৮৬১), হরিনাথ মজুমদারের 'বিজয়বসন্ত' (১৭৮১ শকাব্দ), কেদারনাথ দত্তের 'নলিনীকান্ত' (১৮৫৮) ও 'প্রিয়ম্বদ' (১৮৫৫), জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পারিজাত-বিকাশ' (১৮৬৩), দ্বারকানাথ রায়ের 'সুশীল মন্ত্রী' (১৮৫৬), জগদীশ তর্কলঙ্কারের 'বাসন্তিকা' (১৮৬০), কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'নীলাঞ্জন' (১৮৬০০), অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পুরঞ্জন' (১৮৬১), ইত্যাদি।

তৃতীয় ধারা হইতেছে ঐতিহাসিক কাহিনী। এগুলিতে কল্পনার খেলা কম। ইহার সূত্রপাত রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্যচরিত্র'এ (১৮০১) ও 'লিপিমালা'র

(১৮০২) কয়েকটি আখ্যায়িকায়, এবং পরিণতি প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়'এ (১৮৬৯) ॥

৪

মাইকেল মধুসূদন দত্ত যেমন নবীন কবিতার জন্মদাতা প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-৮৩) তেমনি গল্প-উপন্যাসের পথকর্ত্তা। বেতাল-পঞ্চবিংশতি তুতিনামা আরব্য-উপন্যাস গোলে-বকায়লি ইত্যাদির বাহিরেও যে গল্পরস থাকিতে পারে তাহা প্যারীচাঁদ দেখাইয়া দিলেন আলালের-ঘরের-দুলাল লিখিয়া। একজন সমসাময়িক সমালোচকের কথায়, "ইনিই বঙ্গভাষানুরাগীদিগের অন্তর হইতে 'বারাণসী নগরে প্রতাপমুকুট নামে', 'মিথিলা নগরে গুণাধিপ নামে' ইত্যাদি প্রকার পরম্পরাগত গৌরচন্দ্রিকাপ্রিয়তা দূর করিয়াছেন, এবং পাঠকসমূহকে নিতান্ত বালকগণের শ্রবণ-প্রিয় পিতামহীকথিত এক রাজা তার দো সো রাণীর গল্পের ন্যায় গল্পপাঠে অনর্থক কালাতিপাত হইতে নিবৃত্ত করিবার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।"

রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় প্যারীচাঁদ ক্ষুদ্রকায় 'মাসিক পত্রিকা' বাহির করিয়াছিলেন (১৮৫৪)। উদ্দেশ্য অল্পশিক্ষিত জনসাধারণকে বিশেষ করিয়া অন্তঃপুরবাসিনীদিগকে শিক্ষাছলে সাহিত্যরসের যোগান দেওয়া। তাই প্রবন্ধগুলির বিষয় ছিল লঘু চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ, আর রচনারীতি ছিল কথ্যভাষার অনুগত। লেখ্য ও কথ্য ভাষার এই মিশ্রণ-রীতিটাই ছিল মাসিক-পত্রিকার প্রধান বিশেষত্ব। পত্রিকাটির আদর্শ ছিল এই,—"এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্যে ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।" প্যারীচাঁদের প্রথম রচনাগুলি মাসিক-পত্রিকাতেই আগে বাহির হইয়াছিল।

প্যারীচাঁদের বাঙ্গালা বইগুলি সাধারণত "টেকচাঁদ ঠাকুর" এই ছদ্মনামে বাহির হইত। 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮, দ্বি-স ১৮৭০)[১], 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯, দ্বি-স ১৮৬৩)[২], 'রামারঞ্জিকা'

[১] বেশির ভাগ মাসিক-পত্রিকায় (১৮৫৫ হইতে) প্রথম বাহির হইয়াছিল।

[২] মাসিক-পত্রিকায় প্রথম বাহির হইয়াছিল।

(১৮৬০), 'যৎকিঞ্চিৎ' (১৮৬৫), 'অভেদী' (১৮৭১) ও 'আধ্যাত্মিকা' (১৮৮০) প্যারীচাঁদের প্রধান গল্পরচনা। 'গীতাঙ্কুর' (তৃ-স ১৮৭০) তাঁহার লেখা অধ্যাত্মসঙ্গীত-সংগ্রহ। প্যারীচাঁদের সব লেখাই শিক্ষাত্মক ও উদ্দেশ্যমূলক।

আলালের-ঘরের-দুলাল প্যারীচাঁদের সবচেয়ে সার্থক রচনা। বইটির নামেই উদ্দেশ্যমূলকতা ধরা পড়িয়াছে। যদিচ কাহিনীর ধারাবাহিকতা উপন্যাসের মতই তবুও বইটিকে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস বলা চলে না কয়েকটি কারণে। প্রথমত প্লট খাপছাড়া রকমের। দ্বিতীয়ত মূল কাহিনী প্রায়ই অবান্তর ঘটনায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তৃতীয়ত অধিকাংশ ভূমিকা অপরিণত, অস্ফুট অথবা ক্ষণিক। চতুর্থত নারী-ভূমিকাগুলি অত্যন্ত অবহেলিত। পঞ্চমত সাধারণ উপন্যাসে অপেক্ষিত প্রণয়রস একেবারেই নাই। আলালের-ঘরের-দুলালকে কতকটা ডিকেন্‌সের 'পিক্‌উইক্ পেপার্স'-এর মত চিত্রোপন্যাস বলা যাইতে পারে। এই ধরণের রচনার বৈশিষ্ট্য হইতেছে "এপিসোড্‌" বা অবান্তর আখ্যানগুলির মনোজ্ঞতা এবং ভূমিকা-চিত্রগুলির বর্ণোজ্জ্বলতা। কাহিনীর নায়ক বলিতে মতিলাল, কেন না বইটি তাহারই জীবন-ইতিহাস। কিন্তু ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে প্রধানত ঠক্‌চাচার দ্বারা। সেদিক দিয়া দেখিলে ঠক্‌চাচাই আসল নায়ক, এবং তাহা হইলে বইটি "পিকারেস্‌ক্" নভেলের পর্য্যায়ে পড়ে। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম অমর চরিত্র হইতেছে ঠক্‌চাচা, পুরানো সাহিত্যের ভাঁড়ুদত্তের পাশে তাহার স্থান সাহিত্যসৃষ্টির জনবিরল অমরাবতীতে।

ঠক্‌চাচার নাম একটা ছিল, লেখক তাহা একবার বলিয়াছেনও। তাহার পর সে নাম লেখক ভুলিয়া গিয়াছেন, পাঠকও খেয়াল করে না, যেহেতু ঠক্‌চাচা ছাড়া আর কোন নাম তাহার খাটে না। স্বামীর সহধর্ম্মিণী ঠক্‌চাচীর দেখা দৈবাৎ এক-আধবার পাওয়া যায়। এ ভূমিকাটি পরিস্ফুট করিলে বইটির মূল্য বাড়িত। "কর্ম্মকাজ শেষ হইলে গোসল ও খানা খাইয়া বিবির নিকট বসিয়া বিদ্‌রির গুড়গুড়িতে ভড়্‌র্ ভড়্‌র্ করিয়া তামাক টানিতেন। সেই সময়ে তাঁহাদের স্ত্রীপুরুষের সকল দুঃখ-সুখের কথা হইত। … ঠক্‌চাচী মোড়ার উপর বসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তুমি হররোজ এখানে ওখানে ফিরে বেড়াও—তাতে মোর আর লেড়কাবালার কি ফয়দা? :… রোপেয়া কড়ি কিছুই দেখি না, তুমি দেয়ানার মত ফের—চুপচাপ মেরে হাবলিতেই বসেই রহ। ঠক্‌চাচা কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন—আমি যে' কোশেশ করি তা কি বল্‌ব, মোর কেত্‌না ফিকির, কেত্‌না পেঁচ—কেত্‌না শেস্ত তা জবানিতে বলা যায় না,

শিকার দস্তে এল এল হয় আবার পেলিয়ে যায়।" শেষ পর্য্যন্ত এই "দস্তে এসে পেলিয়ে যাওয়া"-ই ঠক্‌চাচার মত বাস্তব পাষণ্ডের ট্রাজেডি। ঠক্‌চাচা জালিয়াৎ ও ফেরেববাজ বদমায়েস। কিন্তু সবশুদ্ধ সে জীবন্ত মানুষ এবং হৃদয়গ্রাহী চরিত্র। রামলালকে শিক্ষানুরাগী সংস্কারপন্থী ও সৎ দেখিয়া ঠক্‌চাচার উদ্বেগ শুধু লাভহানির আশঙ্কাজনিত নয়। সে যথার্থই বিশ্বাস করে যে "দুনিয়াদারি করতে গেলে ভালা বুরা দুই চাই—দুনিয়া সাচ্চা নয়—মুই একা সাচ্চা হয়ে কি কর্‌বো?"

শুধু ঠক্‌চাচা নয়, এটর্নি বট্‌লর্‌ তাহার কেরানী বাঞ্ছারাম মাষ্টার বক্রেশ্বর-বাবু প্রভৃতি ভূমিকাও সুচিত্রিত। বক্রেশ্বরবাবুর ভূমিকায় সর্ব্বকালিকত্বের স্পর্শ আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কলিকাতায় ও ভাগীরথীতীরবর্ত্তী শহরতলী অঞ্চলে মধ্যবিত্ত সমাজের কিছু খাঁটি খবর পাই আলালের-ঘরের-দুলালে, এ খবর আর কোথাও পাই না। দুইচারি ছত্রে সেকালের মানুষকে জীবন্ত করিয়া আঁকিয়াছেন প্যারীচাঁদ। "বাবুরাম বাবু চৌগোঁপ্পা—নাকে তিলক—কস্তাপেড়ে ধুতি পরা—ফুলপুকুরে জুতা পায়—উদরটি গণেশের মত—কোঁচান চাদরখানি কাঁধে—এক গাল পান"। সেকালের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের এমন ছবি আর পাই কোথায়। এইরকম ছবির পর ছবি চলিয়াছে আলালের-ঘরের-দুলালে। শুধু মানুষের প্রতিকৃতিতে নয় প্রকৃতি-বর্ণনায় এবং প্রকৃতির পটভূমিকায় মানবসংসারের আলিম্পনেও প্যারীচাঁদের রসদৃষ্টির পরিচয় আছে। যেমন,

> বৃষ্টি খুব এক পসলা হইয়া গিয়াছে—পথ ঘাট পেঁচ পেঁচ সেঁত সেঁত করিতেছে—আকাশ নীলমেঘে ভরা—মধ্যে মধ্যে হড়মড় হড়মড় শব্দ হইতেছে। বেংগুলা আশে পাশে ঘাঁওকোঁ ঘাঁওকোঁ করিয়া ডাকিতেছে। দোকানি পসারিরা ঝাঁপ খুলিয়া তামাক খাইতেছে—বাদলার জন্যে লোকের গমনাগমন প্রায় বন্ধ—কেবল গাড়োয়ান চীৎকার করিয়া গাইতে গাইতে যাইতেছে ও দাসো কাঁদে ভার লইয়া—"হাংগো বিসখা সে যিবে মথুরা" গানে মত্ত হইয়া চলিয়াছে। বৈদ্যবাটীর বাজারের পশ্চিমে কয়েক ঘর নাপিত বাস করিত। তাহাদিগের মধ্যে একজন বৃষ্টির জন্যে আপন দাওয়াতে বসিয়া আছে। এক একবার আকাশের দিকে দেখিতেছে ও এক একবার গুণ গুণ করিতেছে, তাহার স্ত্রী কোলের ছেলেটি আনিয়া বলিল—ঘরকন্নার কর্ম্ম কিছু খা পাইনে—হেদে! ছেলেটাকে একবার কাঁকে কর—এদিকে বাসনমাজা হয়নি ওদিকে ঘর নিকন হয়নি, তারপর রাঁদা বাড়া আছে—আমি একলা মেয়ে মানুষ এসব কি করে করব আর কোনদিগে যাব?—আমার কি চাট্টে হাত চাট্টে পা? নাপিত অমনি খুর ভাঁড় বগল দাবায় করিয়া উঠিয়া বলিল—এখন ছেলে কোলে করবার সময় নয়—কাল বাবুরাম বাবুর বিয়ে, আমাকে একক্ষুনি যেতে হবে।

পরবর্ত্তী বইগুলিরও মূল্য এইরকম ছবিতে, তবে তাহাতে ছবির সংখ্যাও কম আসিয়াছে এবং রঙও ফিঁকা।

রামারঞ্জিকা স্ত্রীশিক্ষামূলক। ইহার নিবন্ধগুলি মাসিক-পত্রিকার প্রথম সংখ্যা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং রামারঞ্জিকা প্যারীচাঁদের প্রথম রচনা। মদ-খাওয়া-বড়-দায়-জাত-থাকার-কি-উপায়ের অনেকগুলি প্রস্তাবও মাসিক-পত্রিকায় প্রথম বাহির হইয়াছিল। ইহার কয়েকটি প্রস্তাব সমসাময়িক দুই শ্রেষ্ঠ নাট্যকারকে প্রভাবিত করিয়াছিল।[১] যৎকিঞ্চিতে ক্ষীণ গল্পের সূত্রে অধ্যাত্মকথা বর্ণিত হইয়াছে।[২] অভেদী ও আধ্যাত্মিকা রূপক-উপন্যাস।[৩]

সাধুভাষাকে কথ্যভাষার ছাঁচে ঢালাই করিয়া প্যারীচাঁদ বাঙ্গালা গদ্যকে সরস এবং সহজ করিয়া গড়িতে চেষ্টা করিলেন। সে চেষ্টা একটু পরেই থামিয়া গেল। প্যারীচাঁদ ঢলিয়া পড়িলেন নীতি-উপদেশ ও অধ্যাত্মচর্চ্চার দিকে এবং তাঁহার ভাষাও ঝুঁকিল সাধুভাষার দিকে। এদিকে বিদ্যাসাগরী রীতির ধ্বনিগাম্ভীর্য্যে বাঙালীর কান ও মন তৃপ্ত ছিল। তাই আলালের-ঘরের-দুলালের ভাষা ও রীতি শুধু কৌতূহল জাগাইয়াই রহিল ॥

৫

সাহিত্যের ভাষা লইয়া এক্স্পেরিমেণ্ট করিলেন দুইজন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত কবিতায়, প্যারীচাঁদ মিত্র গল্পে। মাইকেল সাধুভাষাকে আশ্রয় করিলেন কিন্তু কথ্যভাষাকে পরিবর্জ্জন করিলেন না। তাঁহার ঝোঁক পড়িল ব্যঞ্জনবহুল শব্দের দিকে, কেননা ছন্দে তরলতার অপেক্ষা তরঙ্গ তাঁহার অভীপ্সিত। সুতরাং অপরিচিত আভিধানিক শব্দের প্রবেশ তাঁহার রচনা-রীতিতে বাধামুক্ত। প্যারীচাঁদ মিত্র কথ্যভাষাকে আশ্রয় করিলেন কিন্তু সাধুভাষার ঠাট পরিত্যাগ করিলেন না। প্যারীচাঁদের উদ্দেশ্য রচনাকে সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য এবং হৃদ্য করা। এইজন্য অপরিচিত আভিধানিক শব্দের কথা দূরে থাক পরিচিত তৎসম শব্দের প্রবেশ তাঁহার রচনায় নির্ব্বাধ ছিল না। একেবারে মুখের ভাষার তুচ্ছতা হইতে বাঁচাইবার জন্য যতটুকু প্রয়োজন তাহার বেশি সাধুভাষার শব্দ তিনি গ্রহণ করেন নাই। তবে প্যারীচাঁদ রচনাশিল্পী ছিলেন না। তাঁহার রচনা পরিমার্জ্জনাবর্জ্জিত। সেই কারণে প্যারীচাঁদের ভাষায় সাধারণ পাঠকের গতি সর্ব্বদা অকুণ্ঠিত নয়।

[১] বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য (তৃ-স) পৃ ৯০-৯১ দ্রষ্টব্য। [২] ঐ পৃ ৯২-৯৩। [৩] ঐ পৃ ৯৩-৯৪।

সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে কালীপ্রসন্ন সিংহ কথ্যভাষাকে—কথ্যভাষাকে বলিলে সবটুকু বলা হয় না, কলিকাতার বাসিন্দাদের উপভাষাকে—পূরাপূরি আশ্রয় করিয়া বেনামিতে 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' (১৮৬১-৬২) লিখিলেন। উদ্দেশ্য ছিল দুইটি, কলিকাতার উৎসব-সমাজ-সংসারের সরস ও বাস্তব বর্ণনা উপলক্ষ্যে কোন কোন ব্যক্তি ও পরিবারের প্রতি কটাক্ষ, এবং মধুসূদন ও প্যারীচাঁদ প্রভৃতির রচনারীতির উপরে টেক্কা দিয়া নূতন পদ্ধতির গদ্য সৃষ্টি। হুতোম-প্যাঁচার-নক্শার ভাষা বিশুদ্ধভাবে কথ্য-ভাষাশ্রিত সন্দেহ নাই। কিন্তু সে কথ্যভাষার সঙ্গে স্ল্যাঙ্ বা ইতর ভাষার প্রভেদ বড় সূক্ষ্ম, এবং সে সূক্ষ্মতা অনেক সময়ই লেখকের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। ভাষার জন্য হুতোম-প্যাঁচার-নক্শার মূল্য আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু সে মূল্য সাহিত্যিক ততটা নয় যতটা ঐতিহাসিক। এবং ঐতিহাসিকের কাছেই নক্শার বিবরণগুলি অতিশয় আদরণীয়। এই বইখানি আর কিছু উপকার না করুক বাঙ্গালা প্রহসন রচনাকে অনেকটাই প্রভাবিত করিয়াছে॥

৬

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (১৮২৫-৯৪) 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'এ (১৯১৯ সংবৎ)[১] কন্টারের 'রোমান্স্ অব্ হিষ্টরি—ইণ্ডিয়া' হইতে গৃহীত দুইটি কাহিনী আছে—'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয়-বিনিময়'।[২] প্রথমটি নিতান্ত সংক্ষিপ্ত, এবং সম্পূর্ণভাবে মূলানুগত। অঙ্গুরীয়-বিনিময় দীর্ঘতর রচনা। ইহার কাহিনী সবটাই রোমান্স-অব্-হিষ্টরির 'দি মাহ্রাট্টা চীফ্' গল্প হইতে গৃহীত নয়। ভূদেব গল্পটিকে নিজস্ব কল্পনায় একটি বিশেষ পরিণতির দিকে আগাইয়া লইয়া গিয়াছেন। আরংজেবের কন্যা রোসিনারা শিবজীর হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন এবং দুইজন পরস্পর অনুরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু অদৃষ্টের ফেরে এবং সমাজের খাতিরে তাঁহাদের অনুরাগ মিলনে সার্থক হইল না। ইহাই অঙ্গুরীয়-বিনিময়ের কাহিনী। বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনীতে যে অঙ্গুরীয়-বিনিময়ের প্রভাব পড়িয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না।[৩] শিবজীর সঙ্গে জগৎসিংহের বা ওসমানের কোনই মিল নাই বটে, তবে আয়েষা নিঃসন্দেহ রোসেনারার আদর্শে গঠিত

[১] ১৮৬২-৬৩; দ্বি-স ১২৭১।

[২] হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'জয়াবতীর উপাখ্যান'এর মূলও (বহরমপুর ১২৭০) কন্টারের বই থেকে নেওয়া।

[৩] বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য (তৃ-স) পৃ ৯৭-৯৮।

হুতোম প্যাঁচার নক্সা।

(প্রবন্ধ কল্পনা।)

প্রথম ভাগ।

ধর্ম্মাদিষু বহুপ্রোক্তং সারার্থং সুখ কণ্ঠয়াৎ।
প্রকাশায় চরিত্রানাং মনুষ্যানাম্ মুদা।
চিত্তবৃত্তেশ্চ সর্ব্বাশৈ প্রতিভা পরিমার্জ্জিতা।

কলিকাতা।

শঙ্কু প্রেস্

বসু কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রচারিত।

খবি পাড়া।

১৭৮৪।

পৃ ১৭০ক

তাহা। রামদাস স্বামীও অভিরাম স্বামীর আদর্শ। উভয়ত্রই নায়িকার অঙ্গুরীয় কাহিনীকে ঘুরাইয়াছে। আকারে অঙ্গুরীয়-বিনিময় বড় গল্পের মত, প্রকারে ইহাতে নভেলের সর্ব্বাঙ্গীণতা আছে। ঐতিহাসিক পরিবেশও ক্ষুণ্ন হয় নাই। শুধু ভাষার কাঠিন্যে ও দ্রুতবর্ণনার রসহীনতায় অঙ্গুরীয়-বিনিময় সাধারণ পাঠকের মনে ধরে নাই ॥[১]

৭

প্রচলিত একটি রূপকথাকে উপন্যাসের ছাঁচে ঢালিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন গোপীমোহন ঘোষ 'বিজয়বল্লভ'এ (১৮৬৩, দ্বি-স ১৮৮১)।[২] কাহিনী এই। অযোধ্যার রাজা জয়ধ্বজের দ্বিতীয় পত্নীর পুত্র হইলে প্রথম পত্নী চিকিৎসক পাতঙ্গির সাহায্যে ছেলেটিকে হত্যার চেষ্টা করে। মৃত বলিয়া নির্দ্ধারিত শিশুর দেহ সরযূর জলে পরিত্যক্ত হইলে এক জেলে তাহাকে বাঁচায়। মগধবাসী বণিক ধনপতি জেলের কাছ হইতে ছেলেটিকে কিনিয়া লইয়া পালন করে। এই ছেলে বিজয়বল্লভ। বড় হইয়া সে রাজপুত্র শান্তশীলের সহচর নিযুক্ত হইল। একদা রাজসভা হইতে ফিরিবার সময়ে বিজয়বল্লভ রাজবাড়ীর বাগানে ঢুকিয়া একটি পলাতক পোষা পাখী ধরে। পাখীটি রাজকুমারী চম্পকলতার। তখন উদ্যানে রাজকুমারী সখীদের সহিত বেড়াইতেছিল। বিজয়বল্লভ পাখীটিকে রাজকুমারীর হাতে দিতে যাইবে এমন সময় পিঞ্জরপলায়িত বাঘ আসিয়া রাজকন্যাকে আক্রমণ করে। বিজয়বল্লভ বাঘ মারিয়া রাজকন্যাকে বাঁচায়, এবং উভয়ের মনে প্রণয়সঞ্চার হয়। এদিকে অযোধ্যা হইতে বিতাড়িত হইয়া পাতঙ্গি আত্মগোপন করিয়া সোমদত্ত নাম লইয়া মগধরাজের সভাসদ্ হইয়াছে। বিজয়বল্লভের প্রতি তাহার বড় বিদ্বেষ, যেহেতু তাহাকে সে মারিতে পারে নাই। সোমদত্ত রটাইয়া দিল বিজয়বল্লভ নীচকুলোৎপন্ন। তাহার ষড়যন্ত্রে রাজার মন বিগড়াইল। ইতিমধ্যে বিজয়বল্লভ স্বপ্ন দেখিয়া ব্যাকুলমনে বাহির হইয়াছে মাতাপিতার খোঁজে। বিন্ধ্যাচলে গিয়া সে এক তান্ত্রিকের ছলনায় পড়িল। সেখানে তাহার উদ্ধারকর্ত্তা সেই বুড়ো জেলে তাহাকে জানাইয়া দিল যে তান্ত্রিক তাহাকে দেবীর কাছে বলি দিবে। সেখান হইতে পলাইয়া বিজয়বল্লভ অযোধ্যায় আসিল এবং দৈবের চক্রান্তে রাজরোষে পড়িয়া

[১] রাজনারায়ণ বসুর 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা' পৃ ৫২-৫৩ দ্রষ্টব্য।

[২] বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য (তৃ-স) পৃ ৭৯-৮৪।

কারারুদ্ধ হইল। এই সংবাদ মগধ-রাজসভায় পৌঁছিলে যুবরাজ শান্তশীল সসৈন্যে অযোধ্যায় আসিল বিজয়বল্লভের উদ্ধারে। প্রথমবার যুদ্ধে যুবরাজ হারিয়া গেল। তাহার পর বিজয়বল্লভ কারাগার হইতে পলাইয়া যুবরাজের সঙ্গে মিলিত হইল। দ্বিতীয়বার যুদ্ধে শান্তশীলের জয় হইল। খবর পাইয়া সোমদত্ত বিজয়বল্লভের অনিষ্টচেষ্টায় অযোধ্যায় আসিল। তাহার ষড়যন্ত্রে নিরস্ত্র বিজয়-বল্লভ ধরা পড়িয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল। তাহাকে শূলে চড়াইবার উদ্যোগ হইতেছে এমন সময় বুড়ো জেলে আর রাজবাড়ীর বুড়ো দাসী আসিয়া বিজয়-বল্লভকে জয়ধ্বজের পুত্র বলিয়া সনাক্ত করিল। সোমদত্ত আত্মহত্যা করিল। চম্পকলতার সহিত বিজয়বল্লভের বিবাহ হইল।

বিজয়বল্লভের রচনারীতি সম্পূর্ণভাবে বিদ্যাসাগরী, উপন্যাসের পক্ষে একেবারে অচল। বঙ্কিমের রচনায় বিজয়বল্লভের অল্পস্বল্প প্রভাব আছে মনে করি। কপালকুণ্ডলার কাপালিকের উপর বিজয়বল্লভের বিন্ধ্যাচলবাসী তান্ত্রিকের ছায়া আছে। বিষবৃক্ষের কুন্দনন্দিনীর স্বপ্ন আর বিজয়বল্লভের স্বপ্ন একেবারে সম্পর্কবিরহিত নয়। বিজয়বল্লভের কিছু সমাদর হইয়াছিল, দ্বিতীয় সংস্করণ তাহার প্রমাণ ॥[১]

৮

ইংরেজি উপাখ্যান প্রভৃতির অনুবাদ অনেককাল পূর্ব্বেই শুরু হইয়াছিল। এই কার্য্যে অগ্রণী হইয়াছিল বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ। ইঁহাদের বাঁধা বাঙ্গালী লেখক ছিলেন রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন এবং মধুসূদন মুখোপাধ্যায়। বঙ্গভাষানু-বাদক সমাজের প্রকাশিত এবং স্বল্পমূল্যে বিক্রীত অনেকগুলি আখ্যায়িকা বহুসমাদৃত হইয়াছিল। যেমন, জন রবিন্‌সনের 'রাবিন্‌সন ক্রুসোর জীবন-চরিত' (শ্রীরামপুর ১৮৫২), রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের 'গোপাল-কামিনী' (১৮৫৬), মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের 'সুশীলার উপাখ্যান' তিন ভাগ (১৮৫৯-৬০) ইত্যাদি।

খ্রীষ্টান লেখকেরাও ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে উপদেশাত্মক অনুবাদ-কাহিনী (অধিকাংশই পুস্তিকা) অনেক ছাপাইয়াছিলেন। এই বইগুলি প্রায়ই বিনামূল্যে বিতরিত হইত বলিয়া সহরে-পল্লীতে কিছু প্রসারলাভ করিয়াছিল। বাঙ্গালী

[১] গোপীমোহন ঘোষ একটি জ্যোতির্বিদ্যার বই লিখিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টান গদ্যলেখকদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরে সংস্কৃত কলেজের ছাত্র বিপ্রচরণ চক্রবর্ত্তীর নাম উল্লেখযোগ্য।[১] প্রথমে ইনি পদও লিখিতেন। নমুনা-রূপে একটি গান উদ্ধৃত করিতেছি। বিষয় যীশুর আগমনী—'ত্রাণারুণোদয়'

রজনী প্রভাত হৈল	যীশুখ্রীষ্ট আগমনে।
চল ২ বলে রাখাল	হেরিব তাঁহারে নয়নে।
আদম্ হাওয়া পাপ করিল,	তিমিরে জগত ব্যাপিল,
নরের মন ব্যাকুল হইল,	ঈশ্বরের বিধি উল্লঙ্ঘনে॥
ত্রাণহীন মানবে হেরে,	অঙ্গীকার করেন তারে,
তারক দিব তোমারে,	উদ্ধার পাবে তাঁর মরণে॥
ঈশ্বরবাক্য অনুসারে,	জন্মিলেন নারীর উদরে,
ত্রাণবারি লইয়া করে,	উদ্ধার পাবে তাঁর মরণে॥
দীন হীনে বলে ভাই,	চল খ্রীষ্টের কাছে যাই,
ত্রাণবারি ভিক্ষা চাই,	পান করিলে বাঁচিব প্রাণে॥[২]

মুসলমান খ্রীষ্টানের লেখা গদ্য আখ্যায়িকা হইতেছে সুজাত আলীর 'দুঃখিনী কন্যা' (১৮৬৩)।

আলোচ্য সময়ে অনুবাদমূলক আখ্যায়িকা যথেষ্ট লেখা হইয়াছিল। নাম করিবার মত হইতেছে স্কটের 'লেডি অব্ দি লেক্' অবলম্বনে অজ্ঞাতনামার 'অপূর্ব্ব কারাবাস' (১৮৭১), শেক্স্পিয়রের 'টুয়েল্ফ্‌থ নাইট্' অবলম্বনে কান্তিচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'সুশীলা-চন্দ্রকেতু' (১৮৭২), 'গালিভারস্ ট্রাভ্‌ল্স্'এর অনুবাদ উপেন্দ্রনাথ মিত্রের 'অপূর্ব্ব দেশভ্রমণ' (১৮৭৬), 'ডন্ কুইক্সোট্'এর অনুবাদ বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তীর 'অদ্ভুত দিগ্বিজয়' (প্রথম খণ্ড ১৮৮৭) এবং ফীল্ডিঙের 'এমেলিয়া'র অনুবাদ নন্দলাল দত্তের 'মন্মথ-মনোরমা' (প্রথম খণ্ড ১৮৭৭)। রেনল্ড্সের উপন্যাসের অনুবাদ এই সময়ে সাধারণ পাঠকের বেশ রুচিকর হইয়াছিল। রেনল্ড্সের সর্ব্বপ্রথম অনুবাদ হরিচরণ রায়ের 'লণ্ডন-রহস্য' (প্রথম খণ্ড মুর্শিদাবাদ ১৮৭১)। তাহার পর ফকিরচাঁদ বসুর 'উজীরপুত্র' (১৮৭২-৭৬) এবং ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের 'হরিদাসের গুপ্তকথা' বা 'আমার গুপ্তকথা' (১৮৭২-৭৩) উল্লেখযোগ্য। হুতোম-প্যাঁচার-

[১] হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীর কুৎসা রচনা করিয়া বিপ্রচরণ 'শিববৃত্তান্ত' (১৮৫৭) লিখিয়াছিলেন। ইঁহার অপর রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 'সত্যগুরু' (১৮৫৭) ও 'টমখুড়ো' (১৮৬৩)। ইনি কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তকও লিখিয়াছিলেন।

[২] উপদেশক পত্রিকা (ফেব্রুয়ারি ১৮৪৭) পৃঃ ৪৭।

নক্শার অনুসরণে কলিকাতার কথ্য ভাষায় লেখা এবং দেশি ছাঁচে ঢালা ও যথাসম্ভব পরিচ্ছন্ন রচনা বলিয়া হরিদাসের গুপ্তকথা দীর্ঘকাল ধরিয়া সমাদৃত ছিল, এবং বটতলার ছাপাখানা হইতে "গুপ্তকথা"-নামিত বহু তুচ্ছ অনুকরণ বাহির হইয়াছিল। ভুবনচন্দ্র রেনল্ড্সের অনেক উপন্যাসের এবং বিবিধ রোমহর্ষক ইংরেজি নভেলের অনুবাদ করিয়াছিলেন। এইধরণের অপর রচনার মধ্যে "গজপতি রায়"-এর 'মাধব-মোহিনী' (১৮৭৩) ও 'চন্দ্র-রোহিণী' (১৮৭৫)[১] উল্লেখযোগ্য। লেখকের আসল নাম গিরীন্দ্রকুমার দত্ত (১৮৪১-১৯০৯)। ইনি 'হীরালাল' নাটক (১৮৭৭) লিখিয়াছিলেন এবং ইংরেজি 'পাঞ্চ্'এর অনুসরণে 'বসন্তক' পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন (১৮৭৪-৭৬)।[২]

হুতোম-প্যাঁচার-নক্শার অনুকরণে বটতলা[৩] (অর্থাৎ সস্তা) ছাপাখানা হইতে অজস্র ইতরধরণের ছোট ছোট পুস্তিকা মুদ্রিত হইয়া অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত সাধারণ পাঠকের গল্পরসপিপাসা মিটাইত শতাব্দীর শেষ পাদে। পরেও এগুলির চাহিদা লোপ পায় নাই, দুই-চারিখানি এখনও ছাপা হয়। পুস্তিকাগুলির নামকরণ প্রায়ই হইত ছড়া ধরিয়া। যেমন ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত—হরিমোহন কর্ম্মকারের 'ওঠ ছুড়ি তোর বিয়ে', শ্যামাচরণ সান্নালের 'আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ', রাজকুমার চন্দ্রের 'দেক্‌কে শুনে আক্কেল গুড়ুম', সুরেশচন্দ্র দাস ঘোষের 'কি মজার ভেকেশন', নন্দলাল দত্তের 'অবাক্ কলি পাপে ভরা' ও 'আপনার মান আপনি রাখি', গোলাম হোসেনের 'কলির বৌ হাড়-জ্বালানী' (১৮৬৭), শেখ আজিমুদ্দীনের 'কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে' (১৮৬৮), ইত্যাদি ॥

[১] বই দুইখানির নামান্তর 'ঐতিহাসিক নবন্যাস' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। চন্দ্র-রোহিণী অংশত রহস্যসন্দর্ভে প্রথম বাহির হইয়াছিল।

[২] গিরীন্দ্রকুমার ছবি আঁকিতে পারিতেন। আলালের-ঘরের-দুলালের দ্বিতীয় সংস্করণে ও বসন্তকে তাঁহার রেখাচিত্রের প্রচুর নিদর্শন আছে। ইনি তিলোত্তমাসম্ভব-মেঘনাদবধ-বীরাঙ্গনার সচিত্র সংস্করণের জন্য কতকগুলি রঙীন ছবি আঁকিয়াছিলেন। চিত্রবিদ্যা বিষয়ে একটি পুস্তিকা ইনি লিখিয়াছিলেন। ব্রজলীলা বিষয়ে ইনি একটি গীতিনাট্যও লিখিয়াছিলেন। তাহা প্রকাশিত হয় নাই। গিরীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র রাধানাথ দত্ত মহাশয়ের কাছে এই তথ্য পাইয়াছিলাম।

[৩] 'বটতলার বেসাতি' (বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ প্রথম সংখ্যা) দ্রষ্টব্য।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিশ বছরের আয়োজন

১

বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের প্রকাশের পর হইতে রবীন্দ্রনাথের সাধনার প্রকাশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই বিশ বছর (১৮৭২-৯১) বাঙ্গালা সংস্কৃতির ও সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সময়। বাঙ্গালীর ইংরেজি শিক্ষা তখন অনেকটা ধাতস্থ, সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বস্বীকৃত, ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙ্গালীর কাছে চাকুরির দরজা খোলা। সিপাহীবিদ্রোহের পর দেশের শাসনব্যবস্থা অধিকতর সুশৃঙ্খল, রেল-টেলিগ্রাফের কল্যাণে ভারতবর্ষের প্রান্তগুলি সংহত ও সুগম, বাঙ্গালীর প্রেস্‌টিজের তখন উচ্চ বাজার-মূল্য।

পূর্ব্বের সময়কে যদি সংস্কার-পর্ব্ব নাম দিই তবে আলোচ্য সময়কে বলিব শিক্ষা-পর্ব্ব। পূর্ব্বের যুগে সাহিত্যের প্রবণতা ছিল সমাজ-সংস্কারের দিকে, বেড়া-ভাঙার দিকে। আলোচ্য যুগে সাহিত্যের প্রবণতা হইল চিত্ত-সংস্কারের দিকে, ঘর-গড়ার দিকে। বঙ্গদর্শনের সূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে এই যুগের তাৎপর্য্য অভিব্যক্ত। চিত্ত-সংস্কারের একটি বড় প্রকাশ হইল "জাতীয়"-বোধের উন্মেষে, স্বাধীনতাস্পৃহার জাগরণে। গদ্যে পদ্যে, নাটকে প্রবন্ধে, তর্কে অভিনয়ে, বেশে ব্যবহারে, চিন্তায় কর্ম্মে এই সময়ের যুগের মর্ম্মকথাটি প্রকাশোন্মুখ হইল।

এইখানে একটা অবান্তর কথা বলি। সম্প্রতি এই ভাবটা কোন কোন মহলে পুষ্ট হইতেছে যে উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী "জাতীয়"-জাগরণ তাহার স্বাধীনতাস্পৃহা সত্যকার কিছু নয়, এবং সিপাহীবিদ্রোহে যে বাঙ্গালী যোগ দেয় নাই সেটা তাহার অনপনেয় কলঙ্ক। একথা একেবারে অশ্রদ্ধেয়। মিউটিনিতে বাঙ্গালী যোগ দেয় নাই, তাহার কারণ বাঙ্গালী সিপাহী বলিয়া কিছু ছিল না এবং সিপাহীদের ষড়যন্ত্রে বাঙ্গালীর যোগ দিবার কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপলক্ষ্যও ছিল না। সত্য বটে যে শিক্ষিত বাঙ্গালী সিপাহী-বিদ্রোহে উল্লসিত হয় নাই, শঙ্কিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে লজ্জার কারণ নাই। সিপাহীবিদ্রোহের একটা প্রধান উপলক্ষ্য ছিল সমাজ-সংস্কারবিমুখতা।

ইংরেজ বিধবাবিবাহ আইন পাস করিয়াছে, সে আমাদের ইংরেজি শিখাইয়া বিদেশি-ভাবাপন্ন করিতেছে, সে আমাদের জাতিপাঁতিতেও হাত দিতে উদ্যত —এইসব ধারণাই উত্তরপশ্চিম ভারতে সিপাহীদের, লুটেরা গুণ্ডাদের ও অশিক্ষিত জনসাধারণের একটা বড় অংশকে উত্তেজিত করিয়াছিল। তাহাদের পিছনে ক্ষমতাশালী মতলববাজেরা তো ছিলই। সিপাহীদের জয়লাভ মানে আবার জীর্ণ মোগল-শাসনে ফিরিয়া আসা এবং প্রায় শতাব্দীব্যাপী প্রগতির প্রত্যাহার। শিক্ষিত বাঙ্গালীর কাছে এ চিন্তা অসহ। কিন্তু তাই বলিয়াই যে বিদ্রোহদমনের তীব্র অত্যাচারের সে প্রতিবাদ করে নাই তাহা নয়। দায়ে পড়িয়া যুদ্ধও করিয়াছে। সিপাহীবিদ্রোহে বাঙ্গালীর সহানুভূতির বড় প্রমাণ রজনীকান্ত গুপ্তের সুবৃহৎ 'সিপাহীবিদ্রোহের ইতিহাস' (প্রথম খণ্ড ১২৮৩)॥

২

এ সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যগুরু। বাঙ্গালীর সাহিত্যে এবং সংস্কৃতিতে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা সাধিত করিলেন তাহা এইভাবে নির্দ্দেশ করা যায়ঃ গদ্যের লঘুতর ও সরস রূপ-দান, ঐতিহাসিক এবং গার্হস্থ্য রোমান্‌স্ সৃষ্টি, নিরাবিল কৌতুক-রসের এবং শুচি রসবোধের প্রবর্ত্তন, পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে সাহিত্য-সমালোচনার পথনির্দ্দেশ, শিক্ষার আলোকদীপ্ত স্বাধীন-বুদ্ধির কষ্টিপাথরে হিন্দু ধর্ম্মের ও শাস্ত্রের মূল্যবিচার, "নব্য" হিন্দু ধর্ম্মের পক্ষাবলম্বন, সমাজ-চেতনা রাষ্ট্র-চেতনা এবং সাংস্কৃতিক চেতনার উদ্দীপন, এবং সর্ব্বোপরি পাঠক-চিত্তে সাহিত্য-রসতৃষ্ণা জাগানো।

বাঙ্গালা গদ্যে রসসঞ্চার ও উপন্যাসের রূপ-সৃষ্টি বঙ্কিমের প্রধান কৃতিত্ব।[১] প্রধানত ইহার দ্বারাই তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন জীবনস্পন্দন আনিয়াছিলেন। স্থূল পণ্ডিতি রসিকতা অথবা স্থূলতর গ্রাম্য ইতরতা (যাহা তখন কৌতুকরসের নামে চলিত) রহিত করিয়া দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ইতরতাবর্জ্জিত নির্ম্মল কৌতুকরসের স্বাদ যোগাইলেন। সর্ব্বপ্রকার অশুচিতা-অশ্লীলতার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের যে মজ্জাগত বিমুখতা ছিল তাহার একটি দীপ্ত কাহিনী রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে বলিয়াছেন। বঙ্গদর্শনে পুস্তক-সমালোচনায়ও বঙ্কিমের সুরুচি-প্রিয়তার প্রমাণ অবিরল নয়।

বাঙ্গালায় সাহিত্য-সমালোচনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র

১ বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য (তৃ-স) পৃ ১০৫-১১২ দ্রষ্টব্য।

বিবিধার্থসংগ্রহে। বঙ্গদর্শনে বঙ্কিম সমালোচনার নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন। শুধু ভালো-লাগা মন্দ-লাগা ধরিয়া নয়, কোন প্রাচীন অথবা নবীন অলঙ্কার শাস্ত্রের বিচারে নয়, নীতির ও শালীনতার দিক দিয়া সাহিত্যবিচার শুরু করিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু তাঁহার কাব্যরসবোধ খুব সূক্ষ্ম ছিল না, তাই কাব্যসমালোচনায় বঙ্কিম একেবারেই নির্ভরযোগ্য নন। তবে অক্ষম গল্প বা নাটক রচনার বিচারে তিনি ছিলেন সর্ব্বদা নির্ম্মম। এই জন্যই সেই ব্যাপক অনুকরণের কালে অনেক তুচ্ছ রচনা কালের সম্মার্জ্জনীর অপেক্ষা না করিয়া প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই অপসারিত হইয়াছিল।

বঙ্কিম পুরানো সংস্কৃতির আবহাওয়ায় মানুষ হন নাই। ইংরেজি শিক্ষায় তাঁহার মন গঠিত। প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম্ম ও সাহিত্যের প্রতি তাঁহার মনোভাব ইংরেজি-শিক্ষার ফলেই পাওয়া। আমাদের পুরানো সাহিত্য ইউরোপীয় সাহিত্যের কাছে হীন এ কথা স্বীকার করিতে সেকালের অধিকাংশ ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙ্গালীর মত তাঁহারও মন কুণ্ঠাবোধ করিত। তাই তিনি শেষজীবনে হিন্দু শাস্ত্রের আলোচনায় নিমগ্ন হইয়া তাহার বৈষম্য ও বৈরূপ্য মিলাইয়া দিয়া পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক-বিচারে গ্রহণযোগ্য করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। আমাদের ধর্ম্ম ও আচারের মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যাহা তুচ্ছ যাহা হীন যাহা বহুদিন কালবারিত। স্বাজাত্যগর্ব্বে লাগে বলিয়া বঙ্কিম একথা প্রকাশ্যে মানেন নাই। বাহিরে তাই উল্টা কথাই বলিয়াছিলেন এবং শশধর তর্কচূড়ামণি-ব্যাখ্যাত ও চন্দ্রনাথ বসু-প্রচারিত "বৈজ্ঞানিক" নব্য-হিন্দুত্বের দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন। ইংরেজি-শিক্ষা হজম করিয়াও বঙ্কিমচন্দ্র বিধবাবিবাহ-প্রচলন ও বহুবিবাহ-নিষেধের প্রতি বিমুখ ছিলেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিও প্রসন্ন ছিলেন না। সমাজ-সংস্কারের প্রতি বঙ্কিমের এই বিরূপতার একটি কারণ মনে হয় বিদ্যাসাগরের প্রতি অবচেতন ঈর্ষ্যা[১], আর একটি কারণ স্বাধীনচিন্তার প্রতিক্রিয়ার ঝোঁক। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি বঙ্কিমের বিমুখতার হেতু খুব স্পষ্ট নয়। সাধারণ বা ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজের কথা ছাড়িয়া দিই, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রভাবিত আদি ব্রাহ্মসমাজ দেশীয় আচারব্যবহার ও আধ্যাত্মিক আদর্শ

১ বাঙ্গালা গদ্যের প্রধান লেখক বলিয়া সর্ব্বস্বীকৃত বিদ্যাসাগরের প্রতিষ্ঠায় বঙ্কিম বহুবার সবলে এমন কি উষ্মার সহিত প্রতিবাদ করিয়াছেন। দ্বিতীয় বর্ষের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বহুবিবাহ প্রবন্ধ এবং প্যারীচাঁদ মিত্রের গ্রন্থাবলীর ভূমিকা দ্রষ্টব্য। "শ্রী অঃ" অর্থাৎ অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিত "তুলনায় সমালোচন" প্রবন্ধটির মূলেও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণা আছে।

মানিয়া চলিয়াছিল। তথাপি আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বঙ্কিমের মনোভাব অনুকূল না হইবার কারণ নিশ্চয়ই তাঁহার অধ্যাত্মচেতনার অভাব ও কবিচেতনার ক্ষীণতা। আদি ব্রাহ্মসমাজ বেদান্তপরায়ণ ছিল না, ছিল ধ্যানস্থির উপলব্ধিগভীর ভক্তিনিষ্ঠ, এবং তাহার শাস্ত্র ভগবদ্গীতা নয়, উপনিষদ্। উপনিষদের অধ্যাত্মচিন্তা বঙ্কিমের চিত্ত স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাই তিনি হিন্দুশাস্ত্রচর্চ্চায় উপনিষদকে বাদ দিয়া ভগবদ্গীতাকে ধরিলেন এবং কৃষ্ণচরিত্রের আলোচনায় ঐতিহাসিক পন্থা অবলম্বন করিলেন। অধ্যাত্মচেতনা না থাকায় তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্বে গভীর অনুভূতির স্থান হয় নাই। বঙ্কিমের সমর্থন ছিল পুথিগত নিষ্কামকর্ম্মে, ধ্যানগম্য আনন্দরসোপলব্ধির সন্ধান তিনি পান নাই। গীতার নৈষ্কর্ম্ম্যবাদের পিছনেও যে কতখানি ধ্যানধারণার ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির ভূমিকা আবশ্যক তাহা তিনি বিবেচনা করেন নাই। তাই শেষ তিন উপন্যাস আনন্দমঠ-দেবীচৌধুরাণী-সীতারামের মূল চরিত্রগুলি পুথিপড়া নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধ হইলেও মানুষের মত হয় নাই।

বঙ্কিমের উপন্যাস তাঁহার রূপকল্পনা-উদ্ভাবনা, জীবনভাবনার সৃষ্টি নয়। তাঁহার উপন্যাসে জীবনের প্রত্যক্ষ-উপলব্ধি অথবা সংসার-সমাজের বাস্তব-সমস্যা প্রতিফলিত হয় নাই। তাই বঙ্কিমের সৃষ্ট নরনারী শেষ পর্যন্ত রূপকল্পনা-লোকের অধিবাসীই রহিয়া গিয়াছে।

কর্ম্মে জ্ঞানে চিন্তায় শিক্ষিত বাঙ্গালীকে উদ্বুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া বঙ্কিম 'বঙ্গদর্শন' বাহির করিলেন (১৮৭২)। দেশের অতীত ইতিহাস ও প্রাচীন গৌরবের আলোচনা দ্বারা শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনে যাহাতে আত্মসম্মানবোধ সঞ্চারিত হয় সেই জন্য এই অধ্যবসায়। সেই সঙ্গে সমাজবোধ জাগাইবার চেষ্টাও রহিল। দেশের রাষ্ট্রীয় সংহতির অভাবের প্রতিও তিনি সচেতন ছিলেন। কিন্তু এবিষয়ের আলোচনায় প্রধান অন্তরায় তুই-পুরুষের সরকারি চাকুরি॥

৩

বঙ্কিম বাঙ্গালা উপন্যাসের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং শ্রেষ্ঠ লেখক। তাঁহার উপন্যাস বাহির হইবামাত্র বহু-অনুকৃত হইতে লাগিল। কেহ বা বঙ্কিমের কাহিনীকে উপসংহারের সমাধি খুঁড়িয়া পুনর্জ্জীবিত করিলেন। কেহ বা বঞ্চিত নায়িকাকে মিলাইয়া দিলেন। তুইচারিজন লেখক ভিন্ন পথ অবলম্বন করিবার মত

মৌলিকতা ও সাহস দেখাইয়াছিলেন। মধ্যমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের লেখায় ফুটিল নিপুণ সৌন্দর্য্যবোধ এবং অযত্নসম্ভূত সৃষ্টি-ঐশ্বর্য্য। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে দরিদ্র ভদ্র বাঙ্গালীঘরের পরিচিত দুঃখসুখের কাহিনী স্থান পাইল। প্রতাপচন্দ্র ঘোষ রীতিমত ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিলেন। রমেশচন্দ্র দত্তের রচনায় ঐতিহাসিক রোমান্স এবং মধুর সংসারচিত্র নূতন রঙ পাইল। শক্তিশালিনী লেখিকা দেখা দিলেন ॥

৪

আলোচ্য যুগে কবিতা-রচনা বহিয়াছিল ত্রিধারায়—(১) মধুসূদনের অনুকরণে ও অনুসরণে মহাকাব্যে ও খণ্ডকাব্যে, (২) ঈশ্বরগুপ্তের অনুসরণে ব্যঙ্গ কবিতায়, এবং (৩) নূতন সৃষ্ট রোমান্টিক গীতিকাব্যে। প্রথম ধারার প্রধান লেখক ছিলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন, দ্বিতীয় ধারায় হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃতীয় ধারায় বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী। বিহারীলালের রচনায় পূর্ব্বানুবৃত্তি থাকিলেও ইনি এই সময়ের যুগপ্রবর্ত্তয়িতা কবি। বিহারীলালের নূতনত্ব হইতেছে কাব্যে স্বানুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রকাশ ও প্রাধান্য।

আলোচ্য সময়ে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা হইল এবং নাটকের আবাদ চলিয়াছিল আরো জোরে। কয়েকজনের রচনা অভিনয়ে উৎরাইয়াছিল। সমাজসংস্কারঘটিত নাটকের চলন কমিয়া আসিল। তাহার স্থল লইল ব্যঙ্গাত্মক নাটক প্রহসন ও শেষের দিকে পৌরাণিক নাটক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকে দেশপ্রেমের কথা প্রথম শোনা গেল। গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকে দর্শকের ভিড় জমিতে লাগিল। নাটক রচনার সংখ্যা বাড়িল কিন্তু কদর বাড়িল না, যেহেতু সহজলভ্য উপন্যাসের রসের আস্বাদ পাইয়া সাধারণ পাঠক "না টক না মিষ্টি" নাট্যরচনায় তেমন আকর্ষণ অনুভব করে নাই ॥

৫

ছোটগল্প এখনো সুদূরে। বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকটি "ক্ষুদ্র উপন্যাস" অর্থাৎ বড় গল্প লিখিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে যেটি সবচেয়ে ছোট, যুগলাঙ্গুরীয়, তাহাতেও উপন্যাসের লক্ষণই প্রকট। অনুজ পূর্ণচন্দ্রের 'মধুমতী'তে ছোটগল্পেব লক্ষণ কিছু দেখা দিয়াছে। অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের 'দামিনী'তে ছোটগল্পের উপক্রম স্পষ্ট। শশিচন্দ্র দত্তের 'টেলস্ অব্ ইয়োর্'এর (১৮৪২?) বাঙ্গালা অনুবাদ

'উপন্যাসমালা'র (১৮৭৭) কোন কোন কাহিনীতে ছোটগল্পের লক্ষণ আছে। ইহার কোনটিই আসলে ছোটগল্প নয়॥

৬

এ সময়ে শিক্ষিত বাঙ্গালীর চিন্তা যে যে নূতন দিকে ঝোঁক দিল তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে জাতীয়তাবোধ ও স্বাজাত্যগর্ব্ব। আগের যুগে শিক্ষিত বাঙ্গালীর আত্মহীনতাভাবনা তাহাকে সমাজসংস্কারে প্রবৃত্তি দিয়াছিল। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর আর্থিক অবস্থা ও সামাজিক প্রতিপত্তি এখন দৃঢ়তর হওয়ায় তাহার আত্মসম্মান-বোধ খাড়া হইবার অবলম্বন পাইল। সে সময়ে বাঙ্গালীর ঘরে শক্তিশালী পুরুষের অভাব ছিল না। তাঁহারা দিকে দিকে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিদেশি রাজপুরুষের কাছে চাকুরী-পরায়ণ শিক্ষিত বাঙ্গালী উপযুক্ত মর্য্যাদা প্রায় পাইত না। সেই ক্ষোভই "ন্যাশনাল" আন্দোলনে প্রথম ঢেউ তুলিল।

শিক্ষিত বাঙ্গালী তখন মনে প্রাণে অপূর্ব্ব উন্মাদনা অনুভব করিতেছে। বাঙ্গালী সকল বিষয়েই যে ইংরেজের কাছে হীন নয় এবং সুযোগ সুবিধা পাইলে যে সে তাহাদের সমকক্ষ—ইহা প্রতিপন্ন করিতে যেন হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। এই উত্তেজনার প্রথম বাহ্য প্রকাশ হিন্দুমেলার অনুষ্ঠানে, যাহার মূলে ছিল নবগোপাল মিত্রের উৎসাহ, রাজনারায়ণ বসু মনোমোহন বসু প্রভৃতির উত্তেজনা এবং জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়ীর সর্ব্বাঙ্গীণ সহযোগিতা। হিন্দুমেলার জের টানিয়া ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সৃষ্টি হইল, এবং সেই কংগ্রেসকে অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় চেতনা ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হইতে লাগিল। সমসাময়িক সাহিত্যে এই ইতিহাসের ধারা দুর্লক্ষ্য নয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভারতী'তে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির 'হিতবাদী'তে এবং রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা'য় সে চেতনা নামের মধ্য দিয়াও প্রকট।

এখানে সাহিত্যে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের উদ্বোধনের ইতিহাস সংক্ষেপে বলি। দেশপ্রীতির প্রথম আভাস দেখা গেল ঈশ্বরগুপ্তের রচনায়। দেশপ্রীতি তাঁহার অকৃত্রিম কেননা তাহা জীবনপ্রীতিরই আর এক দিক। ঈশ্বর-গুপ্তের চেষ্টা ছিল শিক্ষিত বাঙ্গালীকে ঘরের দিকে টানা। দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দেশপ্রীতির সজ্ঞান পোষকতা করিতে লাগিল। ভারতীয়

বিদ্যার অনুশীলনের দ্বারা দেশের প্রতি শিক্ষিত ব্যক্তির শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে ব্রতী হইলেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার লেখকবৃন্দ—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি। ইতিমধ্যে টডের রাজস্থান-কাহিনী ইংরেজিনবীশদের বহু-আকাঙ্ক্ষিত দেশপ্রেমের কাহিনী শুনাইয়াছে। ইংরেজি সাহিত্যে যে দেশপ্রেমের রস পাওয়া গিয়াছিল এবং ইংরেজি শিক্ষায় যে স্বাধীনতাহীনতার বেদনা জাগাইয়াছিল তাহার নিবৃত্তির কোন পথ ছিল না। এখন রাজস্থানের বীরত্বকাহিনীর মধ্যে রোম-গ্রীসের ইতিহাসে পড়া কাহিনীর স্বাদগন্ধ পাইয়া শিক্ষিত বাঙ্গালী যেন নূতন রূপকথার রাজ্য জয় করিল।

এই নবজাগ্রত স্বাধীনতাবোধে এখন বিদেশি শাসকের অন্যায় অবিচার স্পষ্ট হইয়া দেখা দিতে লাগিল। জনসাধারণ যে-অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতেছিল সাহিত্যে তাহা মুখরিত হইতে বিলম্ব হইল না। শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে শাসিতের নালিশ প্রতিধ্বনিত হইল নীলদর্পণে।

সাহিত্যে জাতীয়তাবোধের প্রথম প্রকাশ দেশের অতীত ইতিহাসের পটভূমিকায় দেশপ্রেমের লালন, দ্বিতীয় প্রকাশ জনসাধারণের স্বাধীনতাহীনতার প্রতি সচেতনতা, তৃতীয় প্রকাশ ভারতবর্ষের অখণ্ডত্ব-অনুভূতি (হিন্দুমেলার অনুষ্ঠানে "ন্যাশনাল" আন্দোলনে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর-মনোমোহন বসু প্রভৃতির স্বদেশি গানে এই অনুভূতির সূত্রপাত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকে তাহার বিকাশ), চতুর্থ প্রকাশ শাসনকর্ত্তৃপক্ষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে পরাধীন প্রজার বলপ্রয়োগকল্পনা (উপেন্দ্রনাথ দাসের নাটকে এই ভাবের সূত্রপাত)। সংস্কৃতির দিক দিয়া বঙ্কিম জাতীয়তাবোধের পোষকতা করিতে লাগিলেন। আনন্দ-মঠে তিনি যে নিষ্কাম জনসেবার আদর্শ স্থাপন করিলেন তাহাতে জাতীয়তাবোধের পঞ্চম প্রকাশ এবং ইহাই কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠায়। ইহার পরে আর এক পরিণতি অনুশীলন-সমিতি প্রভৃতি বিপ্লবী-গোষ্ঠী।

এই সময়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের ফল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। কংগ্রেসের জন্ম হইতেই যে দেশশুদ্ধ লোক শঙ্খঘণ্টা বাজাইয়া অভ্যর্থনা করিয়াছিল তাহা নহে, উপেক্ষা-অনাদরের ভাগ কম ছিল না। সাহিত্যেও খোঁচা মারিতে ছাড়ে নাই। ইহাতে কিন্তু আসিয়া যায় নাই। কিছুকালের জন্য সাহিত্যে

জাতীয়তার পোষকতা কমিয়া আসিল দুইটি কারণে—প্রথমত বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণে শিক্ষিত বাঙ্গালী ঝুঁকিল গীতা-অনুশীলনে এবং দ্বিতীয়ত হিন্দুধর্ম্মের তথাকথিত "নব"-জাগরণে। প্রধানত শেষোক্ত কারণেই "সাময়িক" সাহিত্য হইতে (সাময়িক-পত্র হইতে নয়) রাজনীতি পরিবর্জ্জিত হইতে লাগিল। ইহার জন্য শাসনকর্ত্তৃপক্ষের মনোভাবও কতকটা দায়ী ॥

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বঙ্কিমচন্দ্র

১

অনেকেরই ধারণা যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত যেমন ইংরেজি কাব্য লিখিয়া আশানুরূপ যশোলাভ করিতে না পারিয়া বাঙ্গালা কাব্য-নাটকের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও তেমনি প্রথমে ইংরেজি উপন্যাস রচনায় ব্যর্থকাম হইয়া শেষে বাঙ্গালা উপন্যাস-রচনায় মন দেন। এ ধারণা ঠিক নয়। বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের (?) ঘোষিত পুরস্কারের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রথম বাঙ্গালা উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। এ সম্ভবত ১৮৫৮-৬০ খ্রীষ্টাব্দের কথা।[১] বঙ্কিমচন্দ্র পুরস্কার পান নাই, তাঁহার রচনাটিও বাহির হয় নাই। তাঁহার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস *Rajmohan's Wife* ইংরেজিতে লেখা।[২] আমার মনে হয় এখানি তাঁহার পুরস্কার-অপ্রাপ্ত বাঙ্গালা রচনাটিরই অনুবাদ। রাজমোহন্‌স্‌ ওয়াইফের কাহিনী একটু বেশিমাত্রায় রোমান্টিক, রোমাঞ্চক বলিলেও হয়। এই কাহিনীই 'কৃষ্ণকান্তের উইল' কাহিনীর বীজ যোগাইয়াছে।

বঙ্কিমের প্রথম রচনাগুলিতে ইংরেজি উপন্যাসের অনুসরণ আছে। কিন্তু সেগুলির মধ্যে এমন কিছু নাই যাহা বিসদৃশ। তাহার কারণ বঙ্কিমকে মাইকেলের মত একেবারে খোল-নলিচা শুদ্ধ গড়িয়া লইতে হয় নাই। দুর্গেশনন্দিনীর মধ্যে স্কটের 'আইভ্যান্‌হো'র সাক্ষাৎ অনুপ্রেরণা থাক্‌ বা না থাক্‌ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অঙ্গুরীয়-বিনিময়ের স্পষ্ট প্রভাব যে আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। অঙ্গুরীয়-বিনিময়ের শাহজাদী রোসিনারা দুর্গেশনন্দিনীর নবাবজাদী আয়েষার পূর্ব্বরূপ, শিবজী জগৎসিংহের, রামদাস স্বামী অভিরাম

[১] গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী তাঁহার 'বঙ্কিমচন্দ্র' দ্বিতীয় ভাগে (১২৯৭) লিখিয়াছেন, "বঙ্কিমবাবু যখন কলেজে পড়েন, তখন কলিকাতার বঙ্গ-সাহিত্য-লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য একটি সভা ছিল। সেই সভা হইতে প্রতি বৎসরে শ্রেষ্ঠ বঙ্গীয় লেখককে পুরস্কার দেওয়া হইত। বাবু বঙ্কিমচন্দ্র এই পুরস্কার প্রত্যাশায় উক্ত উপন্যাসখানি প্রেরণ করেন। কিন্তু তখনকার সভা সে পুস্তকখানি পুরস্কারযোগ্য মনে না করিয়া, অন্য একখানি গ্রন্থলেখককে সেই পুরস্কার প্রদান করেন।"

[২] কিশোরীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত Indian Field সাপ্তাহিকে ধারাবাহিকভাবে বাহির হইয়াছিল (১৮৬৪), কিছুকাল পূর্ব্বে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় গ্রন্থকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

স্বামীর। দুর্গেশনন্দিনীর ঘটনা বাঙ্গালাদেশে ঘটিয়াছে, সেজন্য তিলোত্তমাকে পাইয়াছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের সব উপন্যাসই রোমান্স-শ্রেণীর, কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে সঙ্কলিত হোক অথবা ভদ্র বাঙ্গালীর সংসার হইতে আহৃত হোক। তাই নরনারীর প্রণয়-দ্বন্দ্বই তাঁহার উপন্যাস-কাহিনীর প্রধান অবলম্বন। বঙ্কিমের নায়ক-নায়িকার মধ্যে সাধারণত পূর্ব্বরাগের অবসর নাই, অধিকাংশ স্থলেই বিবাহিত নরনারীর মানসিক দ্বন্দ্ব উপন্যাসের বিষয়। যেখানে পূর্ব্বরাগের বিস্তৃত ভূমিকা ফাঁদিতে হইয়াছে সেখানে নায়ক-নায়িকা দূর-ইতিহাসের পাত্র-পাত্রী অথবা, আধুনিক বাঙ্গালী ঘরের কাহিনী হইলে, বিধবা। রজনীতে নায়িকা অন্ধ, সুতরাং তাহার পূর্ব্বরাগের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে দায়ী হইতে হয় নাই। সমস্ত দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসটাই পূর্ব্বরাগের চিত্র। কপালকুণ্ডলায় পূর্ব্বরাগের চিত্র সংক্ষিপ্ত কিন্তু কাব্যরসবাহী বলিয়া উজ্জ্বল। এখানে বিবাহের পর নায়কের অনুরাগ পূর্ব্বরাগের তীব্রতা লইয়া নায়িকাকে অনুসরণ করিয়া তাহাকে নিয়তির মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে। ইহারই বিপরীত চিত্র মৃণালিনীতে। সেখানে নায়িকার অনুরাগ তাহাকে নায়কের সন্ধানে দেশদেশান্তর ঘুরাইয়া ফিরাইয়াছে। অতঃপর বঙ্কিমের রোমান্টিকতায় একটু রঙ ফিরিল, ইতিহাসের রঙীন দূরত্ব ত্যাগ করিয়া নায়ক-নায়িকা মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর কাছের লোক ঘরের মানুষ হইয়া দেখা দিল। ইহাতে কাহিনীর হৃদ্যতা বাড়িল, পাঠক পড়িতে পড়িতে ভাবিতে শিখিল। বিষবৃক্ষ-চন্দ্রশেখর-কৃষ্ণকান্তের উইল-রজনী এই পর্য্যায়ের উপন্যাস। তৃতীয় পর্য্যায়ে রোমান্টিকতায় নূতনতর রূপ জাগিল। ঘরের মানুষ যেন ভেক লইয়া পর হইয়া গেল। লাঠালাঠি গোলাগুলি লইয়া হানাহানি এবং রোমাঞ্চকর পলায়ন ইত্যাদি থাকিলেও প্রথম পর্য্যায়ের মত রস জমিল না। তাহার একটা বড় কারণ ধর্ম্ম ও তত্ত্ব-কথার ধোঁয়ার ভিতর দিয়া চরিত্রগুলি বাস্তব মানুষ হইয়া দেখা দেয় নাই। আনন্দমঠ-দেবীচৌধুরাণী-সীতারাম এই পর্য্যায়ে পড়ে।

বিষয়বস্তুর প্রকৃতি এবং রোমান্স-রসের পরিমাণ অনুসারে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-গল্পগুলিকে তিন ভাগে ফেলা যায়। এক, রসপ্রধান এবং বিশুদ্ধ রোমান্টিক। যেমন দুর্গেশনন্দিনী কপালকুণ্ডলা মৃণালিনী ইন্দিরা যুগলাঙ্গুরীয় রাধারাণী ও রাজসিংহ। এগুলিতে নায়কনায়িকার প্রেম নির্দ্বন্দ্ব। কাহিনী

জমিয়া উঠিয়াছে মিলনের বাহ্যিক বাধায় ঘটনার ফেরে ও অদৃষ্টের চক্রান্তে। দুই, নীতিপ্রধান ও গার্হস্থ্যরোমান্টিক। যেমন, বিষবৃক্ষ কৃষ্ণকান্তের-উইল চন্দ্রশেখর এবং রজনী। নায়ক-নায়িকার প্রণয়দ্বৈধঘটিত অন্তর্দ্বন্দ্ব এই উপন্যাস-গুলির বৈশিষ্ট্য। তিন, নীতিপ্রধান ও "গীতোক্ত" অধ্যাত্ম-রোমান্টিক। যেমন, আনন্দ-মঠ দেবী-চৌধুরাণী এবং সীতারাম। দেশানুরাগ ও লোকহিত এই তিনটি উপন্যাসের বীজমন্ত্র। দ্বিতীয় শ্রেণীর উপন্যাসের নীতি-আদর্শ সামাজিক, তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাসের নীতি-আদর্শ রাষ্ট্রিক ও আধ্যাত্মিক।

রাজসিংহ ছাড়া বঙ্কিমের আর সব উপন্যাসের আখ্যানবস্তু বাঙ্গালাদেশের পটভূমিকায় পরিকল্পিত। কিন্তু তাহার মধ্যে শুধু দুইটিতে, বিষবৃক্ষে ও কৃষ্ণকান্তের-উইলে, প্রায়-সমসাময়িক বাঙ্গালীর কথা স্থান পাইয়াছে। কিন্তু এখানেও বাস্তব-অনুগতি কয়েকটিমাত্র খণ্ডিত দৃশ্যে পর্য্যবসিত। বস্তুত বঙ্কিমের উপন্যাসে বাস্তব-অনুগতির স্থান কখনোই প্রধান নয়। তাঁহার মেয়ে-পুরুষ নিজেদের প্রণয়স্বপ্নে মশগুল, হৃদয়ারণ্যে তাহাদের বাস, প্রতিদিনকার ঘরকরনার কাজে তাহারা অনুপস্থিত। তাই হৃদয়দ্বন্দ্বের ও প্রণয়ব্যাকুলতার বাহিরে যে বৃহৎ কর্ম্ম ও ভাব জীবন পড়িয়া রহিয়াছে সে বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণ উদাসীন। মাঝে মাঝে যে গৃহস্থালির বর্ণনা পাই তাহা রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপটের মত অচল ছবি মাত্র, নায়ক-নায়িকার প্রাণের সংযোগ সেগুলিতে নাই। সুতরাং বঙ্কিমের সৃষ্টিতে প্রতিদিনের সংসারযাত্রা হইতে বিচ্ছিন্ন ও আত্মসর্ব্বস্ব নারীরা (—প্রধান ভূমিকা নারীরই—) ঘরের পরিচিত লোক না হইয়া দূরের মানুষ বইয়ের মানুষ হইয়াছে। অবান্তর চরিত্রের আপেক্ষিক অপ্রাচুর্য্যও কাহিনীর প্রেমসর্ব্বস্বতাকে বাড়াইয়াছে।

কিন্তু সে জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে দোষ দিব না। তিনি বাঙ্গালীর সংসারের ছবি আঁকিতে বসেন নাই, তিনি এমন কোন ঘটনার অবতারণা করেন নাই যাহা বাঙ্গালীর অভিজ্ঞতায় সচরাচর ঘটিয়া থাকে। তিনি চাহিয়াছিলেন গল্প জমাইতে, সাহিত্যে নূতন পিপাসা জাগাইতে। তাই তিনি রোমান্সের ফ্রেমটিই বাছিয়া লইয়াছিলেন, এবং সেই ফ্রেমের মধ্যে তাঁহার শিল্প-আদর্শকে রূপ দিতে পারিয়াছিলেন। সাহিত্যে সৃষ্টির এই নূতন ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ফসল ফলাইবার কৃতিত্ব বঙ্কিমচন্দ্রের॥

২

বঙ্কিম বাঙ্গালায় গল্পরসপ্রবাহ বহাইলেন, এবং সেই সঙ্গে তেমনি সেই প্রবাহের উপযুক্ত প্রণালী ভাষাও গড়িয়া লইতে হইল। বঙ্কিম যখন উপন্যাস-রচনায় হাত দিলেন তখন সাধু গদ্যের ভাষা সুপ্রতিষ্ঠিত। সেই ভাষায় তাঁহার প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী লেখা। পরের উপন্যাস দুইটিতে সাধুভাষার কঠিন বন্ধন কিছু আলগা হইয়াছে। তাহার পর বিষবৃক্ষে বঙ্কিমের নিজস্ব গদ্যরীতির আত্মপ্রকাশ। এ রীতিতে সাধু গদ্য সহজ নমনীয় ও সর্ব্বসমর্থ হইল। যে ভাষা শুধু বর্ণনার ও উপদেশ-বিচারের উপযুক্ত ছিল তাহা এখন চিত্রণের ও মননের উপযোগী হইল।

বঙ্কিমের উপন্যাসের গঠনগত বৈশিষ্ট্য পাঁচটি।

(১) বিবাহের পূর্ব্বে প্রণয়সঞ্চার অর্থাৎ পূর্ব্বরাগ। রূপকথা ছাড়া বঙ্কিম-পূর্ব্ব আখ্যায়িকায় পূর্ব্বরাগ অভাবিত ছিল। তখন নায়ক-নায়িকার "গান্ধর্ব্ব" অথবা "বৈধ" বিবাহের পর তবে তাহাদের প্রণয়লীলা শুরু হইত। দুর্গেশ-নন্দিনীতে পূর্ব্বরাগই আদ্যন্ত জুড়িয়া আছে। কপালকুণ্ডলা-চন্দ্রশেখর প্রভৃতিতে নায়ক-নায়িকার বিবাহ কাহিনীর গোড়াতে ঘটিয়া গেলেও তাহাদের পরবর্ত্তী প্রণয়প্রচেষ্টাকে "অনুরাগ" না বলিয়া পূর্ব্বরাগই বলিতে হয়। এখানে নায়ক-নায়িকার ভাবসম্মিলনে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি। বাঙ্গালী-সমাজে পূর্ব্বরাগ নাই, তাই বঙ্কিম যে-দুইটি উপন্যাসে আধুনিক বাঙ্গালীঘরের কথা বলিয়াছেন সেখানে নায়িকাকে বিধবা করিয়া বাস্তবতা বাঁচাইয়াছেন। রজনী অন্ধ বালিকা, সুতরাং তাহার পূর্ব্বরাগে দোষ নাই। কপালকুণ্ডলা চন্দ্রশেখর ইন্দিরা আনন্দ-মঠ দেবী-চৌধুরাণী ও সীতারাম—এগুলিতে পূর্ব্বরাগ (একতরফা ও দোতরফা) চলিয়াছে বিবাহের পরে। তিলোত্তমা রাজপুতের মেয়ে, পুরা বাঙ্গালী নয়। মৃণালিনী ও হিরন্ময়ী দূর-ইতিহাসের কল্পনা।

(২) চন্দ্রশেখর এবং রজনী ছাড়া সর্ব্বত্র প্রধান নায়িকার প্রেম নির্দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব সাধারণত নায়কেরই। কপালকুণ্ডলা-মৃণালিনী-ইন্দিরা-রাজসিংহ প্রভৃতিতে নায়কের প্রেমও দ্বন্দ্ববিহীন। ইংরেজি উপন্যাসের "ত্রিভুজ বিরোধ" শুধু চন্দ্রশেখরেই আছে।

(৩) ভবিষ্যদ্‌গণনা যোগবল সাধু-সন্ন্যাসীর অলৌকিক শক্তি ইত্যাদি অতিপ্রাকৃত ব্যাপারের উপস্থাপন বঙ্কিমের প্রায় সব উপন্যাসেই আছে। সাধু-

সন্ন্যাসীর দ্বারা ঘটনাসূত্রের নিয়ন্ত্রণ হইতেছে বঙ্কিমের উপন্যাসশিল্পের একটা বিশিষ্ট টেকনিক। বঙ্কিম নিজে অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসী ছিলেন, সুতরাং ইহা পাঠক-ভোলানো সস্তা উপায় মাত্র নয়।

(৪) অধিকাংশ উপন্যাসে দুইটি করিয়া সমান্তরাল প্রেম-কাহিনী আছে—একটি মুখ্য, অপরটি গৌণ। মৃণালিনীতে ও চন্দ্রশেখরে কাহিনী দুইটিতে সমান্তরলতার সামঞ্জস্য নাই। এখানে যেন একটি বইয়ের মলাটে দুইটি উপন্যাস বাঁধানো হইয়াছে। যে-উপন্যাসে দুইটি প্রণয়কাহিনী নাই সেখানে নায়কের একাধিক পত্নী অথবা প্রণয়প্রার্থিনী উপস্থিত। যেমন কপালকুণ্ডলায় বিষবৃক্ষে কৃষ্ণকান্তের-উইলে এবং দেবী-চৌধুরাণীতে।

(৫) নায়িকাদের বাস হৃদয়-রাজ্যেই, সংসারের সঙ্গে তাহাদের যোগটুকু নিতান্ত বহিরঙ্গ ও অবান্তর। নায়কেরা ততটা অবাস্তব নয়, কিন্তু নারী-চরিত্রের তুলনায় পুরুষ-চরিত্র এতটা অপরিণত যে সেগুলিও ঐতিহাসিক বাস্তবতার বাহিরে। এমন কি বিষবৃক্ষে ও কৃষ্ণকান্তের-উইলে—যেখানে "বঙ্কিমবাবু উনবিংশ শতাব্দীর পোষ্যপুত্র আধুনিক বাঙ্গালীর কথা বলেছেন"—সেখানেও সম্পূর্ণভাবে বাঙ্গালী মানুষ গড়িতে পারেন নাই। তাঁহাব উদ্দেশ্য-প্রবণতা আধুনিক বাঙ্গালীর—নগেন্দ্রের এবং গোবিন্দলালের—চিত্রে স্বভাব-সঙ্গত বর্ণবিরল ব্যক্তিত্ববান্ চরিত্র সৃষ্টির পক্ষে বাধা ছিল। অতীত দিনের কাহিনীগুলিতেও এই ব্যর্থতা পরিস্ফুট। বহুকাল পূর্ব্বে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা ঠিকই। "বঙ্কিমবাবু...যেখানে পুরাতন বাঙালীর কথা বল্‌তে গিয়েছেন, সেখানে তাঁহাকে অনেক বানাতে হয়েছে; চন্দ্রশেখর প্রতাপ প্রভৃতি কতকগুলি বড় বড় মানুষ এঁকেছেন (অর্থাৎ তাঁরা সকল দেশীয় সকল জাতীয় লোকই হতে পারতেন, তাঁদের মধ্যে জাতি এবং দেশকালের বিশেষ চিহ্ন নেই) কিন্তু বাঙালী আঁকিতে পারেন নি।" এইখানে স্কটের কাছে বঙ্কিমের পরাজয়।

বঙ্কিম যে স্কটের আদর্শ অবলম্বন করিয়া উপন্যাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই সঙ্গে দেশি আখ্যায়িকার আদর্শও তিনি একেবারে প্রত্যাখান করেন নাই।[১] ওসমান প্রতাপ প্রভৃতির ভূমিকায় ইংরেজি রোমান্সের "শিভাল্‌রি"র ছাপ অস্বীকার করা যায় না। তবে স্বীকার

[১] দুর্গেশনন্দিনীর প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

করিতে হইবে যে বঙ্কিমের কোন ভূমিকায়ই বিদেশি রঙ জোবড়া হইয়া লাগে নাই। শুধু রজনীর ভূমিকায় কিছু বিদেশি রঙের ছোপ আছে। তবে এখানে লেখক স্বীকার করিয়াছেন যে রজনী বুলোয়ার্ লীটনের 'দি লাষ্ট ডেজ্ অব্ পম্পিয়াই'এর নীডিয়ার অনুকৃতি।

সম্প্রতি বঙ্কিমের সাহিত্যিক কৃতিত্ব লইয়া অভিযোগ উঠিয়াছে যে তাঁহার নভেল-লেখার পিছনে কোন সামাজিক তাগিদ ছিল না এবং তাঁহার রচনায় সমসাময়িক জনচেতনার পাঞ্জা পড়ে নাই। একথা যাঁহারা বলেন তাঁহাদের মনে মধ্য ও শেষ ভিক্টোরীয় যুগের ইংরেজি উপন্যাসের এবং তৎসমসাময়িক ফরাসী উপন্যাসের কথাই জাগিতেছে। এ অভিযোগ নিরর্থক। বঙ্কিমের সময়ে শিক্ষিত বাঙ্গালীর মানস-প্রকৃতি সবে গড়িয়া উঠিতেছে। সাহিত্যে সমাজচেতনার প্রতিফলন হইতে গেলে যে সুদীর্ঘ অতীত সাধনা প্রয়োজন তাহা তখন কোথায়।

বঙ্কিমকে মাঝারিশ্রেণীর নভেল-লেখক বলারও অর্থ নাই। কোন শিল্প-সাধনার যিনি সিদ্ধ আদিকর্ম্মিক তিনি শ্রেণীবিচারের বাইরে।[১] তাঁহার কৃতিত্বের মূল্য যাচাই করিতে গেলে অপর সাহিত্যের আদিকর্ম্মিকদের সঙ্গেই তুলনা করিতে হয় এবং সে তুলনায় দেশের সংস্কৃতির ও সমসাময়িক সংস্থার কথাও মনে রাখিতে হয়।

বঙ্কিমের সৃষ্ট চরিত্রের বাস্তবতা লইয়াও মতভেদ আছে। বঙ্কিমের উপন্যাসে আধুনিক কালোচিত বাস্তবতা খোঁজা অন্যায়। বঙ্কিমের অধিকাংশ উপন্যাসে প্রতিনায়ক আছে বটে, কিন্তু ইংরেজিতে যাহাকে বলে "ভিলেন" তেমন ভূমিকা নাই বলিলেই হয়।[২] প্লটকে আবর্ত্তিত করিয়াছে নায়িকা-প্রতিনায়িকারা, নায়ক-প্রতিনায়কেরা নয়।

বঙ্কিমের ও তাহার অনুবর্ত্তীদের উপন্যাসে দেখা যায় যে পুরুষ-ভূমিকার তুলনায় নারী-ভূমিকাই বেশি ফুটিয়াছে—প্লটে নারীচরিত্রেরই অবিসংবাদী প্রাধান্য, পুরুষচরিত্রের নয়। ইহার হেতু মিলিবে বাঙ্গালীর বিশিষ্ট মানসিকতায়। বৃহত্তর জীবনের সহিত বাঙ্গালীর জাতিগত অন্তরঙ্গ যোগ নাই। বাঙ্গালী বহুকাল যুদ্ধ করে নাই। সুলভ জীবনযাত্রা তাহাকে দূরতর দেশে

[১] এই প্রসঙ্গে অশোকের শিলালিপির একটি কথা স্মরণীয়। অশোক বলিয়াছেন, যিনি কল্যাণ-কর্ম্মের প্রথম প্রবর্ত্তন করেন তিনি দুষ্কর সাধন করেন।

[২] সীতারামের গঙ্গারাম ভিলেনের কাছাকাছি যায়।

বাণিজ্যযাত্রায় প্রলুব্ধ করে নাই। বাঙ্গালী ভ্রমণ অর্থাৎ তীর্থযাত্রা করিত বয়স তিনকাল গিয়া এককালে ঠেকিলে। সুতরাং ঘর-গৃহস্থালি ও গ্রামসীমাবচ্ছিন্ন মাঠঘাট ছাড়িয়া সাধারণ বাঙ্গালীর কল্পনা বড় বেশি দূর বিচরণ করে নাই। অতএব বাঙ্গালা উপন্যাসে আমাদের "সীমাস্বর্গের ইন্দ্রাণী"-রাই যে স্ফুটতর বিকাশ ও গাঢ়তর বর্ণসুষমা লাভ করিবে তাহা স্বাভাবিক এবং সঙ্গত।

বঙ্কিমের অঙ্কিত দাম্পত্যচিত্র প্রেমসর্ব্বস্ব। সেইজন্যই বোধ করি তাহাতে বাৎসল্য প্রভৃতি রসান্তরের মশলা দিয়া প্রণয়ের তীব্রতাকে মন্দীভূত করিবার চেষ্টা নাই। বঙ্কিমের কোন বিবাহিতা নায়িকাই সন্তানবতী নয়। বাৎসল্য-চিত্র দুই টুকরামাত্র পাওয়া যায়, শুধু বিষবৃক্ষে কমলমণির পুত্র সতীশচন্দ্রের এবং আনন্দমঠে কল্যাণী-মহেন্দ্রের কন্যার ছবিতে। কিন্তু দুইটিই নিতান্ত ক্ষণিক চিত্র॥

৩

বঙ্কিমের প্রথম বাঙ্গালা উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনীতে স্কটের আইভ্যান-হোর প্রভাব যতই থাক্ তাহার বেশি আছে ভূদেবের অঙ্গুরীয়-বিনিময়ের। ভারতচন্দ্রের প্রভাব ক্ষীণ হইলেও দুর্লক্ষ্য নয়। হীরা মালিনী যেন বিমলার মধ্যে নবজন্ম লাভ করিয়াছে। পুরানো যাত্রা-সঙের স্বাদ রহিয়া গিয়াছে বিদ্যাদিগ্‌গজ-আসমানীর ভাঁড়ামিতে। দীনবন্ধুর নাটকে যাহা অসঙ্গত হইত না তাহা বঙ্কিমের নভেলে অনপেক্ষিত।

রাজমোহন্‌স্ ওয়াইফ (১৮৬২) বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। কাহিনী সংক্ষেপে এই। মধুমতীর তীরে রাধাগঞ্জ গ্রাম। সে গ্রামের বংশীবদন ঘোষ পূর্ব্ববঙ্গের কোন জমিদারেব সেবক ছিল। নিঃসন্তান জমিদারের মৃত্যু হইলে তাহার ধনসম্পত্তি বংশীবদনের অধিগত হয়। বংশীবদনের মৃত্যুর পর তাহার তিন পুত্র জমিদার সাজিয়া বসিল। জ্যেষ্ঠ রামকান্তের পুত্র মথুর, মধ্যম রামকানাইয়ের ছেলে মাধব, কনিষ্ঠ রামগোপাল নিঃসন্তান। কাহিনী যখন শুরু হইয়াছে তখন বংশীবদনের কোন পুত্র জীবিত ছিল না। রামগোপাল উইল করিয়া তাহার সম্পত্তি মধ্যম ভ্রাতুষ্পুত্র মাধবকে দিয়া যায় এই সর্ত্তে যে সে তাহার শ্রাদ্ধাদি এবং তাহার পত্নীর ভরণপোষণ করিবে। মাধব কলিকাতার কলেজে পড়া এবং সে বিবাহ করিয়াছে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী গ্রামের এক ভদ্রলোকের কন্যা হেমাঙ্গিনীকে। হেমাঙ্গিনীর দিদি অপূর্ব্ব সুন্দরী মাতঙ্গিনীর

বিবাহ হইয়াছে গুণ্ডা রাজমোহন ঘোষের সহিত। মথুর ইংরেজি পড়ে নাই, সে পূরাপূরি পাড়াগেঁয়ে গোঁয়ার-গোবিন্দ জমিদার। তাহার দুই পত্নী তারা ও চম্পক। মাধব যে খুড়ার সম্পত্তি পাইয়াছে তাহা মথুরের বরদাস্ত হয় নাই। সে খুড়ীকে হাত করিয়া মাধবের নামে উইল জালের নালিশ করে এবং ডাকাতি করাইয়া উইল চুরি করিবার চেষ্টায় থাকে। উইলচোর ডাকাতের দলে ছিল রাজমোহন। মাতঙ্গিনী তাহাদের গোপন পরামর্শ শুনিতে পাইয়া ষড়যন্ত্র ফাঁস করিয়া দেয়। রুষ্ট স্বামীর হাত এড়াইতে গিয়া সে মথুরের কবলে পড়ে। মাধবকেও মথুর আটক করিয়া রাখে। তারা জানিতে পারিয়া দুইজনকে উদ্ধার করে। ডাকাতদের একজন পুলিসের হাতে ধরা পড়িয়া সব কথা বলিয়া দেয়। মথুর আত্মহত্যা করে। রাজমোহনের দ্বীপান্তর হয়। মাতঙ্গিনী পিতার আশ্রয়ে ফিরিয়া আসে।

গল্পকাহিনীকে রোমান্টিক না বলিয়া রোমাঞ্চক বলাই উচিত। কাহিনী ঘটনাসর্ব্বস্ব এবং বর্ণনার চাল অত্যন্ত দ্রুত। ভূমিকাগুলির স্ফূর্তি একেবারেই নাই। প্রথম দিকে বর্ণনায় ব্যঙ্গের ঝোঁক আছে, পরে তাহা অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। নায়িকা মাতঙ্গিনীর ভূমিকায় ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনা আছে। মাধবের প্রতি তাহার আকর্ষণ বেশ সহজভাবে অল্পকথায় দুই দিক বাঁচাইয়া ব্যক্ত হইয়াছে। কয়েকটি ঘটনা ও বর্ণনা বঙ্কিমের বাঙ্গালা উপন্যাসে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে বিস্তৃতভাবে। কেন্দ্রীয় ঘটনা, উইল-চুরি, কৃষ্ণকান্তের-উইলে অন্যভাবে দেখা দিয়াছে। মাধব গোবিন্দলালেরই পূর্ব্বপুরুষ এবং মাতঙ্গিনী-হেমাঙ্গিনীর পুনর্জন্ম যথাক্রমে রোহিণী ও ভ্রমররূপে। মাধবের গৃহস্থালীর বর্ণনা বিষবৃক্ষে বিস্তারিত হইয়াছে। মাতঙ্গিনীর ভগিনীপুত্র কমলমণির শিশুপুত্রকে স্মরণ করায়।

'দুর্গেশনন্দিনী'র (১৮৬৫) নায়িকা দুইটি—তিলোত্তমা এবং আয়েষা। আখ্যানবস্তুর পক্ষে তিলোত্তমা মুখ্য আয়েষা গৌণ। কিন্তু কাব্যরসের পক্ষে আয়েষাই মুখ্য তিলোত্তমা গৌণ। দুর্গেশনন্দিনীর বিষয়—অবিবাহিত নর-নারীর প্রেম। এই প্রাক্-বিবাহ প্রেম বাঙ্গালা উপন্যাসে নির্জলা চালাইতে বঙ্কিম কুণ্ঠিত ছিলেন। তাই তিলোত্তমার মাতা বিধবার গর্ভজাত এবং আয়েষা অহিন্দু। বঙ্কিম তাঁহার প্রথম উপন্যাসে এই যে দুইটি নায়িকা-টাইপ সৃষ্টি করিলেন তাহা বাঙ্গালা উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। লজ্জামুকুলিত

অস্ফুটবাক্ অনতিরূঢ়যৌবন তিলোত্তমা বাঙ্গালা উপন্যাসের তরুণী নায়িকার প্রতিনিধি। তিলোত্তমা সৃষ্টি করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালী পাঠকের চিত্ত জয় করিয়াছিলেন। আয়েষা বিলাতি ছাঁচে ঢালা, তবুও আয়েষা অপরিচিতা বিদেশিনী নয়। ধীর মহিমায় এবং আত্মসমাহিতচিত্ততায় বঙ্কিমচন্দ্রের আয়েষা বাণভট্টের মহাশ্বেতারই ভগিনী। জগৎসিংহ নববিবাহিত বাঙ্গালী যুবক-প্রেমিকদের মতই রঙচটা ও ব্যক্তিত্ববিহীন। ওসমানের ভূমিকায় ব্যক্তিত্বের প্রবলতা আছে। দুর্গেশনন্দিনীতে দুইটি নায়িকা এবং একটি নায়ক থাকিলেও প্রণয়ে দ্বন্দ্ব নাই। (ওসমান্ ভালোবাসে আয়েষাকে, আয়েষা ভালোবাসে জগৎসিংহকে, জগৎসিংহ ভালোবাসে তিলোত্তমাকে। এখানে প্রণয়ের গতি একরোখা, সুতরাং দ্বন্দ্ব চতুর্ভুজ নয় ত্রিভুজ তো নয়ই।) এই দ্বন্দ্বহীনতা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম তিন উপন্যাসের বিশেষত্ব। তিনটি উপন্যাসই নায়িকার নামে নামিত।

বিমলার ভূমিকায় ঔচিত্য নাই। বিমলা শুধুই "অ্যানাক্রনিজ্‌ম্" নয়, অস্বাভাবিকও। সে একাধারে তিলোত্তমার সৎমা সখী এবং দূতী। আর্টের পক্ষে যত না হোক ঘটনাবর্ত্তের পক্ষে অভিরাম স্বামী প্রয়োজনীয় ভূমিকা।

'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) বঙ্কিমের নভেলের মধ্যে সব চেয়ে কাব্যধর্ম্মী। নায়িকার নাম ভবভূতির মালতীমাধব হইতে নেওয়া। চরিত্রচিত্রণে কালিদাসের শকুন্তলার ও সেক্স্‌পিয়রের মিরাণ্ডার ছায়া আছে। মূল আখ্যানের পরিসর বেশি নয় বলিয়া মতিবিবির কাহিনী প্রবেশ করিয়াছে। বঙ্কিমের উপন্যাস-কাহিনীর মধ্যে নাটকীয়তার যথোচিত স্থান ছিল। তাই মতিবিবির কাহিনী অসঙ্গত হয় নাই। কপালকুণ্ডলা-ভূমিকার মধ্যেই নবকুমারের রূপতৃষ্ণার প্রতিক্রিয়ার বীজ নিহিত। সেজন্য মতিবিবির ঈর্ষ্যা টানিয়া আনার খুব প্রয়োজন ছিল না।

গৃহবন্ধনহীন এবং বৃহৎপ্রকৃতির উদার-অবকাশলালিত কপালকুণ্ডলা করুণার বশেই নবকুমারকে উদ্ধার করিয়াছিল। তাহাদের বিবাহঘটনা নিতান্ত দৈবগতিকে। বিবাহের তাৎপর্য্য কপালকুণ্ডলা জানিত না। কেন না পারিবারিক স্নেহবন্ধনের মধ্যে সে পরিবর্দ্ধিত হয় নাই। বয়স-অনুযায়ী স্বাভাবিক প্রণয়-বৃত্তিও তাহার পরিস্ফুট হয় নাই। কালিদাসের কথায় কপালকুণ্ডলা ছিল "আরণ্যক"। নবকুমারের মুগ্ধদৃষ্টির উত্তাপে এবং ননদিনী শ্যামাসুন্দরীর সস্নেহ

পরিচর্য্যায় কপালকুণ্ডলার হৃদয়শতদল বিকাশোন্মুখ হইল। নবকুমারের সৌন্দর্য্যপিপাসা যদি অতটা তীব্র হইয়া কপালকুণ্ডলাকে অভিভূত না করিত তবে প্রেমের পূর্ণাভিষেকে তাহার নারীত্ব বিকশিত এবং জীবন সার্থক হইত। কিন্তু নবকুমারের রূপোন্মাদনাই কপালকুণ্ডলাকে দূরে ঠেলিয়া দিতে লাগিল। সংসারে তাহার মন বসে নাই। বারিরাশির নিঃসীমতায় বালিয়াড়ির তরঙ্গিত দিগ্‌বলয়ে তরুশ্যাম নির্জ্জন কুটীরে তাহার বাল্যজীবনের স্মৃতি তাহার মনকে গৃহকর্ম্মের মাঝখানে ক্ষণে ক্ষণে ব্যাকুল করিয়া তুলিত। শ্যামাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "তবে শুনি দেখি, তোমার সুখ কি?" উত্তরে কপালকুণ্ডলা কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিয়াছিল, "বলিতে পারি না। বোধ করি সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।" ঘটনার পরিণতি যখন সমাপ্তিমুখে তখনো দেখি যে নবকুমার কপালকুণ্ডলার চিত্তে এতটুকুও দাগ কাটিতে পারেন নাই। লুৎফ-উন্নিসা কপালকুণ্ডলার কাছে অট্টালিকা ধনজনের পরিবর্ত্তে স্বামিদান চাহিলে কপালকুণ্ডলা "চিন্তা করিতে লাগিলেন, পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানসলোচনে দেখিলেন—কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। অন্তঃকরণ মধ্যে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন—তথায় ত নবকুমারকে দেখিতে পাইলেন না।" ইহাই কপালকুণ্ডলার ট্রাজেডি, কাপালিকের প্রতিহিংসাবৃত্তি বা লুৎফ-উন্নিসার চক্রান্ত কোনটাই নয়।

বঙ্কিমের প্রায় সকল নায়কের মতই নবকুমার অর্দ্ধস্ফুট এবং অতিশয্য-বর্জ্জিত। মতিবিবির ভূমিকা সর্ব্বত্র স্বাভাবিক নয়। নবকুমারের প্রতি মতিবিবির দীপ্ত অনুরাগ বাল্যবিবাহের সংস্কারজনিত বলিয়া মানিয়া লইলেও আকস্মিক ঠেকে। কাপালিকের চরিত্র উজ্জ্বল, জীবন্ত। তবে গোড়ার দিকে কাপালিক যে ভীষণ রহস্যাবৃত বিশালত্ব লইয়া দেখা দিয়াছে তাহা শেষে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। যে তান্ত্রিক-সাধক মানবিক চিত্তবৃত্তিকে নিপীড়ন করিয়া শব-সাধনায় নিরত এবং পুরুষ-বলি দিয়া সাধনাকে সিদ্ধ করিতে উদ্যত তাহাকেই শেষে দেখি যে প্রতিহিংসাপরায়ণ পিশাচের মত আনাচে কানাচে ঘুরিয়া ফিরিতে। বঙ্কিমচন্দ্র কাপালিকের প্রতি সুবিচার করেন নাই।

'মৃণালিনী'র (১৮৬৯) প্লটে সংহতির বেশ অভাব আছে, উপন্যাসটি যেন কয়েকটি খণ্ডচিত্রের সঙ্কলন। গঠনশিল্পের অপরিপাট্য এবং রচনাভঙ্গির শৈথিল্য দেখিয়া মনে হয় যেন মৃণালিনী কপালকুণ্ডলার আগে লেখা। পশুপতি এবং মনোরমা ছাড়া কোন চরিত্রই পরিস্ফুট নয়। নাম-ভূমিকা সব চেয়ে অবাস্তব।

মৃণালিনীর প্রেমাভিসারে বৈষ্ণব-পদাবলীর প্রভাব আছে। গিরিজায়ার ভূমিকায় রিমলা-আসমানী মিলিত হইয়াছে। উপন্যাসটির পক্ষে অত্যাবশ্যক ঐতিহাসিক পটভূমিকা উপেক্ষিত। মনোরমার ভূমিকায় নারীচিত্তের দ্বৈধবৃত্তির বেশ প্রকাশ, তবে অতিপ্রাকৃতের স্পর্শে অতিরঞ্জিত। পশুপতি-মনোরমার কাহিনী লইয়া স্বতন্ত্র উপন্যাস লিখিলে ভালো হইত। বঙ্কিমের শেষ তিন উপন্যাসে যাহা মুখ্যস্থান লইয়াছে সেই দেশপ্রেমের আভাস মাত্র পাইলাম মৃণালিনীতে, এবং এখানেও লেখকের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট যে ইংরেজ এদেশে ব্যক্তিস্বাধীনতা আনিয়াছে এবং ইংরেজ-রাজত্ব বিধাতা-নির্দ্দিষ্ট।

মৃণালিনীর পরে সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র আত্মপ্রকাশ করিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে সর্ব্বাঙ্গীণ জাগরণের জন্য তিনি 'বঙ্গদর্শন' বাহির করিলেন (১২৭৯)। প্রথম সংখ্যা হইতে তাঁহার চতুর্থ উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ' (পুস্তক-আকারে ১২৮০) বাহির হইতে লাগিল। বিষবৃক্ষে বঙ্কিমের সাহিত্যশিল্প পরিণত রূপে দেখা দিল। ঘরোয়া প্রণয়কাহিনী রোমান্সের বস্তু হইল, পাত্রপাত্রীর প্রণয়লীলায় সংঘর্ষ দেখা দিল এবং উপন্যাসের গতি এক নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য লইল। বিবাহের বাহিরে নরনারীর প্রেম বিষবৃক্ষের দ্বারাই বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রথম স্বীকৃত হইল। উপন্যাসে বঙ্কিম নীতি-আদর্শের বীজও বুনিলেন। আইনের অনুমোদন পাইলেও যে বিধবাবিবাহ বাঙ্গালী-সংসারে মঙ্গল আনিতে পারে না ইহাই বিষবৃক্ষের প্রতিপাদ্য। বিষবৃক্ষ নামটিতে উদ্দেশ্যমূলকতা ধরা পড়িয়াছে।

সূর্য্যমুখী বিষবৃক্ষের প্রধান ভূমিকা। এই আত্মত্যাগিনী মহিলাটি বিষবৃক্ষের সমগ্র প্রতিবেশ জুড়িয়া আছে। সূর্য্যমুখীর চিত্রণে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সমস্ত ক্ষমতা সমস্ত সমবেদনা ঢালিয়া দিয়াছেন, তবুও কয়েকটি অবান্তর চরিত্রের কাছে ইহা নিষ্প্রভ হইয়াছে। কুন্দনন্দিনীর ভূমিকা অপরিণত হইলেও অস্বাভাবিক নয়। নগেন্দ্রের ভূমিকা অপরিস্ফুট। তাহার তুলনায় দেবেন্দ্র ব্যক্তিত্বশালী, যদিও লেখকের উদ্দেশ্যমূলকতা এই উজ্জ্বল চরিত্রটিকে শিল্প-পরিণতি হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। হীরার মত জীবন্ত চরিত্র বঙ্কিমের কোন উপন্যাসে নাই। কিন্তু ইহাও স্বাভাবিক পরিণতি পায় নাই। কমলমণির দাম্পত্য চিত্র মনোরম।

'ইন্দিরা' (১৮৭৩)[১] প্রথমে ছিল বড় গল্প। পঞ্চম সংস্করণে (১৮৯৩) বইটি

[১] প্রথমপ্রকাশ বঙ্গদর্শনে (চৈত্র ১২৭৯)।

বাড়িয়া উপন্যাসের রহস্ত পাইল। তবুও ইহা বড় গল্পই রহিয়া গিয়াছে। ইন্দিরায় বঙ্কিম পুরাতন আদর্শের দিকে ঝুঁকিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে সুপরিচিত 'মন্মথ কাব্য' প্রভৃতি আদিরসাল আখ্যায়িকার নায়িকার মত ইন্দিরাও হারানো স্বামীকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছে এবং স্বামীকে হস্তগত করিবার জন্য যাবতীয় নারীকলার প্রয়োগ করিয়াছে। গল্পটির ঘোরালো সূচনা পরে ক্ষীণ আখ্যানবস্তুর মধ্যে তলাইয়া গিয়াছে। শ্বশুরালয়গামিনী ইন্দিরার পাল্‌কি যখন কালাদীঘির ধারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে ততক্ষণে পাঠকের মনও রসসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে পূর্ণমাত্রায়। কিন্তু এই রসাবেশ অল্পক্ষণেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইন্দিরার পরিবর্দ্ধিত সংস্করণে শিল্পের দিক দিয়া কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই বরং নায়িকার ছলাকলার আড়ম্বর গল্পরস তরল করিয়া দিয়াছে।

বঙ্কিমের দ্বিতীয় বড় গল্প 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৩)[১] এডভেঞ্চার-জাতীয়। রচনাভঙ্গি বর্ণনসর্ব্বস্ব। অঙ্গুরীয়-যুগল উপলক্ষ্য করিয়া কাহিনীর জট পাকাইয়াছে এবং খুলিয়াছে বলিয়া এই নাম।

'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫)[২] এক হিসাবে বঙ্কিমের নভেলের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করিতে পারে। কেবল এইখানেই উন্মেষ হইতে পরিণতি পর্য্যন্ত নারী-চরিত্রের সমগ্র রূপটি দেখানো হইয়াছে। কপালকুণ্ডলাতেও চরিত্রবিকাশের চেষ্টা ছিল কিন্তু সেখানে ভূমিকাটির পরিণতি শিল্পশোভন যবনিকার অন্তরালে। বঙ্কিমের আর কোন উপন্যাসে ইংরেজি নভেলের "ত্রিভুজ দ্বন্দ্ব", এক নায়িকার দুই প্রণয়পাত্র—পূর্ব্বপ্রণয়ী এবং স্বামী, নাই। প্রতাপ ও চন্দ্রশেখর দুইই মহৎ চরিত্র। তবে প্রতাপের মত চন্দ্রশেখর একেবারে পুস্তকস্থ মহাপুরুষ নয়। ছোট ভূমিকাগুলির কোন-কোনটি অস্ফুট রহিয়া গিয়াছে। চন্দ্রশেখরের দ্বিতীয় কাহিনী—মীরকাসেম-দলনীর আখ্যায়িকা—মূল প্লটের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিতে পারে নাই। এটিকে স্বতন্ত্র উপন্যাসে রূপ দিলেই বোধ হয় ভালো হইত।

'রজনী' [৩] আকারে উপন্যাসের মত হইলেও প্রকারে বড় গল্পই, পাত্রপাত্রীর জবানিতে লেখা। এই পদ্ধতি যে কলিন্‌সের 'এ ওম্যান্ ইন্ হোয়াইট্' হইতে

[১] বঙ্গদর্শনে (বৈশাখ ১২৮০)।

[২] বঙ্গদর্শনে (১২৮০-৮১)।

[৩] বঙ্গদর্শনে (১২৮১-৮২), পুস্তক-আকারে পরিবর্ত্তিত (১২৮৪)।

ইন্দিরা।

উপন্যাস।

বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত।

কাঁটালপাড়া।

বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে শ্রী হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,

কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৮০।

মূল্য চারি আনা মাত্র।

নেওয়া এবং নামভূমিকা যে লীটনের নীডিয়ার স্মরণে কল্পিত তাহা বঙ্কিম স্বীকার করিয়াছেন। রজনীর প্লটে খুঁত নাই এবং ইহাতে অবান্তর বা অর্দ্ধস্ফুট ভূমিকাও বড় নাই। চন্দ্রশেখরে শৈবলিনী ছেলেবেলার ভালোবাসা ভুলিতে পারে নাই বলিয়া স্বামীর ঘর তাহার করা হয় নাই। রজনীতে লবঙ্গলতা আবাল্য-প্রণয়ের স্মৃতিকে বুকে চাপিয়া হাসিমুখে বৃদ্ধ স্বামীর সেবা ও রুগ্ন সপত্নীর পরিচর্য্যা করিয়াছিল। মানসিক দৃঢ়তা ও গূঢ় তেজস্বিতা লবঙ্গলতার ভূমিকাকে প্রাণবান্ করিয়াছে। ইহা এই উপন্যাসেরও প্রাণ। অমরনাথ রক্তমাংসের মানুষ। প্রেমের স্মৃতিতে দহ্যমান তাহার হৃদয় রজনীর কৃতজ্ঞতাবলেপে শান্ত। কিন্তু এমনি তাহার ভাগ্য যে রজনীর প্রতি তাহার ভালোবাসাই তাহাকে বাধ্য করিল রজনীকে প্রত্যাখ্যান করিতে। অমরনাথের এই ট্রাজেডিকে বঙ্কিম গুরুত্ব দেন নাই, তবুও মনে হয় যে প্রতাপের ট্রাজেডি ইহার কাছে তুচ্ছ। রজনী বঙ্কিমের শিল্পকর্ম্মের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। নিজের কৃতিত্বে নিঃসংশয় ছিলেন বলিয়াই বঙ্কিম কলিন্‌স্-লীটনের কাছে প্রকাশ্য ঋণ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

রজনীর পরে 'রাধারাণী' [১] গল্পটির কাহিনীতে কোন বিশেষত্ব নাই, সাধারণ প্রেমের গল্প মাত্র।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'এর (১৮৭৮)[২] খ্যাতি সর্ব্বাধিক। বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ গল্প-উপন্যাস নায়িকার নামে নামিত। দুইখানি নায়কের নামে, আর চারিখানির নাম উদ্দেশ্যমূলক অথবা ঘটনাবীজ-ঘটিত—বিষবৃক্ষ, যুগলাঙ্গুরীয়, কৃষ্ণকান্তের-উইল এবং আনন্দ-মঠ। পাত্রপাত্রীর নামে কৃষ্ণকান্তের-উইলের নামকরণ চলিত না, কেন না কোন ভূমিকাই আদর্শ-স্থানীয় নয়। বিষবৃক্ষের মত এখানেও বিধবাবিবাহের অকল্যাণকর পরিণতি দেখানো হইলেও বঙ্কিমচন্দ্র এখানে নীতি স্থাপন করেন নাই। গ্রন্থের নামের মধ্যে কাহিনীর বীজ যে উইল-চুরি তাহারই প্রাধান্য স্বীকৃত। এই প্রসঙ্গে সংস্কৃত নাটক মৃচ্ছকটিকের নাম তুলনীয়। আনন্দ-মঠে বঙ্কিমের একটা বিশেষ আইডিয়া মূর্ত্তিলাভ করিয়াছে। এখানে কাহিনীতে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের সঙ্গতি ও পরিণতি নাই এবং বিশিষ্ট নায়ক-নায়িকাও নাই। তাই সেই বিশেষ আইডিয়ার অনুসারে বইটির নাম।

[১] বঙ্গদর্শনে (কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ১২৮২), পুস্তিকা-আকারে (১৮৭৫), পরিবর্ত্তিত (চ-স ১৮৯৩)।

[২] বঙ্গদর্শনে (১২৮২)।

রাজমোহন্‌স্‌-ওয়াইফের সঙ্গে কৃষ্ণকান্তের-উইলের সম্বন্ধ আগে নির্দ্দেশ করিয়াছি। বিষবৃক্ষের সঙ্গেও কৃষ্ণকান্তের-উইলের কিছু সংযোগসূত্র আছে। দুইটি উপন্যাসেরই ব্যাপার বিধবা নারীর সহিত জীবৎপত্নীক পুরুষের প্রেম এবং সেই প্রেমের অশুভ পরিণাম। বিষবৃক্ষে এই প্রেমের উৎপত্তি স্বাভাবিক। কৃষ্ণকান্তের-উইলে তাহা অভিমানের প্রতিক্রিয়ারূপে উপস্থিত। নায়িকাদ্বয়ের মধ্যেও বৈপরীত্য আছে। কুন্দনন্দিনী কামনাহীন অচিরযুবতী, রোহিণী বাসনাদীপ্ত প্রৌঢ়যুবতী—যদিও উভয়েই ভাগ্যবঞ্চিত। কোন কোন সমালোচকের মতে বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণকান্তের-উইলে "অবৈধ" প্রণয় স্বীকার করিয়া বাঙ্গালা উপন্যাসে আধুনিকতার পথ দেখাইয়াছেন। একথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। তিনি "অবৈধ" প্রণয়কে পদে পদে অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন। রোহিণী-গোবিন্দলালের প্রণয়লীলাকে রসহীন কুশ্রীতার পঙ্কে ধাপে ধাপে অবতরণ করাইয়া রোহিণীর পরিণাম যেভাবে দেখানো হইয়াছে তাহাতে প্রমাণিত হয় যে শিল্পী এখানে আচার্য্য হইয়াছেন। তবে রোহিণীর অপমৃত্যুর জন্য লেখককে দায়ী করা সঙ্গত নয়। হত্যা ছাড়া রোহিণীর যে পরিণতি হইত তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পাদর্শের কাছে অভাবনীয়। ভ্রমর-চরিত্র সঙ্গত ও মধুর, কিন্তু শেষের দিকে তাহার অভিমানের বাড়াবাড়ি কাব্যোচিত হইলেও বাস্তবতাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলীর সকল নায়ক-চরিত্রের মধ্যে গোবিন্দলালের ব্যক্তিত্বপূর্ণ ভূমিকা সর্ব্বাধিক পরিস্ফুট। অবান্তর চরিত্রগুলিও যথাসম্ভব অল্প আয়োজনে উজ্জ্বল।

'রাজসিংহ'[১] বঙ্কিমের একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস। পরিবর্দ্ধিত পুনর্লিখিত ও পূর্ণাঙ্গপ্রাপ্ত চতুর্থ সংস্করণকে (১৮৯৩) বঙ্কিমের শেষ এবং বৃহত্তম উপন্যাস বলিতে পারি। ঐতিহাসিক ভূমিকায় অপেক্ষিত শালীনতার অভাব সত্ত্বেও ঐতিহাসিক রস বেশ ফুটিয়াছে। ব্যাপিকা নির্ম্মলকুমারীর অনৈতিহাসিক ভূমিকায় বইটির ঐতিহাসিক পরিবেশ অনেকটাই ক্ষুন্ন। দুর্গেশ-নন্দিনীর ওসমান যেন সাজ বদল করিয়া মবারক হইয়াছে। জেব্‌-উন্নিসার ভূমিকায় স্বাভাবিকতা আছে। উদিপুরীর ভূমিকা মোটেই জমে নাই। চরিত্রাঙ্কনের দুর্ব্বলতাসত্ত্বেও কাহিনীর মনোহারিতায় রাজসিংহ বঙ্কিমের উপন্যাসের মধ্যে বিশিষ্ট।

[১] অংশত বঙ্গদর্শনে (১২৮৪-৮৫), পুস্তক-আকারে (১২৮৮)।

'আনন্দ মঠ'[১] হইতে দেখা গেল বঙ্কিমের উপন্যাসকল্পনায় ভাটার টান ধরিয়াছে। কাহিনী অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসের আধারে পরিকল্পিত। প্লট সংহত নয়, যেন কয়েকটি চিত্রের সমষ্টি। এক মহৎ আদর্শ—দেশপ্রীতি এবং নিষ্কামকর্ম্মের সমন্বয়—উপন্যাসটির প্রতিপাদ্য। সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ ঐতিহাসিক ঘটনা কিন্তু আনন্দ-মঠে ইহার যে চিত্র আছে তাহা ঐতিহাসিকতাবর্জ্জিত। বাঙ্গালাদেশে জাতীয়তাবোধের উন্মেষে এবং লোকহিতৈষণার প্ররোচনায় আনন্দ-মঠের প্রভাব কম নয়। স্বামী বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ-মিশন ও বেলুড়-মঠ প্রতিষ্ঠায় এবং তরুণদের অনুশীলন-সমিতির বিপ্লবপ্রচেষ্টায়ও আনন্দ-মঠের প্রেরণা পরোক্ষ নয়। তবে উপন্যাস হিসাবে আনন্দ-মঠ শিল্পসার্থক নয়। দেশের যে আবহাওয়ার মধ্যে অসন্তোষবহ্নি ধূমায়িত হইতে হইতে একদা সন্ন্যাসীবিদ্রোহে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার কোন পূর্ব্বাভাস বা আয়োজন উপন্যাসের পটভূমিকায় নাই। সে কারণে সমগ্র ব্যাপারটির তাৎপর্য্য যথোচিত গুরুত্ব পায় নাই। সন্ন্যাসীরা সব যেন বিশিষ্ট একটি মতবাদের প্রতীক, তাই প্রাণহীন। ভূমিকাগুলির ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের অভাব গল্পরস ব্যাহত করিয়াছে। একটি ছাড়া সব চরিত্রই অর্দ্ধস্ফুট। একমাত্র শান্তির ভূমিকাই উপন্যাসটিতে কিছু উজ্জ্বলতা দিয়াছে। নিমাইয়ের ভূমিকাও মনোহারী তবে ক্ষণিক।

আনন্দ-মঠে মতবাদ ও ভাবাদর্শ কতকটা শিল্পের আবরণে আবৃত ছিল, 'দেবী চৌধুরাণী'তে[২] তাহা নিরাবরণভাবে প্রকট হইল। ব্যাস যেমন নন্দগোপ-সুতকে গীতানুশাস্তা মহাভারত-কর্ণধাররূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, বঙ্কিমও তেমনি গৃহস্থকন্যা প্রফুল্লকে নিষ্কামধর্ম্মের আচার্য্যা দেবী-চৌধুরাণীতে খাড়া করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। দেবী-চৌধুরাণী যে কৃষ্ণের আদর্শাবতার তাহা বঙ্কিম স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন উপন্যাসের ভরতবাক্যে—"আমি নূতন নহি, আমি পুরাতন। আমি সেই বাক্যমাত্র।" (এখানে কি বাইবেলের প্রতিধ্বনি —"আদিতে বাক্য ছিলেন"?) আনন্দ-মঠের সঙ্গে দেবী-চৌধুরাণীর পার্থক্য প্রধানত এইখানে যে দেশোদ্ধারে লাগিয়াছে প্রথম উপন্যাসে সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা, দ্বিতীয় উপন্যাসে ব্যক্তিগত উদ্দীপনা। দেবী-চৌধুরাণী-ভূমিকার বিকাশে প্রধান ত্রুটি রোমাঞ্চক রোমান্টিকতার প্রাধান্য। উপন্যাসের প্রথম পাতায়

[১] বঙ্গদর্শনে (১২৮৭-৮৯), পুস্তক-আকারে (১২৮৯)।

[২] অংশত বঙ্গদর্শনে ১২৮৯-৯০, পুস্তক-আকারে (১২৯০)।

প্রফুল্লর যে মূর্ত্তি দেখা যায় তাহা পরিচিত ও স্বাভাবিক। পরে ভবানী পাঠকের হাতে পড়িয়া তাহার সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটিয়াছে। তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু সেই রূপান্তরের ইতিহাসটুকু না দিলে শিল্পের হানি হয়। পাঠক-গোচরের অন্তরালে প্রফুল্ল-চরিত্রের মৌলিক পরিবর্ত্তন ঘটিবার ফলে উপন্যাস-কাহিনী প্রতীতিজনক হইতে পারে নাই। অপ্রধান ভূমিকাগুলি ভালোই ফুটিয়াছে, কেবল দিবা ও নিশি নিষ্কামকর্ম্মের মুখোস পরিয়া স্বাতন্ত্র্যহীন ও নিষ্প্রাণ। ঘরসংসারের চিত্র যেটুকু আছে তাহা যথাসম্ভব বাস্তব এবং মনোহর।

অরাজক রাজশক্তির বিরুদ্ধতা 'সীতারাম'এর[১] মর্ম্মকথা। রজনীর অমরনাথের পর সীতারাম-ভূমিকাই বঙ্কিমের অঙ্কিত শ্রেষ্ঠ পুরুষ-চরিত্র। সীতারাম আদর্শ পুরুষ নয়, দোষে গুণে জড়িত মানুষ। সেইখানেই এই ভূমিকাটির সার্থকতা। শ্রীর ও জয়ন্তীর ভূমিকা অবাস্তব। রমা-ভূমিকায় দলনী বেগমের ছায়া আছে। গঙ্গারাম বঙ্কিমের সৃষ্ট একমাত্র পাষণ্ড-চরিত্র। রচনায় লেখকের ক্লান্তির ও অন্যমনস্কতার পরিচয় অসুলভ নয়॥

৪

বাঙ্গালা সাহিত্যে সুনির্ম্মল কৌতুকরসধারার অবতারণা বঙ্কিমের একটি প্রধান কৃতিত্ব। নিরাবিল কৌতুকের অন্তঃপ্রবাহ তাঁহার নভেলের ভাষায় অন্তরঙ্গতার নিবিড়তা দিয়াছে। তাঁহার রচনাগুলির মধ্যে ইহা স্ফুটতর। বঙ্কিমের তিনখানি বই পূরাপূরি কৌতুকরসাশ্রিত—লোকরহস্য কমলাকান্ত এবং মুচিরাম-গুড়ের-জীবনচরিত। শিল্পে ও জীবনে কুশ্রীতা-কদর্য্যতার প্রতি বঙ্কিমের আন্তরিক বিতৃষ্ণা ছিল, তাই তাঁহার রসিকতায় গ্রাম্যতার ক্লেদ নাই এবং ব্যঙ্গেও ব্যক্তিগত খোঁচা নাই। মানবচরিত্রের সাধারণ দুর্ব্বলতাগুলিই তাঁহার জ্বালাহীন সকৌতুক ব্যঙ্গ উদ্দীপ্ত করিয়াছে। সুতরাং সাধারণপাঠকসমাজে এই লেখাগুলির সমাদর প্রচুর এবং ত্বরিত হয় নাই। পাঠকদের রুচি লক্ষ্য করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র লোকরহস্যের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছিলেন,

> বঙ্গদেশের সাধারণ পাঠকের এইরূপ সংস্কার আছে যে রহস্য মাত্র গালি, গালি ভিন্ন রহস্য নাই। সুতরাং তাঁহারা বিবেচনা করেন যে এই সকল প্রবন্ধে যে কিছু ব্যঙ্গ আছে, তাহা ব্যক্তিবিশেষকে গালি দেওয়া মাত্র। এই শ্রেণীর পাঠকদিগের নিকট নিবেদন যে তাঁহাদের জন্য এ গ্রন্থ লিখিত হয় নাই—তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া এ গ্রন্থ পাঠ না করিলেই আমি কৃতার্থ হইব।

[১] প্রচারে (১২৯১-৯৩), পুস্তক-আকারে (১২৯৩)।

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত (১২৭৯-৮০) কয়টি "কৌতুক ও রহস্য" প্রবন্ধ 'লোকরহস্য' নামে পুস্তকাকারে সঙ্কলিত হয় (১৮৭৪)।[১] লোক-রহস্যের কৌতুকরস সূক্ষ্মবিদ্রূপবর্জ্জিত বলিয়া বঙ্কিমের রসরচনার মধ্যে সর্ব্বাধিক জনপ্রিয় হইয়াছিল।

শুধু রসরচনা বলিয়াই নয় বঙ্কিম-সাহিত্যশিল্পের এক অভিনব সৃষ্টি বলিয়াও 'কমলাকান্ত'[২] বঙ্কিমের একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে ইহা তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া স্বীকার করিতেন। ডি-কুইন্‌সির *Confessions of an Opium-eater*-এর অনুসরণে কমলাকান্তের-দপ্তরের পরিকল্পনা। প্রবন্ধ ও নক্‌শাগুলি ভাবগর্ভ এবং সরস, বুদ্ধির দীপ্তিতে উদ্ভাসিত। দপ্তরের উপোদ্‌ঘাতে কমলাকান্তের চকিতদর্শনটুকু পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে।

> তাহার একটি দপ্তর ছিল। কমলাকান্তের কাছে ছেঁড়া কাগজ পড়িতে পাইত না, দেখিলেই তাহাতে কি মাথা-মুণ্ড লিখিত, কিছু বুঝিতে পারা যাইত না। কখন কখন আমাকে পড়িয়া শুনাইত—শুনিলে আমার নিদ্রা আসিত। কাগজগুলি একখানি মসী-চিত্রিত, পুরাতন জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডে বাঁধা থাকিত। গমনকালে কমলাকান্ত আমাকে সেই দপ্তরটি দিয়া গেল। বলিয়া গেল, তোমাকে ইহা বখশিশ করিলাম।

এই কয়েকটি কথার অন্তরালে যে অদ্ভুতপ্রকৃতি মানুষটির ট্রাজিক আভাস পাই তাহা লইয়া একটি ভালো গল্প লেখা যাইত।

'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত'[৩] ব্যঙ্গগল্প। দীনবন্ধু মিত্রের সধবার-একাদশীতে যে ঘটিরাম ডেপুটির কথা আছে তাহাই এই গল্পটির প্রেরণা যোগাইয়াছে।

উচ্ছ্বাসপূর্ণ কয়েকটি ছোট ছোট প্রবন্ধ—যেগুলিতে গদ্যকবিতার পূর্ব্বাভাস লক্ষ্য করা যাইতে পারে—'বঙ্গদর্শন' 'ভ্রমর' ও 'প্রচার' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এগুলি অধিকাংশ 'কবিতাপুস্তক'এ (১৮৭৮) ও ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ 'গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক'এ (১৮৯১) সঙ্কলিত হইয়াছিল। প্রথম দুই বছরে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বিজ্ঞানবিষয়ক নয়টি প্রবন্ধ সঙ্কলিত হয় 'বিজ্ঞানরহস্য' নামে (১৮৭৫, দ্বি-স ১২৯১)। প্রবন্ধগুলি বেশ সহজ করিয়া লেখা। "বিজ্ঞাপন"এ বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,

[১] দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৮৮) আটটি নূতন প্রবন্ধ সংযোজিত এবং একটি পুরাতন প্রবন্ধ ("রামায়ণের সমালোচন, শ্রীমদ্ধনুমদ্বংশজ শ্রীমন্মহামর্কট প্রণীত") পুনর্লিখিত।

[২] বঙ্গদর্শন হইতে 'কমলাকান্তের দপ্তর' নামে পুস্তক আকারে মুদ্রিত (১৮৭৫)। দ্বিতীয় সংস্করণে তিনটি নূতন প্রবন্ধ যুক্ত হইয়া 'কমলাকান্ত' নাম হইল (১২৯২)। এই তিন প্রবন্ধ হইতেছে—'কমলাকান্তের পত্র' 'বুড়ো বয়সের কথা' এবং 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী'।

[৩] পুস্তক-আকারে (১৮৭৯)।

লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য এই, যে আলোচিত বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব সকল সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক, বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীর বালকেরা, এবং আধুনিক শিক্ষিতা বাঙ্গালী স্ত্রী, বুঝিতে পারেন।

৫

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত কতকগুলি সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ 'বিবিধ সমালোচনা' নামে (১৮৭৬), এবং দর্শন ও অন্যান্যবিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ 'প্রবন্ধ পুস্তক' (১৮৭৯) নামে সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই দুইটি বই পরে কিঞ্চিৎ পরিবর্জ্জনসহ 'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রথমভাগের অন্তর্ভুক্ত হয় (১২৯৪)। 'বিবিধ প্রবন্ধ' দ্বিতীয় ভাগে (১৮৯২) বঙ্গদর্শনে ও প্রচারে প্রকাশিত ধর্ম্ম-ইতিহাস-অর্থনীতি-সমাজনীতি-সাহিত্য-রচনাদর্শ প্রভৃতি নানাবিষয়ক প্রবন্ধাবলী সঙ্কলিত। বঙ্কিমচন্দ্র যখন বঙ্গদর্শন বাহির করেন তখন বাঙ্গালাদেশে ইংরেজি-শিক্ষিত সমাজে মিলের হিতবাদের এবং কঁতের মনুষ্যত্ববাদের বড় আদর। এই দুই বিদেশি মনীষীর চিন্তাধারা বঙ্কিমচন্দ্রকে বিশেষ প্রভাবিত করিয়াছিল এবং তাহারই ফলে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'বঙ্গদেশীয় কৃষক' (১২৭৯) এবং 'সাম্য' [১] (১২৮০, ১২৮২) নামক দীর্ঘ প্রবন্ধদ্বয় লেখা হয়।

বঙ্গদর্শনের প্রথম পর্য্যায় শেষ হইয়া গেলে পর বঙ্কিম সোস্যালিজম্ চর্চা ছাড়িয়া হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনায় ঝুঁকিলেন। তখন স্বভাবতই তাঁহার দৃষ্টি পড়িল সাংখ্যদর্শনের দিকে, কেন না প্রাচীন ভারতীয় দর্শনচিন্তার মধ্যে সাংখ্যই ইউরোপীয় দর্শনচিন্তার সবচেয়ে কাছাকাছি। এই আলোচনার ফলে তাঁহার চিত্তবৃত্তির অনুশীলন যতই হোক, সাহিত্যশিল্প যে ক্ষতিগ্রস্ত হইল তাহার প্রমাণ শেষ তিনখানি উপন্যাস। সাংখ্যদর্শন হইতে ভগবদ্গীতা বেশি দূরে নয়। বঙ্কিম সাংখ্য হইতে যোগে পৌঁছিলেন। ভগবদ্গীতার আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমের মন হইতে মিল্-কঁতের প্রভাব কমিয়া আসিতে লাগিল, তবে একেবারে মুছিয়া গেল না। কঁতের দৃষ্টিতে বঙ্কিম হিন্দুশাস্ত্রের এবং কৃষ্ণচরিত্রের আলোচনা করিতে লাগিলেন। কঁতের সঙ্গে বঙ্কিমের প্রধান মত-পার্থক্য হইতেছে ঈশ্বরের অস্তিত্ব লইয়া। কঁত নিরীশ্বর, বঙ্কিম সেশ্বর। কিন্তু ঈশ্বরকে বঙ্কিম চরম-উৎকর্ষপ্রাপ্ত মানব বা "অবতার" শ্রীকৃষ্ণের আদর্শে ভাবিয়াছেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের যে বাণী—নিষ্কামকর্ম্ম ও লোকহিত—তাহাতেই বঙ্কিম মানবের চরম

[১] প্রচারে (১২৯২-৯৪), গ্রন্থাকারে (১২৯৫)।

আদর্শ দেখিয়াছিলেন, এবং সেই পরম বাণীর খাতিরে তাঁহার বক্তব্যকে পাশ্চাত্য-বিচারপদ্ধতির দ্বারা পরিশোধিত করিয়া মহামানব প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই চেষ্টার ফল 'ধর্ম্মতত্ত্ব-অনুশীলন' এবং 'কৃষ্ণচরিত্র'।

'ধর্ম্মতত্ত্ব, প্রথমভাগ—অনুশীলন'[১] পাশ্চাত্যদৃষ্টিতে কঁত-মতবাদের আলোকে হিন্দুধর্ম্মের ও আচারের সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যা গুরু-শিষ্যের কথোপকথন (catechism) রূপে উপস্থাপিত।

'কৃষ্ণচরিত্র'ও প্রথমে প্রচারে প্রকাশিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৯২) কৃষ্ণচরিত্র পূর্ণতর এবং নূতন রূপ ধারণ করে। ঐতিহাসিক আলোচনার দ্বারা কৃষ্ণলীলা-কাহিনীর বিভিন্ন ধারাগুলির পৌর্ব্বাপর্য্যবিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া অলৌকিক ও অযৌক্তিক অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বাদ দিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ এবং আদর্শ প্রকটিত করিয়া ইংরেজি-শিক্ষিতের গ্রহণযোগ্য করাই কৃষ্ণচরিত্রের উদ্দেশ্য। কঁতের মনুষ্যত্ববাদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন বলিয়াই বঙ্কিম শ্রীকৃষ্ণ-লীলাকাহিনীকে পরিবর্জ্জন ও পরিশোধন করিবার সাহস করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনলীলা-কাহিনী সর্ব্বাগ্রেই বাদ গিয়াছে, কেন না পাশ্চাত্য-বিচারদৃষ্টিতে ইহা অসম্ভব, মথুরা- ও দ্বারকা-লীলার সহিত সঙ্গতিবিহীন এবং বঙ্কিমের চিন্তায় অশোভন। ঐতিহাসিক বিচার বিশ্লেষণ করিয়া বঙ্কিম যে মূল কৃষ্ণচরিত্র অনুমান করিয়াছেন তাহা আদর্শ মানব বা অবতার চরিত্র বলিয়া সকলে গ্রহণ করিবে না, এবং বঙ্কিমের যুক্তির ও বিচারের মূলেও গলদ আছে। তবুও একথা স্বীকার করিতে হইবে যে কৃষ্ণচরিত্রে বঙ্কিম যে মনন-শীলতার এবং শাস্ত্রকে বিচারের কষ্টিতে যাচাই করিবার মত স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিয়াছেন তাহা তখনকার পক্ষে অত্যন্ত অসাধারণ। যেকালে একদিকে বিলাতি আচারের ও নাস্তিকতার মূঢ়তায় অপরদিকে তাহার প্রতিক্রিয়ায় নব্য হিন্দুধর্ম্মের বিচারবিহীন উচ্ছ্বাসে দেশ আকুল, "আমাদের বঙ্গসমাজের এইরূপ উল্‌টা রথের দিনে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র রচিত হয়। যখন বড় ছোট অনেকে মিলিয়া জনতার স্বরে স্বর মিলাইয়া গোলে হরিবোল দিতেছিলেন তখন প্রতিভার কণ্ঠে একটা নূতন সুর বাজিয়া উঠিল,—বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র গোলে হরিবোল নহে। ইহাতে সর্ব্বসাধারণের অনুমোদন নাই, সর্ব্বসাধারণের প্রতি অনুশাসন আছে।" কৃষ্ণচরিত্রের যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ।

[১] পুস্তক-আকারে (১৮৮৬)।

যখন আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরাও আত্মবিস্মৃত হইয়া অন্ধভাবে শাস্ত্রের জয়-ঘোষণা করিতেছিলেন তখন বঙ্কিমচন্দ্র বীরদর্পসহকারে কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে স্বাধীন মনুষ্যবুদ্ধির জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। তিনি শাস্ত্রকে ঐতিহাসিক যুক্তি দ্বারা তন্নতন্নরূপে পরীক্ষা করিয়াছেন এবং চিরপ্রচলিত বিশ্বাসগুলিকেও বিচারের অধীনে আনয়ন পূর্ব্বক অপমানিত বুদ্ধিবৃত্তিকে পুনশ্চ তাহার গৌরবের সিংহাসনে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া দিয়াছেন।[১]

৬

যেসকল পাঠক সংস্কৃত সাহিত্যের অথবা সংস্কৃতানুসারী বাঙ্গালা সাহিত্যের ধার বিশেষ ধারিতেন না অথচ ইংরেজি সাহিত্যে তেমন দখল না থাকায় যাঁহারা বাঙ্গালা বই পড়া অবজ্ঞার বিষয় মনে করিতেন না তাঁহারাই বঙ্কিমের প্রধান সমঝদার ছিলেন, এবং স্বভাবতই ইঁহাদের মধ্যে দলে ভারি ছিলেন নারী ও তরুণেরা। প্রচলিত সাহিত্য-প্রিয় সমালোচকবর্গ সাধারণ্যে বঙ্কিমের লেখার সমাদর দেখিয়া নিতান্ত কঠোরভাবে নিজেদের বিরাগ প্রকাশ করিতেন।

অগ্নির ন্যায় সর্ব্বভুক্ পুস্তকপাঠকেরা পুস্তক পাইলেই একাদিক্রমে সর্ব্বপ্রকার পুস্তক পাঠ করেন ও প্রায় সকল পুস্তকের প্রশংসা করেন।

কিন্তু রামগতি ন্যায়রত্ন বঙ্কিমের প্রথম তিনখানি উপন্যাসের যে সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহাতে পক্ষপাতহীনতার চেষ্টা আছে ঈর্ষ্যার রূঢ়তা নাই।[২] দুর্গেশনন্দিনী লেখকের জ্যেষ্ঠ অগ্রজের নামে উৎসর্গিত। এইজন্য 'সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়'এর (প্রথম খণ্ড ১৮৭৫) লেখক লিখিয়াছিলেন,

দেখুন, সেই মহাত্মা জ্যেষ্ঠ সহোদরকে একখানি অশ্লীল গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়াছেন। কনিষ্ঠ হইয়া অশ্লীল গ্রন্থ জ্যেষ্ঠ সহোদরকে উৎসর্গ করিতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করেন নাই।

সমালোচক ইহাও বলিতে চাহেন যে বঙ্কিমের উপন্যাসে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট তাহা নিজস্ব নয়।

লেখক স্কট ও মিলটন প্রভৃতির ইংরাজী পুস্তক হইতে যাহা সঙ্কলন করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার আপনার বুদ্ধি ও কল্পনা যোজনা হয় নাই, তাহাই কথঞ্চিৎ ভাবুক লোকের শ্রোতব্য হইয়াছে।

তবুও সমালোচক অনিচ্ছাসত্ত্বে স্বীকার করিয়াছেন যে বঙ্কিমের রচনায় মনোহারিত্ব আছে।

উক্ত লেখকের একটি গুণ আছে, তাহা আমি অস্বীকার করিতে পারি না। তিনি আপনার গ্রন্থ সন্নিবেশিত ঘটনাবলী এতদূর মনোরম করিতে পারেন, যে তাহা পিতামহী দেবীর উপকথার ন্যায়, শূন্যহৃদয় নির্ব্বোধের নিদ্রাকর্ষণ করিতে পারে।

[১] সাধনা চতুর্থ বর্ষ প্রথম ভাগ পৃ ২৬৫-৬৬।

[২] বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব (প্রথম খণ্ড ১৮৭২) পৃ ৩২৩-৪৩।

বঙ্গদর্শনে গ্রন্থ-সমালোচনায় বঙ্কিমের বিরুদ্ধবাদীরা প্রায় আগুন হইয়া উঠিয়াছিল। প্যারীমোহন কবিরত্নের একটি গানে তাহার পরিচয় আছে।[১]

> বঙ্গদর্শনের দর্শনশক্তি চমৎকার,
> এ দোষদর্শনে রোষ হয় না কার ?
> অন্ধ যে জন, নাইকো লোচন, সমালোচন কেন তার ?
> পদে পদে দেখতে পাই, কর্ত্তা কর্ম্ম বোধ নাই,
> ভাব রসের মা-গোসাইঞ, কেন লেখার ছল ধরে,—
> রাধাকৃষ্ণ বল্‌তে শিখে, দুট একটা পদ্য লিখে,
> ধরাটাকে শরা সম জ্ঞান করে ,—
> শুনে হাসি পায়, বাঁচিনে লজ্জায়,
> কালে বাপ্ত পণ্ডিত হবে, এই কারখানা সেই প্রকার। ...

সুরলোকে-বঙ্গের-পরিচয়ের লেখকও বলিয়াছেন,

> কোন সমালোচক বাবুর আপন লিখিত পুস্তকে কর্ত্তা ক্রিয়া প্রকাশ অপ্রকাশ রাখার স্থান-বিচার নাই। কি মদগর্ব্বের প্রভাব! তিনি আশা করেন, তাঁহার ভাষাকে আদর্শ করিয়া, লোকে এক ব্যাকরণ প্রস্তুত করুক।

নাটকেও বঙ্কিমচন্দ্র নিন্দুক ও বিদ্বিষ্ট সমালোচকের কটাক্ষ এড়াইতে পারেন নাই। গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'বিধবার দাঁতে মিশি' প্রহসনে (১৮৭৪) উড়ুম্বর চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্রকেই কটাক্ষ করা হইয়াছে। যেমন,

> উড়ুম্বর। গুড নাইট বরদা বাবু।
> গোরা। আইয়ে ইণ্ডিয়ান সার ওয়াল্টার স্কট।
> উড়ুম্বর। আর কেন জ্বালাও বাবা।

ক্ষুদ্রকায় পুস্তিকা 'বঙ্গীয় সমালোচক (কাব্য)' (১২৮৭) (লেখক "বাউল শ্রীফকিরচাঁদ বাবাজী" অর্থাৎ কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ) বঙ্কিমচন্দ্রকে অভদ্র ব্যঙ্গ করিয়া শুরু হইয়াছে। প্রথমেই ছবি—কাঁঠাল গাছের তলায় বাঁদর দাঁড়াইয়া আছে, হাতে বঙ্গদর্শন, নীচে কবিতা "হে বঙ্গ দর্শন কর বঙ্কিম বানর" ইত্যাদি। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এই লেখকই পরে রবীন্দ্রনাথের কড়ি-ও-কোমলকে ভেঙচাইয়া 'মিঠে-কড়া' লিখিয়াছিলেন॥

[১] গীতাবলী (১৮৭৬) পৃ ৮০-৮৩।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

উপন্যাস ও গল্প

১

রোমান্সের যে রসভাণ্ডার বঙ্কিমচন্দ্র খুলিয়া দিলেন তাহা নবসৃষ্টির সমারোহ-গৌরবে সমুজ্জ্বল। তাহার ভাষায় ও ভাবে না ছিল পাণ্ডিত্যের দুরূহতা না ছিল লঘুতার শ্রীহীনতা। অনায়াসে এবং অবিলম্বে বঙ্কিমের উপন্যাস বাঙ্গালী পাঠকের চিত্ত জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল বলিয়া অনুকরণকারিগণের আবির্ভাব ঘটিতে বিলম্ব হয় নাই। ইঁহাদের রচনা প্রায়ই তুচ্ছ, তবে সাময়িক সমাদর হইতে সর্বদা বঞ্চিত নয়। দুর্গেশনন্দিনী ও বিষবৃক্ষ প্রকাশের মধ্যবর্ত্তী কালে এমন দুই-চারিখানি উপন্যাস রচিত হইয়াছিল যাহার মধ্যে বঙ্কিমের প্রভাব অনুপস্থিত অথবা বিরল। ঐতিহাসিক পটভূমিকা অথবা গার্হস্থ্য পরিবেশকে উপযুক্ত প্রাধান্য দিয়া প্রণয়রসের একছত্রতা কমাইয়া এই উপন্যাসগুলির কোন কোনটি বঙ্কিমের রচনা হইতে কিছু অগ্রসর।

"শ্রীমতী" হেমাঙ্গিনীর 'মনোরমা'র (১৮৭৪) রচনাকাল ১২৭২ সাল[১]। সরল সাধুভাষায় লেখা। ইহাতে সমসাময়িক আখ্যায়িকার মত মধ্যে মধ্যে অল্পস্বল্প পয়ার ছত্র থাকিলেও উপন্যাসের লক্ষণহীন নয়। গার্হস্থ্যচিত্রের পরিকল্পনায় নারীহস্তের স্পর্শ আছে। মনোরমা স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক আখ্যায়িকা, তবে সাহিত্যরসবর্জ্জিত নয়। বিজয়বল্লভের মত ইহাতেও পূর্ব্বতন আখ্যায়িকা হইতে উপন্যাসের অভিব্যক্তির নিদর্শন পাইতেছি।

কালীকৃষ্ণ লাহিড়ীর 'রশিনারা'র (১৮৬৯) বিষয় ভূদেবের অঙ্গুরীয়-বিনিময়ের মত শিবজী-রশিনারার অনুরাগকাহিনী। উপন্যাসটিতে

[১] উৎসর্গপত্রে লেখিকা তাঁহার "পরমারাধ্য পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত আর্য্যপুত্র" মহাশয়কে উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন, "১২৭২ সালে আমি মনোরমার আখ্যায়িকা লিখিতে প্রবৃত্ত হই; এবং ঐ সালেই ইহা সমাপ্ত করি। কিন্তু ইহা মুদ্রাঙ্কনের নিতান্ত অযোগ্য জানিয়া এ পর্য্যন্ত কাহাকেও না দেখাইয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম।"

হেমাঙ্গিনী আরও একটি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, 'প্রণয়প্রতিমা' (১৮৭৭)।

ঐতিহাসিক পরিবেশ ভালো করিয়াই ফুটিয়াছে। চরিত্রচিত্রণেও দক্ষতার পরিচয় আছে। নায়িকার ভূমিকায় বঙ্কিমের আয়েষার যৎসামান্য প্রভাব। শিবজীর ভূমিকা বঙ্কিমের সাধারণ নায়কের তুলনায় জোরালো। রচনারীতি সাধুভাষাশ্রয়ী, সরল ও সরস। বর্ণনাভঙ্গি দ্রুতগতি। রচনারীতিতে বঙ্কিমের প্রভাব লক্ষিত হয় পাঠক-সম্বোধনে। রশিনারার প্রভাবও বঙ্কিমের রচনায় কিছু পড়িয়াছে। রশিনারার স্বপ্নবৃত্তান্ত (প্রথম খণ্ড অষ্টম পরিচ্ছেদ) কতকটা কুন্দনন্দিনীর স্বপ্ন-পরিকল্পনার মূল বলিয়া মনে হয়।

প্রতাপচন্দ্র ঘোষের (?-১৯২১) 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' (প্রথম খণ্ড ১৮৬৯, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮৪)[১] সম্পূর্ণভাবে বঙ্কিমপ্রভাববর্জ্জিত। বরং স্কটের অনুসরণ আছে। তখনকার দিনের বাঙ্গালা উপন্যাসের মধ্যে শুধু বঙ্গাধিপ-পরাজয়ই আকারে সমসাময়িক বিলাতি উপন্যাসের সমকক্ষতার দাবি করিতে পারে।[২] উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই প্রতাপাদিত্যের কাহিনীর সমাদর ছিল। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' বাহির হইবার অনেক আগে ভারতচন্দ্র প্রতাপাদিত্য-মানসিংহ-উপাখ্যান লিখিয়া কাহিনীটিকে সুপরিচিত করিয়াছিলেন। বঙ্গাধিপ-পরাজয়ও সেই প্রতাপাদিত্যের কথা। ইতিহাসজ্ঞ লেখক উপন্যাসে ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। দেশকালানুগতি বা "লোকাল কালার" এই উপন্যাসে যেমন ফুটিয়াছে এমন আর কোন সমসাময়িক রচনায় পাই না। তবে বইটি একান্তভাবে বর্ণনাময় বলিয়া ভূমিকাগুলি পরিস্ফুট হয় নাই। ভাষা নীরস এবং অমসৃণ বলিয়া এবং কল্পনাশক্তির দুর্ব্বলতার জন্য পটভূমিকার বিশালতা এবং দেশ-কাল-ইতিহাসের অনুগতি সত্ত্বেও বঙ্গাধিপ-পরাজয় খুব সার্থক উপন্যাস হয় নাই। ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে প্রতাপচন্দ্রের মত আর কেহই তখন বাঙ্গালা রচনায় এতটা পরিশ্রম স্বীকার করেন নাই।

লিপিচিত্রাঙ্কনে প্রতাপচন্দ্র বেশ দক্ষতা দেখাইয়াছেন কিন্তু প্রায়ই বর্ণনার খুঁটিনাটি পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইবার উপক্রম করে, এবং চিত্রবাহুল্যের জন্য কাহিনীও সর্ব্বত্র জমাট বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই। প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রভৃতির বর্ণনা দিয়া লেখক ইচ্ছা করিয়াই প্রচলিত আখ্যায়িকা-উপন্যাসের ধারার

[১] বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য (তৃ-স) পৃ ১১৪-১১৬ দ্রষ্টব্য।

[২] লালবিহারী দের সমালোচনা।

ব্যতিক্রম করিয়াছিলেন। ইনি ইহাও জানিতেন যে সকল পাঠকের পক্ষে ইহা রুচিকর হইবে না। তাই প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় প্রতাপচন্দ্র এই কথা লিখিয়াছিলেন,

> স্বভাব বর্ণনে ও প্রচলিত রীতি বহির্ভূত রচনাপ্রণালী স্বীকার করায় বোধ হয় গ্রন্থটি নিতান্ত দূষিত হয় নাই। অকারণ কোন বর্ণনা বা বাক্য প্রয়োগ হয় নাই, যত্নে পাঠ করিলে অবশ্য মর্ম্মজ্ঞ হইবেন।

উপদেশ-বচনের ছড়াছড়ি এবং বর্ণনার বাড়াবাড়ি আছে বলিয়া বইটির যে প্রতিকূল সমালোচনা হইয়াছিল তাহার উত্তরে দ্বিতীয় সংস্করণে উদ্ধৃত প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লেখক এই কয়টি কথা যোগ করিয়া দিয়াছেন,

> রুচির অনুরোধে উপদেশ ভাগ সংক্ষেপ করা হয় নাই।...রাগপ্রবণ পাঠকের পক্ষে ছন্দের নৈসর্গিক ও প্রাকৃতিক বর্ণনা অসহ্য হইতে পারে; কিন্তু গ্রন্থখানি কোন বিশেষ-শ্রেণী পাঠকের প্রীতিকর জন্য রচিত নহে। সাধারণ বাঙ্গালীর প্রিয় হইলেই শ্রম সফল।

দীর্ঘ নিসর্গবর্ণনা বোধ হয় সংস্কৃত গদ্যকাব্যের প্রভাবে। মধ্যে মধ্যে ক্লান্তিকর হইলেও এই বর্ণনাগুলির মধ্যে প্রায়ই যে ফটোগ্রাফ-সুলভ চিত্র পাইতেছি তাহাতে লেখকের অনুভূতির পরিচয় আছে।

দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশের পর হইতে বিষবৃক্ষ-প্রকাশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কয় বছরের মধ্যে আরো অনেকগুলি শিক্ষামূলক, আখ্যায়িকাজাতীয় এবং রোমান্টিক অথবা ঐতিহাসিক এড্‌ভেঞ্চার ও প্রণয়কাহিনীঘটিত উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছিল। এইসকল উপন্যাসের অনেকগুলিতেই বঙ্কিমের প্রভাব কমবেশি পড়িয়াছে। যেমন, নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রত্নোত্তমা' (১৮৬৭), অজ্ঞাতনামার 'মনোত্তমা' (১৮৬৮), মীর মশাররফ হোসেনের (১৮৪৮-১৯১২) 'রত্নবতী' (১৮৬৯),[১] জয়গোপাল গোস্বামীর 'শৈবলিনী' (১৮৬৯, দ্বি-স ১৮৮৪), কালীবর ভট্টাচার্য্যের 'অকাল কুসুম' (১৮৬৯), ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চণ্ডালিনী' (১৮৭০), রাজকৃষ্ণ আঢ্যের 'কামরূপ-কামলতা' (ভাটপাড়া ১৮৭১), গৌরীনাথ নিয়োগীর 'আশা-মরীচিকা' (১৮৭২), উমাচরণ চক্রবর্ত্তীর 'বসন্তকুমারী' (১৮৭২), মদনমোহন মিত্রের 'সমরশায়িনী' (১৮৭৩), শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'কাঞ্চনমালা' (১৮৭৩), হরকুমার ঠাকুরের সহধর্ম্মিণীর 'তারাবতী' (১৮৭৩), অজ্ঞাতনামার 'বিজয়সিংহ' (১৮৭৪), ইত্যাদি। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'রাজবালা'র (১৮৭০) কাহিনী লেখকের বাসগ্রামের ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ৷৷

২

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে সাধারণ বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবনের কথা উঠে নাই। সে কথা উঠিল তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৮৪৩-৯১) 'স্বর্ণলতা'য় (১৮৭৪,

[১] ইঁহার অপর আখ্যায়িকা-উপন্যাস—'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (১৮৯১) ও 'গাজীমিঁয়ার বস্তানী' (১৮৯৯)।

দ্বি-স ১৮৭৭)।[১] ইহার পূর্ব্বে "আমাদের এই চিরপীড়িত, ধৈর্য্যশীল, স্বজন-বৎসল, বাস্তভিটাবলম্বী, প্রচণ্ড কর্ম্মশীল পৃথিবীর এক নিভৃত প্রান্তবাসী শান্ত বাঙ্গালীর কাহিনী" কেহ বলে নাই। ভূমিকাগুলি লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অবলম্বনে পরিকল্পিত। ছোট-বড় সুখদুঃখের জালবোনা পরিচিত দিনরজনীর সংসারে অতি সাধারণ নরনারীকে অহরহ যে কঠিন নিষ্ঠুর-রূঢ়তার সম্মুখীন হইতে হয় তাহারই একটি ছোট কাহিনী স্বর্ণলতার বিষয়। পূরাপুরি বাস্তবদৃষ্টি লইয়া উপন্যাস-রচনা বাঙ্গালায় এই প্রথম। তারকনাথ যে উপন্যাসকে কাব্যের কল্পলোক হইতে জীবনের নিত্য-অভিজ্ঞতায় নামাইয়া আনিতে চাহিয়াছিলেন তাহা স্বর্ণলতার নামপৃষ্ঠায় উদ্ধৃতি হইতেই জানা যায়—"কথাপি তোষয়েদ্ বিজ্ঞং যত্নসৌ তথ্যবদ্ ভবেৎ"। বঙ্কিমের উপন্যাসে যে বাঙ্গালী-জীবনের ছবি আছে তাহা কল্পনা-চিত্র, তারকনাথের স্বর্ণলতায় যে ছবি আঁকা হইয়াছে তাহা অভিজ্ঞতার চিত্র। চোখকান বুঝিয়া কায়ক্লেশে ডুমুঠা খাইয়া এবাড়ি-ওবাড়ি ঘুরিয়া এপাড়া-ওপাড়া বেড়াইয়া কোন রকমে দিন কাটাইয়া দেওয়াই পল্লীবাসী শতকরা নব্বই জন বাঙ্গালী যুবকের কাম্য না হইলেও ভাগ্য বটে। এইরূপ নির্ব্বিবাদ জীবনেও কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ঘটিয়া উঠে না। তুচ্ছ কারণে সঞ্জাত পরিবারিক অশান্তি প্রধূমিত হইয়া শান্তিপূর্ণ স্নেহচ্ছায়ানিবিড় পল্লীনীড়কে দগ্ধাবশেষ করিয়া দেয়। একদা বাঙ্গালীর সংসারে যে একান্নবর্ত্তিতা সুখসৌভাগ্যের সেতু ছিল তাহাই এখন নিদারুণ অশান্তির মূল হইতেছে। এই সমস্যাই স্বর্ণলতায় মুখর।

রোমান্টিসিজ্‌মের রঙীন চশমা পরিয়া তারকনাথ প্লটের পরিকল্পনা করেন নাই। তাঁহার পাত্রপাত্রীরাও সুদূর কিংবা অদূর অতীতের জীবিকা-নির্ব্বাহচিন্তাভারাক্লিষ্ট প্রণয়রসাতুর কল্পনাস্বর্গবাসী নয়। অন্নবস্ত্রের চিন্তায় প্রিয়জনের কল্যাণকামনায় আতুরচিত্ত যে নরনারী চিরন্তর জীবননাট্যমঞ্চে ভিড় জমাইয়া চলিয়াছে তাহাদেরই কয়েকটির ভূমিকা অত্যন্ত সাদাসিধা ও স্বাভাবিকভাবে এই উপন্যাসটিতে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। স্বর্ণলতার পাত্র-পাত্রী সব সাধারণ "পাঁচপাঁচি" মানুষ, তাহাদের মধ্য দিয়া লেখক কোন উদাত্ত ভাব অথবা সুগভীর তত্ত্ব ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করেন নাই। চরিত্রচিত্রণে কোথাও

[১] রচনাসমাপ্তির তারিখ ৭ই জুলাই ১৮৭৩। প্রথমপ্রকাশ জ্ঞানাঙ্কুরে (১২৭৯-৮০)। স্বর্ণলতা একাধিকবার ইংরেজিতে অনূদিত হইয়াছে। সর্ব্বশেষ অনুবাদ এডোয়ার্ড টম্‌সনের, *The Brothers* নামে (১৯২৮)।

যে খুঁত নাই এমন কথা বলি না, কিন্তু সে অতিরঞ্জন নয়। স্বর্ণলতার ভাষায় বঙ্কিমের কাব্যশ্রী নাই বটে, কিন্তু ইহা সরল প্রাঞ্জল এবং বর্ণনীয় বিষয়ের একান্ত উপযোগী।

মূল আখ্যানবস্তুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ না থাকিলেও স্বর্ণলতার ভূমিকাগুলির মধ্যে নীলকমলই উজ্জ্বলতম। গল্পের মধ্যে নীলকমলের আবির্ভাব যেমন আকস্মিক তিরোভাব তেমনিই বেদনাদায়ক।

> কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকার ও অপেক্ষাকৃত কৃশ। বয়স ৩২।৩৩, বাম করে তামাক সাজা কলিকা সহ হুঁকা, বাম স্কন্ধে একখানি ময়লা বস্ত্রাবৃত একটি বেহালা ঝুলান, দক্ষিণ করে একগাছি তল্‌দা বাঁশের ছড়ি, পায়ে জুতা নাই, একখানি মলিন বস্ত্র পরিধান। কটিদেশ হইতে গলা পর্য্যন্ত অনাবৃত, মস্তকে চাদর একখানি পাগড়ি করিয়া বাঁধা, কোমরে একটি ক্ষুদ্র বোঁচকা।

এই মূর্ত্তিতে নীলকমল হাঁসখালির রাস্তার ধারে গাছতলায় বিধুভূষণের সম্মুখে তথা গল্পের আসরে আচম্বিতে অবতীর্ণ হইল। নীলকমলকে দিয়া কিছু হাস্য-কৌতুকের সৃষ্টি করাই বোধ হয় লেখকের আসল উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু চরিত্রটির মধ্যে যে অসামান্যতা ও বাস্তবতা আছে তাহাই ইহাকে সকরুণ সমবেদনায় ও সর্ব্বজনীন মানবত্বে অভিষিক্ত করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে অমর করিয়াছে। নীলকমল কলিকাতায় কখনো যায় নাই শুনিয়া বিধুভূষণ যখন জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কেমন করে তবে একা কলিকাতায় যাবে, কে রাস্তা বলে দেবে?" তাহার উত্তরে নীলকমল যাহা বলিল তাহা তাহারই মুখে শোভা পায়। নীলকমল বলিল, "রাস্তার লোকে রাস্তা বলে দেবে। কাণের জল জল দিলে বেরোয়।" নীলকমলের "পদ্ম-আঁখি আজ্ঞা দিলে" গান শুনিয়া সকলেই হাসিত, বিধুভূষণও হাসিয়াছিল। তাহাতে নীলকমল বলিয়াছিল, "যে পদ্ম-আঁখির গানটা শুনে তুমি হাস্‌লে, কত লোক উহা শুনে কেঁদেছে।" এই কথাটির মধ্যে নীলকমল চরিত্রের মূল সুরটুকু আছে। বিধুভূষণের মতই অনেক পাঠক নীলকমলের চরিত্র পড়িয়া হাসিয়াছে, কিন্তু সাহিত্যরসিক অন্তর্গূঢ় কারুণ্যে মুগ্ধ। স্বর্ণলতার নীলকমল রবীন্দ্রনাথের 'আপদ'এর নীলকান্তকে সুনিশ্চিতভাবে স্মরণ করায়।

তারকনাথ আরো কয়েকখানি উপন্যাস ও গল্প লিখিয়াছিলেন। 'হরিষে বিষাদ'এ (১৮৮৭) গ্রাম্য চক্রান্তের নিতান্ত স্বাভাবিক ছবি ফুটিয়াছে। গ্রাম্য নারীর চিত্র জীবন্ত। 'অদৃষ্ট' (১৮৯২) সাংসারিক মনোমালিন্য ও চক্রান্ত ঘটিত। এই উপন্যাস দুইটিরও মূলে ডাক্তার গ্রন্থকারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

ইহার অপর গ্রন্থ হইতেছে 'তিনটি গল্প' (১২৯৫)। তাহার একটি, 'ললিত সৌদামিনী'[১] স্বর্ণলতার পরেই লেখা হইয়াছিল ॥

৩

বঙ্কিমচন্দ্রের পর তাঁহার মধ্যমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-৮৯) বঙ্গদর্শনের সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের আসরে নামিয়াছিলেন মাসিকপত্রিকা 'ভ্রমর' বাহির করিয়া (বৈশাখ ১২৮১)। ভ্রমরের প্রথম দুই সংখ্যায় সঞ্জীবচন্দ্রের দুইটি গল্প প্রকাশিত হয়। 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট'[২] এবং 'দামিনী'। ইহাই সঞ্জীবচন্দ্রের প্রথম বাঙ্গালা রচনা। এক বৎসর আগে প্রকাশিত কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্রের 'মধুমতী' এবং সঞ্জীবের 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' ও 'দামিনী'—এই তিনটি গল্পেই অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস ধ্বনিত। দামিনীর পরিকল্পনা এবং রচনারীতি তখনকার পক্ষে অভাবনীয়। ব্যঙ্গমিশ্রিত লঘু পরিহাস-রসিকতা সঞ্জীবচন্দ্রের রচনাশৈলীর একটা বড় বিশেষত্ব। দামিনীতে এই রীতির পূর্ণ অভিব্যক্তি।

সঞ্জীবচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'কণ্ঠমালা'র (১৮৭৭, দ্বি-স ১৮৮৬)[৩] প্রথমাংশে যেমন বাঁধুনি আছে শেষাংশে তেমন নাই। ইহাই সঞ্জীবের রচনার প্রধান দোষ। তাঁহার সাহিত্যপ্রতিভা যেমন উজ্জ্বল ছিল উদ্যম উৎসাহ অধ্যবসায় ও শ্রমশীলতা তেমন দীপ্ত ছিল না। সেইজন্যই তাঁহার প্রতিভার ভগ্নাংশমাত্রের পরিচয় রহিয়া গিয়াছে তাঁহার রচনায়। কণ্ঠমালার শৈলবালা-ভূমিকা বাঙ্গালা উপন্যাসে নূতন সৃষ্টি। এই বাস্তব-চরিত্রই উপন্যাসটির প্রধান আকর্ষণ। কণ্ঠমালার বিংশ পরিচ্ছেদে যে "মহাকুলীন"-উপাধিধারী "শুভানুধ্যায়ী সম্প্রদায়" উল্লিখিত হইয়াছে তাহাই বঙ্কিমচন্দ্রকে আনন্দ-মঠের পরিকল্পনা যোগাইয়াছিল বলিয়া মনে করি।

'মাধবীলতা'য় (১৮৮৪)[৪] কণ্ঠমালার কয়েকটি ভূমিকার পূর্ব্ব-ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। মাধবীলতার রোমান্টিক আখ্যানবস্তুতে দেশীয় রূপকথার ছাপ কিছু আছে। রচনারীতিও রূপকথার ধরণের। মূল আখ্যানের সঙ্গে অল্পবিস্তর

[১] প্রথমপ্রকাশ জ্ঞানাঙ্কুরে (অগ্রহায়ণ-মাঘ) ১২৮২।

[২] পুস্তিকা-আকারে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত।

[৩] প্রথমপ্রকাশ (অধিকাংশ) ভ্রমরে (আষাঢ় ১২৮১ হইতে)।

[৪] প্রথমপ্রকাশ বঙ্গদর্শনে (১২৮৫-৮৭)।

সম্পৃক্ত ঘটনা-বর্ণনার জটাজালে মূলকাহিনী মধ্যে মধ্যে খেই হারাইয়া ফেলিয়াছে। পরিসমাপ্তিও নিতান্ত আকস্মিক। নাম-ভূমিকা ছাড়া অপর চরিত্রগুলি পরিস্ফুট। পিতম-চরিত্র উৎকৃষ্ট সৃষ্টি। গ্রন্থকারই যেন ইহার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

'জাল প্রতাপচাঁদ' (১৮৮৩)[১] ইতিহাসকাহিনী হইলেও লিখিবার গুণে উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক। সঞ্জীবচন্দ্রের সহানুভূতি উৎপীড়িত "জাল" প্রতাপচাঁদ-ভূমিকাটিকে পাঠকের চক্ষে মহিমামণ্ডিত করিয়াছে।

সঞ্জীবচন্দ্রের অপর লেখাগুলি পরিমাণে খুব বেশি না হইলেও রচনার গুণে কম মূল্যবান্ নয়। তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 'যাত্রা' (পুস্তিকা-আকারে ১৮৭৫) এবং 'পালামৌ' (বঙ্গদর্শন ১২৮৭-৮৯)। শুদ্ধ ভ্রমণকাহিনী উপলক্ষ্যে যে আখ্যানমাত্রবর্জ্জিত মনোরম সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব তাহা পালামৌ প্রমাণিত করিয়াছে। ছোটনাগপুরের আদিম গিরি-দরী-অরণ্যানী এবং আরণ্যক পশু-মানব লেখকের সমবেদনারসধারার অভিষেকে পালামৌ প্রবন্ধগুলিতে নূতনতর মাধুর্য্যমণ্ডিত হইয়া জীবন্ত হইয়াছে। অসংলগ্ন ও অপ্রচুর চিত্রসমষ্টি হইলেও পালামৌ সঞ্জীবচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা।

সঞ্জীবচন্দ্রের লেখার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে নির্ম্মল ও গভীর রসবোধ, ব্যাপক সহানুভূতি ও সূক্ষ্ম কৌতূহলদৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের কথায়,

> সঞ্জীব বালকের ন্যায় সকল জিনিষ সজীব কৌতূহলের সহিত দেখিতেন এবং প্রবীণ চিত্রকরের ন্যায় তাহার প্রধান অংশগুলি নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া তাঁহার চিত্রকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেন এবং ভাবুকের ন্যায় সকলের মধ্যেই তাঁহার নিজের একটি হৃদয়াংশ যোগ করিয়া দিতেন।

সঞ্জীবের রসদৃষ্টির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রসদৃষ্টির কিছু মিল পাওয়া যায়। রচনা-রীতিতেও ক্বচিৎ সঞ্জীবকে রবীন্দ্রনাথের অগ্রদূত বলা চলে। প্রতিভার তুলনায় সঞ্জীবের সাহিত্যসৃষ্টি পর্য্যাপ্ত নয়। "তাঁহার প্রতিভার ঐশ্বর্য্য ছিল কিন্তু গৃহিণীপনা ছিল না।" রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন,

> তাঁহার অপেক্ষা অল্প ক্ষমতা লইয়া অনেকে যে পরিমাণে সাহিত্যের অভাব মোচন করিয়াছেন তিনি প্রচুর ক্ষমতা সত্ত্বেও তাহা পারেন নাই; তাহার কারণ, সঞ্জীবের প্রতিভা ধনী কিন্তু গৃহিণী নহে।

[১] প্রথমপ্রকাশ বঙ্গদর্শনে (১২৮৯)।

সঞ্জীব-বঙ্কিমের কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মধুমতী' গল্পটির পরিকল্পনায় বঙ্কিমের প্রভাব সুস্পষ্ট। পূর্ণচন্দ্র একটি উপন্যাসও লিখিয়াছেন, 'শৈশব সহচরী'।[১] কমলাকান্তের দপ্তরে পূর্ণচন্দ্রের রচনা আছে॥

৪

কর্মসূত্রে বহরমপুরে থাকার সময়ে রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) বঙ্কিমের অনুরোধে বাঙ্গালা উপন্যাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার প্রথম উপন্যাস 'বঙ্গবিজেতা' (১৮৭৪)[২] আকবরের সময়ের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় কল্পিত। ঘটনার বাহুল্য ও ভূমিকার ভিড় কাহিনীকে যেন শ্বাসরুদ্ধ করিয়াছে। রমেশ-চন্দ্রের অপর তিন ঐতিহাসিক উপন্যাসেও এই ব্যাপার, তবে অতটা বেশি নয়। প্রতিনায়ক শকুনি ইংরেজি উপন্যাসের "ভিলেন" বা পাষণ্ড। বইটির আখ্যানবস্তু কোন বিশেষ ইংরেজি বই হইতে নেওয়া না হইলেও চরিত্রচিত্রণে এবং পারিপার্শ্বিকের বর্ণনায় কিছু বিদেশি প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মহাশ্বেতার স্বাধীনচিত্ততা ও গম্ভীর মহিমা কতকটা বিলাতি ধরণের হইলেও চরিত্রটি সম্পূর্ণভাবে দেশি ছাঁচে ঢালাই। ইন্দ্রনাথ-সরলার প্রণয়লীলার মধ্যেও বিদেশি ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। চন্দ্রশেখর এবং তাঁহার আশ্রমের চিত্রে বিলাতি ভাব পরিস্ফুট। নিদারুণ শীত পড়িলেও বাঙ্গালা দেশে অতি বড় ধনীরও "গৃহে গৃহে শীত নিবারণার্থ অগ্নি জ্বলিতেছে, তাহার চতুঃপার্শ্বে বন্ধুবান্ধবে উপবেশন করিয়া মিষ্টালাপ করিতেছে"—এমনটি দেখা যায় না।

> গৃহের মধ্যস্থানে অগ্নি জ্বলিতেছে অগ্নির ঠিক পশ্চাতে চন্দ্রশেখর বসিয়াছেন। তাঁহার নিজ দক্ষিণ পার্শ্বে সেই সমৃদ্ধিশালী অতিথি বসিয়া আছেন,—সেই দুইজনের উভয়পার্শ্বে ও পশ্চাতে অনেক আশ্রমবাসী উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। চন্দ্রশেখরের কিঞ্চিৎ পশ্চাতে, ঈষৎ অন্ধকারে মহাশ্বেতা অবগুণ্ঠনবতী হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার পার্শ্বে শিখণ্ডিবাহন বসিয়া রহিয়াছেন, মৃদু মৃদু কি কথা কহিতেছেন,···

এই দৃশ্য কোন বিলাতি পান্থশালায়ই সম্ভব। বিমলার চরিত্রে যে দৃঢ়তা প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং সাহসিকতা দেখি তাহাও বিদেশি উপন্যাসের নায়িকার উপযুক্ত। বিশ্বেশ্বরী পাগলিনীর চরিত্রও তাই। জীবনসন্ধ্যার চারণী ইহার সহিত তুলনীয়। বঙ্গবিজেতায় কোন পাত্রপাত্রীর চরিত্রগত বিকাশ দেখানো

[১] প্রথমপ্রকাশ বঙ্গদর্শনে (১২৮২-৮৪), পুস্তক-আকারে (১৮৭৮)।

[২] প্রথমপ্রকাশ জ্ঞানাঙ্কুরে (১২৭৯)।

হয় নাই। এবং ঘটনাবাহুল্যের জন্য ভূমিকাগুলির সম্পূর্ণ প্রকাশও হয় নাই। তথাপি একথা মানিতে হয় যে চরিত্রগুলি নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রাখিয়াছে।

বঙ্গবিজেতার রচনাভঙ্গি সাধুভাষাত্মক, বর্ণনামূলক। কথ্য ভাষার ছাপ প্রায় নাই। কথোপকথনে আছে, কিন্তু সেখানেও সাধুভাষার মিশ্রণ।

'মাধবীকঙ্কণ' (১৮৭৭) শাহজাহানের সময়ে পরিকল্পিত। টেনিসনের 'এনক আর্ডেন' কবিতার ভাব অবলম্বনে মাধবীকঙ্কণের কাহিনী গড়া হইয়াছে। যে প্রণয়-কাহিনী গল্পের বীজ তাহা উপন্যাসটির ছোট অংশ মাত্র। অদৃষ্টবঞ্চিত গৃহত্যাগী অস্থিরচিত্ত নায়ক নরেন্দ্রনাথের বিদেশে বিচিত্র অভিজ্ঞতাই বইটিতে প্রধান স্থান লইয়াছে। নায়কের তুলনায় নায়িকা হেমলতার স্থান খুবই অপ্রধান হইলেও নায়িকার ব্যক্তিত্ব একেবারে অস্ফুট নয়। প্রতিনায়ক শ্রীশচন্দ্রও অল্পরেখায় ফুটিয়াছে। তবে সর্ব্বাপেক্ষা সুচিত্রিত হইয়াছে একটি অবান্তর ভূমিকা। শ্রীশচন্দ্রের ভগিনী শৈবলিনীর আবির্ভাব নিতান্ত ক্ষণিক, কিন্তু তাহারই মধ্যে এই নিরীহ বিধবা মেয়েটি পাঠকের চিত্ত অধিকার করিয়া বসে। উপাখ্যানের প্রারম্ভে রমেশচন্দ্র শৈবলিনীর যে চিত্র উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা ভাবে ও ভাষায় যেন কিশোর রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি।

> সেই কৃষ্ণকেশমণ্ডিত শ্যামবর্ণ নম্র বাক্যশূন্য মুখখানি ও আয়ত শান্তরশ্মি নয়ন দুইটী দেখিলে যথার্থই হৃদয় ভ্রাতৃস্নেহে আপ্লুত হয়, যথার্থই বোধ হয় যেন সায়ংকালের শান্তি ও স্তব্ধতার শৈবালে আবৃত মুদিতপ্রায় শৈবলিনী মুখখানি নত করিয়া রহিয়াছে।
>
> এ জগতে শৈবলিনী কিছুবই আকাঙ্ক্ষিণী নহে। বিধবা শৈবলিনী সহচর চাহে না। যে আম্রবৃক্ষ ও বংশবৃক্ষ শৈবলিনীর নম্র কুটীর চারিদিকে সস্নেহে মণ্ডিত করিয়া মধ্যাহ্নে ছায়া বর্ষণ ও সায়ংকালে মৃদুস্বরে গান করিত, তাহারাই শৈবলিনীর সহচর···

পরবর্ত্তী কালে একশ্রেণীর "রোমাঞ্চকারী" উপন্যাস-রচয়িতা মোগল-সম্রাট্দের অন্তঃপুরের যে আরব্য-উপন্যাসোচিত কাহিনী লিখিয়া অর্ব্বাচীন পাঠকমণ্ডলীর হৃদয় জয় করিয়াছিলেন রমেশচন্দ্রের মাধবীকঙ্কণে সেই ভীষণরমণীয় দৃশ্য প্রথম দেখা গেল। রমেশচন্দ্রের বর্ণনায় বেগমমহলের রহস্যপূর্ণ সৌন্দর্য্য-বিজৃম্ভিত বিভীষিকামণ্ডিত পরিবেশ উজ্জ্বল হইয়াছে।

আরংজেবের সঙ্গে শিবজীর সংঘর্ষ 'জীবনপ্রভাত'এর (১৮৭৬) আখ্যান-বস্তু। ভূমিকাগুলি বেশ পরিস্ফুট এবং যথাসম্ভব ইতিহাস-অনুগত। বঙ্কিম-চন্দ্রের রাজসিংহে বর্ণিত ভূমিকার তুলনায় রমেশচন্দ্রের অঙ্কিত আরংজেবের ভূমিকা বেশি স্বাভাবিক। সর্ব্বোপরি বইটিতে আছে স্বদেশপ্রীতির অকৃত্রিম

প্রকাশ। 'জীবনসন্ধ্যা'য় (১৮৭৯) জাহাঙ্গীরের সময়ের ইতিহাসকাহিনী। জীবনসন্ধ্যায় কল্পনার অপেক্ষা ইতিহাসের পরিমাণ বেশি। ঘটনার বাহুল্য এবং কাহিনীর দ্রুতগতি কাহিনী ব্যাহত করিয়াছে। চারণীর ভূমিকায় স্কটের প্রভাব আছে।

বঙ্গবিজেতা-মাধবীকঙ্কণ-জীবনপ্রভাত-জীবনসন্ধ্যা এই চারিখানি ইতিহাস-ঘটিত উপন্যাসের ঘটনাগুলি মোগল-শাসনের একশত বৎসরের মধ্যে ঘটিয়াছিল বলিয়া বই চারিখানি একত্র 'শতবর্ষ' নামে সঙ্কলিত হয় (১৮৭৯, দ্বি-স ১৮৮১)। অতঃপর রমেশচন্দ্র দুইখানি উপন্যাস লিখিলেন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের জীবন লইয়া, 'সংসার' (১২৯৩) ও 'সমাজ' (১৮৯৪)। সংসারে পশ্চিমবঙ্গের পাড়াগাঁয়ের দরিদ্র ভদ্রসংসারের চিত্র আছে।[১] এই বিষয়ে রমেশচন্দ্রের পথপ্রদর্শক ছিলেন পাদ্‌রি লালবিহারী দে। লালবিহারীর *Bengal Peasant Life* বা *Govinda Samanta* বইটিতে (১৮৭৪) বর্দ্ধমান জেলার চাষীঘরের নিখুঁত চিত্র পাই। রমেশচন্দ্রের উপন্যাসের স্থানও এই অঞ্চল। সংসারের ভূমিকাগুলি এমন স্বাভাবিক যে মনে হয় লেখক সমস্ত চোখে দেখিয়া লিখিয়াছেন। সংসারে বিধবাবিবাহের সমর্থন আছে। সেই হিসাবে ইহা[২] বিষবৃক্ষের জবাব।

সংসারের প্রধান ভূমিকাগুলির পরবর্ত্তী জীবনকাহিনী সমাজে অনুসৃত হইয়াছে।

রমেশচন্দ্রের লেখায় ধার ছিল না, সেইজন্য গল্পরস সর্ব্বত্র জমিতে পারে নাই। তবে রমেশচন্দ্র বাঙ্গালা রোমান্‌সে নূতনত্বের আবির্ভাব করিলেন। ঐতিহাসিক পরিবেশের সঙ্গে কাহিনীর সংযোগ দৃঢ়তর করিয়া দিয়া তিনি বাঙ্গালা রোমান্‌সে বৈচিত্র্য ঘটাইলেন। রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে ইতিহাসের মর্য্যাদা যথাসম্ভব রক্ষিত। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় সব সময় অতটা ইতিহাস-অনুগতি পাই না। কোন কোন বিষয়ে বঙ্কিম সংস্কারবিমুখ ছিলেন এবং তাঁহার স্বদেশপ্রীতির মধ্যে উপদেষ্টার ভাব ছিল। রমেশচন্দ্র সংস্কারবিমুখ ছিলেন না, তাঁহার মনোবৃত্তি ছিল শুশ্রূষুর। দেশের অতীত ইতিহাসের প্রতি অনুরাগ লইয়াই রমেশচন্দ্র তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি—'শতবর্ষ'—লিখিয়াছিলেন, এবং

[১] বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য (তৃ-স) পৃ ১১৯-১২১।

[২] রমেশচন্দ্র কর্ত্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত *The Lake of Palms* নামে। প্রকাশক T. Fisher Unwin (লণ্ডন ১৯০২)।

এই প্রেরণাতেই তাঁহার ঋগ্বেদের অনুবাদ ১২৯২-৯৪ এবং দুই খণ্ড 'হিন্দুশাস্ত্র' (১৩০২-০৩) সঙ্কলন। দেশের আধুনিক ইতিহাসও উপেক্ষিত হয় নাই। তাহার প্রমাণ সংসার ও সমাজ। ইংরেজি রচনাতেও রমেশচন্দ্রের বিশেষ স্বাচ্ছন্দ্য ছিল। ইংরেজি পদ্যে লেখা তাঁহার রামায়ণ ও মহাভারত কাহিনী ইংরেজি সাহিত্যের ক্লাসিক্‌সের অন্তর্গত॥

৫

রমেশচন্দ্র যে পরিবারের সন্তান সেই কলিকাতা রামবাগানের দত্ত-পরিবার ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজি শিক্ষায় দেশের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিল। বংশকর্ত্তা রসময় দত্ত বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বাংশের লোক। কলিকাতার শিক্ষিত সমাজে ইনি বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন, এবং সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি ইত্যাদি রূপে ইনি সেকালের শিক্ষাব্যবস্থায় কর্তৃত্ব করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার পুত্র-ভ্রাতুষ্পুত্রদের মধ্যে খ্যাতিমান্ ছিলেন উমেশচন্দ্র, শশিচন্দ্র, হরচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র। হরচন্দ্রের প্রবন্ধের জবাবে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' লিখিয়াছিলেন। শশিচন্দ্র ভারত-বর্ষীয়দের মধ্যে প্রথম ইংরেজি গল্পলেখক। ইঁহার *Tales of Yore* (১৮৪৫ ?) গল্পগুলির বিষয় প্রধানত টডের রাজস্থান-কাহিনী হইতে নেওয়া।[১] ইতিহাস-কাহিনীর প্রতি দত্ত-পরিবারের লেখকদের প্রবণতা এইখান থেকেই লক্ষ্য করা যায়। গোবিন্দচন্দ্রের কন্যা তরু দত্ত (১৮৫৬-৭৭) বিশেষ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। দুই কন্যা ও পত্নীকে লইয়া গোবিন্দচন্দ্র খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং ইউরোপে যান। সেখানে গিয়া তরু দত্ত ইংরেজি ও ফরাসী ভাষায় কবিতা লিখিয়া সবিশেষ প্রশংসিত হইয়াছিলেন। তরু দত্তের কোন কোন বিশিষ্ট কবিতায় দেশের ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগের প্রকাশ আছে। দেবীর শঙ্খ-পরিধান কাহিনীর মত বিষয় লইয়া কবিতা রচনায় তাঁহার কোন সম-সাময়িক বাঙ্গালী কবি উৎসাহবোধ করেন নাই।[২] তরু দত্ত ফরাসীতে একটি ছোট উপন্যাসও লিখিয়াছিলেন, নাম 'ল দু জুর্নাল্ দ মাদ্‌মোয়াজেল্

[১] গল্পগুলি বাঙ্গালায় অনুবাদ করাইয়া শশিচন্দ্র 'উপন্যাসমালা' নামে বাহির করিয়াছিলেন (১৮৭৭)।

[২] তরু দত্তের Jogadhya Uma কবিতা দ্রষ্টব্য। কবিতাটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছেন।

দ্'আর্ভ্যার্' (১৮৭৮)।[১] এই প্রণয়কাহিনীর গঠনপারিপাট্য সমসাময়িক বাঙ্গালা উপন্যাসে তখনও অসম্ভূত।

রমেশচন্দ্রের মধ্যম ভ্রাতা যোগেশচন্দ্র ইংরেজিতে কবিতা লিখিতেন॥

৬

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যা স্বর্ণকুমারী (১৮৫৫-১৯৩২) বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম ভালো লেখিকা। দীর্ঘকাল ধরিয়া ইনি (১২৯১-১৩০১, ১৩১৫-২১) 'ভারতী' সম্পাদন করিয়াছিলেন। স্বর্ণকুমারীর কবিতা ও নাট্য-রচনা অকিঞ্চিৎকর নয়। তবে উপন্যাস-গল্পেই ইঁহার কৃতিত্ব সর্ব্বাধিক পরিস্ফুট। প্রথম উপন্যাস 'দীপনির্ব্বাণ'এর (১৮৭৬) বিষয় পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তার কাহিনী। 'ছিন্নমুকুল' (১৮৭৯) বাঙ্গালা রোমান্সে নূতনত্বের অবতারণা করিয়াছে, ভ্রাতা-ভগিনীর স্নেহ সাধারণ প্রণয়কাহিনীর স্থান লওয়ায়। 'মালতী'র (১২৮৬) বিষয়ও অনুরূপ। মোহম্মদ মহসীনের জীবনী 'হুগলীর ইমামবাড়ী'র (১২৯৪) বিষয়। 'কাহাকে ?' (১৮৯৮) রোমান্টিক প্রেমকাহিনী। 'মিবাররাজ' (১৮৭৭), 'বিদ্রোহ' (১৮৯০), এবং 'ফুলের মালা' (১৮৯৪) এগুলির কাহিনী ইতিহাসাশ্রিত।[২] স্বর্ণকুমারী শেষ জীবনেও কয়েকখানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, 'বিচিত্রা' (১৯২০), 'স্বপ্নবাণী' (১৯২১) ও 'মিলনরাত্রি' (১৯২৫)।

স্বর্ণকুমারীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'স্নেহলতা' (১২৯৯)। বাঙ্গালী-সমাজে আধুনিকতার সমস্যা লইয়া এই প্রথম উপন্যাস লেখা হইল। চরিত্রচিত্রণ ও মনোবিশ্লেষণ বেশ স্বাভাবিক॥

-

গোবিন্দচন্দ্র ঘোষের 'চিত্তবিনোদিনী' (১৮৭৪) ঘটনাপ্রধান সুখপাঠ্য রচনা। সিপাহী-বিদ্রোহের পটভূমিকায় আখ্যানবস্তু পরিকল্পিত। ইঁহার অপর উপন্যাস 'মেহের আলি'।[৩] ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী (?-১৯০৩) বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব এড়াইবার কিছু চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রথম উপন্যাস

[১] শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায় বইটি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছেন 'কুমারী আরভ্যার-এর দিনপঞ্জী' নামে (১৯৪৯)।

[২] স্বর্ণকুমারীর গল্প-উপন্যাস অধিকাংশই প্রথমে ভারতীতে বাহির হইয়াছিল।

[৩] আর্য্যদর্শনে প্রথম প্রকাশিত (মাঘ ১২৮২ হইতে)।

'চন্দ্রনাথ' (১৮৭৩, দ্বি-স ১৮৮৩) কলিকাতা অঞ্চলের সামাজিক দুর্নীতির বাস্তব চিত্র বলিয়া একেবারে মূল্যহীন নয়। নক্‌শাকে উপন্যাসের রূপ দিলে যেমন হয় চন্দ্রনাথ তেমনিই হইয়াছে। নাটকরূপ পাইলে হয়ত সার্থক হইতে পারিত। চরিত্রাঙ্কনে লেখকের বাস্তবদৃষ্টির পরিচয় আছে। রচনাভঙ্গিতেও নূতনত্বের চেষ্টা আছে। লেখক কথ্য এবং লেখ্য উভয় রীতিই ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য করিতে পারেন নাই।[১] চন্দ্রনাথের পর ক্ষেত্রপাল দুইখানি ছোট সামাজিক দুর্নীতিঘটিত নাটক লেখেন, 'হীরক অঙ্গুরীয়ক' (১৮৭৫) এবং 'হেমচন্দ্র' (১৮৭৬)। ইঁহার দ্বিতীয় উপন্যাস 'মুরলা'র (১৮৮০) আখ্যানকল্পনা পুরানো ধরণের, রচনারীতিও সাধুভাষার। ভূমিকায় লেখক বলিয়াছেন,

> এই উপন্যাসের প্রথম চারি পরিচ্ছেদ পূর্ব্বে বঙ্গমহিলা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।... আমাদিগের দেশীয় আচার ব্যবহারের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া বর্ত্তমান-রুচি-উপযোগী একটি চিত্তহারী উপন্যাস রচনা করা অতিশয় দুরূহ জানিয়া, অনেকেই একমাত্র সাময়িক রুচির অনুরোধে ইউরোপীয় প্রথা সকল, দেশীয় ঘটনায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন, কিন্তু এপ্রকার অনুকরণে সত্যের বিশেষ অবমাননা হয় বলিয়া অসামাজিকতা ও অসাময়িকতা দোষ পরিহার করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছি।

ইঁহার 'মধুযামিনী ও কৃষ্ণা' দুইটি গল্প (১৭৮৫)। কৃষ্ণা সম্পূর্ণ নহে, প্রথম খণ্ড মাত্র।[২] মধুযামিনীর ঘটনাস্থল হইতেছে মধ্যপ্রদেশ এবং পাত্রপাত্রী স্থানীয় অধিবাসী।[৩] 'ভারতভ্রমণ কাব্য (১৮৬৪) ও 'রাজবালা' নাটক (১২৭৮) রচয়িতা চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গঙ্গাধর শর্ম্মা ওরফে জটাধারীর রোজনামচা'য় (১৮৮৩)[৪] লেখকের অভিজ্ঞতালব্ধ পল্লীচিত্র বেশ স্বাভাবিক ও সহৃদয় ভাবে বর্ণিত।

কপালকুণ্ডলার পরিসমাপ্তি যতই আর্টিষ্টিক হোক না কেন গল্পখোর পাঠকের মনোমত হয় নাই। গঙ্গাগর্ভে পড়িবার পর নবকুমার-মৃন্ময়ীর অদৃষ্টে কি ঘটিল তাহা জানিবার জন্য সাধারণ পাঠকের মন নিতান্ত ব্যাকুল ছিল। ইঁহাদের মুখ চাহিয়া দামোদর মুখোপাধ্যায় (১৮৫৩-১৯০৭) কপালকুণ্ডলাকে গঙ্গাগর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়া গল্পের জের টানিলেন 'মৃন্ময়ী'তে (১৮৭৪)। সাধারণ পাঠক কপালকুণ্ডলা-কাহিনীর পরিশেষ জানিবার জন্য যে কতকটা ব্যগ্র ছিল

[১] বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা দ্রষ্টব্য (বঙ্গদর্শন আষাঢ় ১২৮১)।

[২] অংশত 'বান্ধব'এ প্রকাশিত।

[৩] প্রথমে 'সহচরী'তে প্রকাশিত।

[৪] প্রথমপ্রকাশ বঙ্গদর্শনে (১২৮৪)।

তাহা বুঝি মৃন্ময়ীর অভাবনীয় সমাদরে। দামোদর দুর্গেশনন্দিনীর "উপসংহার" লিখিয়াছিলেন 'নবাবনন্দিনী বা আয়েষা' নামে। ইহাতে আয়েষার জীবনের জের টানা হইয়াছে।[১] খুন-জখম অত্যাচার ইত্যাদি রোমাঞ্চক ঘটনা দামোদরের উপন্যাসে সহজলভ্য।[২] 'বিমলা'য় (১৮৭৭) এই বিশেষত্ব প্রথম দেখা গেল। ইহার অপর উপন্যাস হইতেছে 'দুই ভগিনী' (১৮৮১), 'জয়চাদের চিঠি' (১৮৮৩), 'মা ও মেয়ে', 'কর্ম্মক্ষেত্র', 'শান্তি', 'সোণার কমল' (১৯০৩), 'যোগেশ্বরী', 'অন্নপূর্ণা', 'ললিতমোহন', 'সপত্নী', 'অমরাবতী', 'প্রতাপসিংহ', 'বিষ-বিবাহ', 'নবীনা', 'শত্রুরাম', ইত্যাদি। কয়েকটি উপন্যাসে বঙ্কিমের অনুসরণে নিষ্কামধর্ম্মের আদর্শখ্যাপন আছে। ইংরেজি উপন্যাসের রূপান্তরীকরণে দামোদর দক্ষতা দেখাইয়াছেন। 'কমলকুমারী' (দ্বি-স ১২৯১) এবং 'শুক্লবসনা সুন্দরী' বই দুইটি যথাক্রমে স্কটের 'দি ব্রাইড অব্ ল্যামারমূর' এবং কলিন্সের 'দি ওম্যান ইন্ হোয়াইট' অবলম্বনে লেখা। দামোদরের রচনাভঙ্গি সরল এবং বিষয়ের উপযোগী। আখ্যানবস্তু কৌতূহলোদ্দীপক। চরিত্রচিত্রণ মন্দ নয়। প্রধান দোষ রোমাঞ্চকতার প্রাবল্য এবং স্পষ্ট উপদেশাত্মকতা।

হারাণচন্দ্র রাহার 'রণচণ্ডী' (১৮৭৬) কাছাড়ের ইতিবৃত্তমূলক। উপন্যাস এবং ইতিহাস দুই হিসাবেই বইটি মূল্যহীন নয়।[৪] ইহার অপর উপন্যাস 'সরলা' (১৮৭৬) সংসারচিত্রময় বড় গল্প। ইনি অনেকগুলি খ্রীষ্টীয় পুস্তিকা বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। 'গল্পের বই' 'পদ্মমাসি' 'বাল্যসখী' 'নাড়ুগোপাল' ইত্যাদি খ্রীষ্টান-পাঠ্য কাহিনী। কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর 'চন্দ্র-কেতু'তে (১২৮৫) চব্বিশপরগণার অঞ্চল বিশেষে প্রচলিত পীর গোরাচাদের কিংবদন্তী স্থান পাইয়াছে।

কালীময় ঘটকের (১৮৩৩-১৯০০) 'ছিন্নমস্তা' (১৮৭৮) স্ত্রীশিক্ষামূলক উপন্যাস এবং 'শর্ব্বাণী' (১৮৯০) রোমান্টিক উপন্যাস, ঘটনাবৈচিত্র্যতার ও দ্রুতগতির জন্য সুখপাঠ্য।[৫]

[১] বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আয়েষা'ও (১৮৯৭) দুর্গেশনন্দিনীর আর এক পরিশিষ্ট।

[২] প্রথমপ্রকাশ (অধিকাংশ) জ্ঞানাঙ্কুরে (মাঘ ১২৮১ হইতে)।

[৩] মহাভারত-কাহিনী অবলম্বনে দামোদর 'সুকন্যা' নাটক (১৯০০) লিখিয়াছিলেন।

[৪] বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য (তৃ-স) পৃ ১২৭-২৮।

[৫] দুইভাগ 'চরিতাষ্টক'এ (১৮৬৩, ১৮৭৩) মহৎজীবন সঙ্কলিত। পাঠ্যপুস্তকরূপে বইটির যথেষ্ট সমাদর ছিল।

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'মায়াবিনী' (১৮৭৭) গজনীর মামুদের ভারতবর্ষ আক্রমণ-সম্বন্ধীয় ঘটনা অবলম্বনে বিরচিত বিয়োগান্ত রোমান্‌স্। বঙ্কিমের প্রভাব সুস্পষ্ট। 'বীরবরণ'এর (১২৯০) কাহিনীর পত্তন হইয়াছে বৌদ্ধ আমলের বাঙ্গালা দেশে। বৌদ্ধ সম্রাট্‌দের পরাজিত করিয়া শৈব আদিশূর রাজা হইয়াছিলেন—ইহাই এই বৃহৎ উপন্যাসটিতে বর্ণিত। মদনমোহন মিত্রের 'সমরশায়িনী'ও (১৮৭৩) ইতিহাস-কল্পিত রোমান্‌স্। উপেন্দ্রনাথ মিত্রের 'প্রতাপসংহার' (১৮৭৯, দ্বি-স ১৮৮৩) প্রতাপাদিত্যের কাহিনী অবলম্বনে লেখা। যোগেশচন্দ্র দে ও নিত্যদাস রায় বিরচিত "ঐতিহাসিক উপন্যাস" 'নগনন্দিনী' (১৮৮০) দুরূহ সাধুভাষায় লেখা। ইহাতে পরিচ্ছেদের নাম "সর্গ"। কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'একাকিনী'ও (১৮৮০) তথাকথিত "ঐতিহাসিক উপন্যাস"। "একজন পরিব্রাজক প্রণীত" ইতিহাসকল্পিত রোমান্‌স্ 'শৈলবালা'য় (১২৮৮) রমেশচন্দ্রের প্রভাব লক্ষণীয়। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের (১৮৬০-?) "বিয়োগান্ত উপন্যাস" 'যোগিনী' প্রকাশিত হয় ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। ইঁহার দ্বিতীয় উপন্যাস 'কমলাদেবী'র (১৮৮৫) নায়ক অম্বররাজ মানসিংহ। 'জীবনতারা' (১৮৮৯) ইঁহার তৃতীয় উপন্যাস। ক্ষেত্রগোপাল রায়ের 'ইন্দ্রকুমারী' (১৮৯১) বর্গির হাঙ্গামার পটভূমিকায় রচিত, রমেশচন্দ্রের সুস্পষ্ট অনুসরণে।

দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী (১৮৫৪-১৯২০) ১২৯০ সালে 'নব্যভারত' বাহির করেন। 'শরৎচন্দ্র' (১৮৭৭-৭৮), 'বিরাজমোহন' (১৮৭৮), 'সন্ন্যাসী' (দ্বি-স ১২৮৮), 'ভিখারী' (১৮৮১), 'যোগজীবন' (১২৮৯), 'অপরাজিতা' (১৮৯০), 'পুণ্যপ্রভা' (১৮৯৬), 'মুরলা' ইত্যাদি অনেকগুলি উপন্যাস ইনি রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার উপন্যাসগুলিতে দেশকালানুগত্য থাকিলেও স্পষ্ট উপদেশাত্মক এবং বিশেষভাবে গুরুভার বলিয়া সুখপাঠ্য নয়॥

৮

শিবনাথ শাস্ত্রীর (১৮৪৭-১৯১৯) উপন্যাসগুলি উপদেশাত্মক হইলেও চিত্রাঙ্কণের গুণে বেশ সুখপাঠ্য। প্লট সাধারণত শিথিলবন্ধ। চরিত্রচিত্রণ প্রায়ই পূর্ণাঙ্গ নয়। তথাপি সূক্ষ্ম দৃষ্টির এবং সরস বর্ণনার জন্য ইঁহার উপন্যাসের চিত্রগুলি বিশেষভাবে উপভোগ্য হইয়াছে।[১] কাব্যরচনা লইয়া শিবনাথ সাহিত্যের

[১] বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য (তৃ-স) পৃ ১২৮-৩০।

আসরে প্রথম দেখা দিয়াছিলেন এবং তাহাতে প্রশংসাও পাইয়াছিলেন। প্রথম উপন্যাস 'মেজ বৌ' (১৮৮০) অল্প দিনে লেখা ফরমায়েসি রচনা। বইটির বেশ আদর হইয়াছিল।[১] দ্বিতীয় উপন্যাস 'যুগান্তর'এ (১৮৯৫) ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শিক্ষিত বাঙ্গালীর চিন্তায় কর্ম্মে যে যুগান্তর আসিয়াছিল তাহারই একদিকের যথাসম্ভব বিস্তৃত ইতিহাস। সাধনায়[২] যুগান্তরের সমালোচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, "এমন পর্য্যবেক্ষণ, এমন চরিত্র সৃজন, এমন সরস হাস্য, এমন সরল সহৃদয়তা বঙ্গসাহিত্যে দুর্লভ।" যুগান্তরের কয়েকটি পৃষ্ঠায় ভক্তিরসসিক্ত ভগবৎপরায়ণ সরলহৃদয় শ্রীধর ঘোষের চরিত্র অতি উজ্জ্বল মনোহর ভাবে ফুটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,

> লেখক যেখানেই নবযুগের আবর্ত্ত ছাড়িয়া খাঁটি মানুষগুলির কথা বলিয়াছেন সেইখানেই দুটি চারিটি সরল বর্ণনায় স্বল্প রেখাপাতে অতি সহজেই চিত্র আঁকিয়াছেন এবং পাঠকের হৃদয়কে রসে অভিষিক্ত করিয়াছেন। একস্থলে গ্রন্থকার প্রসঙ্গক্রমে শ্রীধর ঘোষের সহিত কেবল চকিতের মত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিয়া তাহাকে অপসৃত করিয়া দিয়াছেন—কিন্তু সেই স্বল্পকালের পরিচয়েই আমাদের মনে একটা আক্ষেপ রাখিয়া গিয়াছেন, আমাদের বিশ্বাস, লেখক মনোযোগ করিলে এই শ্রীধর ঘোষটিকে একটি গ্রন্থের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করিয়া আর একটি উপন্যাসকে প্রাণদান করিতে পারিতেন।

শ্রীধর ঘোষের মত আর একটি চরিত্র শিবনাথের তৃতীয় উপন্যাস 'নয়নতারা'য় (১৮৯৯) আছে। ইনি হইতেছেন বাঁড়ুজ্জে বাড়ীর কর্ত্তা বৃদ্ধ শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

> কর্ত্তার বয়ঃক্রম প্রায় ৮০ বৎসর হইবে; কিন্তু দেহে এখনও বিলক্ষণ বল আছে, আজও প্রাতে রীতিমত পদব্রজে গঙ্গাস্নানে গিয়া থাকেন, মানুষটী খর্ব্বাকৃতি, যেন গিলে বিচীটীর মত; তবে বার্দ্ধক্যবশতঃ দেহে বলি দেখা দিয়াছে; বর্ণটী শ্যাম, রূপটী সুস্নিগ্ধ, কমনীয় প্রশান্ত, পবিত্র, সদ্ভাব ও সাধুতার আভাতে উজ্জ্বল! দেখিলেই ভক্তিশ্রদ্ধার উদয় হয়; নাসাতে তিলক, বাহুদ্বয়ের উপরে বক্ষঃস্থলে হরিনামের ছাপ ও গলদেশে তুলসীর মালা, কণ্ঠসংলগ্ন একটি স্বর্ণনির্ম্মিত হুকে কুঁড়োজালিটী সর্ব্বদাই ঝুলিতেছে; তবে বস্ত্রাবৃত থাকে বলিয়া সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না।

শেষ উপন্যাস 'বিধবার ছেলে' (১৩২২) অসংস্কৃত রচনা।[৩] অপর তিনটির মত এই উপন্যাসেরও প্লটের ভিত্তি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর স্থাপিত॥

[১] মেজ-বৌএর "উপসংহার" লিখিয়াছিলেন দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'শান্তিমঠ' নামে (১৮৮৭)।

[২] চতুর্থ বর্ষ প্রথমভাগ পৃ ৪৭১।

[৩] পরে লেখকের পুত্রকর্ত্তৃক সম্পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল 'উমাকান্ত' নামে (১৯২২)।

৯

অম্বিকাচরণ গুপ্ত প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ও ইতিহাসের গবেষণায় কিছু নাম করিয়াছিলেন। ইনি কয়েকখানি গল্প-উপন্যাসও লিখিয়াছিলেন, 'কপট-সন্ন্যাসী' (১৮৭৪), 'কমলে কণ্টক', 'সংসারসঙ্গিনী' (১৮৮৫), 'শান্তিরাম' (১৮৮৫), 'কৃষকসন্তান' (১২৯৪) ইত্যাদি। 'পুরাণো কাগজ' (১৮৯৯) উপন্যাসে অসাধারণত্ব আছে। প্রাচীন দলিল ও চিঠিপত্রের মধ্য দিয়া এক জমিদার-ঘরের পুরানো কাহিনী ইহাতে বিবৃত। অম্বিকাচরণের লেখায় পশ্চিমরাঢ়ের স্থানীয় ভাব কিছু কিছু আছে।

তারকনাথ বিশ্বাস অনেকগুলি উপন্যাস ও গল্প রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রথম উপন্যাস 'গিরিজা' (১৮৮২) বঙ্গদর্শনে সমালোচিত হইয়াছিল। তাহার পর 'সুহাসিনী' (১৮৮২), 'কমলা' (১২৯০), 'বিজয়সিংহ', 'রমণী', 'কুসুমিকা', 'কমলকুমারী' (১২৯৩), 'চন্দ্রপ্রভা' (১২৯৩), 'বিরজা' (১২৯৪), 'বসন্তবালা', 'ক্ষান্তমণি' ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। ১৩০৭ সালে ইঁহার দুইখণ্ড গ্রন্থাবলী বাহির হইয়াছিল, বাকি খণ্ডগুলি অনেক কাল পরে বাহির হয়। তারকনাথের উপন্যাসের প্লট কৌতূহলোদ্দীপক এবং ঘটনাবহুল। এই হিসাবে দামোদর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ইঁহার কিছু মিল আছে। ঘটনাবাহুল্যে এবং বর্ণনার ভিড়ে তারকনাথের গল্প-উপন্যাসগুলি সুবিন্যস্ত ও সুপরিণত হয় নাই।

নটেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বসন্তকুমারের পত্র' (১৮৮২) দুই বন্ধুর মধ্যে চিঠির আকারে লেখা প্রেমকাহিনী। এক বিরাহিতা তরুণীর পুরুষান্তরের প্রতি আসক্তি এবং শেষে তাহার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটনাটিকে অভিনব এবং কৌতূহলপূর্ণ করিয়াছে। রচনায় কিছু দক্ষতার পরিচয় আছে।

কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলের পণ্ডিত ব্রজনাথ ভট্টাচার্য্য দুইখানি স্ত্রীশিক্ষামূলক উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, 'সরোজবাসিনী' এবং 'কনক-নলিনী' (১২৯০)। শেষের বইটিতে মাঝে মাঝে দুই-চারি ছত্র পদ্য আছে।

কালীপ্রসন্ন দত্তের 'বিজয়' (১২৯১) উপন্যাসে সিপাহী-যুদ্ধের সময়ে তান্তিয়া টোপির বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। লেখক উপন্যাসে ইতিহাসকাহিনীকে প্রধান স্থান দিয়াছেন। প্রবোধচন্দ্র সরকারের 'শালফুল'এর (বাঁকুড়া ১৮৯৭) কাহিনীর পত্তন হইয়াছে লেখকের বাসভূমি গড়বেতা (বগড়ি পরগনা) অঞ্চলের "নায়েক" বিদ্রোহের (১৭৮৫) পটভূমিকায়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক হইতে শুরু করিয়া বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক অবধি প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরিয়া এডভেঞ্চার-বহুল গার্হস্থ্যচিত্রময় রোমান্টিক উপন্যাস রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১-১৯৪০)। নগেন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস 'পর্ব্বতবাসিনী' (১২৯০)। তাহার পর 'অমরসিংহ' (১৮৮৯), 'লীলা' (১৮৯২), 'তমস্বিনী' (১৯০০), 'জয়ন্তী' (১৯২৯), 'আরাতামা' (১৯৩০) ও 'ব্রজনাথের বিবাহ' (১৯৩১) বাহির হয়। লীলায় বর্ণিত গার্হস্থ্যচিত্র নিখুঁত এবং রসোজ্জ্বল। তমস্বিনীতে যৌনসম্পর্কিত বাস্তবদৃষ্টি প্রথম দেখা গেল। নগেন্দ্রনাথ অনেকগুলি উৎকৃষ্ট ছোট ও বড় গল্প রচনা করিয়াছিলেন। সহৃদয়তা এবং ঔৎসুক্যজনকতা নগেন্দ্রনাথের উপন্যাসের বিশিষ্ট গুণ। কয়েকটি উপন্যাসে সেকালের বাঙ্গালাদেশের রোমান্টিক ছবি আঁকা হইয়াছে।

চণ্ডীচরণ সেন (১৮৪৫-১৯০৬) উপন্যাসের ছাঁদে ইতিহাস লিখিয়াছিলেন। ইঁহার প্রথম রচনা মিসেস্ ষ্টৌ-এর 'আঙ্ক্‌ল্ টম্‌স্ কাবিন' উপন্যাসের অনুবাদ 'টমকাকার কুটীর' (প্রথম ভাগ ১২৯১)। তাহার পর 'মহারাজ নন্দকুমার' (১৮৮৫), 'দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ' (১৮৮৬), 'অযোধ্যার বেগম' (১৮৮৬, দ্বি-স ১৮৯৪), 'ঝান্সীর রাণী' (১৮৮৮) ও 'এই কি রামের অযোধ্যা' (১৮৯৫) রচিত হয়। 'চল্লিশ বৎসর' (১৩১০) টলষ্টয়ের একটি বড় গল্পের অনুবাদ ॥[১]

১০

বাঙ্গালাদেশের পল্লী অঞ্চলের প্রকৃতি সহৃদয় ও সরলভাবে প্রকাশ পাইল শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের (?-১৩১৫) উপন্যাসে। শ্রীশচন্দ্র চারিখানি উপন্যাস ও বড় গল্প লিখিয়াছিলেন 'শক্তিকানন' (১৮৮৭), 'ফুলজানি' (১৮৯৪), 'কৃতজ্ঞতা' (১৮৯৬)[২] এবং 'বিশ্বনাথ' (১৮৯৬)[৩]। বিগত শতাধিক বর্ষের পল্লী-জীবনের রোমান্টিক কাহিনী এই উপন্যাসগুলিতে চিত্রিত। শক্তিকানন প্রকাশিত হইলে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন,

> আপনার লেখা আমার ভারি ভাল লাগে। ওর মধ্যে কোন নভেলি মিথ্যা ছায়া নেই। ...আপনি কোন রকম ঐতিহাসিক ঔপদেশিক বিড়ম্বনায় যাবেন না—সরল মানবহৃদয়ের

১ ইঁহার অপর রচনা 'মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাপ্রদাতা লর্ড মেটকাফের জীবনী' (১৮৮৭)।

২ প্রথমপ্রকাশ সাধনায় (১৩০০)।

৩ প্রথমপ্রকাশ সাহিত্যে (১৩০১-০২)। শ্রীশচন্দ্রের অপর বই 'রাজতপস্বিনী' (১৯১৯) নব পর্য্যায় বঙ্গদর্শনে প্রথম বাহির হইয়াছিল। বইটি পুঁটিয়ার রাণী শরৎসুন্দরীর জীবনী।

মধ্যে যে গভীরতা আছে—এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখদুঃখপূর্ণ মানবের দৈনন্দিন জীবনের যে নিরানন্দময় ইতিহাস তাই আপনি দেখাবেন। শীতল ছায়া, আম কাঁঠালের বন, পুকুরের পাড়, কোকিলের ডাক, শান্তিময় প্রভাত এবং সন্ধ্যা এর মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে, তরল কলধ্বনি তুলে, বিরহ-মিলন হাসি কান্না নিয়ে যে মানব-জীবনস্রোত অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হচ্ছে তাই আপনি আপনার ছবির মধ্যে আনবেন।

ফুলজানিতে শ্রীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের অনুরোধ মানিতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে কিন্তু শক্তিকাননের মত এখানেও রোমান্টিক ঘটনার আকস্মিক আবির্ভাব উপন্যাস-কাহিনীকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। ফুলজানির সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ বইটির দোষগুণ সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়াছিলেন।[১]

শ্রীশচন্দ্রে লেখার বিশেষ গুণ এই যে ইহাতে পল্লী-মানুষের জীবনের ছবি পল্লীপ্রকৃতির ছবির সঙ্গে এক হইয়া প্রতিবিম্বিত। রবীন্দ্রনাথের কথায়,

পরিচিত সহজ সৌন্দর্য্যের সহিত সুন্দরভাবে সহজে পরিচয় সাধন করাইয়া দেওয়া অসামান্য ক্ষমতার কাজ, বাঙ্গালার লেখক সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীশবাবুর সেই ক্ষমতাটি আছে।

১১

গিরিজাভূষণ ভট্টাচার্য্যের 'পশ্চিমে বাঙ্গালী'র (১২৯৫) রোমান্টিক কাহিনীতে লক্ষ্ণৌ অঞ্চলের চিত্র বেশ ফুটিয়াছে।[২] ঘটনাটির মধ্যে বাস্তবতার অংশ নগণ্য বলিয়া মনে হয় না। ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,

পশ্চিমে বাঙ্গালি, উপন্যাস, কোন ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হয় নাই, তবে ইহাতে সকলেই আপনার মুখ আপনি দেখিতে পাইবেন, এবং অপরের মুখও দেখিতে পাইবেন।

যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় অনেকগুলি উপদেশমূলক সামাজিক ও গার্হস্থ্য কাহিনী লিখিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ক'নে বউ' (দ্বি-স ১২৯৭), 'প্রেম-প্রতিমা বা প্রিয়ম্বদা' (ঐ ?), 'উপন্যাসলহরী' (১২৯৭), 'প্রসন্নকুমারের উইল' (১৯০০), 'চা-কুলীর আত্মকাহিনী' ইত্যাদি। বিশুদ্ধ শিক্ষাত্মক কাহিনীর মধ্যে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সুরুচির কুটীর' (১২৮৬-৯১) উল্লেখযোগ্য। সত্যচরণ মিত্র কয়েকখানি গার্হস্থ্যচিত্রঘটিত উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ হইতেছে 'বড় বৌ বা সুধাবৃক্ষ'

[১] সাধনা চতুর্থ বর্ষ প্রথম ভাগ পৃ ৬৭-৭৫ ।
[২] ইঁহার দ্বিতীয় উপন্যাস 'জীবনসহচর'।

(দ্বি-স ১৮৯২)। অপর উপন্যাস ‘অবলাবালা’, ‘আকাশগঙ্গা’ ও ‘সহমরণ’। ‘কল্পনা’ সম্পাদক হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকগুলি ছোট বড় উপন্যাস লিখিয়াছিলেন,—‘প্রায়শ্চিত্ত’, ‘দুটি ভাই’ (১২৯১), ‘কুলীন কাহিনী’ (১২৯২), ‘সুহাসিনী’, ‘মাধুরী’ ইত্যাদি। ইঁহার ‘রায় মহাশয়’এ (১৮৯২)[১] জমিদারী-শাসনের সুনিপুণ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কথায়,

> জমিদারী সেরেস্তার গোমস্তার মুহুরি হইতে সামান্য প্রজা পর্য্যন্ত সকলেই যথাযথ পরিমাণে বাহুল্যবর্জ্জিত হইয়া আপন আপন কাজ দেখাইয়া গেছে।

সতীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের ‘রাণী দুর্গাবতী’তে (১৮৯২) বঙ্কিম-রমেশের প্রভাব অত্যধিক। বইটিকে “বটতলা” সাহিত্যের একটি ভালো নমুনা বলিতে পারি।[২]

ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৬-?) অনেকগুলি ছোট-বড় উপন্যাস লিখিয়াছিলেন—‘শৈলবালা’, ‘পরেশপ্রসাদ,’ ‘কোহিনূর,’ ‘অমৃত পুলিন’ (দ্বি-স ১৮৯৮), ‘যুগল প্রদীপ’ (১৩০৫) ইত্যাদি। অন্যান্য উপন্যাস-লেখকদিগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন ‘মনোরমার গৃহ’ (১২৯৯) ইত্যাদি প্রণেতা চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; ‘সুরবালা’ (১৩০৮) ইত্যাদি প্রণেতা চন্দ্রশেখর কর; ‘উমা’ (১৯০০) ও ‘রূপলহরী’ প্রণেতা ‘নায়ক’-সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৭-১৯২৩); ‘মোহিনী প্রতিমা’ (১৮৮৭), ‘নিরাশ-প্রণয়’ (১৮৮৮), ‘বিমাতা না রাক্ষসী’ (১৩০০), পদ্মিনী (১৩০১) এবং ‘প্রতিভাসুন্দরী’ ইত্যাদি গার্হস্থ্য ও ঐতিহাসিক উপন্যাসের লেখক হারাণচন্দ্র রক্ষিত। দীনেশচরণ বসুর ‘কুলকলঙ্কিনী’ (১৮৮৩) উল্লেখযোগ্য কাহিনী॥

১২

ডিটেক্‌টিভ-কাহিনী লেখকের মধ্যে ‘আদরিণী’ (১৮৮৭), ‘ঠগীকাহিনী’ (১৩০১) ও ‘দারোগার দপ্তর’ পুস্তিকামালার (১৮৯৩-৯৯) প্রণেতা প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের[৩] এবং ‘গোয়েন্দা-কাহিনী’ পুস্তিকামালার (১৩০১ হইতে) সঙ্কলয়িতা শরচ্চন্দ্র সরকারের নাম অগ্রগণ্য। বটতলার একজন প্রধান উপন্যাস-

[১] প্রথমপ্রকাশ সাহিত্যে (১২৯৮)।

[২] ইহার পূর্ব্বে গ্রন্থকার ‘প্রিয়তমার পত্র,’ ‘প্রেমময়ী’ এবং ‘রাজরাণী’ উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন।

[৩] নিজের জীবন লইয়া প্রিয়নাথ ‘তেত্রিশ বৎসরের পুলিশ-কাহিনী বা প্রিয়নাথ-জীবনী’ (১৯১২) লিখিয়াছিলেন।

লেখক সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য[১] অনেক ডিটেক্‌টিভ ও রোমাঞ্চক কাহিনী লিখিয়াছিলেন। 'আদরিণী' (১৮৯৪) ইত্যাদির লেখক ক্ষেত্রমোহন ঘোষ বটতলার প্রকাশকদিগের জন্য প্রচুর ডিটেক্‌টিভ কাহিনী লিখিয়াছিলেন ইংরেজির অনুসরণে ও অনুকরণে। অম্বিকাচরণ গুপ্ত 'গোয়েন্দার গল্প' (১৩১৫) বাহির করিয়াছিলেন। পরে এ বিষয়ে সর্ব্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন পাঁচকড়ি দে। ইঁহার প্রধান সহযোগী ছিলেন শরচ্চন্দ্র সরকার, ধীরেন্দ্রনাথ পাল ও মণীন্দ্রনাথ বসু (রাজনারায়ণ বসুর পুত্র)। পাঁচকড়ির ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস আধুনিক ভারতীয় প্রায় সব ভাষাতেই অনূদিত হইয়াছিল॥

১৩

নক্‌শাজাতীয় রচনার ভাব এবং প্রহসনের বিষয় অবলম্বনে গল্প-উপন্যাস লেখা শুরু করিলেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১)। গদ্যে পদ্যে ইন্দ্রনাথের ব্যঙ্গরচনা তখনকার পাঠক-সমাজে এক নূতন মত্ততার সৃষ্টি করিয়াছিল। ইঁহার 'কল্পতরু' (১২৮১) বাঙ্গালায় প্রথম ব্যঙ্গ-উপন্যাস।[২] বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র বইটির প্রশংসা করিয়াছিলেন। কল্পতরুর বাস্তব-চিত্র উপভোগ্য, কিন্তু রুচি সর্ব্বত্র শুচি নয়। সেকালে প্রধানত ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী অথবা ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী শিক্ষিত ব্যক্তিদের দ্বারাই সমাজে অগ্রগতির সূচনা, সেইকারণে কল্পতরুতে এবং পরবর্ত্তী অধিকাংশ রচনায় ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী নব্যেরাই বিশেষভাবে ব্যঙ্গ-চিত্রের বিষয়ীভূত হইয়াছিল। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রমুখ "নব্য হিন্দু" নেতারা ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগীর ব্যঙ্গচিত্রাঙ্কণে অনুরাগ প্রদর্শন করিলেও এ কাজের সূত্রপাত হয় নব্য-সমাজেরই একজন প্রধান মুখপাত্রের দ্বারা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' প্রহসনে (১৮৭২) ব্রাহ্মসমাজের অনুরাগীদের আচরণে অসঙ্গতির ও আতিশয্যের চিত্র প্রথম পাই। ইন্দ্রনাথের বিশেষ ক্ষমতা ছিল বাঙ্গালা রচনায় এবং সেইসঙ্গে ছিল পর্য্যবেক্ষণ শক্তি।[৩] বঙ্কিমচন্দ্র মুচিরাম-গুড়ের-জীবনচরিতে ইন্দ্রনাথেরই অনুসরণ করিয়াছেন।

[১] ইঁহার প্রথম (?) উপন্যাস 'কনক প্রতিমা' (১২৯৭)।

[২] দ্বিতীয় কাহিনী 'ক্ষুদিরাম'এ (১২৯৪) সম্পূর্ণতা নাই।

[৩] ইন্দ্রনাথের চুটকি রচনাগুলি 'পঞ্চানন্দ' পত্রিকায় বাহির হইত। পরে এই পত্রিকা বঙ্গবাসীর অন্তর্ভুক্ত হয়। রচনাগুলি 'পাঁচুঠাকুর' নামে গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত।

[৪] বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য (তৃ-স) পৃ ১৩৩-৩৫।

বঙ্গবাসী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (১২৬১-১৩১২)[১] ইন্দ্রনাথের সাহিত্যশিষ্য। যোগেন্দ্রনাথের রচনায় ইন্দ্রনাথের স্বাচ্ছন্দ্য নাই। রস কিছু যে নাই তাহা নয়, তবে মাত্রাধিক্যে তাহা প্রায়ই বিরস। চরিত্রচিত্রণে অতিশয়োক্তি না থাকিলে ইহার উপন্যাস-কাহিনী সাহিত্যশিল্প হিসাবে মর্য্যাদা পাইত। যোগেন্দ্রচন্দ্র এই ব্যঙ্গ কাহিনীগুলি লিখিয়াছেন—'মডেল ভগিনী' (১৮৮৬-৮৯), 'কালাচাঁদ' (১৮৮৯-৯০), 'চিনিবাস চরিতামৃত' (১৮৯০), 'নেড়া হরিদাস' (১৩০৮, তৃ-স ১৩১৫), তিন ভাগ 'বাঙ্গালী-চরিত' (১২৯২-৯৩) এবং 'মহীরাবণের আত্মকথা' (১২৯৫)। এই বইগুলির প্রধান প্রধান ভূমিকায় কোন না কোন সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। তবে রঙ এত চড়া যে কাহিনী সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রান্ত। কালাচাঁদে বাস্তবদৃষ্টির যে পরিচয় আছে তাহা উপযুক্ত লেখকের হাতে ভালো ফল দিত।

যোগেন্দ্রচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী' (১৯০২-০৬) বিশুদ্ধ রোমান্স্ এবং বাঙ্গালা ভাষায় বৃহত্তম উপন্যাস। প্লট বিশাল, এবং বহুভাষণ বাদ দিলে কাহিনী নিরতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক। শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে দেশে ও বিদেশে বাঙ্গালী-জীবনের খণ্ডচিত্র ইহাতে উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত। কাহিনীর মূলে একটি বাস্তব-ঘটনা ছিল বলিয়া গ্রন্থকার ইঙ্গিত দিয়াছেন। চরিত্রচিত্রণ মোটামুটি ভালোই। তবে সবিশেষ পরিস্ফুট কাশীবাসী, শিয়ালমারা ও সনাতন দাস। কাশীবাসীর ভূমিকায় এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ব্যঙ্গচিত্রিত। দুই একটি ভূমিকায় হুগোর 'ল মিজরাব্‌ল্' উপন্যাসের ছায়াপাত হইয়াছে।

সিপাহী বিদ্রোহে নিজের বিচিত্র অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিদ্রোহে বাঙ্গালী' (১৩৩৩) লিখেন।[২] কাহিনী দুর্গাদাসের, রচনা যোগেন্দ্রচন্দ্রের। কাহিনী বেশ কৌতূহলোদ্দীপক, রচনাও বর্ণনার উপযোগী।

তাবৎ ব্যঙ্গ-উপন্যাসের মধ্যে যোগেন্দ্রচন্দ্রের মডেল-ভগিনীর প্রচার হইয়াছিল সর্ব্বাধিক। তাই ইহার অনুকরণে একাধিক বই অবিলম্বে বাহির হইয়াছিল। যেমন, 'মডেল ভ্রাতা বা আদর্শ যুবক' (১৮৮৭)। ইহাতে এক অল্পশিক্ষিত কাগজের সম্পাদকের প্রথম স্ত্রী সত্ত্বেও দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া বিড়ম্বনা-ভোগের কাহিনী আছে। "শ্রীযুক্ত পথিকচন্দ্র কবিরত্ন (ওরফে)

[১] ঐ পৃ ১৩৫-৩৬। [২] জন্মভূমিতে প্রথম প্রকাশিত 'আমার জীবনচরিত' নামে।

বিষ্ণুশর্ম্মা-জুনিয়ার" বিরচিত "সমাজ-চিত্র উপন্যাস" 'ভজহরি' (১২৯৩) বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। ব্যঙ্গকাহিনীটি কোন বাস্তব ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয়। চন্দ্রনাথ বসুর ব্যঙ্গ-উপন্যাস 'পশুপতিসম্বাদ' (১২৯০) ইন্দ্রনাথের অনুসরণে লেখা।[১] রচনারীতিতে বঙ্কিমের অনুকরণও স্পষ্ট। 'হক্ কথা' (১২৮০) বইটির লেখকের নাম অজ্ঞাত। বিজ্ঞাপনে লেখক বলিয়াছেন,

> 'হক্ কথা' হালিসহর পত্রিকাতে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়া সম্প্রতি পুস্তকাকারে প্রচারিত হইল। অনেক প্রসিদ্ধ লোকের স্বভাব পরিহাস সহকারে চিত্রিত হইয়াছে।

হক্-কথায় এই নয়টি চিত্র বা নিবন্ধ আছে—এডেড্ স্কুল, কেরাণিগিরি, সুসভ্য কবির দল, মনে রাখা, অবতারের ওয়ারিশ্, রসিকতা, কাম্বেলীয় সৃষ্টি, শিক্ষা বিজ্ঞান ও কেম্বল সাহেব, এবং কলিকাতার শক্‌বাজি। রসিকতা নিবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি কটাক্ষ আছে।

ঈষৎ ব্যঙ্গের ও কৌতুকের সুরে সমসাময়িক সমাজের ও সাহিত্যের সমালোচনা করা হইয়াছে অজ্ঞাতনামার দুই খণ্ড 'সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়'এ (১৮৭৬, ১৮৭৭)। বইটি বাঙ্গালা সমসাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসের পর্য্যায়ে পড়ে। গ্রন্থকার সম্ভবত ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিলেন। ইহা অনুমান হয় তাঁহার সাধুভাষার প্রতি পক্ষপাতিত্ব হইতে। এই সম্বন্ধে লেখক একটি কৌতুকাবহ চিত্র আঁকিয়াছেন প্রিন্স দ্বারকানাথের জবানিতে। কাহিনীটি সংক্ষেপে দেওয়া গেল। একদা "নীচ বিকলাঙ্গ বঙ্গভাষায় শব্দবৃন্দ" বাগ্‌দেবীকে বলিল,

> মাতঃ! সাধু কিম্বা নীচভাষার শব্দ সকলই আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা সকলেই আপনার সন্তান,...এবার সাধুসমাজে অধিকার না দেওয়া হইলে আমরা আপনার শ্রীচরণ-প্রান্তে অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিব।

সরস্বতী সত্যাগ্রহভয়ে ভীত হইয়া বলিলেন, "বাঙ্গালা দেশে যাও, তথায় ভদ্রসমাজে অধিকার পাইবে।" ইতর শব্দেরা প্রথমেই গেল বিদ্যাসাগরের কাছে। তিনি হাসিয়া কহিলেন, আমার পুস্তকে সংস্কৃতের ঔরস পুত্র সাধু শব্দেরই স্থান, তোমরা ব্যভিচারদোষে উৎপন্ন, তোমাদের স্থান নাই,

> তবে যে দুই একটি ইতর শব্দকে আমার এস্থানে দেখিতে পাইতেছ, ইহারা কেবল সাধু শব্দদিগের বহন কার্য্যে নিযুক্ত আছে।

তখন তাহারা গেল তত্ত্ববোধিনী সভায়। সেখানে

> অযোধ্যানাথ পাক্‌ড়াশী সরোষে তাহাদিগকে তিরস্কার করিলে তথা হইতে বিমুখ হইয়া

[১] বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত।

তাহারা কোর্ট অফ ওয়ার্ডসে রাজেন্দ্রবাবুর সম্মুখে উপস্থিত হইল। তিনিও বিদায় দিলেন। তথা হইতে বিনির্গত হইয়া, তাহারা কালীপ্রসন্ন সিংহের পুরাণসংগ্রহ পুস্তকালয়ে উপস্থিত হইয়া মহাভারতে প্রবেশার্থে প্রস্তাব করিল। উক্ত প্রস্তাবে সিংহ সিংহের প্রতাপ ধারণ পূর্ব্বক গভীরগর্জ্জনে কলিকাতা নগর কম্পিত করিয়া কহিলেন,—কি প্রশ্রয়! তোমরা আমার পুরাণসংগ্রহে স্থান পাইতে আসিয়াছ? এবং সরস্বতী তোমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন, বলিতেছ? আমি তোমাদিগের সরস্বতীর সহিত কোন সম্বন্ধ রাখি না; তাঁহাকে ভয় কি? আমার চাতুরী তোমরা কি জানিবে? আমি কম পাত্র নহি! জান না এখনই তোমাদিগের মস্তক মুণ্ডন করিয়া বিদায় দিব। অন্যে পরে কা-কথা! ঐ দেখ ভট্টাচার্য্যদিগের অসংখ্য শিরঃশিখাশ্রেণীতে আমার গৃহের প্রাচীর সুসজ্জিত হইয়াছে। 'শিখাই-ত-বটে-হে!' এই বলিয়া ইতর শব্দেরা ভয়াকুল হইয়া পলায়নের উপক্রম করিতেছে, তবু সিংহের ইঙ্গিতে হেমচন্দ্র, কৃষ্ণধন, অভয়াচরণ প্রভৃতি ভট্টাচার্য্যগণ সক্রোধে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা ইতর শব্দদিগকে পুস্তকালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

সেখান হইতে ইতর শব্দেরা গেল মির্জ্জাপুরে বাল্মীকি যন্ত্রে, কিন্তু জানালা দিয়া সেখানেও "স্থূলাঙ্গ যমসম পুরুষ" হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে দেখিয়া দ্রুতবেগে পলাইয়া সরস্বতীর কাছে ফিরিয়া যাইবার পূর্ব্বে বিশ্রামার্থে

কেহ কেহ বেলিয়াঘাটায়, কেহ কেহ নারিকেলডাঙ্গায়, কেহ কেহ পর্‌মিট্‌ ঘাটে, নিজ নিজ পুরাতন বাসায় গমন করিল। মর্ত্ত্যলোকে বিকলাঙ্গ অসাধু শব্দদিগের ঈদৃশ অপমান ঘটিয়াছে, অন্তর্য্যামিনী বাগ্‌দেবী জানিতে পারিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব ও বঙ্গদর্শন সম্পাদক, নাটক রচয়িতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পুস্তক লেখক, গবর্ণমেণ্ট গেজেটের অনুবাদক, জেলা আদালতের উকীল ও আম্‌লাগণকে প্রত্যাদেশ করিলেন যে,—'আমি বিকলাঙ্গ ইতর শব্দগণকে তোমাদের সন্নিধানে প্রেরণ করিব, ইহাদিগকে হতাদর না করিয়া, তোমাদিগের বর্ণনাতে সাদরে স্থান দান করিবে, তাহাতে তোমাদিগের অশেষ মঙ্গল হইবে।'

নব্যলেখকদিগের মুখপাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের উপর লেখকের বিরাগ স্পষ্ট। মধুসূদনের ও হেমচন্দ্রের প্রতিও প্রসন্নতা নাই। লেখক যে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর অনুগত তাহার প্রমাণ বিরল নয়।

অম্বিকাচরণ গুপ্তের[১] 'দেবসমিতি বা সুরলোকে স্বদেশকথা' সুরলোকে-বঙ্গের-পরিচয়ের অক্ষম অনুকরণ। দুর্গাচরণ রায়ের 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন'-এর[২] পরিকল্পনায় সুরলোকে-বঙ্গের-পরিচয়ের ক্ষীণ প্রভাব আছে। দেবগণের-মর্ত্ত্যে-আগমনে গঙ্গার উভয় তীরস্থ প্রসিদ্ধ স্থানের বর্ণনা ও প্রধান প্রধান

[১] পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।
[২] কল্পদ্রুম পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত (১২৮৭ হইতে)।

ব্যক্তি-বস্তু-বিষয়ের সব পরিচয় আছে। একাধারে ভূগোল ইতিহাস ও জীবন-চরিত। অত্যন্ত উপাদেয় রচনা।

বটতলা প্রকাশকেরা ছোট-বড় বহু নক্শাচিত্র ও ব্যঙ্গ-কাহিনী প্রকাশ করিয়াছিলেন। এইসকল রচনা সাধারণত সুরুচিসঙ্গত নয় এবং প্রায়ই কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থের অনুকরণ॥

১৪

রূপকথার ছাঁচে বিশুদ্ধ সাহিত্যরস জমানো বিশেষ ক্ষমতার কাজ। "অসম্ভবের রাজ্যে যেখানে কোন বাঁধা নিয়ম, কোন চিহ্নিত রাজপথ নাই, সেখানে স্বেচ্ছাবিহারিণী কল্পনাকে একটি নিগূঢ় নিয়ম-পথে পরিচালনা করিতে গুণপনা চাই। কারণ, রচনার বিষয় বাহ্যতঃ যতই অসঙ্গত ও অদ্ভুত হউক না কেন, রসের অবতারণা করিতে হইলে তাহাকে সাহিত্যের নিয়ম-বন্ধনে বাঁধিতে হইবে।" কল্পনাশক্তি সমবেদনা মাত্রাজ্ঞান এবং সরলতা—এই কয়টি গুণের সমাবেশ না হইলে গল্পে অদ্ভুত-কৌতুক রস মিশ খায় না এবং "রূপকথার ঠিক স্বরূপটি, তাহার বাল্য-সারল্য, তাহার অসন্দিগ্ধ বিশ্বস্ত ভাবটুকু" ফুটিয়া উঠে না। এই কয়টি গুণের দুর্লভ সমাবেশ হইয়াছে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৪৭-১৯১৯) রচনায়। তাঁহার 'কঙ্কাবতী' (১২৯৯) বাঙ্গালা সাহিত্যের এমন একটা দিক খুলিয়া দিল যেদিকে আমাদের সাহিত্যরথীদের গতিবিধি কখনো ছিল না।[১] কঙ্কাবতীর ভাই বাড়ীতে একটি আম আনিয়া দিব্য দিয়া বলিয়াছিল কেহ যেন সেটি না খায়, যে খাইবে তাহাকে সে বিবাহ করিবে। শিশু কঙ্কাবতী না জানিয়া সেই আমটি খাইয়াছিল। ভাইকে বিবাহ করিতে হইবে—এই সঙ্কটে পড়িয়া অগত্যা কঙ্কাবতী গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী নদীতে গিয়া নৌকা চড়িয়া ভাসিয়া যায়। ছেলে-ভুলানো-ছড়ায় প্রাপ্ত কঙ্কাবতীর এই ভগ্নাংশ কাহিনীটুকু অবলম্বন করিয়া এবং লুইস্ ক্যারলের 'অ্যালিস্ ইন্ ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড'এর আদর্শ কতকটা অনুসরণ করিয়া ত্রৈলোক্যনাথ তাঁহার অভিনব উপাখ্যানটি রচনা করিলেন। লেখকের সকৌতুক স্নিগ্ধ কটাক্ষে সঞ্জীবিত মানুষ-পশু-ভূত-প্রেতিনী সকলে সম্ভব-অসম্ভবের রাজ্যে অবিরোধে পরস্পরের পরম আত্মীয় হইয়া উঠিয়াছে। উদ্ভট কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া এমন নূতন

[১] সাধনা দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম ভাগ পৃ ৩৫৭-৬০ দ্রষ্টব্য।

অদ্ভুতরস সৃষ্টি সকল দেশের সাহিত্যেই বিরল, এবং আমাদের বিজ্ঞ দেশে আরো বিরল এই রসের বয়স্ক রসিক। তাই রবীন্দ্রনাথ আশঙ্কা করিয়াছিলেন,

> আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে বর্ণিত একঠেঙোমুল্লুকনিবাসী শ্রীমান্ ঘ্যাঁঘো ভূতের সহিত শ্রীমতী নাকেশ্বরী প্রেতিনীর শুভবিবাহবার্ত্তা আমাদের এই দুইঠেঙোমুল্লুকের অত্যন্ত ধীর গম্ভীর সম্ভ্রান্ত পাঠকসম্প্রদায়ের কিরূপ ঠেকিবে আমাদের সন্দেহ আছে।

রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কা সত্য হইয়াছে। এখন পঞ্চাশের নিম্নবয়স্ক বাঙ্গালী পাঠকের কাছে বইটি অজ্ঞাত।

কঙ্কাবতী ত্রৈলোক্যনাথের প্রথম রচনা হইলেও রচনাভঙ্গিতে কিছুমাত্র জড়ত্ব নাই। "লেখাটি পাকা এবং পরিষ্কার। লেখক অতি সহজে সরল ভাষায় আমাদের কৌতুক এবং করুণা উদ্রেক করিয়াছেন এবং বিনা আড়ম্বরে আপনার কল্পনা শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।" মধ্যে মধ্যে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ আছে। কিন্তু সে ব্যঙ্গে কোন কণ্টক বা জ্বালা নাই, কোন ব্যক্তিও ব্যঙ্গের উদ্দিষ্ট নয়।

ত্রৈলোক্যনাথের দ্বিতীয় গ্রন্থ হইতেছে গল্পের বই 'ভূত ও মানুষ' (১৮৯৭)।[১] 'বাঙ্গাল নিধিরাম' গল্পটি হুগোর 'টয়লার্স অব দি সী' উপন্যাসের ছায়াবলম্বনে লেখা। 'বীরবালা' কতকটা রূপক গল্প। 'লুল্লু' গল্পে পুনরায় শ্রীমান্ ঘ্যাঁঘো ও শ্রীমতী নাকেশ্বরীর সাক্ষাৎ পাই। 'নয়নচাঁদের ব্যবসা'র ব্যঙ্গকৌতুক অপূর্ব্ব।

'ফোক্‌লা দিগম্বর' (১৩০৭) সরস কাহিনী। বিয়ে পাগলা দিগম্বরের স্ত্রীর ভূমিকা চমৎকার। উপন্যাসের রঙ্গভূমিতে দেখা দিয়াই দিগম্বরী আসর মাৎ করিয়া ফেলিলেন।

> চওড়া কস্তাপেড়ে শাড়ি তিনি পরিয়াছিলেন, মুখখানি তাঁহার বড় একটি হাঁড়ির মত ছিল। সেই হাঁড়ির মধ্যস্থল—উচ্চ নাসিকা দ্বারা, দুই পার্শ্ব দুই চলের অস্থিদ্বারা, নিম্নদেশ মুখগহ্বর দ্বারা, আর তাহার উপর কতকগুলি বড় বড় গোঁফের কেশ দ্বারা সুশোভিত ছিল। যদি কোন মানুষের ঠিক বাঁশির মত নাক থাকে, তাহা হইলে তাঁহার ছিল। মাথার চুলগুলি অধিকাংশ পাকিয়া গিয়াছিল, তবে পাকার ভিতর কাঁচা চুলও অনেক ছিল। মাথার সম্মুখভাগে টাক পড়িয়াছিল। কতক সেই টাকের উপর হইতে, কতক কাঁচা পাকা চুলের ভিতর হইতে, সিন্দূরের ছটা বাহির হইতেছিল। শীতলাদেবী কি সুভদ্রা ঠাকুরাণীও ললাটদেশের এতখানি অংশ সিন্দূরে রঞ্জিত করেন কি না, তা সন্দেহ। সেই সিন্দূরের ছটা দেখিয়া বোধ হইল, যেন তাঁহার সমস্ত শরীরটি পতিভক্তিতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, শরীরে পতিভক্তি আর ধরে না, তাই তাহার

[১] গল্পগুলি প্রথমে জন্মভূমিতে বাহির হইয়াছিল (১২৯৮-১৩০২)।

কতকটা এখন মাথা ফুঁড়িয়া বাহির হইতেছে। স্ত্রীলোকটি শ্যামবর্ণা ; তাঁহার দেহটি যেমন দীর্ঘে, তেমনি প্রস্থে, পাঠানদিগের দেশেও তাঁহার প্রতি একবার ফিরিয়া চাহিতে হয়!…মুখখানি যেন পৃথিবীর সমস্ত নারীকুলকে বলিতেছিল, 'ওরে, অভাগীরা! পতিপরায়ণা সতী কাহারে বলে, যদি তোদের দেখিতে সাধ থাকে, তবে আয়! এই আমাকে দেখিয়া যা'।…

'মুক্তামালা' (১৯০১) বাঙ্গালায় নব-আরব্যোপন্যাস। ব্যঙ্গ-অদ্ভুত বিচিত্র-রসের সমাবেশে গল্পগুলি অত্যন্ত জমিয়াছে। 'ময়না কোথায়!' (১৩১১) উপন্যাসে বধূনির্য্যাতনের ও শুচিবায়ুর বীভৎস পরিণাম প্রদর্শিত। 'মজার গল্প' (১৩১২) বইটির কয়েকটি গল্পের মূল বিদেশি। ইংরেজি গল্পের ভাব-অবলম্বনে লেখা হইলেও 'পূজার ভূত' গল্পটি বাঙ্গালায় একটি উৎকৃষ্ট ভূতের গল্প। 'বিদ্যাধরীর অরুচি'র কৌতুকরস চমৎকার। 'এক ঠেঙো ছকু'র অদ্ভুত রস বেশ গাঢ়। 'পাপের পরিণাম' (১৩১৫) স্পষ্টত উপদেশাত্মক উপন্যাস, তবুও আখ্যানবস্তুর চমৎকারিত্বের জন্য উতরাইয়া গিয়াছে।

'ডমরু-চরিত'এর গল্পগুলি লেখকের মৃত্যুর পরে গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত (১৩৩০)। এই গল্পগুলিকে মুক্তামালার নবপর্য্যায় বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালা সাহিত্যে ডমরুধর উল্লেখযোগ্য নবজাতক। ইহাতে সাহিত্যরূপসৃষ্টির অমরতা আছে। অতিশয়োক্তির আশঙ্কা স্বীকার করিয়া বলিতেছি, সেরভান্তের ডন্ কুইক্সোট্ কোনান্ ডয়েলের শার্লক্ হোম্স এবং আর্নেষ্ট ব্রামার কাই লুঙের মত ত্রৈলোক্য-নাথের ডমরুধরও নিখিল সাহিত্যলোকে অমরত্ব প্রাপ্ত। গল্পগুলির মধ্যে ব্যঙ্গ-কৌতুক-কারুণ্যের যে ত্রিধারা প্রচ্ছন্নভাবে বহিয়া গিয়াছে তাহাতে লেখকের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার তিক্তমধুর স্বাদ মিশিয়া ডমরুচরিত-কাহিনীগুলিকে বিশেষ স্বাদনীয় করিয়াছে। 'স্বদেশী কোম্পানি' হইতে কিছু নিদর্শন দিই।[১] শঙ্কর ঘোষ স্বদেশী-কোম্পানির এজেণ্ট। সে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া স্বদেশী কোম্পানীর তৈয়ারী ম্যালেরিয়া জ্বরের আরক, অজীর্ণ রোগের মহৌষধ, রঙ ফরসা হইবার মলম ইত্যাদি বেচিয়া বেড়ায়। শঙ্কর ঘোষের বক্তৃতায় ভুলিয়া ডমরুধর এক শিশি রঙ ফরসা হইবার ঔষধ কিনিয়া ফেলিল। এক টাকা মূল্যের শিশি আট আনায় কিনিয়া ডমরুধরের মনে খট্কা লাগিল। ভাবিল,

[১] দেশি জিনিষ তৈয়ারি ও দেশি পণ্য বিদেশে রপ্তানি বিষয়ে ত্রৈলোক্যনাথ বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ইনি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে এই বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। বাল্যে ও কৈশোরে ত্রৈলোক্যনাথের বিচিত্র অভিজ্ঞতা 'বঙ্গভাষার লেখক'এ দ্রষ্টব্য।

আমি ডমরুধর! সুমিষ্ট বক্তৃতা করিয়া আমাকে ঠকাইয়া এ আট আনা লইয়া গেল। এ সামান্য ছোক্‌রা নয়। ইহা দ্বারা কি কোনরূপ কাজ করিতে পারা যায় না?

শঙ্কর ঘোষকে ডাকাইয়া তাহার পরিচয় লইয়া ডমরুধর বলিল,

তুমি তিনটা পাস দিয়াছ। পাঁচ দ্রব্য মিশাইয়া নূতন বস্তু প্রস্তুত করিতে পার। ঔষধ বেচিয়া কি লাভ হইবে? কোন একটা লাভের বস্তু প্রস্তুত করিতে পার না?

ডমরুধরের কথা শঙ্করের মাথায় নূতন ফন্দি আনিয়া দিল। পরের দিন সে একরাশি এঁটেল মাটি ও চারি-পাঁচ তা ধবধবে সাদা কাগজ আনিয়া ডমরুধরকে দেখাইয়া বলিল সে এঁটেল মাটি হইতে সেই কাগজ প্রস্তুত করিয়াছে। ডমরুধর মনে মনে হাসিয়া শঙ্কর ঘোষের সহযোগিতায় স্বদেশী কাগজ-প্রস্তুত কোম্পানী খুলিতে রাজি হইল। এই উদ্দেশ্যে দুইজনে কলিকাতায় চলিয়া আসিল। অতঃপর ডমরুধরের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

চারি পাঁচ দিন পরে আমরা দুইজনে কলিকাতা গমন করিলাম। ভালরূপ একটা স্বদেশী-কোম্পানি খুলিতে হইলে দুই চারিজন বড়লোকের নাম আবশ্যক। আমরা তাহার যোগাড় করিলাম। একটা মিটিং হইল। এঁটেল মাটি ও কাগজের নমুনা দেখিয়া বড়লোকেরা ঘোরতর আশ্চর্য্য হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেবল একজন বলিলেন,—'এঁটেল মাটি দিয়া কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা আমি জানিতাম না। আমি মনে করিতাম যে, খড়ি মাটি দিয়া কাগজ প্রস্তুত হয়।'

শঙ্কর ঘোষ উত্তর করিলেন,—'খড়িমাটি দিয়া হইতে পারে কিন্তু তাহাতে খরচ অধিক পড়ে।'

কাগজ সম্বন্ধে ইঁহার এইরূপ গভীর জ্ঞান দেখিয়া অন্য সকলে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সেই যাঁহারা ইংরাজিতে বক্তৃতা করেন, যাঁহাদের বক্তৃতা শুনিয়া স্কুল-কলেজের ছোড়া-গুলো আনন্দে হাততালি দিয়া গগন ফাটাইয়া দেয়, আমরা সেইরূপ দুজন বক্তার যোগাড় রাখিয়াছিলাম।...কয়েকজন বড়লোক ও উগ্র বক্তা ডাইরেক্টর বা পরিচালক হইলেন। কারণ, এই সকল বড়লোক ও বক্তারা সকল প্রকার কারুকার্য্য ও ব্যবসাবাণিজ্য সম্বন্ধে দুরন্ধর। ইঁহারা না জানেন, এমন বিষয় নাই। শঙ্কর ঘোষ ইংরেজি ও বাঙ্গালায় কোম্পানির বিবরণ প্রদান করিয়া কাগজ ছাপাইলেন ও সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলেন। বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল যে, যে ব্যক্তি এক শত টাকার শেয়ার বা অংশ কিনিবে, প্রতি মাসে লাভস্বরূপ তাহাকে পঁচিশ টাকা প্রদান করা হইবে।

দেশে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। সকলে বলিতে লাগিল যে, আর আমাদের ভাবনা নাই। যখন এঁটেল মাটি হইতে কাগজ প্রস্তুত হইবে, তখন বালি হইতে কাপড় হইবে। বিদেশ হইতে কোন দ্রব্য আর আমাদিগকে আমদানি করিতে হইবে না। দেশ টাকায় পূর্ণ হইয়া যাইবে। এই কথা বলিয়া কলিকাতার বাঙ্গালীরা একদিন সন্ধ্যা বেলা আপন আপন ঘর আলোকমালায় আলোকিত করিল।

ত্রৈলোক্যনাথের রচনারীতি তাঁহার নিজস্ব। লেখ্যভাষাকে কথ্যভাষার সঙ্গে এমনভাবে মিলাইয়া দিতে অল্প লেখকই পারিয়াছেন॥

১৫

গল্প শোনার প্রবৃত্তি মানুষের চিরন্তন। আদিকালের মানবের কল্পনাবৃত্তির উন্মেষে তখনকার দিনের গল্প-উপকথার গুরুত্ব নগণ্য ছিল না। চিরন্তন মানবশিশু গল্প-উপকথার মধ্য দিয়াই কল্পনার ও বুদ্ধির স্তন্য পান করিয়া আসিতেছে। কিন্তু সাহিত্যশিল্পের বিশিষ্ট রূপকল্প হিসাবে গল্পের ব্যবহার ঘটিয়াছে অনেককাল পরে। আর সাহিত্যিক ছোটগল্পের উৎপত্তি হইয়াছে নিতান্ত আধুনিক সময়ে।

আদিম মানবের মধ্যে সাহিত্যপ্রচেষ্টা জাগিয়াছিল অজ্ঞাতসারে—অর্থহীন ছড়ায়, ঘুমপাড়ানো সুরে অথবা ভূতঝাড়ানোর বা দেবতা-আহ্বানের মন্ত্রে। এইসব ছড়ায় ক্রমশ সুরের সঙ্গে অর্থের উদয় হইয়া গানের সৃষ্টি হইল। আরো পরে ছড়া-গানে যখন সুরকে ছাপাইয়া অর্থ প্রাধান্য লাভ করিল তখন কবিতার উৎপত্তি। বহিঃপ্রকৃতির রুদ্র অথবা শিব রূপ দেখিয়া তাহার মধ্যে অপ্রাকৃত শক্তির লীলা কল্পনা করিয়া আদিম মানব আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে দেবপূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সকল দেশেই মানবের আদি সাহিত্য এইরূপে দেবপূজাত্মক ধর্ম্মের অঙ্গরূপে উদ্ভূত এবং বিকশিত হইয়াছিল। বহিঃপ্রকৃতির ও অন্তর্বৃত্তির সহিত অবিরত সংঘর্ষের ফলে আদিম মানবের মননশক্তির উৎকর্ষ দ্রুত বাড়িতে থাকে। ইহাতে ভাষার প্রকাশশক্তি ও শব্দসম্পদও বিশেষভাবে বাড়িতে থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে মননশক্তির ও কল্পনাবৃত্তির ত্বরিত উন্মেষ হইতে থাকে। মানবসভ্যতার এই অবস্থায় ছেলে ভুলাইতে অথবা শিক্ষা দিতে কিংবা আনন্দে কালহরণের নিমিত্ত বাস্তবঘটিত অথবা সম্পূর্ণকল্পিত গল্পের চলন হইল। যুগ যুগ ধরিয়া এইরূপ গল্প লোকের মুখে মুখেই চলিয়া আসিয়াছিল, কেননা ধর্ম্মসাহিত্যে স্থানলাভ করিবার যোগ্যতা সেগুলির ছিল না। ক্বচিৎ ছন্দের বন্ধনে পড়িয়া কোন কোন গল্প প্রাচীনত্বের দাবিতে ধর্ম্মকাহিনীর বা ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে এবং সেকালের সাহিত্যে—অর্থাৎ ধর্ম্মসাহিত্যে—স্থানলাভ করিবার সৌভাগ্য পায়। আমাদের ভারতবর্ষের প্রাচীনতম কাব্য—জগতের প্রাচীনতম সাহিত্যসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কাব্য—যে ঋক্‌বেদসংহিতা তাহার মধ্যেও এইভাবে আগত কয়েকটি গল্পের আদল রক্ষিত আছে। তাহার

মধ্যে একটি কাহিনী বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাহিনীগুলির একটি। পুরূরবা-উর্ব্বশীর প্রেমকাহিনী শুধু বৈদিক কবিকে নহে, পরবর্ত্তী কালের প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ ভারতবর্ষীয় কবিকে কাব্য-নাটক রচনায় প্রণোদিত করিয়াছে। আমাদের প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষদিগের কাছে এই কাহিনীর সমাদর চিরকাল ছিল, সেইজন্য ঋক্‌বেদসংহিতা হইতে আরম্ভ করিয়া শতপথব্রাহ্মণ ও মহাভারতের মধ্য দিয়া কালিদাসের কাল অবধি এবং তাহার পরেও, এই প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরিয়া অপ্সরোরমণী-প্রেমমুগ্ধ মানববীরের সকরুণ গাথা আমাদের সাহিত্যে গুঞ্জরিত হইয়া আসিয়াছে ॥

১৬

প্রায় সকল প্রাচীন সাহিত্যেই গদ্যের চলন হইয়াছে পদ্যের অনেককাল পরে এবং গল্প-রচনায় গদ্যের প্রয়োগ হইয়াছে আরো অনেককাল পরে। এবিষয়ে আমাদের প্রাচীন সাহিত্য অসামান্যরূপে সৌভাগ্যবান্। এখানে গদ্য এবং গল্প দুইই পাওয়া যাইতেছে। ঋক্‌বেদসংহিতায় গদ্যের স্থান নাই, কিন্তু পরবর্ত্তী বৈদিক গ্রন্থসমূহে গদ্যেরই ব্যবহার। বৈদিক সাহিত্যে “ব্রাহ্মণ” গ্রন্থগুলি এবং প্রাচীনতর উপনিষদ্‌গুলি প্রধানত গদ্যে রচিত। ব্রাহ্মণ গ্রন্থ-গুলির মধ্যে প্রাচীনতম হইতেছে ‘ঐতরেয়ব্রাহ্মণ’। এই বইটিতে দুই-চারিটি গদ্য গল্প পাওয়া যাইতেছে। তাহার মধ্যে হরিশ্চন্দ্র-শুনঃশেফ কাহিনী সর্ব্বাধিক মূল্যবান্। আকারে ছোট হইলেও ইহা আমাদের সাহিত্যের প্রথমতম উপন্যাস। রূপান্তরিতভাবে হরিশ্চন্দ্র-শুনঃশেফের গল্প প্রায় আধুনিক-কাল অবধি চলিয়া আসিয়াছে। দাতাকর্ণের কাহিনীতে এবং ধর্ম্মমঙ্গলের হরিশ্চন্দ্র-পালার কাহিনীতে ইহারই ক্ষীণ প্রতিধ্বনি। সকল দেশের প্রাচীন সাহিত্যে গল্পমাত্রই ছিল নীতিমূলক অথবা শিক্ষাত্মক। আমাদের প্রাচীনতম সাহিত্যেও তাই। কিন্তু নীতিমূলকতা সত্ত্বেও আমাদের পুরানো গল্পগুলির আকর্ষণ এই গল্পপ্লাবনের দিনেও কম নয়। শুধু কাহিনীর জন্য নয়, ভাষার সারল্যে ও বর্ণনার ঋজুতায় ব্রাহ্মণ-উপনিষদের গল্প অনতিক্রান্ত। আমাদের দেশের সাহিত্যিক গল্পরচনার সব চেয়ে পুরানো এবং ভালো নিদর্শন ঐতরেয়ব্রাহ্মণে বর্ণিত (৫. ২. ১৪) মনুর পুত্র নাভানেদিষ্ঠের কাহিনী। এই ছোট গল্পটির মধ্যে বালক নাভানেদিষ্ঠের পিতৃপরায়ণ সরলহৃদয়ের যে পরিচয় আছে তাহার মাধুর্য্য এই তিন হাজার বছরের অন্তরালেও ম্লান হয় নাই।

"গল্প" কথাটি আধুনিক কালে ব্যবহৃত হইলেও শব্দটি নূতন সৃষ্ট নয়। ইহারই সংশ্লিষ্ট "জল্পি" শব্দ ঋক্‌বেদে পাওয়া গিয়াছে "গল্পগুজব, নিন্দাবাদ" অর্থে। বৈদিক কবি সোম দেবতার কাছে প্রার্থনা করিতেন যেন তাঁহার নামে বাজে গুজব অলীক কাহিনী প্রচলিত না হয় ("মা নো নিদ্রা ঈশত মোত জল্পিঃ")। অর্ব্বাচীন সংস্কৃত গল্পের অর্থে "কথানক", "কথানিকা" শব্দ চলিত হইয়াছিল। অপভ্রংশের মধ্য দিয়া এই দুইটি শব্দ এখন হিন্দীতে "কহানা," "কহানী" হইয়াছে। আবার সংস্কৃতের ছদ্মসাজ পরিয়া বাঙ্গালায় হইয়াছে "কাহিনী"। "উপন্যাস" শব্দের আদিম অর্থ বৈদিক জল্পির মত—"কল্পিত অভিযোগ, মিথ্যা কাহিনী"। এই অর্থেই কালিদাসের দুষ্যন্ত বলিয়াছিলেন, "কিমিদমুপন্যস্তম্"।

শিক্ষামূলক গল্পের উৎকর্ষ ভারতবর্ষে যেমন হইয়াছিল এমন আর কোন দেশে নয়। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে এবং অন্যত্র পঞ্চতন্ত্রে বৌদ্ধ "জাতক" কাহিনীতে ও "অবদান" গ্রন্থে জৈনদের 'কথা'য় মানুষ ও পশুপক্ষিঘটিত এবং বিবিধ উৎকৃষ্ট মনোরঞ্জক ও নীতিবেদক গল্প রহিয়াছে। এইরূপ কয়েকটি গল্পের অনুবাদ ভারতবর্ষের বাহিরেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। গ্রীসে যে গল্পগুলি পৌঁছাইয়াছিল তাহার কতকগুলি ঈশপের নামে প্রচলিত হইয়া এখন সর্ব্বদেশের অধিকারভুক্ত।

রোমান্টিক গল্প আর রূপকথাও কিছু কিছু পাওয়া যায় ভাঙ্গা সংস্কৃতে লেখা 'মহাবস্তু', 'দিব্যাবদান' প্রভৃতি বৌদ্ধ সংস্কৃত "অবদান" গ্রন্থে পালিতে লেখা জাতক-কাহিনীতে এবং জৈনদের সংগৃহীত অর্দ্ধমাগধী-অপভ্রংশ-সংস্কৃতে লেখা নিবন্ধে। পৈশাচী প্রাকৃতে রচিত গুণাঢ্য-প্রণীত 'বৃহৎকথা' কাব্যে সেকালের বহু বিচিত্র মনোরঞ্জক কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছিল। বৃহৎকথা অনেকদিন লুপ্ত, তবে ইহার কাহিনীগুলি ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথামঞ্জরী' এবং সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর' কাব্যে অনূদিত এবং 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রভৃতি গদ্য-পদ্য গ্রন্থে রূপান্তরিত হইয়া রহিয়া গিয়াছে। এইসকল প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থের অনেক কাহিনী পরবর্ত্তী কালে ঈরান আরব ও সিরিয়া পর্য্যন্ত প্রসারলাভ করিয়াছিল। আধুনিককালের আরব্য-উপন্যাসের বহু আখ্যায়িকার মূল "অবদান" ও "জাতক" কাহিনীতে এবং কথাসরিৎসাগর প্রভৃতি কাব্যে পাওয়া যাইতেছে।

এখনকার দিনে উপন্যাস বলিতে যাহা বোঝায় তাহা সেকালে ছিল না। সাহিত্যের রূপকল্পের বিবর্ত্তনে উপন্যাস অত্যন্ত অর্ব্বাচীন। মনের ঘাতপ্রতিঘাত, চরিত্রের সংঘর্ষ ও বিকাশ এবং সূক্ষ্ম অনুভূতির বিশ্লেষণ উপন্যাসের প্রধান উপাদান। সাহিত্যে এমন আণুবীক্ষণিক এবং বিশ্লেষণকারী দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক কালে স্বাভাবিকভাবে ইউরোপেই প্রথম দেখা দেয়। প্রাচীনকালে কেন সেদিন অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে গল্পে-আখ্যায়িকায় বর্ণনা-ঘটনাই ছিল একমাত্র বস্তু। তবুও বাণভট্টের 'কাদম্বরী'তে (সপ্তম শতাব্দী) আধুনিক উপন্যাসের পূর্ব্বভাস ক্ষীণ হইলেও আছে। বর্ণনার আড়ম্বর কমাইয়া যদি চরিত্রচিত্রণের দিকে বাণভট্ট বেশি লক্ষ্য দিতেন তাহা হইলে বইটি বিশ্বসাহিত্যের প্রথম উপন্যাস হইবার গৌরব পাইত। ঔপন্যাসিকের উপযুক্ত পর্য্যবেক্ষণশক্তির এবং সহানুভূতির পরিচয় বাণভট্টের লেখায় দুর্লভ নয়। কিন্তু মারাঠা ভাষায় "কাদম্বরী" বলিতে উপন্যাস বুঝাইলেও বাণভট্টের কাব্য হইতে আধুনিক উপন্যাসের সৃষ্টি হয় নাই। ইংরেজি নভেলের অনুসরণে প্রথমে বাঙ্গালায় এবং পরে বাঙ্গালার অনুকরণে অপর আধুনিক ভারতীয় ভাষায় উপন্যাসের চলন হইয়াছে।

ছোটগল্পের উদ্ভব ও বিকাশ উপন্যাসের আবির্ভাবের কিছুকাল পরে হইয়াছে এবং দুইই কাহিনীসর্ব্বস্ব বলিয়া ছোটগল্প যে উপন্যাসেরই প্রকারভেদ বলা চলে না। শুধু আকারে নয় প্রকারেও উপন্যাসের সঙ্গে ছোটগল্পের পার্থক্য।[১] (তবে আধুনিক অনেক বাঙ্গালা উপন্যাস আকারে বড় হইলেও আসলে ফেনায়িত ছোটগল্পই।) উপন্যাসের মত ছোটগল্পেরও উৎপত্তি এবং বিকাশ ঘটিয়াছে ভারতবর্ষের বাহিরে ইউরোপে ও আমেরিকায়। আধুনিক ছোটগল্পের আদর্শ রূপের জন্মদাতা হইতেছেন ফরাসী লেখক প্রস্‌পের মেরিমে (১৮০৩-১৮৭০) ও রাশিয়ার কবি আলেক্‌সান্দের পুশকিন (১৭৯৯-১৮৩৭)। অমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক এডগার অ্যালেন পো ডিটেক্‌টিভ গল্পের সৃষ্টিকর্ত্তা। ইঁহার অপর নূতন কৃতি হইতেছে ছোটগল্পের মধ্যে অতিপ্রাকৃত এবং ভয়ানক রসের পরিবেশ সৃষ্টি। ফ্রান্সে অনেক ভালো গল্প-লেখক জন্মিয়াছিলেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন আলফঁস্ দোদে (১৮৪০-৯৭) এবং গী দ মোপাসাঁ (১৮৫০-৯৩)।

বাঙ্গালা উপন্যাসের সৃষ্টি হইয়াছিল প্রধানত ইংরেজি রোমান্‌সের আদর্শ অনুসরণে। কিন্তু বাঙ্গালা ছোটগল্পের বেলায় সে কথা খাটে না। বঙ্কিমকে

তাঁহার রোমান্‌স-কাহিনী পুরাপুরি অধীত বিদ্যা ও কল্পনার সাহায্যে গড়িতে হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সেভাবে ছোটগল্প সৃষ্টি করেন নাই। অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাই তাঁহার ছোটগল্পের প্রধান উৎস। ছোটগল্প-রচনার কৌশলও রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙ্গালাদেশে যে-সকল লৌকিক এবং ঐতিহাসিক গল্প প্রচলিত ছিল তাহার মূল্যবান্ সংগ্রহ পাইতেছি রামরাম বসুর 'লিপিমালা'য় (১৮০২) এবং উইলিয়ম কেরির 'ইতিহাস-মালা'য় (১৮১২)। হরপ্রসাদ রায়-অনূদিত 'পুরুষ-পরীক্ষা'য় (১৮১৫) এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'প্রবোধচন্দ্রিকা'য়ও (১৮৩৩) অনেক গল্প আছে। পুরুষ-পরীক্ষার অনুকরণে লেখা কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের 'নবনীতি-সার'এ (প্রথম ভাগ ১৮৫৮) পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি স্থানীয় ইতিহাসমূলক গল্প স্থান পাইয়াছে।

নীতিমূলক ছোট ছোট গল্প দৈবাৎ সাহিত্যিক ছোটগল্পের কাছ ঘেঁসিয়া গিয়াছে। বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' দ্বিতীয় ভাগের শেষে ভুবনের কাহিনীটি ইহার ভালো উদাহরণ। ছোটগল্পের যাহা প্রধান লক্ষণ—একটি অখণ্ড ভাবরসে কাহিনীর পরিসমাপ্তি—ইহাতে পরিস্ফুট। সুতরাং বাঙ্গালা মৌলিক ছোট-গল্পের একটি আদি নিদর্শন বলিয়া এটিকে নেওয়া চলে।

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের দিকে শশিচন্দ্র দত্ত ভারত-ইতিহাসকাহিনী অবলম্বন করিয়া ইংরেজিতে কয়েকটি গল্প লিখিয়া 'টেলস্ অব্ ইয়োর' নামে প্রকাশ করেন। এই গল্পগুলির বাঙ্গালা অনুবাদ 'উপন্যাসমালা'র (১৮৭৭) কয়েকটি গল্পে ছোটগল্পের বীজ দেখা দিয়াছে। ইহার পূর্ব্বেও এমন তিন-চারিটি গল্প বাহির হইয়াছিল যাহাতে ছোটগল্পের রূপ দুর্লক্ষ্য নয়। এই তিনটি গল্প হইতেছে পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মধুমতী'[১] এবং সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট'[২] ও 'দামিনী'[৩]। মধুমতীতে কপালকুণ্ডলা-কাহিনীর যেন অনুবৃত্তি হইয়াছে। রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের হাত আছে বলিয়া বোধ হয়। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে যে-সকল গল্প লেখা হইয়াছিল তাহার মধ্যে কেবল দামিনীতেই ছোটগল্পের লক্ষণ বেশিমাত্রায় বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা 'ভিখারিণী'তেও[৪] ছোটগল্পের ঠাট বজায় আছে।

[১] প্রথম প্রকাশ বঙ্গদর্শন জ্যৈষ্ঠ ১২৮০। [২] প্রথম প্রকাশ ভ্রমর বৈশাখ ১২৮১।
[৩] প্রথম প্রকাশ ভ্রমর জ্যৈষ্ঠ ১২৮১। [৪] প্রকাশ ভারতী ১২৮৪।

রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প-রচনায় হাত দিবার সঙ্গে সঙ্গে যাঁহারা ছোটগল্প লিখিতে প্রবৃত্ত হন তাঁহাদের মধ্যে দুইজনের কাজ উল্লেখযোগ্য। স্বর্ণকুমারী দেবী 'ভারতী' পত্রিকায় অনেকগুলি ছোট-বড় গল্প লিখিয়াছিলেন। সেগুলি 'নবকাহিনী'তে (১৮৯২) সঙ্কলিত। নাটকোচিত ক্লাইম্যাক্স্ স্বর্ণকুমারীর গল্পের প্রধান বিশেষত্ব। নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের ছোট ও বড় গল্পের প্রধান গুণ হইতেছে সুখপাঠ্যতা এবং চমৎকারিত্ব। ইহার 'সংগ্রহ'তে (১৮৯২) যে কয়টি গল্প ও চিত্র সঙ্কলিত হইয়াছে তাহার মধ্যে 'শ্যামার কাহিনী' বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য ॥

নবম পরিচ্ছেদ

বিবিধ গদ্য নিবন্ধ

১

পূর্ব্ববর্ত্তী কয় দশকে গদ্য নিবন্ধের যে সমাদর ছিল আলোচ্য সময়ে তাহা অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। ইহার জন্য দায়ী উপন্যাসের আবির্ভাব। যে পাঠক উপন্যাসের রসপায়ী সহজে সে আর নীরস গদ্য ঠুকরাইতে যাইবে না। সুতরাং গদ্য নিবন্ধের কদর রহিল শুধু ধর্ম্মতত্ত্ব-সমাজতত্ত্ব-পুরাতত্ত্ব-আলোচনায় এবং ইতিহাস-জীবনীতে।

আলোচ্য সময়েও বেশির ভাগ ব্রাহ্মসমাজের নেতাদের মধ্যেই ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা নিবদ্ধ ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ও রাজনারায়ণ বসুর রচনা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে।[১] ইঁহাদের পর উল্লেখযোগ্য কেশবচন্দ্র সেন এবং শিবনাথ শাস্ত্রী। কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩৮-৮৪) বক্তৃতা ও ধর্ম্মব্যাখ্যানের ভাষা সরল ও স্পষ্ট। ইঁহার উপদেশাবলী 'ব্রহ্মোৎসব' (১৮৬৮), 'আচার্য্যের উপদেশ' ও 'সেবকের নিবেদন' (১৮৭০ হইতে), 'দৈনিক প্রার্থনা' (১৮৮৪-১৮৮৮), 'ব্রহ্মগীতোপনিষৎ' (১৮৮৬, ১৮৯৩) ইত্যাদিতে সঙ্কলিত। 'জীবনবেদ' (১৮৮৪) আত্মজীবনীর মত। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র পুরাতন ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া দিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহার মুখপত্র 'ধর্ম্মতত্ত্ব' পত্রিকা বাহির করেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র 'সুলভ-সমাচার' নামে সাপ্তাহিকপত্র প্রকাশ করেন। তাহাতে ইঁহার নানাবিষয়ক সুললিত ও ওজস্বী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া কেশবচন্দ্র নববিধান ব্রাহ্মসমাজ গঠন করিলে এই সমাজের মুখপত্র 'নববিধান' ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়। কেশবচন্দ্র ব্রহ্ম-উপাসনায় ভক্তিভাবের কীর্ত্তন প্রভৃতি গান করিয়া পুরাতন হিন্দুসমাজের সঙ্গে নূতন ব্রাহ্মসমাজের বন্ধন ঘনিষ্ঠতর করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রভাবে বাঙ্গালাদেশে ধর্ম্মচিন্তায় যে নব জাগরণ আসে তাহাতে কেশবচন্দ্রেরও হাত ছিল। এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ স্বামীর (১৮৬২-১৯০২) কৃতিত্বও স্মরণীয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে

বাঙ্গালীর জীবনে যাঁহারা নূতন প্রেরণা ও নব উৎসাহ আনিয়া দিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বিবেকানন্দ অগ্রণী। কেশবচন্দ্রের মত বিবেকানন্দও বাগ্মী ছিলেন। তবে কেশবচন্দ্রের বাগ্মিতায় যে উন্মাদনার আভা ছিল বিবেকানন্দের বক্তৃতায় তাহা ছিল না। বিবেকানন্দের বক্তৃতা আবেগ-উচ্ছ্বসিত নয়, বুদ্ধিদীপ্ত। বিবেকানন্দের বাঙ্গালা রচনা বেশি নাই। যেটুকু আছে তাহার লেখকের দৃপ্ত তেজ ও অদম্য কর্ম্মিষ্ঠতার উষ্ণতা আছে।

উপন্যাস-লেখকদিগের প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রীর নাম করিয়াছি এবং কবিতা-রচয়িতাদের মধ্যেও ইঁহার আলোচনা করিব। শিবনাথের উপদেশাবলী ‘বক্তৃতাস্তবক’ (১৮৮৮), ‘ধর্ম্মজীবন’ (১৯০১), ‘মাঘোৎসবের উপদেশ’ (১৩০৮), ‘প্রবন্ধাবলি’ (১৩১১) ইত্যাদি গ্রন্থে সঙ্কলিত আছে। ইঁহার ‘রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ’ (১৩০৪) ও ‘আত্মচরিত’ (১৩২৫) বিশেষ মূল্যবান্ গ্রন্থ।

কেশবচন্দ্রের অনুগামীদিগের মধ্যে অনেকেই ভালো লেখক ছিলেন। গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৫-১৯১০) ফারসী ও আরবী হইতে অনেকগুলি গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন।[১] ‘মোহম্মদের জীবনী’ এবং ‘পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি ও সংক্ষিপ্ত জীবনী’ ইঁহার উল্লেখযোগ্য রচনা। ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল (ছদ্মনাথ “চিরঞ্জীব শর্ম্মা”) গদ্যে পদ্যে অনেক লিখিয়াছিলেন।[২] ইনি বহু অধ্যাত্মসঙ্গীতের রচয়িতা।[৩] ত্রৈলোক্যনাথ দুইখানি উপন্যাস—‘বিংশ শতাব্দী’ (১২৯৮) ও ‘গরলে অমৃত’, তিনখানি নাটক—‘নব বৃন্দাবন’ (১৮৮২), ‘কলি-সংহার’ (১৮৮৪) ও ‘যুগলমিলন’ (১২৯৩), এবং ‘বাল্যসখা’ ও ‘যৌবন সখা’ কাব্য (প্রথম ভাগ ১৮৮৭) লিখিয়াছিলেন। ইঁহার অপর গদ্য গ্রন্থ—‘জগতের বাল্য ইতিহাস’ (১৮৭৫), ‘ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা’, ‘ঈশাচরিতামৃত’ (১৮৮২-৮৩) এবং ‘কেশবচরিত’ (১৮৮৪)। অঘোরনাথ গুপ্তের (১৮৪১-৮১) বিশিষ্ট রচনা তিনখণ্ডে ‘শাক্যমুনি-চরিত্র’ (১২৮২-৮৮)।

কেশবচন্দ্রের অনুজ কৃষ্ণবিহারী সেনও (১৮৪৭-৯৫) ভালো লেখক ছিলেন। ইঁহার ‘অশোকচরিত’ (১৮৯২) বাঙ্গালায় একটি উৎকৃষ্ট জীবনী। বইটিতে

[১] বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য (তৃ-স) পৃ ১৪২-৪৩।

[২] ঐ পৃ ১৪৩।

[৩] ‘গীতরত্নাবলী’তে সঙ্কলিত (১৮৮৪-১৯০০)।

লেখকের লিপিচাতুর্য্যের ইতিহাসনিষ্ঠার এবং অনুসন্ধিৎসার সবিশেষ পরিচয় আছে।[১] ইনি কবিতাও লিখিতেন।[২]

ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনায় চন্দ্রশেখর বসু (১২৪০-১৩২০) উল্লেখযোগ্য। ইঁহার লেখা—'বক্তৃতাকুসুমাঞ্জলি' (১২৮২), 'বেদান্তপ্রবেশ' (১২৮১), 'সৃষ্টি' (১২৮২), 'অধিকারতত্ত্ব' (১২৮৯), 'বেদান্তদর্শন' (১২৯২) ইত্যাদি॥

ব্রাহ্ম নেতাদের অনুকরণে এবং অনেক সময়ই তাঁহাদের বিরুদ্ধে নব্য-হিন্দুধর্ম্মের নেতারা ধর্ম্মতত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হন। ইঁহাদের অগ্রণী শশধর তর্কচূড়ামণি[৩] এবং চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪-১৯১০)। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে ইঁহাদের যোগ ছিল বটে কিন্তু বঙ্কিমের মনস্বিতা বিদ্যা ও বিচক্ষণতা ইঁহাদের কাহারো ছিল না।

চন্দ্রনাথ বসুর লেখায় ধর্ম্মতত্ত্বের সঙ্গে সমাজতত্ত্বের ও সাহিত্যতত্ত্বের খিচুড়ি পাকানো হইয়াছে। চন্দ্রনাথের লিখিবার বেশ ক্ষমতা ছিল, সাহিত্যবোধও ছিল কিন্তু আলোচনায় ও বিচারে সর্ব্বত্র স্থিরবুদ্ধির পরিচয় নাই। চন্দ্রনাথ অনেক পুস্তক-পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে—'শকুন্তলাতত্ত্ব' (১২৮৮), 'ফুল ও ফল' (১২৯২), 'হিন্দু বিবাহ' (১২৯৪), 'ত্রিধারা' (১২৯৭), 'হিন্দুত্ব' (১৮৯২), 'কঃ পন্থাঃ' (১৮৯৮), 'বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি' (১৩০৬), 'সাবিত্রীতত্ত্ব' (১৯০০), 'পৃথিবীর সুখ দুঃখ' (১৩১৫) ইত্যাদি॥[৪]

৩

দর্শনের আলোচনায় একমাত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) ছাড়া কাহারো রচনায় মৌলিক চিন্তার সঙ্গে সাহিত্যভাবনার সুদুর্লভ সম্মিলন ঘটে নাই। দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতিভা অসাধারণ এবং বহুবিচিত্র। কাব্যে সঙ্গীতে গণিতে শর্টহ্যাণ্ড-লেখায় ভাষাতত্ত্বে দর্শনে ইঁহার সজাগ কৌতূহল ছিল, কিন্তু নির্লিপ্ত ও উদাসীন-প্রকৃতি বলিয়া কোন কিছুরই অনুশীলনে আসক্তি ছিল না। তাই তিনি প্রতিভার উপযুক্ত স্থায়ী কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

[১] পরিশিষ্ট 'অশোক-চরিত' নাট্যরচনা। [২] 'কবিতামালা' (১৮৯৫)।

[৩] ইঁহার বক্তৃতা ও ব্যাখ্যান 'ধর্ম্মব্যাখ্যা' (প্রথম পর্ব্ব ১৮৮৪), 'ভক্তিসুধালহরী', 'সাধন-প্রদীপ' ইত্যাদিতে লভ্য।

[৪] রসরচনা পশুপতি-সম্বাদের উল্লেখ আগে করিয়াছি।

এবিষয়ে সঞ্জীবচন্দ্রের সহিত তাঁহার কতকটা মিল আছে। দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রথম দার্শনিক গ্রন্থ হইতেছে চারিখণ্ড 'তত্ত্ববিদ্যা' (১৮৬৬-৬৯)। তাহার পর 'গীতাপাঠের ভূমিকা' বা 'গীতাপাঠ' (১৩২২) ছাড়া অধিকাংশ নিবন্ধই পুস্তিকা। তবুও এগুলি নিতান্ত মূল্যবান্ রচনা। তাহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 'সোণার কাটি রূপার কাটি' (১২৯১), 'সোণায় সোহাগা' (১২৯১), 'আর্য্যামি ও সাহেবিয়ানা' (১৮৯০), 'সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা' (১৮৯১), 'অদ্বৈতমতের প্রথম ও দ্বিতীয় সমালোচনা' (১৩০৩-০৪), 'আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত ও সঙ্ঘাত' (১৩০৬), 'সারসত্যের আলোচনা',[১] 'হারামণির অন্বেষণ' (১৯০৮) ইত্যাদি। ইঁহার অনেকগুলি প্রবন্ধ 'নানাচিন্তা'য় (১৩২৭), 'প্রবন্ধমালা'য় (১৩২৭) ও 'চিন্তামণি'তে (১৩১৯) সঙ্কলিত আছে। দ্বিজেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গদ্য রচনা 'গীতাপাঠের ভূমিকা'।[২] চিঠিলেখায় দ্বিজেন্দ্রনাথের একটি নিজস্ব সহজ ও সরল ভঙ্গি ছিল। এখানে কনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার অসাধারণ মিল।

দ্বিজেন্দ্রনাথের মধ্যম অনুজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩) বিস্তর লেখেন নাই, কিন্তু যাহা লিখিয়াছেন তাহা মূল্যহীন নয়। তাঁহার 'বৌদ্ধধর্ম্ম' (১৩০৮) বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ। 'বোম্বাই চিত্র' (১২৯৫) এবং 'বাল্যকথা'[৩] মনোরম রচনা। মেঘদূতের ও টিলকের ভগবদ্‌গীতার অনুবাদ উল্লেখযোগ্য।[৪] সেকালের শ্রেষ্ঠ জাতীয়সঙ্গীত "মিলে সবে ভারত-সন্তান" ইঁহারই রচনা।

দ্বিজেন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথের পঞ্চম অনুজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮-১৯২৫) প্রধানত নাট্যকার বলিয়াই প্রসিদ্ধ। কিন্তু গদ্য রচনাতেও ইনি কম বিশিষ্ট ছিলেন না। ভারতীতে নানা বিষয়ে ইঁহার প্রবন্ধ বাহির হইত। এগুলি 'প্রবন্ধমঞ্জরী'তে (১৩১২) সঙ্কলিত আছে। সংস্কৃত ইংরেজি ও ফরাসী হইতে ইনি অনেক বই (বিশেষ করিয়া নাটক) অনুবাদ করিয়াছিলেন ॥

৪

বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনকে আশ্রয় করিয়া যে-সকল লেখক খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে প্রধান রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,

[১] নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত (১৩০৮-০৯)।

[২] প্রথম প্রকাশ প্রবাসী ১৩১৮। বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য (তৃ-স) পৃ ১৩৯-৪১।

[৩] প্রথম প্রকাশ ভারতী ১৩১৮। [৪] সুশীলা-বীরসিংহ নাটক ইঁহারই রচনা।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রামদাস সেন এবং শেষের দিকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়[১] কয়েকটি মূল্যবান্ গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।[২] কবি বিদ্যাপতির সত্য পরিচয় ইঁহারই আবিষ্কার। প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১২৫৬-১৩০৭) 'বাল্মীকি ও তৎসমসাময়িক বৃত্তান্ত' (১৮৭৬) এবং 'গ্রীক ও হিন্দু'[৩] বই দুইটিতে পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭) সেকালের একজন বিশিষ্ট গদ্যলেখক। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত ইঁহার রসরচনা সমাদর লাভ করিত। একটি প্রবন্ধ বঙ্কিম কমলাকান্তে স্থান দিয়াছিলেন। অক্ষয়চন্দ্রের সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'সাধারণী' এবং মাসিক 'নবজীবন' পত্রিকা বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। অক্ষয়চন্দ্র পদ্যও লিখিয়াছিলেন, 'গোচারণের মাঠ' এবং 'শিক্ষানবীশের পদ্য' (১৮৭৪) তাহার নিদর্শন। 'মোতিকুমারী' (১৩২৪) ইঁহার রচিত উপন্যাস। অক্ষয়-চন্দ্রের গদ্য নিবন্ধ ও রসরচনাগুলি 'সমাজ সমালোচন' (১৮৭৪), 'সনাতনী', 'রূপক ও রহস্য' ইত্যাদি পুস্তকে সঙ্কলিত আছে। 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে অক্ষয়চন্দ্রের আত্মজীবনী ('পিতাপুত্র') উল্লেখযোগ্য।

রামদাস সেনের (১৮৪৫-৮৭) কৃতিত্ব ভারতীয় পুরাতত্ত্বের আলোচনায়। 'ঐতিহাসিক রহস্য' (১৮৭৪-৭৬), 'ভারতরহস্য' প্রভৃতি গ্রন্থে ইঁহার শ্রমশীলতার ও পাণ্ডিত্যের নিদর্শন রহিয়াছে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর (১৮৫৩-১৯৩১) লিপিভঙ্গি সরল ও সরস এবং নিজস্ব। পাণ্ডিত্যের বোঝা ইঁহার কম ছিল না, কিন্তু গুরু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতই ইঁহার লেখনী পাণ্ডিত্যভারে কুণ্ঠিত হয় নাই। ইঁহার 'ভারতমহিলা' (১২৮৭), 'বাল্মীকির জয়' (১২৮৮) এবং 'কাঞ্চনমালা' (১৩২১)[৪] সমাদৃত হইয়াছিল। হরপ্রসাদের শ্রেষ্ঠ রচনা 'বেণের মেয়ে' (১৩২৬)।[৫] এই উপন্যাস-চিত্রটিতে দশম-একাদশ শতাব্দীর সপ্তগ্রাম অঞ্চলের কাল্পনিক আলেখ্য জীবন্ত ইতিহাস হইয়া ফুটিয়াছে।[৬]

পুরাতত্ত্ব-ঘটিত গ্রন্থের মধ্যে 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণ দাসের

[১] পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য। [২] 'নানা প্রবন্ধ'এ (১৮৮৫) সঙ্কলিত।
[৩] আর্য্যদর্শনে (মাঘ ১২৮৩ হইতে) প্রথম প্রকাশিত।
[৪] প্রথম প্রকাশ বঙ্গদর্শন ১২৯০। [৫] প্রথম প্রকাশ নারায়ণে।
[৬] বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য (তৃ-স) পৃ ১৫২ দ্রষ্টব্য।

'সভ্যতার ইতিহাস' (দ্বি-স ১৮৭৬)[১] বইটির উল্লেখ আবশ্যক। বইটি ইংরেজির অনুসরণে লেখা। এইসঙ্গে ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরীর 'মানবপ্রকৃতি'ও (১৮৮৩) উল্লেখযোগ্য।

ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থের সমাদর আগের মতই ছিল। এই বিভাগে মুখ্য লেখক রজনীকান্ত গুপ্ত (১৮৪৯-১৯০০)। ইঁহার 'সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস' সাত খণ্ড (প্রথম খণ্ড ১২৮৬) বাঙ্গালা ভাষায় এক বিশিষ্ট কীর্ত্তি। ইঁহার অপর রচনা 'জয়দেব-চরিত' (১৮৭৩), 'পাণিনি' (১৮৭৫), 'প্রবন্ধমালা' (১৮৭৭), 'ভারতকাহিনী' (১৮৮৩), 'বীরমহিমা' (১২৯২) ইত্যাদি। রজনীকান্তের রচনাভঙ্গি গাঢ়বন্ধ এবং ওজস্বী। পূর্ব্ববর্ত্তী কালের রচনার মধ্যে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চীনের ইতিহাস' (১৮৬৫) উল্লেখযোগ্য ॥

৫

কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় সঙ্কলিত 'ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিত অর্থাৎ নবদ্বীপের রাজ-বংশের বিবরণ' (১৮৭৫) মূল্যবান্ ঐতিহাসিক নিবন্ধ। ইঁহার 'আত্ম-জীবনচরিত'[২] সুপাঠ্য বই।

'আর্য্যদর্শন' পত্রিকার (১২৮১) প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (১৮৪৫-১৯০৪) গদ্য প্রবন্ধ ও দেশপ্রিয় পাশ্চাত্য-মনীষীর জীবনবৃত্ত লিখিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার রচনা 'জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত' (১৮৭৭),[৩] 'ম্যাট্‌সিনির জীবনবৃত্ত' (১২৮৬)[৪], 'হৃদয়োচ্ছ্বাস বা ভারত-বিষয়ক প্রবন্ধাবলী' (১৮৮১), 'গ্যারিবল্‌ডীর জীবনবৃত্ত' (১৮৯০), 'ওয়ালেসের জীবনবৃত্ত' (১৮৮৬), 'প্রাতঃস্মরণীয় চরিতমালা' (চন্দননগর ১৮৮৩), 'সমালোচনা-মালা' (১৮৮৫), 'চিন্তাতরঙ্গিণী' (১২৯৬), 'কীর্ত্তিমন্দির' (১২৯৬) ইত্যাদি।[৫] যোগেন্দ্রনাথের রচনার বৈশিষ্ট্য গাঢ়তা ও ওজস্বিতা।

যোগেন্দ্রনাথ যখন জীবনবৃত্ত-রচনায় প্রবৃত্ত হন তখন দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন সবে সাড়া জাগাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাই স্বভাবতই তিনি

[১] জ্ঞানাঙ্কুরে প্রথম প্রকাশিত।

[২] প্রথমপ্রকাশ সাহিত্যে (১৩০৩)।

[৩] প্রথমপ্রকাশ আর্য্যদর্শনে (শ্রাবণ ১২৮১-চৈত্র ১২৮২)।

[৪] প্রথমপ্রকাশ আর্য্যদর্শনে (ভাদ্র ১২৮২ হইতে)।

[৫] 'প্রাণোচ্ছ্বাস' (১৮৮৯) কবিতার বই।

পাশ্চাত্য দেশের সেই মহাপুরুষদের জীবনী বাছিয়া লইয়াছিলেন যাঁহারা স্বদেশের অধীনতা মোচনে ব্রতী হইয়াছিলেন। অপরদিকে সত্যচরণ শাস্ত্রী (১৮৬৫-১৯৩৫) তাঁহার গ্রন্থের নায়ক দেশপ্রেমিক মহাত্মা বাছিয়া লইলেন ভারতীয় ইতিহাসকাহিনী হইতে। ইঁহার রচনা 'ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর জীবনচরিত' (১৮৯৫), 'বঙ্গের শেষ স্বাধীন হিন্দু-মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবনচরিত' (১৮৯৬), 'মহারাজ নন্দকুমার-চরিত' (১৮৯৯), 'ক্লাইব-চরিত' (১৩১৪) এবং 'ভারতে অলিকসন্দর' (১৩১৬)।[১]

সমসাময়িক ও অনতিকাল-পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালী মনীষীর জীবনচরিত যে-কয়খানি রচিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত' (১৮৮১), মহেন্দ্রনাথ রায়-লিখিত অক্ষয়কুমার দত্তের 'জীবনবৃত্তান্ত' (১৮৮৫), যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত' (১৮৯৩), বিহারীলাল সরকারের 'বিদ্যাসাগর' (১৮৯৫) এবং চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর' (?-১৩০২)। বৈষ্ণব মহাপুরুষদের জীবনী লিখিলেন অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় (?-১৩৩৯)। ইঁহার রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ভক্তচরিতামৃত' ও 'হরিদাস-ঠাকুর' (১৮৯৬)।[২] মীর মশাররফ হোসেনের (১৮৪৮-১৯১২) তিন পর্ব্ব 'বিষাদ-সিন্ধু' (১২৯১-৯৭) কারবালার করুণ কাহিনী লইয়া লেখা এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।[৩]

কালীপ্রসন্ন ঘোষের (১৮৪৩-১৯১০) 'বান্ধব' পত্রিকা (১২৮১ হইতে) বঙ্গ-দর্শনের সুযোগ্য সহায়ক হইয়াছিল। কালীপ্রসন্ন পদ্যও কিছু কিছু লিখিয়াছিলেন, তবে তাঁহার গদ্য-নিবন্ধগুলি এবং সমালোচনা সমধিক প্রসিদ্ধ। বিদ্যাসাগরী রীতি ইনি উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন বলিয়া "পূর্ব্ববঙ্গের বিদ্যাসাগর" খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন শৈশবে ফারসী পড়া শুরু করিয়াছিলেন গ্রামের মক্তবে তাহার পর টোলে সংস্কৃত শেষে ইস্কুলে ইংরেজি। রচনায় ফারসীর ছাপ নাই, সংস্কৃত ও ইংরেজির

[১] এই প্রসঙ্গে যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের 'বঙ্গের বীরপুত্র' কাব্য (প্রথম খণ্ড ১২৯১) উল্লেখযোগ্য।

[২] 'মেয়েলী ব্রত'ও মূল্যবান্ সংগ্রহ।

[৩] ইঁহার নাটক ও উপন্যাসের উল্লেখ যথাস্থানে দ্রষ্টব্য। অপর গদ্যরচনা—'বিবি খোদেজার বিবাহ', 'হজরত ওমরের ধর্ম্মজীবন লাভ', 'হজরত বেলালের জীবনী', 'মদিনার গৌরব', 'আমার জীবনী' ইত্যাদি। 'বিবি কুলসম' (১৯১০) পত্নীর জীবনী।

আছে। কালীপ্রসন্নের গদ্যরচনা 'নারী-জাতিবিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৬৯), 'প্রভাতচিন্তা' (ঢাকা ১৮৭৭), 'ভ্রান্তিবিনোদ' (১৮৮১), 'নিভৃতচিন্তা' (১৮৮৩), 'নিশীথচিন্তা' (১৮৯৬), 'ভক্তির জয়', 'প্রমোদ-লহরী' (১৮৯৫), 'মা না মহাশক্তি' (১৯০৫), 'জানকীর অগ্নি-পরীক্ষা' (১৯০৫), 'ছায়াদর্শন' (১৯১০) ইত্যাদি।[১]

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের (১২৫৬-১৩২৯) শোকোচ্ছ্বাস-নিবদ্ধ 'উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম' (১৮৭৬) একদা তরুণ পাঠকদের উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছিল। ইঁহার অপর গদ্যগ্রন্থ 'সারস্বতকুঞ্জ' (১২৯৭), 'স্ত্রীচরিত্র' (১২৯৭) এবং 'কুঞ্জলতার মনের কথা'। চন্দ্রশেখর নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শনে পুস্তক-সমালোচনা করিতেন এবং বিবিধ পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেন।

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় (১৮৫১-১৯০৩) বিভিন্ন পত্রিকায় কবিতা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিতেন। এইরূপ কতকগুলি প্রবন্ধ 'সাহিত্যমঙ্গল'এ (১২৯৫) সঙ্কলিত আছে। ইহার অপর গ্রন্থ 'সাতনরী', 'উদ্ভট কাব্য' (১২৯০), 'শারদীয় সাহিত্য' (১৩০৩), 'সহরচিত্র' (১৩০৮), 'সোহাগ চিত্র' (১৩০৮) ইত্যাদি।

সাহিত্যসমালোচনায় এবং বিবিধ আলোচনায় বীরেশ্বর পাঁড়ে খানিকটা স্বাধীনচিন্তার পরিচয় দিয়াছিলেন। ইঁহার রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'মানবতত্ত্ব' (১৮৮৩), 'অদ্ভূত স্বপ্ন বা স্ত্রীপুরুষের দ্বন্দ্ব' (১২৯৫), 'ধর্ম্মবিজ্ঞান' (১২৯৭), 'ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত' (১৮৯৭) ইত্যাদি। শেষের বইটি নবীনচন্দ্রের রৈবতক কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস—এই কাব্যত্রয়ীর সমালোচনা। সাহিত্যালোচনায় পূর্ণচন্দ্র বসুর গ্রন্থাবলী উল্লেখযোগ্য—'কাব্যসুন্দরী' (১৮৮০), 'সাহিত্যচিন্তা' (১৩০৩), 'কাব্যচিন্তা' (১৩০৭), 'সমাজতত্ত্ব' (১৩০৯), 'সমাজচিন্তা', 'দেবসুন্দরী', 'সৃষ্টিবিজ্ঞান', 'ফলশ্রুতি' ইত্যাদি। গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর তিন ভাগ 'বঙ্কিমচন্দ্র'ও (১২৯৩, ১২৯৭, ১৮৯৮) এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

[১] কালীপ্রসন্নর লেখা আধ্যাত্মিক গান 'সঙ্গীতমঞ্জরী'তে (১৮৭২) এবং শিশুপাঠ্য কতকগুলি কবিতা 'কোমল কবিতা' নামে (১৯২৫) সঙ্কলিত হইয়াছিল।

দশম পরিচ্ছেদ

নাটক : ১৮৭২-১৯১২

১

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা জোড়াসাঁকোয় মধুসূদন সান্ন্যালের বাড়ীতে প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় বা পাবলিক থিয়েটার—ন্যাশনাল থিয়েটার—স্থাপিত হইয়া বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যে দ্বিতীয় যুগের আবির্ভাব সূচিত করিল। দীনবন্ধু মিত্রের সরস নাটক-প্রহসনগুলির অভিনয় সাধারণ দর্শকমণ্ডলীকে রঙ্গমঞ্চের প্রতি টানিতে লাগিল। মধুসূদনের ও রামনারায়ণের নাট্যরচনাও অভিনীত হইতে লাগিল। সাধারণ দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য সমাজচিত্র ও সমসাময়িক ঘটনা লইয়া ছোট-বড় নাটক-প্রহসন লেখা হইতে লাগিল।[১]

প্রচলিত নাটকগুলি অভিনীত হইয়া গেলে বঙ্কিমচন্দ্রের ও রমেশচন্দ্রের কোন কোন উপন্যাস নাটকে পরিবর্ত্তিত হইয়া অভিনীত হইতে লাগিল। প্রসিদ্ধ কাব্যগুলিও রেহাই পাইল না। মধুসূদনের তিলোত্তমাসম্ভব ও ও মেঘনাদবধ,[২] হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার এবং নবীনচন্দ্রের পলাশির-যুদ্ধ নাট্যরূপ পাইয়া রঙ্গালয়ে ভিড় জমাইয়াছিল ॥

২

বাঙ্গালায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হইল বটে কিন্তু প্রায় প্রথম হইতেই দলাদলির জন্য দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই, এবং অনেকটা সেই কারণেই রঙ্গমঞ্চের প্রভাব বাঙ্গালা নাটকরচনাকে সুনির্দ্দিষ্ট ও উন্নতির পথে পরিচালিত করিতে পারে নাই। দর্শকদের রুচিই তাই রঙ্গমঞ্চের এবং নাটক রচনার ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল।

[১] আলোচ্য সময়ে এই ধরণের বিশিষ্ট রচনার মধ্যে প্রথম হইতেছে শিশিরকুমার ঘোষের 'নয়শো রূপেয়া' (১২৯৭)। সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বন করিয়া ইনি একটি ছোট প্রহসনও রচনা করিয়াছিলেন, 'বাজারের লড়াই' (১৮৭৪)।

[২] ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত পঞ্চাঙ্ক 'মেঘনাদ-বধ' নাটকের পাদ্রি লালবিহারী দে কর্ত্তৃক সংশোধিত সংস্করণ (পৃ ৯৫, ১৮৭৯) ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরিতে আছে। পরে দ্রষ্টব্য।

ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম পর্ব্ব তিন মাস কাল। এক মাস শেষ হইতে না হইতেই দলে ভাঙ্গন ধরিল, এবং মাস দুই কোন রকমে টানাটানি করিয়া চলিল। তাহার পর ভাঙ্গিয়া পড়িল। দলাদলি খানিকটা টাকাকড়ি হিসাবপত্র লইয়া খানিকটা ঈর্ষ্যার জন্য। একদলের কর্ত্তা হইলেন ম্যানেজার ধর্ম্মদাস সুর।[১] তাঁহার দলে রহিল মতিলাল সুর, মহেন্দ্রলাল বসু, গোপালচন্দ্র দাস, শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি। ইঁহারা দৃশ্যপট ইত্যাদি ষ্টেজ-সরঞ্জাম ও কিছু অর্থ অধিকার করিয়া ন্যাশনাল থিয়েটার চালাইতে লাগিলেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই দলে এখন প্রকাশ্যভাবে যোগ দিলেন। দ্বিতীয় দলের কর্ত্তা হইলেন সেক্রেটারি নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইঁহার দলে রহিল অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী,[২] অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়[৩] ইত্যাদি। ইঁহারা পোষাক-পরিচ্ছদগুলি লইয়া নূতন থিয়েটার খুলিলেন "হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার" নামে। প্রথম দল রাধাকান্ত দেবের ঠাকুরবাড়ীর নাটশালা, মধুসূদন সান্যালের বাড়ী, কলিকাতা অপেরা হাউস ইত্যাদি স্থানে অভিনয় করিতে লাগিলেন। হিন্দু ন্যাশনাল দল ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে লিণ্ডসে ষ্ট্রীটের অপেরা হাউসে কয়েকবার অভিনয় করিয়া ঢাকায় চলিয়া গেলেন। ঢাকার বাঁধা ষ্টেজ পূর্ব্ববঙ্গরঙ্গভূমিতে ইঁহারা দুই মাস ধরিয়া অভিনয় করিয়া যশ ও অর্থ দুইই লাভ করিলেন। ফিরিয়া ইঁহারা চুঁচুড়ায় কয়েকবার অভিনয় করিয়াছিলেন (সেপ্টেম্বর ১৮৭৩)। হিন্দু ন্যাশনালের দেখাদেখি মূল ন্যাশনাল দলও ঢাকায় গিয়াছিল, কিন্তু ভালো ষ্টেজের অভাবে জুত করিতে পারে নাই। কলিকাতায় ফিরিয়া ন্যাশনাল দল এখানে ওখানে অভিনয় করিতে লাগিল। এই অভিনয়ে দ্বিতীয় দলের কেহ কেহ যোগ দিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে হিন্দু ন্যাশনাল নাম পালটাইয়া গ্রেট ন্যাশনাল হইল। গ্রেট ন্যাশনালের অভিনীত প্রথম

[১] ইনি ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে মুখ্য ব্যক্তি। ন্যাশনাল থিয়েটারের ষ্টেজ ইঁহারই গড়া। বাঙ্গালীর প্রথম থিয়েটার-বাড়ী (গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার) ও তাহার ষ্টেজ ধর্ম্মদাসের পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ম্মিত হইয়াছিল। থিয়েটারে যোগ দিবার পূর্ব্বে ইনি স্কুলমাষ্টার ছিলেন।

[২] ইনি ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম এবং প্রধান নাট্যশিক্ষক ছিলেন।

[৩] ইনি কলিকাতা আর্টস্কুলে পড়িয়াছিলেন। দৃশ্যপট ইত্যাদি আঁকায় ইনি ধর্ম্মদাস সুরকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। যখন থিয়েটারে অভিনেত্রী ছিল না তখন ইনিই নারী-ভূমিকায় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ছিলেন।

বই 'কাম্যকানন' (৩১ ডিসেম্বর ১৮৭৩) নিজস্ব গৃহে। ভুবনমোহন নিয়োগী ছিলেন স্বত্বাধিকারী।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে দুই দল জোড়া লাগিল "গ্রেট ন্যাশনাল" নামে। যুক্ত দলের প্রথম অভিনয় হরলাল রায়ের 'হেমলতা' (১৪ এপ্রিল ১৮৭৪)। মাস কতক যাইতে না যাইতে আবার ভাঙ্গন ধরিল। নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকজন অভিনেতা ও অভিনেত্রী লইয়া ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে "গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানি" খুলিলেন এবং চুঁচুড়ায় ও কলিকাতায় ময়দানে লুইস থিয়েটারে 'সতী কি কলঙ্কিনী' 'দুর্গেশনন্দিনী' 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' ইত্যাদি অভিনয় করিলেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা বেঙ্গল থিয়েটারের সঙ্গে মিলিয়া গেল।

ন্যাশনাল ও গ্রেট ন্যাশনাল যখন মফস্বলে অভিনয় করিয়া কোন রকমে অস্তিত্ব বজায় রাখিতেছিল তখন আশুতোষ দেবের ভাগিনেয় শরৎচন্দ্র ঘোষ বিডন ষ্ট্রীটে বেঙ্গল থিয়েটার খুলিলেন। বাঙ্গালা দেশে এই থিয়েটার দলই প্রথম হইতে নিজস্ব ষ্টেজে অভিনয় করিয়াছিল এবং এই দলই প্রথম অভিনেত্রী গ্রহণ করে। প্রথম অভিনেত্রীদের মধ্যে নাম-করা ছিল জগত্তারিণী, গোলাপকামিনী (পরে নাম হয় সুকুমারী দত্ত)[১], এলোকেশী এবং শ্যামা। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট মাইকেলের সন্তানদের সাহায্যার্থে 'শর্ম্মিষ্ঠা' অভিনীত হয়। দেবযানী ও দেবিকা ভূমিকা দুইটিতে দুই অভিনেত্রী নামিয়াছিলেন। অভিনয় খুব জমিয়াছিল এবং পরে একাধিকবার পুনরাবৃত্ত হইয়াছিল। অপর সকল অভিনয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'মোহন্তের এই কি কাজ' (৬ সেপ্টেম্বর), 'দুর্গেশনন্দিনী' (২০ ডিসেম্বর) এবং 'মায়াকানন' (১৮ এপ্রিল ১৮৭৪)। বেঙ্গল থিয়েটারে দীনবন্ধুর নাটক অভিনীত হয় নাই।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে "ওরিয়েন্টাল থিয়েটার" নামে একটি দল রামনারায়ণ তর্করত্নের নাটক এবং মদনমোহন মিত্রের 'মনোরমা' অভিনয় করিয়াছিল। এ থিয়েটার একেবারেই জমে নাই।[২]

[১] উপেন্দ্রনাথ দাসের শরৎ-সরোজিনী নাটকে সুকুমারী ভূমিকা অভিনয়ে অসামান্য দক্ষতার জন্য সুকুমারী নামে পরিচিত হন। উপেন্দ্রনাথের উদ্যোগে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে অভিনেতা গোষ্ঠবিহারী দাসের সহিত সুকুমারীর বিবাহ হইয়াছিল।

[২] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' (দ্বি-স ১৯৩৯) পৃ ১৫৪ দ্রষ্টব্য।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে গ্রেট ন্যাশনালের একটি দল উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অভিনয় দেখাইতে যায়। দিল্লী লাহোর মীরাট লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি শহরে ইঁহাদের বাঙ্গালা নাটক প্রহসন অভিনয় বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করিয়াছিল এবং এইসব অঞ্চলে দেশীয় রঙ্গমঞ্চের ও অভিনয়ের পথ দেখাইয়াছিল।

এই বছরের আগষ্ট মাসে গ্রেট ন্যাশনালের স্বত্বাধিকারী ভুবনমোহন নিয়োগী থিয়েটারটি ইজারা দেন। ইজারাদার কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে থিয়েটারের নাম হইল "ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার"। ম্যানেজার হইলেন মহেন্দ্রলাল বসু। তখন ধর্ম্মদাস সুরের দল খুলিল "নিউ এরিয়ান (লেট ন্যাশনাল) থিয়েটার", এবং বেঙ্গল থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চে উপেন্দ্রনাথ দাসের 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' লইয়া নামিল (১৪ আগষ্ট ১৮৭৫)। এই নাটকের অভিনয় অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল।

নিউ এরিয়ানের দল অচিরে ন্যাশনালে যোগ দিল এবং ন্যাশনাল ঘন ঘন স্বত্বাধিকারী ও ম্যানেজার বদলাইতে লাগিল,—ধর্ম্মদাস সুর, অবিনাশচন্দ্র কর, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেন্দ্রলাল বসু, কেদারনাথ চৌধুরী, অমৃতলাল বসু ইত্যাদি। বাঙ্গালা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের এই অস্থিতাবস্থার অবসান ঘটিল ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে। তখন স্বত্বাধিকারী হইয়াছেন প্রতাপচন্দ্র জহরী [১] এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ পুরোপুরি যোগ দিয়াছেন। এইখানে গিরিশচন্দ্রের প্রথম নাটক 'রাবণবধ'এর অভিনয় হইল।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়,[২] বিনোদিনী[৩] প্রভৃতি কয়েকজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা-অভিনেত্রী ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেট ন্যাশনাল ছাড়িয়া দিয়া গুরমুখ রায়ের[৪] নবগঠিত "ষ্টার থিয়েটার"এ যোগ দিলেন। এখানে গিরিশচন্দ্রের 'দক্ষযজ্ঞ' লইয়া প্রথম অভিনয় হইল। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে গুরমুখ রায়ের মৃত্যু হইলে অমৃতলাল বসু ও অমৃতলাল মিত্র প্রভৃতি কয়েকজন থিয়েটারটি কিনিয়া লইলেন। গিরিশচন্দ্র ইঁহাদের দলে রহিলেন না।

মতিলাল শীলের বংশধর গোপাললালের থিয়েটার করিবার শখ হওয়ায়

[১] ইনি অবাঙ্গালী ছিলেন।

[২] ইনি ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্যোক্তাদের অন্যতম। নারী ও পুরুষ চরিত্রের অভিনয়ে এবং ভাঁড়ামিতে ইঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল।

[৩] ইনি অতিশয় শিল্পদক্ষ ও ভাবুক অভিনেত্রী ছিলেন।

[৪] ইনি ছিলেন পঞ্জাবী।

তিনি অনেক টাকা দিয়া ষ্টার থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চ কিনিয়া লন। এবং নাম দেন "এমারেল্‌ড থিয়েটার"। তখন ষ্টারের দল হাতিবাগানে বর্ত্তমান ষ্টার রঙ্গমঞ্চ তৈয়ারি করিলেন। আদি ন্যাশনাল থিয়েটারের অপর দল—অর্থাৎ অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, মহেন্দ্রলাল বসু, মতিলাল সুর, রাধামাধব কর প্রভৃতি—এমারেল্‌ডে যোগ দেন। এখানে প্রথম অভিনয় হইল কেদারনাথ চৌধুরীর 'পাণ্ডব-নির্ব্বাসন'। এ অভিনয় জমিল না। তখন গিরিশচন্দ্রকে ম্যানেজার করিয়া আনা হইল পাঁচ বছরের মেয়াদে। এমারেল্‌ডে অভিনীত গিরিশচন্দ্রের প্রথম নাটক 'পূর্ণচন্দ্র'। পাঁচ বছর শেষ হইবার আগেই গোপাললাল শীলের থিয়েটারের শখ মিটিয়া গিয়াছিল। মহেন্দ্রলাল বসু ও অতুলকৃষ্ণ মিত্র এমারেল্‌ড থিয়েটার ইজারা লইয়া চালাইতে লাগিলেন। গিরিশচন্দ্র ষ্টারে চলিয়া আসিলেন। এখানে আসিবার পর তাঁহার 'প্রফুল্ল' অভিনীত হইল।

১৮৮০ হইতে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ—অর্থাৎ গিরিশচন্দ্রের জীবনের অবসান পর্য্যন্ত—বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চ গিরিশ-শাসিত ছিল বলা যায়। গিরিশচন্দ্রের যখন মৃত্যু হয় তখন কলিকাতায় পাঁচটি রঙ্গমঞ্চ চলিতেছিল—ষ্টার, বেঙ্গল, বীণা, এমারেল্‌ড ও মিনার্ভা।

গিরিশচন্দ্রের সময়ে বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চে একজন বিশিষ্ট অভিনেতা-ম্যানেজার বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। ইনি অমরনাথ দত্ত। অল্প বয়সেই অমরনাথ থিয়েটারের নেশায় মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইনি এমারেল্‌ড রঙ্গমঞ্চ ভাড়া লইয়া "ক্লাসিক থিয়েটার" খোলেন। সেখানে প্রথমে অভিনীত হয় গিরিশচন্দ্রের 'হারানিধি'। অমরনাথের থিয়েটারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাট্যকর্ম্ম হইতেছে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'আলিবাবা'র অভিনয়। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে অমরনাথ রঙ্গালয় সম্পর্কিত প্রথম বাঙ্গালা সাময়িকপত্র সাপ্তাহিক 'রঙ্গালয়' বাহির করিয়াছিলেন এবং বছর তিনেক (১৩১৬-১৩১৮) 'নাট্যমন্দির' নামে মাসিকপত্রও চালাইয়াছিলেন। অমরনাথের উদ্যোগেই অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বেতন ভদ্র-পরিমাণের হয়।

অভিনেত্রী গ্রহণ করিবার পর হইতেই বাঙ্গালা রঙ্গালয়ের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত হয়। এই কাজে অগ্রণী ছিল বেঙ্গল থিয়েটার। দুই চারিজন ছাড়া সেকালের অভিনেত্রীদের সম্বন্ধে আমাদের কিছুই জানা নাই। বেঙ্গল থিয়েটারে নামজাদা নটীদের মধ্যে ছিলেন এলোকেশী, জগত্তারিণী, শ্যামাসুন্দরী। ন্যাশনাল

থিয়েটারের উল্লেখযোগ্য নটী কাদম্বিনী, যাদুমণি, ক্ষেত্রমণি, লক্ষ্মীমণি এবং বিনোদিনী। ১৭ জুলাই ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান (ও ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া)' হইতে জানা যায় যে তখন সবচেয়ে প্রতিষ্ঠাপন্ন অভিনেত্রী ছিলেন নারায়ণী।[১]

ভারতবর্ষের অন্যস্থানেও বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চে বাঙ্গালী অভিনেতাদের অভিনয় ও ঐক্যবাদন স্থানীয় রঙ্গমঞ্চ স্থাপনে উৎসাহ দিয়াছিল। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে স্থানীয় বাঙ্গালীদের উৎসাহে থিয়েটার পার্টি গঠনের খবর পাইয়াছি। বাঙ্গালা দেশ হইতে দুইজন অভিনেতা গিয়া এই দলে যোগ দেয়॥[২]

৩

সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্ব হইতে কলিকাতায় জাতীয় আন্দোলন হিন্দুমেলাকে আশ্রয় করিয়া শিক্ষিত জনসাধারণের চিত্তকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। অল্পকাল মধ্যে এই "ন্যাশনাল" ঢেউ রঙ্গালয় অবধি পৌঁছাইল। তাহার প্রথম প্রকাশ দেখা গেল কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষুদ্র রূপক-দৃশ্য 'ভারত মাতা'য় (১৮৭৩)। জাতীয় আন্দোলনের মূলে ছিল প্রধানত জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়ী। ইহার মন্ত্র ছিল দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি" এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "মিলে সবে ভারতসন্তান" গান। ভারতমাতার মর্ম্মকথাও এই দুইটি গানের মধ্যে নিহিত। ভারত-মাতায় একটিমাত্র দৃশ্য। প্রথমে একটু প্রস্তাবনার মত—সূত্রধার প্রবেশ করিয়া একটি ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিয়া এই গান ধরিল,

হে ভ্রাতঃ ভারতবাসী দেখনা চাহিয়ে।
পাইতেছ কি যাতনা মোহ-মদে মাতিয়ে॥
রিপুর হইয়ে দাস, করিতেছ সর্ব্বনাশ,
ভুগিছ অশেষ ভোগ, লোভকূপে পড়িয়ে।
হিংসা-রূপ পিশাচিনী, অতিশয় মায়াবিনী,
মজনা মজনা হায় তার প্রেমে ভুলিয়ে॥

[১] "National Theatre (Calcutta). The oldest and most successful actress of the Indian stage—Sreemati Narayani—will take her benefit to-night, when the charming and sublime opera "Model of Chastity" and the pantomimic representation of "Alladin, or the Wonderful Lamp," will be produced. Considering the particular histrionic talent for which this artiste is renowned, it is needless to observe she will be well patronised by the play-goers, which she well deserves." (১৭ই জুলাই ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে পুনর্মুদ্রিত)।

[২] ১ সেপ্টেম্বর ১৮৭৯ তারিখের ষ্টেট্‌স্‌ম্যান (১ সেপ্টেম্বর ১৯৫৪ তারিখে পুনর্মুদ্রিত)।

তাহার পর এই উক্তি করিয়া সূত্রধারের প্রস্থান,

> ভারতভূমির ও ভারত-সন্তানগণের বর্ত্তমান দুরবস্থা প্রদর্শনই "ভারতমাতার" উদ্দেশ্য। যদ্যপি সমাগত সুধীমণ্ডলীর একজনও এই অভিনয় দর্শনে ভারতমাতার দুঃখ দূর কোর্‌তে এক দিনও যত্ন পান, তাহা হলেই আমার ও গ্রন্থকর্ত্তার শ্রম সফল।

রূপকের দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হইল হিমালয় পর্ব্বতে।[১] "চিন্তামগ্না আলুলায়িত-কেশা ভারতমাতা আসীনা। সম্মুখে ভারত-সন্তানগণ নিদ্রিত।" ভারতলক্ষ্মী প্রবেশ করিয়া "মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি" এবং "দেখ গো ভারতমাতা তোমারি সন্তান" গান দুইটি গাহিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিলে ভারত-মাতা চোখ খুলিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন এবং নিদ্রিত সন্তানদের জাগাইতে চেষ্টা করিলেন। "একজন ওঠে আর একজন শোয়, আর একজন ওঠে আর একজন শোয়, এইরূপে একে একে সকলে শয়ন করিল"। তখন ভারতমাতা গান ধরিলেন, "উঠ উঠ যাদুমণি কত কাল ঘুমাবে আর"। তখন অনেকের ঘুম ভাঙ্গিল। একজন বলিল, "মা, ডাক্‌চ কেন মা?" আর একজন বলিল, "বেশ ঘুমচ্ছিলাম, কেন জাগালে মা?" ভারতমাতা বলিলেন,

> তোদের অভাগা জননীর দুরবস্থা একবার দেখ বাবা, অলঙ্কারগুলি দস্যুতে অপহরণ কোরেছে, একটু তেল পাইনে যে চুলে দিই, এই মলিন শতগ্রন্থি বস্ত্র আর কতকাল পোর্‌তে হবে যাদু? বাবা, তোরা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়ে তোদের মার এই দুর্দ্দশা ঘোচা।

এই বলিয়া ভারতমাতা আবার একটি গান ধরিলেন। সে গানের মর্ম্ম —"হিংসা, দ্বেষ, লোভ, মান, অভিমান, স্বাধীনতা-পদে দাও বলিদান, দেখ রে সবারে ভায়ের সমান, অজ্ঞান পিশাচে কর দমন।" ক্ষুধিত ভারতসন্তানগণ মায়ের কাছে খাদ্য চাহিয়া শেষে কিছু না পাইয়া স্তন্যপান চাহিল। ভারতমাতা বলিলেন,

> বাবা, মায়েতে কি দুধ আছে, যে তোদের দেবো, বাছা শরীরে কি রক্ত আছে? সব চুষে খেয়েছে।[২]

সন্তানদিগকে কাজকর্ম্মের চেষ্টা দেখিতে বলিলে তাহারা উত্তর দিল,

[১] পাদটীকায় এই অভিনয়নির্দ্দেশ আছে, "ভারতলক্ষ্মী প্রবেশ করিলে লাল আলো জ্বালাইতে হইবে, ও প্রস্থান করিলে পর এককালীন সমুদয় আলো নিভাইয়া ঘোর অন্ধকার করিবে।"

[২] রবীন্দ্রনাথের 'দেশের উন্নতি' (রচনাকাল ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮) কবিতার ভারতমাতায় এই নাট্য-রচনাটির পরোক্ষ ইঙ্গিত থাকা সম্ভব। উপরের উদ্ধৃতির সঙ্গে কবিতাটির এই ছত্রটি তুলনীয়,

> অন্ধকারে, ঐ রে শোন্ ভারতমাতা করেন 'গ্রোণ',
> এ হেন কালে ভীষ্ম দ্রোণ গেলেন কোনখানে।

১ম। মা, আমাদের চারিদিক্ বন্ধ, কোন্ দিকে যাই মা? আমাদের চাকরীর পথ বন্ধ, ব্যবসার পথ বন্ধ, বাণিজ্যের পথ বন্ধ, মা কি কোরবো মা? কেমন করে খাব মা?

২য়। মা, ইচ্ছে হয় যে মহারাণীর জন্য যুদ্ধ করেও প্রতিপালিত হই, মা, তাও হতে দেয় না মা।

৩য়। মা, আমাদের দেশে এত নুন, আমরা একটু নুন পর্য্যন্ত খেতে পাইনে, দেখ মা, আমাদের দেশের তাঁতগুলি পর্য্যন্তও বন্ধ। কি করি কোথায় যাই মা, কার কাছে গেলে দুটি খেতে পাব মা?

ভারতমাতা তখন মহারানী ভিক্টোরিয়ার কাছে দুঃখ জানাইতে বলিলে ভারতসন্তানগণ বলিল,

মা, এত চেঁচিয়ে ডেকিচি যে, গলা ভেঙ্গে গেছে। মা! তাঁর কোন দোষ নেই, এই অভাগাদের কান্না, সাগর পার হয়ে তাঁর কাছে ত যেতে পারে না।

মায়ের কথায় আরো একবার ডাক পাড়িলে এক সাহেব আসিয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিল,

রে দুরাশয় দুর্ব্বৃত্তগণ, এই জন্যই কি আমরা তোদের জ্ঞান দান কচ্চি। রে নরাধম রাজবিদ্রোহিগণ, মহারাণীকে ডাক্তে তোদের মনে অণুমাত্র ভয় সঞ্চার হলো না? ওঃ এমন জান্লে কে তোদের লেখাপড়া শেখাত?......মহারাণী কাদের? তিনি আমাদের মহারাণী, ইংলণ্ডেশ্বরী তা জানিস্?......তোরা তাঁর কে? কিসে আমাদের উন্নতি হবে, কিসে আমাদের কোষ ধনে পরিপূর্ণ হবে, কিসে আমরা সুখে থাক্বো, মহারাণীর ইহাই ঐকান্তিক ইচ্ছা। নির্ব্বোধগণ, কিছুদিন হলো পার্লিয়ামেণ্ট সভায় ঐ বিষয়ের এক বক্তৃতা হয় তাতে কি মহারাণী তোদের হয়ে একটা কথা বলেছিলেন? সে দিন কেন কোন্ দিনই বা বলে থাকেন, তোদের দুঃখ নিবারণ কোর্তে কবে চেষ্টা করেচেন? তা তোরা যেমন নরাধম, কৃতঘ্ন, তেমনি তোদের উপযুক্ত শিক্ষা দিচ্চি (পদাঘাত)।

পদাঘাত পাইয়া ভারতসন্তানগণ কাঁদিতে লাগিলে ভারতমাতা "কোথায় হরিশ, কোথায় গিরিশ, কোথায় রামমোহন, কোথায় রামগোপাল" বলিয়া মূর্চ্ছা গেলেন। এমন সময় দ্বিতীয় সাহেব প্রবেশ করিয়া প্রথম সাহেবের গলা টিপিয়া ধরিয়া বলিল, "রে দুরাচার দুর্ব্বৃত্ত, ইংরাজ জাতির কলঙ্ক, তুই এখান হতে দূর হ।" এই বলিয়া এক "পদাঘাত ও প্রথম সাহেবের বেগে প্রস্থান।" দ্বিতীয় সাহেব ভারতমাতার নিকটে গিয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিল,

মা কিছু দুঃখ করোনা, তোমাদের দুঃখ-রজনী শীঘ্রই অবসান হবে। তুমি কি ফসেট্, টরেন্স প্রভৃতি মহাত্মাগণের নাম শোনোনি, যাঁহারা অভাগা ভারতসন্তানদের দুঃখ দূর কোর্তে প্রাণপণ যত্ন করে থাকেন। আর এই যে সজ্জনপালক, প্রজারঞ্জক, মহামতী লর্ড নর্থব্রুক গবর্ণর জেনেরেল হোয়েছেন, ইনিই তোমাদের দুঃখ দূর কোর্বেন।

দ্বিতীয় সাহেব প্রস্থান করিলে ধৈর্য্যের প্রবেশ এবং পয়ার-উক্তি। তাহার

সারমর্ম্ম, "ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর সবে"। তাহার পর সাহস আসিয়া আরো কিছু পয়ারে ভরসা দিয়া প্রস্থান করিলে "ঐক্যতার প্রবেশ" ও বক্তৃতা,

> ভ্রাতৃগণ, অনৈক্যতা, আত্মাভিমান ও স্বজাতিহিংসাই, তোমাদের সর্ব্বনাশের মূল। যতদিন তোমাদের অন্তর হতে এ সকল ভাব দূরীভূত না হবে, ততদিন তোমাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। এখন সকলে আমার আশ্রয় গ্রহণ কর ও কায়মনবাক্যে জননীর দুঃখনাশ ব্রতে ব্রতী হও।

> "কেন ডর ভীরু কর সাহস আশ্রয়
> 'যতোধর্ম্ম স্ততো জয়'
> ছিন্ন ভিন্ন হীনবল ঐক্যেতে পাইবে বল
> মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়?"

এই বলিয়া "ঐক্যতা"র প্রস্থান এবং যবনিকা-পতন।

কিরণচন্দ্রের অনুরূপ দ্বিতীয় রচনা হইতেছে 'ভারতে যবন' (১৮৭৪)। ইঁহার নামে একটি ক্ষুদ্র নাট্যনিবন্ধ চলিয়াছিল, 'গোপন চুম্বন' (১৮৭৮)।[১]

হারাণচন্দ্র ঘোষের 'ভারতী দুঃখিনী' (১২৮২) চতুরঙ্ক রূপক-নাট্য। পাত্র-পাত্রীর মধ্যে মুখ্য হইতেছেন মাতা ভারতী এবং তাঁহার কন্যাবর্গ—বঙ্গসুন্দরী, অযোধ্যা, মদ্রবালা, মালবিকা, রাজবারা, জয়াবতী, যোধাবতী এবং উদয়না। নটেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'এই কি সেই ভারত' (১২৮২) নিতান্ত ক্ষুদ্র রচনা। ইঁহার অপর নাট্যরচনা হইতেছে ক্ষুদ্র গীতিনাট্য 'মাল্যপ্রদান' (১৮৭৬)। কুঞ্জবিহারী বসুর 'ভারতে অধীন?' (১২৮১) ভারত-মাতার এবং 'ধর্ম্মক্ষেত্র' (১২৮৩) ভারতে-যবনের অনুকরণ॥

৪

জাতীয় আন্দোলনের প্রভাব সমসাময়িক নাটকের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম দেখা গেল হরলাল রায়ের 'হেমলতা নাটক'এ। হেমলতা (১৮৭৩)[২] রোমান্টিক নাটক এবং কতকটা ইংরেজি আদর্শে পরিকল্পিত। দেশের পরাধীনতার বেদনার স্পষ্ট প্রকাশ আছে। যেমন,

> মা, আমি যেন শুনতে পাচ্ছি ভারতবর্ষ বলছেন শীঘ্র যাও বিলম্ব করিও না। এই

[১] অনেকে এটি গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচনা বলিয়া মনে করেন। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির ক্যাটালগে ইহা কিরণচন্দ্রের রচনা বলিয়া উল্লিখিত আছে।

[২] বঙ্গদর্শনে (মাঘ, ১২৮০) সমালোচিত। বইটির সমাদর হইয়াছিল; "পরিবর্ত্তিত পরিশোধিত" দ্বি-স ১২৮১, তৃ-স ১২৮২।

স্বর্গতুল্য ভারতভূমিকে যবনেরা অধীনতাশৃঙ্খলে বদ্ধ করবে ; তা মনে করাই মৃত্যুর অধিক। ভারতভূমি পরাধীন হবার পূর্ব্বে প্রত্যেক ভারতসন্তান প্রাণত্যাগ করুক।[১]

প্রধান ভূমিকাগুলির পরিকল্পনায় বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য নাই, তবে সত্যসখার উন্মাদ-ভূমিকা এবং লক্ষ্মী ও কমলাদেবী মন্দ হয় নাই। রচনারীতিতে কিছু নৈপুণ্যের পরিচয় আছে। হরলালের দ্বিতীয় নাট্যরচনা 'শত্রু-সংহার নাটক'এর (১৮৭৪)। আখ্যানবস্তু ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার হইতে গৃহীত। 'বঙ্গের সুখাবসান'এ (১৮৭৪) বখ্‌তিয়ার খিল্‌জি কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে গান আছে একটিমাত্র, তাহাও শুধু কৌতুকরসের জন্য। 'রুদ্রপাল নাটক'এর মূল (১৮৭৪) শেক্‌স্পিয়রের 'ম্যাক্‌বেথ'। পঞ্চম নাটক 'কনকপদ্ম' (১৮৭৫) অভিজ্ঞান-শকুন্তল অবলম্বনে লেখা। হরলালের সব নাটকই বহুবার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল॥[২]

৫

মদনমোহন মিত্রের ষড়ঙ্ক 'মনোরমা নাটক'এ (১৮৭২) বাস্তব গার্হস্থ্যচিত্রের পরিবেশে মদ্যপায়িতার ও ব্যভিচারের শোচনীয় পরিণাম প্রদর্শিত হইয়াছে। নাটকীয় ঘটনার পরিণতি উমেশচন্দ্র মিত্রের বিধবাবিবাহ নাটকের মত। সধবার-একাদশীর প্রভাব ক্ষীণ হইলেও দুর্লক্ষ্য নয়। রচনারীতি সরল ও সরস। কিছু কিছু ছড়া ও পদ্য আছে।[৩] মধ্যে মধ্যে গ্রাম্যতার স্পর্শ আছে। কয়েকটি গান আছে।

'বৃহন্নলা নাটক' (১৮৭৪) পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক। 'বিচিত্রমিলন নাটক' (১৮৭৫) সপ্তাঙ্ক রোমান্টিক নাটক।[৪] ভাষা ও ভাব লঘু। 'শরদ প্রতিমা' (১৮৭৮) সম্পূর্ণাঙ্গ নাটক নয়, দেবীমাহাত্ম্যখ্যাপক পাঁচটি দৃশ্যের সমষ্টি।

[১] চতুর্থ অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক, সত্যসখার উক্তি।

[২] হরলাল একটি উপন্যাস লিখিয়াছেন 'সঙ্গিনী' নামে। অষ্টম সংস্করণ (১২৯৮) স্বর্ণলতার শেষে হেমলতার সঙ্গে সঙ্গিনীর বিজ্ঞাপন আছে।

[৩] পদ্যে মাঝে মাঝে ভালো ছত্র আছে। যেমন,

স্বপনের আশা বোন্ স্বপনে ফুরায়,
ফুরাবে আমার দিন আশার আশায়।

[৪] মদনমোহন মিত্রের অপর রচনার মধ্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস 'সমরশায়িনী' এবং পদ্যের বই 'কবিতাকদম্ব' (১৮৭০), 'পদ্যসোপান' (১৮৭০), ও 'জীবনময় কাব্য' (ঢাকা ১২৯৬)।

শেষে আছে "ক্রমশঃ প্রকাশ্য"। বর্ণাশুদ্ধির বাহুল্য এবং রচনারীতির জটিলতা হইতে মনে হয় যে শরদ-প্রতিমা সম্ভবত অপর কোন ব্যক্তির রচনা॥

৬

বাঙ্গালা নাটকের দ্বিতীয় পর্ব্বের প্রথম দিকে রোমান্টিক নাটকেরই একাধিপত্য ছিল। এগুলির আখ্যানবস্তু যতটা না হউক অন্তত পাত্র-পাত্রীর নাম সাধারণত ইতিহাস বা প্রচলিত ইতিবৃত্ত হইতে গৃহীত বলিয়া প্রায়ই "ঐতিহাসিক নাটক" মার্কা থাকিত। এগুলিকে ঐতিহাসিক নাটক বলা চলে না তবে কোন-কোনটিতে ইতিহাস-কাহিনীর মোটামুটি অনুসরণ ছিল। সেগুলিকে ইতি-হাসাশ্রিত রোমান্টিক নাটক বলা যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ব্বে এবং মধুসূদনের পরে লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী এই ধরণের নাটক লিখিয়া কিছু নাম করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মীনারায়ণের দুইখানি নাটক বিষাদান্ত, 'নন্দবংশোচ্ছেদ' (১৮৭৩)[১] ও 'নবাব সেরাজুদ্দৌলা' (১৮৭৬)।[২] পঞ্চাঙ্ক নন্দবংশোচ্ছেদে শেক্স্পিয়রের হ্যামলেটের ছায়া পড়িয়াছে। কোন লম্পট জমিদারের অনুচর এক কুলীন-কন্যাকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়া হাওড়ার পুলিস কোর্টে ফেসাদে পড়িয়াছিল—ইহা লক্ষ্মীনারায়ণের দ্বিতীয় নাটক 'কুলীন কন্যা অথবা কমলিনী'র (১৮৭৪) কাহিনী। এই ঘটনা লইয়া এক অজ্ঞাতনামা লেখক 'নাপিতেশ্বর নাটক' (১২৮০) রচনা করিয়াছিলেন।[৩] 'আনন্দকানন' (১৮৭৪) ক্ষুদ্রকায় এবং পদ্যে রচিত।[৪] চারিখানি নাটকই গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণ দুইখানি উপন্যাসও লিখিয়াছিলেন, 'শক-দুহিতা' (১৩০৬) এবং 'নরবলি' (১৩০৯)। পার্নেলের 'হার্মিট্' কাব্যের অনুবাদের কথা আগে বলিয়াছি॥

৭

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঞ্চম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (১৮৪৮-১৯২৫) বহুমুখী শিল্প-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। নাট্যরচনায় নাট্যাভিনয়ে সঙ্গীতে চিত্র-কলায় এবং সচেষ্ট দেশহিতৈষিতায় তিনি সেই অসামান্য দিনেও অসামান্যতা দেখাইয়াছিলেন। বাঙ্গালাদেশে এবং ভারতবর্ষে আধুনিক সংস্কৃতির ইতিহাসে

[১] বঙ্গদর্শনে ১২৮০ শ্রাবণ সংখ্যা সমালোচিত। [২] আর্য্যদর্শনে (আশ্বিন ১২৮৩) সমালোচিত।
[৩] বঙ্গদর্শনে (ভাদ্র ১২৮১) সমালোচিত। [৪] গ্রেট ন্যাশনালে অভিনীত (নভেম্বর ১৮৭৪)।

জোড়াসাঁকো ঠাকুর-পরিবারের প্রযত্ন অগ্রগণ্য। তাহার মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অংশ নগণ্য নয়। বিশেষভাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আনুকূল্যই রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বাতিশায়ী প্রতিভাকে সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশের সুযোগ দিয়াছিল, সেকথা স্মরণীয়।

পাথুরিয়াঘাটা-ঠাকুরবাড়ীর মত জোড়াসাঁকো-ঠাকুরপরিবারও যে বাঙ্গালা নাটকরচনার ও নাট্যাভিনয়ের যথেষ্ট পোষকতা করিয়াছিলেন সেকথা প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছি। এই পোষকতায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাত যথেষ্ট ছিল। জোড়াসাঁকো থিয়েটারে নবনাটকের নটীর ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম সম্পর্ক। কিছুকাল পরে তিনি নিজেই নাট্যরচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রাচীনতার পক্ষপাতী আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে পৃথক হইয়া নব্যতাপন্থী কেশবচন্দ্র সেন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন। স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রভৃতি কোন কোন বিষয়ে এই নূতন ব্রাহ্মসমাজে কিছু আতিশয্য দেখা দিয়াছিল। খ্রীষ্টান উপাসনারীতির অনুকরণও এই সমাজের এক নূতনত্ব হইল। এই সব উৎকটতার দিকে কটাক্ষ করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম নাট্যরচনা একাঙ্ক প্রহসন 'কিঞ্চিৎ জলযোগ!' (১৮৭২) লেখা হইল। স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মত পরে বদলাইয়াছিল বলিয়া প্রহসনখানি পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। কিঞ্চিৎ-জলযোগে কেশবচন্দ্রের প্রতি কটাক্ষ আছে কিন্তু তাহাতে ব্যক্তিগত বিদ্বেষের জ্বালা নাই। ভূমিকায় চারিত্রিক অসঙ্গতি অপেক্ষা ঘটনাসংস্থানের বৈচিত্র্যই কৌতুকরস সৃষ্টি করিয়াছে। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এবং জোড়াসাঁকো থিয়েটারে প্রহসনটি একাধিকবার অভিনীত হইয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অপর নাটকগুলির অভিনয়ও সাধারণ রঙ্গমঞ্চে ভিড় জমাইত।

কিঞ্চিৎ-জলযোগের কিছু পরিচয় দিই।

নব্য-ব্রাহ্ম বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষ স্ত্রীর কাছে ঈশ্বর-সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তিনি আর মদ্যপান করিবেন না। সে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া মাতাল হইয়া গৃহে ফিরিলে পত্নী বিধুমুখী তাঁহাকে মৃদু ভর্ৎসনা করিলেন, "আবার ফের মাতাল হয়েছ?"

> পূর্ণ। হাঁা ডিয়ার মদ খেলে কি কখন পাপ হয়, স্যান্‌জার কাছে এতদিন লেকচার শুনে কি শেষে এই বিদ্যে হল?

বিধুমুখী। কি? পাপের উপর পাপ? একটা পাপ করে কোথায় অনুতাপ করবে, না ফের পাপ! আমাদের পরমগুরু, পরমপূজনীয়, শ্রদ্ধাষ্পদ, ভক্তিভাজন, পাপীর গতি শ্রীপতিতপাবন সেন মহাশয়কে কি না তুমি স্যান্‌ডা বল্লে?

পূর্ণ। স্যান্‌ডা বললুম এতেও দোষ হল? এই নাও ঘাট হয়েছে, আর আমি কথা কব না। (পার্শ্ব পরিবর্তন।)

বিধুমুখী। আমার কাছে ঘাট মান্‌লে কি হবে?

পূর্ণ। ঘাট তবে আর কার কাছে মান্‌বো! তুমিই তো আমার সর্ব্বস্ব ধন, তুমি যা বল, আমি তাই শুনি। বল্লে, সাঁইজির গির্জেয় যাব, ভাল তাই যাও! বল্লে, রব্‌সেনের ওখানে চা খাব, ভাল তাই খাও, বল্লে, মেয়েমানুষের স্বাধীনতা আছে, আমি যেখানে খুসি উড়বো—ভাল তাই ওড় গিয়ে! আমি কোন্ কথাটা শুনিনি বল দেখি ডিয়ার? (বিধুমুখীর পদ ধরিয়া ক্রন্দন।)

বিধুমুখী। ওকি ওকি! ছি ছি ছি! আমার পায়ে পড়লে কি হবে? একবার অনুতাপ কর, তা হলেও পাপ ক্ষয় হবে।

কিঞ্চিৎ-জলযোগের পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'পুরুবিক্রম নাটক' (১৮৭৪, দ্বি-স ১৮৭৯)[১] রচনা করিলেন। জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়ীর উদ্যোগে হিন্দুমেলার মধ্য দিয়া যে দেশপ্রিয়তার উচ্ছ্বাস উঠিয়াছিল, সাহিত্যে তাহার মুখ্য অভিব্যক্তি হইল পুরুবিক্রমে। এই পঞ্চাঙ্ক নাটকখানির রচনার মধ্যে বাঙ্গালাদেশের সমসাময়িক ইতিহাসের একটুখানি হৃদয়োচ্ছ্বাস শুদ্ধ হইয়া আছে।

সেকন্দর শা পাঞ্জাব আক্রমণ করিলে রাজা পুরু এবং কুলু-পর্ব্বতের স্বাধীন অবিবাহিত রানী ঐলবিলা তাহাকে বাধা দিবার জন্য স্থানীয় নৃপতিগণকে উত্তেজিত করিতেছে। রাজা তক্ষশীল পড়িয়াছে উভয়সঙ্কটে। তাহার ভগিনী অম্বালিকা সেকন্দরের হাতে কিছুকাল বন্দিনী ছিল, সেই হইতে সে বিজেতার প্রতি প্রণয়শীল। অম্বালিকা ভাইকে সেকন্দরের সহিত যোগ দিবার জন্য নির্ব্বন্ধ করিতেছে। তক্ষশীল ঐলবিলার প্রণয়াভিলাষী। ঐলবিলা পুরুকে ভালোবাসে, কিন্তু সে তাহার মনোভাব বাহিরে প্রকাশ করিয়া পাণিপ্রার্থীদের নিরাশ করিতে চাহে না, কেননা তাহা হইলে তাহারা দেশরক্ষায় পুরুর সহিত সহযোগিতা করিবে না। সেকন্দর সন্ধিপ্রার্থী হইয়া দূত পাঠাইলে পুরু প্রত্যাখ্যান করিল। তক্ষশীল উদাসীন রহিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে সেকন্দর গোপনে শত্রুশিবির আক্রমণ করিল। কাপুরুষোচিত অতর্কিত আক্রমণে পড়িয়া পুরুর সৈন্য পর্য্যুদস্ত হইল। পুরু তখন সেকন্দরকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান

[১] গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গিত।

করিল। দ্বন্দ্বযুদ্ধে সেকন্দর পরাস্ত হয় হয় এমন সময় তাহার এক সৈনিক পুরুকে আহত করিল। অপর কতিপয় সৈনিক বীরত্বসহকারে যুদ্ধ করিয়া মৃতকল্প পুরুকে শিবিরে ফিরাইয়া আনিল। এদিকে তক্ষশীলের হাতে বন্দিনী ঐলবিলা উদাসিনী পারিকার হাতে চিঠি দিয়া পুরুর নিকট সংবাদ পাঠাইল। অম্বালিকা আসিয়া তাহাকে ভ্রাতা তক্ষশীলের প্রতি অনুকূল করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কথায় কথায় ঐলবিলা অম্বালিকার মনে নিদারুণ আঘাত দিয়া ফেলিল, "লজ্জাহীন না হলে, কি কোন হিন্দু মহিলা যবনের প্রেম আকাঙ্ক্ষা করে?" নিদারুণ ক্রুদ্ধ হইয়া অম্বালিকা ঐলবিলার সর্ব্বনাশ করিতে কৃতসংকল্প হইল। ঐলবিলা যেন তক্ষশীলের প্রতি প্রেম নিবেদন করিতেছেন এইভাবে এক জাল চিঠি তৈয়ার করিয়া অম্বালিকা দূত দিয়া পুরুর হাতে পৌঁছাইয়া দিল। পুরু সেই পত্র আসল মনে করিয়া ঐলবিলার প্রতি বিরূপ হইল। তক্ষশীল মৃতকল্প পুরুকে দেখিতে গিয়া তাহার অতর্কিত আক্রমণে নিহত হইল। পুরুও গ্রীক সৈন্যের হাতে বন্দী হইল। সেকন্দর ঐলবিলাকে ভয় দেখাইল যে পুরুর ভবিষ্যৎ সে তক্ষশীলের হাতে ছাড়িয়া দিবে। তখন খবর আসিল তক্ষশীল নিহত। সেকন্দর পুরুকে স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করিল। তাহার পর যখন সেকন্দর পূর্ব্বদিকে যুদ্ধযাত্রায় যাইবে তখন অম্বালিকা সঙ্গে যাইতে চাহিল। কিন্তু সেকন্দর রাজি হইল না। অম্বালিকার সকল আশা ফুরাইল। অবশেষে সে স্বীয় দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্ত করিল পুরু-ঐলবিলার মিলন ঘটাইয়া দিয়া।

পুরুবিক্রমের কেন্দ্রীয় ভূমিকা অম্বালিকার। এই চরিত্রটিই সম্পূর্ণভাবে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে। বিদেশী বিধর্ম্মী "অধ্বগে বদ্ধরাগা" এই তরুণীর ট্রাজেডি নাটকের উপসংহারকে অশ্রুভারাক্রান্ত করিয়াছে। তাহার হৃদয়ের অবলম্বন ছিল দুইটি—তক্ষশীল এবং সেকন্দর, ভাই ও প্রণয়ী। একজন মরিয়া গেল, অপরজন তাহাকে ছাড়িয়া গেল। তাহার উপর ব্যর্থ দেশদ্রোহিতা ও হীনতা তাহাকে পদে পদে লাঞ্ছিত করিতে লাগিল। অম্বালিকার পরেই তক্ষশীলের ও সেকন্দরের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। পুরুর ভূমিকা পরিস্ফুট হয় নাই। ঐলবিলার ভূমিকা প্রথম অংশে স্পষ্ট দ্বিতীয় অংশে অপরিণত। এই ভূমিকায় গ্রীক নাটকের ছায়াপাত হইয়াছে।

পুরুবিক্রমের সমালোচনায়[১] বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "গ্রন্থখানি বীররস-

[১] বঙ্গদর্শন ভাদ্র ১২৮২।

প্রধান এবং গ্রন্থে বীরোচিত বাক্যবিন্যাস বিস্তর আছে বটে, কিন্তু সকল স্থানেই যেন বীররসের খতিয়ান বলিয়া বোধ হয়।" একথা ঠিক। পুরুবিক্রমের বীররস অবাস্তব, যুদ্ধের ও দ্বন্দ্বযুদ্ধের বর্ণনা থিয়েটারি ধরণের। কিন্তু সমগ্রভাবে দেখিলে পুরুবিক্রমে যে অকৃত্রিম দেশানুরাগ-রস উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। লেখকের মধ্যম অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ রচিত "মিলে সবে ভারত-সন্তান" গানটিতে নাটকের মর্ম্মকথাটি ধ্বনিত হইয়াছে। নাটকে অপর যে দুইটি স্বদেশ-সঙ্গীত আছে সেগুলিও সেকালে খুব চলিত হইয়াছিল।

পুরুবিক্রমের অল্পকাল পরেই ষড়ঙ্ক 'সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক' (১৮৭৫, চ-স ১২৯০)[১] লেখা হইল। ইহাও দেশানুরাগাত্মক নাটক, তবে এখানে প্রধান রস বীর নয়, করুণ। পুরুবিক্রমে দেশরক্ষায় যোদ্ধৃত্বের দিকটা বড় করিয়া দেখানো হইয়াছে, সরোজিনীতে সংহতির ও বিচক্ষণতার মূল্যের উপর জোর পড়িয়াছে। আলাউদ্দীনের দ্বিতীয়বার চিতোর আক্রমণ ঘটনার উদ্যোগপর্ব্ব এই নাটকটির বিষয়। রাজপুত সর্দ্দারদের সংহতি আলাউদ্দীনের প্রথম চিতোর-অভিযান ব্যর্থ করিয়া দেয়। তখন আলাউদ্দীন বাহুবলের একান্ত ভরসা ছাড়িয়া দিয়া কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহার এক অনুচর মহম্মদ আলি ব্রাহ্মণযুবকের ছদ্মবেশে "ভৈরবাচার্য্য" নাম ধরিয়া মেওয়ারের কুলদেবী চতুর্ভুজার পুরোহিতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এবং কালক্রমে পৌরোহিত্যের ভার পায়। মেওয়ারের রাজা লক্ষ্মণসিংহের দুই প্রধান সর্দ্দার, বাদলাধিপতি বিজয়সিংহ এবং গারাধিপতি রণধীরসিংহ। লক্ষ্মণসিংহের একমাত্র দুহিতা রূপবতী সরোজিনীর সঙ্গে বিজয়সিংহের বিবাহ স্থির ছিল। রণধীরসিংহ ছিল লক্ষ্মণসিংহের সেনাপতি। সরোজিনীকে উপলক্ষ্য করিয়া যাহাতে মেওয়ারের সর্দ্দারদের মধ্যে বিরোধ বাধিয়া উঠে এবং আলাউদ্দীন তাহাদিগকে অনায়াসে পরাজিত করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে ভৈরবাচার্য্য অমাবস্যার নিশীথে দেবগ্রামস্থিত দেবী-মন্দিরের নিকটে শ্মশানে লক্ষ্মণসিংহকে দেবমূর্ত্তি দেখাইয়া দৈববাণী শুনাইয়া দেয় যে দেবী ক্ষুধিত রহিয়াছেন, রাজকুমারীকে বলিরূপে না পাইলে তৃপ্ত হইবেন না। লক্ষ্মণসিংহ দ্বিধায় পড়িয়া গেলেন, একদিকে কন্যাস্নেহ অপর দিকে রাজকর্ত্তব্য এবং দেশপ্রেম। রণধীরসিংহকে রাজা সকল কথা বলিলেন এবং উভয়ে আবার

[১] "উদাসিনী-প্রণেতা সুহৃদ্বরের হস্তে" অর্থাৎ অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীকে উৎসর্গিত।

সেই দেবমূর্ত্তি দেখিলেন আর দৈববাণী শুনিলেন। রণধীরের উপদেশে রাজা তাঁহার রাজকর্ত্তব্য পালনেই কৃতসঙ্কল্প হইলেন। চিতোরে পত্র গেল, দেবগ্রামে সরোজিনীর বিবাহ হইবে সুতরাং রানী যেন সরোজিনীকে লইয়া অবিলম্বে চলিয়া আসেন। তাহার পর রাজা তাঁহার বিশ্বস্ত পৈতৃক অনুচর রামদাসকে সকল কথা বলিলেন। রামদাস তাঁহাকে পিতৃকর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিলে রাজা দোলাচলচিত্তবৃত্তি হইয়া রামদাসের পরামর্শে রানীকে পুনরায় পত্র দিলেন, বিবাহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে সুতরাং দেবগ্রামে আসিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই চিঠি পাইবার পূর্ব্বেই তাঁহারা দেবগ্রামে আসিয়া পড়িলেন। রণধীরের যুক্তিতে রাজার মন আবার উল্টা দিকে ঝুঁকিল। তিনি গোপনে সরোজিনীকে বলি দিতে সম্মত হইলেন। ইতিমধ্যে লক্ষ্মণসিংহের দ্বিতীয় পত্র রানীর হস্তগত হইয়াছে। বিজয়সিংহকে বিবাহে বীতরাগ ভাবিয়া রানী সরোজিনীকে লইয়া চিতোর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু পথে বিজয়সিংহের সহিত দেখা হওয়ায় বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করা স্থির হইল এবং তাঁহারা দেবগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। রানী জানিলেন বিবাহ হইবে কিন্তু তাঁহাকে বিবাহ স্থলে থাকিতে দেওয়া হইবে না। ওদিকে গোপনে বলির আয়োজন চলিয়াছে। এমন সময় রামদাস আসিয়া সকল কথা ফাঁস করিয়া দিল। বিজয়সিংহ ক্রুদ্ধ হইল। রাজা স্নেহের মর্য্যাদা রাখিয়া মাতা-পুত্রীকে পলাইবার সুযোগ দিলেন এবং বিজয়সিংহের প্রতি ক্রোধবশত কন্যাকে বলিলেন, "তুমি যদি আমার কন্যা হও, তা'হলে বিজয়সিংহকে জন্মের মত বিস্মৃত হও।" বিজরসিংহ রোষেনারা নামে এক মুসলমান যুবতী ও তাহার সখীকে বন্দী করিয়া দেবগ্রামে রাখিয়াছিল। রোষেনারা বিজয়সিংহের প্রতি প্রেমাসক্ত এবং তাই সরোজিনীর প্রতি তাহার প্রবল বিদ্বেষ। রানীর ও সরোজিনীর পলায়ন-সংবাদ রোষেনারা রণধীরসিংহকে বলিয়া দিল। বিজয়সিংহের বাধাদানসত্ত্বেও সরোজিনী ধরা পড়িয়া মন্দিরের আনীত হইল। শেষমুহূর্ত্তে রাজার মন টলিয়া গেল। তখন রণধীর তাঁহার চোখ বাঁধিয়া দিল। ভৈরবাচার্য্য সরোজিনীকে কাটিবার জন্য খড়্গ উঠাইয়াছে এমন সময় দলবল লইয়া বিজয়সিংহ আসিয়া খড়্গ কাড়িয়া লইল। প্রাণভয়ে ভৈরবাচার্য্য তখন গণনায় ভুল স্বীকার করিয়া বলিল যে দৈববাণীর উদ্দিষ্ট নারী রাজকুমারীই নহেন, রাজ্যের অধিবাসিনী যে কোন সুন্দরী তরুণীকে বলি দিলে চলিবে। তখন তাড়াতাড়ি খুঁজিয়া একজনকে ধরিয়া আনা হইল।

ভৈরবাচার্য্য স্বহস্তে তাহার বক্ষে ছুরি বসাইয়া দিল। তাহার পর জানা গেল যে সে সেই মুসলমানযুবতী বন্দিনী রোষেনারা এবং ভৈরবাচার্য্যের নিরুদ্দিষ্ট কন্যা। এদিকে খবর আসিল আলাউদ্দীন চিতোর আক্রমণ করিয়াছে। সকলে চিতোরের দিকে ধাবিত হইল। কিন্তু প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়াও চিতোর রক্ষা করা গেল না। লক্ষ্মণসিংহ তাঁহার দ্বাদশ পুত্র ও বিজয়সিংহ প্রভৃতি যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। সরোজিনী ও রাজপুরনারীরা অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন।

সরোজিনী নাটকের আখ্যানে প্রাচীন গ্রীক-নাট্যকার এউরিপিদেসের 'ইফিগেনেইয়া হে এন্ আউলিদি' নাটকের প্রবল ছায়াপাত হইয়াছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মূল গ্রীক পড়েন নাই, সম্ভবত রেনাঁ-র ফরাসী অনুবাদই ইঁহার উপজীব্য ছিল। লক্ষ্মণসিংহের এবং সরোজিনীর ভূমিকায় মধুস্দনের কৃষ্ণকুমারী-নাটকের প্রভাব দেখা যায়। তথাপি প্লটের গঠনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কৃতিত্ব স্বীকার্য্য। প্রধান ভূমিকা হইতেছে লক্ষ্মণসিংহের। একদিকে পিতৃস্নেহ অপর-দিকে রাজকৃত্য এই দুই বিরুদ্ধ কর্ত্তব্যের দোটানায় পড়িয়া রাজার চিত্তবৃত্তির প্রকাশ ভালোই হইয়াছে। অপর ভূমিকাও মোটের উপর সুচিত্রিত। রোষেনারা-ভূমিকায় পুরুবিক্রমের অম্বালিকার সাদৃশ্য কিছু আছে। ফতেউল্লার ভূমিকা নিছক কৌতুকরসের জন্য পরিকল্পিত।

"জ্বল্ জ্বল্ চিতা, দ্বিগুণ, দ্বিগুণ" ইত্যাদি কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের রচনা।[১] রামদাসের মুখে ভরতবাক্যের মত যে কবিতাটি দেওয়া হইয়াছে তাহা লেখকের অন্তরঙ্গ বন্ধু কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর রচনা বলিয়া অনুমান করি।

শহরে-মফস্বলে রঙ্গমঞ্চে এবং যাত্রার আসরে অভিনীত হইয়া সরোজিনী নাটক একদা দেশকে মাতাইয়াছিল। আর কোন বাঙ্গালা নাটক এমন সমাদর লাভ করে নাই।

সরোজিনী নাটকের পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দ্বিতীয় প্রহসন লেখা হয়। প্রথমে নাম ছিল 'এমন কর্ম্ম আর করবো না' (১৮৭৭), পরে হয় 'অলীকবাবু' (১৯০০)। প্রহসনটি ঘরে-বাহিরে অভিনয়ে সমাদৃত হইয়াছিল। বাড়িতে অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। নায়ক অলীকপ্রকাশ মিথ্যাভাষণকে আর্টরূপে অনুশীলন করিয়াছেন, মিথ্যার উপর মিথ্যা গাঁথিয়া

[১] বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' দ্রষ্টব্য।

প্রাসাদ বানাইতে তাঁহার সঙ্কোচ ও লজ্জা নাই, আর নায়িকা হেমাঙ্গিনী বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পড়িয়া মনে মনে আপনাকে উপন্যাসের নায়িকা গড়িয়াছেন। বিশুদ্ধ কৌতুকরসবহ এই প্রহসনটিতে কোন ব্যক্তির বা কোন সমাজের বিরুদ্ধে বিরাগ বা বিদ্বেষের কটাক্ষ নাই। বিরল আয়োজনে স্বল্প কথায় কৌতুকরস ঘনীভূত হইয়াছে। ইহাতে বঙ্কিমের বর্ণনারীতির ও গোপাল উড়ের গানের প্যারডি আছে। এইপ্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ক্ষুদ্র রসরচনা "রামিয়াড"-এর[১] নাম করা যায়।

অতঃপর ইংরেজি হইতে অনূদিত 'রজতগিরি' ভারতীতে (কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ ১২৮৫)[২] "ব্রহ্মদেশীয় নাটক ও নাটকাভিনয়" শীর্ষকে বাহির হইল। দুইটি ছোট অংশ ছাড়া আগাগোড়া অমিত্রাক্ষর পয়ার।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তৃতীয় মৌলিক নাট্যরচনা 'অশ্রুমতী নাটক' (১৮৭৯, তৃ-স ১৮৮৭)[৩] পঞ্চাঙ্ক। পুরুবিক্রমে দেশপ্রেমের উদ্দীপনা, সরোজিনীতে দেশপ্রেমের সহিত বাৎসল্যের দ্বন্দ্ব, অশ্রুমতীতে দেশপ্রেমের পটভূমিকায় পিতৃপরায়ণতার সহিত প্রেমের বিরোধ অভিব্যক্ত হইয়াছে। চিতোরের রাণা প্রতাপসিংহ কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া মানসিংহ তাঁহার কন্যা অশ্রুমতীকে অপহরণ করাইয়া মুসলমান সেনানায়ক ফরিদ খাঁর সহিত বিবাহ দিয়া প্রতিশোধ লইতে চেষ্টিত হয়। শাহজাদা সেলিম অশ্রুমতীকে ফরিদ খাঁর কবল হইতে উদ্ধার করিয়া নিজের কাছে রাখে এবং উভয়ে প্রণয়াসক্ত হয়। এদিকে প্রতাপের ভাই শক্তসিংহ সেলিমের কবল হইতে অশ্রুমতীকে উদ্ধার করিবার জন্য বিকানীরের বন্দী রাজকুমার পৃথ্বীরাজের সহিত মন্ত্রণা করে। স্থির হয় যে পৃথ্বীরাজ অশ্রুমতীকে বিবাহ করিবে। কিন্তু অশ্রুমতী স্বীকৃত হইল না। সেলিমের প্রতি তাহার মনোভাব প্রকাশ হইয়া পড়িল। কতকটা মানসিংহের মন্ত্রণায় এবং কতকটা স্বেচ্ছায় ফরিদ খাঁ সেলিমের মন ভাঙ্গাইতে চেষ্টা করিল। সেলিম অবিলম্বে অশ্রুমতীকে বিবাহ করিতে চাহিলে শক্তসিংহের অনুরোধে অশ্রুমতী সাতদিনের সময় লইল, তাহাতে সেলিমের সন্দেহ বাড়িল। এদিকে ব্যাকুল কন্যাকে পিতার সংবাদ দিবার জন্য রাত্রিতে গোপনে

[১] প্রবন্ধমালায় সঙ্কলিত। ১২৮৪ সালের ভাদ্র সংখ্যা ভারতীতে "গঞ্জিকা অথবা তুরিতানন্দ বাবাজির আক্ড়া" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

[২] পুস্তকাকারে ১৩১০।

[৩] বিলাতপ্রবাসী রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গিত।

পৃথ্বীরাজ অশ্রুমতীর গৃহদ্বারে আসিয়াছে। ফরিদ খাঁর চক্রান্তে এই খবর পূর্ব্বেই সেলিমের কানে গিয়াছিল। সেলিম আসিয়া পৃথ্বীরাজকে আক্রমণ করিল। দুইজনে অসিযুদ্ধ হইতেছে এমন সময় ফরিদ খাঁ পিছন হইতে পৃথ্বীরাজকে অস্ত্রাঘাতে নিহত করিল। সেলিম উন্মত্ত হইয়া অশ্রুমতীর বক্ষে ছুরি বসাইতে গেল, কিন্তু আমূলবিদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই তাহা তাহার হাত হইতে খসিয়া পড়িল। অশ্রুমতী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। সেলিম মনে করিল যে সে মরিয়া গিয়াছে। এমন সময় শক্তসিংহ আসিয়া সেলিমের নিকট মানসিংহ-ফরিদ খাঁর ষড়যন্ত্র ফাঁস করিয়া দিল। শক্তসিংহ অশ্রুমতীর মৃতকল্প দেহ তুলিয়া লইয়া আরাবল্লী পর্ব্বতে চলিয়া গেল। সেখানে পুরাতন বন্ধু ভীল-সর্দ্দারের শুশ্রূষায় অশ্রুমতী সুস্থ হইয়া উঠিলে তাহাকে উদয়পুরে পেষলা নদীর তীরে কুটীরে মুমূর্ষু প্রতাপসিংহের শয্যাপার্শ্বে আনা হইল। মুসলমানের, বিশেষ করিয়া তাঁহার চিরশত্রু আকবরের পুত্র সেলিমের আশ্রয়ে অশ্রুমতী ছিল জানিয়া কুলকলঙ্কিনী জ্ঞান করিয়া প্রতাপ তাহাকে তখনি বিষপানে দেহত্যাগ করিতে বলিল। অশ্রুমতী বিষ খাইবে এমন সময় শক্তসিংহ আসিয়া বিষপাত্র কাড়িয়া লইল এবং সকল ব্যাপার ব্যক্ত করিল। অশ্রুমতীর দেহ অপবিত্র হয় নাই জানিয়া প্রতাপের মন নরম হইল। অশ্রুমতীকে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ চিরকুমারী যোগিনীর ব্রত অবলম্বন করিতে আদেশ দিয়া প্রতাপ প্রাণত্যাগ করিল। মণ্ডলগড়ে সেলিমের ছাউনির নিকটে শ্মশানে অশ্রুমতী যোগিনীর বেশ ধরিয়া আসিয়া দেখিল যে তাহার সহচরী, পৃথ্বীরাজের প্রেমাসক্ত মলিনা উন্মত্ত হইয়া তখনও পৃথ্বীরাজের মৃতদেহ আঁকড়াইয়া বসিয়া আছে। সেলিমও নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়া শ্মশানে আসিয়া যোগিনীকে দেখিল, তাহাকে অশ্রুমতীর প্রেতমূর্ত্তি মনে করিয়া ক্ষমাভিক্ষা করিল এবং অশ্রুমতী তাহাকে ভালোবাসিত কিনা তাহা শেষবারের মত জানিয়া সংশয়চ্ছেদ করিতে চাহিল। যোগিনী তাহার দিকে চাহিয়া নিজের মনের কথা একটি গানে গাহিয়া অপসৃত হইয়া গেল। ইহাই অশ্রুমতীর কাহিনী।

অশ্রুমতী নাটকের প্রধান ভূমিকা হইতেছে অশ্রুমতীর, তাহার পর সেলিমের। অশ্রুমতীর হৃদয়ের দ্বন্দ্ব হইতেছে পিতৃভক্তির সঙ্গে প্রণয়ের। কিন্তু তাহার নিতান্ত বালিকা-হৃদয়, তাই এই দ্বন্দ্ব তেমন প্রবল হয় নাই। পিতার মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে যে আঘাত সে পাইল তাহা বড় কঠিন, এবং তাহাই তাহার জীবনের গতিকে ভিন্নপথে প্রবাহিত করিল। একদিকে প্রেম অপর দিকে ঈর্ষ্যা,

এই দ্বন্দ্বে পড়িয়া সেলিমের অব্যবস্থিতচিত্ততা নাটকে সুন্দরভাবে দেখানো হইয়াছে। অধিকাংশ পাত্রপাত্রীর নাম এবং পারিপার্শ্বিক ব্যাপার ইতিহাস হইতে গৃহীত বটে কিন্তু ঘটনাসংস্থান সম্পূর্ণ কাল্পনিক। তাই সেলিম ও অন্যান্য ভূমিকায় ইতিহাসের আনুগত্য না থাকায় দোষের হয় নাই। প্রতাপসিংহের ভূমিকা যথাসম্ভব ইতিহাসানুগত। অপ্রধান ভূমিকাগুলিও সুচিত্রিত। তাহার মধ্যে পৃথ্বীরাজের ভূমিকার স্বাতন্ত্র্য প্রশংসনীয়।

অশ্রুমতী নাটকে যে কয়টি গান আছে তাহার মধ্যে একটি রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহ-ঠাকুরের-পদাবলী হইতে গৃহীত, "গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝে"। "প্রেমের কথা আর বোলো না" ইত্যাদি শেষের গানটি এবং আরো দুই একটি গান লেখকের অন্তরঙ্গ বন্ধু কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর রচনা বলিয়া অনুমান করি।

অশ্রুমতীর পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একটি নিতান্ত ক্ষুদ্র গীতিনাট্য রচনা করেন, 'মানময়ী' (১৮৮০)। অনেককাল পরে ইহা 'পুনর্বসন্ত' (১৮৯৯) নামে বর্দ্ধিতায়তন হয়। ইহার স্বল্পকাহিনীতে শেক্স্পিয়রের 'এ মিড্‌সামার নাইট্‌স্ ড্রীম'এর ছায়াপাত আছে। মানময়ীতে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর লেখা কয়েকটি ও রবীন্দ্রনাথের লেখা একটি গান আছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চতুর্থ এবং শেষ মৌলিক নাটক হইতেছে পঞ্চাঙ্ক 'স্বপ্নময়ী নাটক' (১৮৮২)।[১] অপর তিনখানি নাটকের মত স্বপ্নময়ীকেও ঠিক ঐতিহাসিক নাটক বলা চলে না, যদিও ইহার প্রধান ভূমিকাগুলি ইতিহাস হইতে নেওয়া। সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে দক্ষিণপশ্চিম বঙ্গে চিতুয়া-বরদার জমিদার শোভাসিংহ এবং পাঠান-সর্দ্দার রহিম খাঁ মোগল-শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং বর্দ্ধমানের রাজা কৃষ্ণরাম রায়কে নিহত করিয়া বর্দ্ধমান অঞ্চল অধিকার করে। কৃষ্ণরামের কন্যা সত্যবতীর উপর অত্যাচার করিতে গিয়া শোভাসিংহ সত্যবতী কর্তৃক নিহত হয়। এইটুকু হইতেছে ইতিহাসকাহিনী। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকের আখ্যানের সঙ্গে এই কাহিনীর সম্পর্ক নিতান্ত বহিরঙ্গ।

বরদা পরগনার জমিদার শুভসিংহ স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিল। দেশব্যাপী বিদ্রোহ জাগাইবার উদ্দেশ্যে সে তাহার বিশ্বস্ত

[১] লেখকের বন্ধু কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীকে উৎসর্গিত।

অনুচর সূরজমলের পরামর্শে নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে মহাপুরুষ সাজিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে বর্দ্ধমানে আসিয়া পৌঁছে। উদ্দেশ্য, রাজা কৃষ্ণরামের প্রশ্রয়পাগল কন্যা স্বপ্নময়ীকে ভুলাইয়া রাজকোষের সন্ধান করা এবং তাহা লুট করিয়া সেই টাকায় আরংজেবের বিরুদ্ধে সৈন্যদল খাড়া করা। রাজা কৃষ্ণরাম নিতান্ত ভালোমানুষ, ছেলে জগৎরাম ও মেয়ে স্বপ্নময়ীকে শাসন করিতে পারেন না। রাজ্যশাসনেও উদাসীন, কেবল শাস্ত্রচর্চ্চা লইয়া আছেন। পিতার ঔদাসীন্যে মাতৃহীনা স্বপ্নময়ী রাজপ্রসাদের বাহিরে যথেচ্ছভ্রমণের অধিকার পাইয়াছে। স্বপ্নময়ী শুভসিংহকে দেখিয়া তাহাকে দেবতা মনে করিয়া ভুলিল। শুভসিংহও তাহার রূপে আকৃষ্ট হইল। এমন বালিকাকে ঠকাইতেছে মনে করিয়া তাহার মনে চাঞ্চল্য জাগিল, কিন্তু সূরজমলের যুক্তি তাঁহার মনকে দৃঢ়তর করিল। রাজকুমার জগৎসিংহ বড় যোদ্ধা। তিনি যাহাতে মোগলের পক্ষ না লইতে পারেন সেইজন্য তাঁহার অনুচর পাঠান সর্দ্দার রহিম খাঁকে সূরজমল হাত করিল। রহিম খাঁ জগৎরামকে মদ্যপান শিখাইল এবং নিজের স্ত্রী জেহেনাকে দিয়া তাহাকে ভুলাইতে প্রবৃত্ত হইল। জেহেনা জগৎরামের স্ত্রী সুমতির সখীরূপে প্রসাদে ঢুকিয়া শেষে জগৎরামের মন অধিকার করিল। রহিম খাঁ জগৎরামকে নবাবের কাছে যাইতে না দিয়া নিজেই চুপিচুপি চলিয়া গেল। জেহেনা রটাইয়া দিল, তাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। রহিম ফিরিয়া আসিয়া দেখিল গৃহিণী জগৎরামের অঙ্কলক্ষ্মী। জগৎরামকে ও জেহেনাকে মারিতে গিয়া রহিম সুমতির প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে নিজেই প্রাণ হারাইল। তখন জেহেনার বিষয়ে জগৎরাম মোহমুক্ত হইল, এবং সুমতি পুনরায় স্বামীর হৃদয় অধিকার করিল। এদিকে মন্ত্রীর ও পারিষদদিগের কথায় রাজা স্বপ্নময়ীর জন্য এক বর্ষীয়ান্ যড়্দর্শনাভিজ্ঞ পাত্র স্থির করিয়াছেন। দিল্লীর বাদশাহের জন্মদিনের রাত্রিতে বিবাহ স্থির। শুভসিংহ ও সূরজমল সেই রাত্রিতে রাজবাড়ীতে হানা দিবে ঠিক করিয়াছে। যথা-লগ্নে পাত্রী উপস্থিত হইল বিদ্রোহী বাহিনীর পুরোভাগে। শুভসিংহকে দেখিয়া রাজা চিনিতে পারিলেন এবং স্বপ্নময়ীকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। শুভসিংহ দেবতা নহেন মানুষ জানিয়া স্বপ্নময়ী মরমে মরিয়া গেল। তখন শুভসিংহ ছদ্মবেশ ফেলিয়া দিয়া নিজের অপরাধ স্বীকার করিল। শুভসিংহের বাল্যবন্ধু জগৎসিংহ। উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইল। ইতিমধ্যে সূরজমল তাহার বাগদী অনুচরদের সাহায্যে রাজবাড়ীতে আগুন লাগাইয়া দিয়াছে। সকলে এদিকে-ওদিকে পলাইল, কেবল রাজা

বারান্দায় আটক পড়িয়া গেলেন। তখন শুভসিংহ আত্মপ্রাণ তুচ্ছ করিয়া রাজাকে উদ্ধার করিল। প্রাসাদের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া রাজার উপর পড়িল। রাজা শুভসিংহকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। অপ্রকৃতিস্থ স্বপ্নময়ী শুভসিংহকে এখনও দেবতাজ্ঞান করিতেছে। সে কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিল তাহার পিতাকে বাঁচাইয়া দিতে। শুভসিংহ তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে সে দেবতা নয় মানুষ। স্বপ্নময়ী যখন বুঝিল তখন তাহার মন একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার পিতাও নাই, কি অবলম্বন করিয়া সে বাঁচিবে। স্বপ্নময়ীর নির্ব্বেদে শুভসিংহের মনে নিদারুণ আগাত লাগিল। সে স্বপ্নময়ীর সম্মুখে আত্মহত্যা করিয়া বিবেকদংশনের জ্বালা এড়াইল। স্বপ্নময়ীর বোধ স্বপ্ন-জাগরণের দোলায় দুলিতেছিল, এখন শুভসিংহের আত্মহত্যায় তাহা চিরদিনের জন্য স্বপ্নরাজ্যে ডুবিয়া গেল। স্বপ্নময়ী পাগল হইয়া গেল। জগৎরাম ও সুমতি জগন্নাথক্ষেত্রে তীর্থদর্শনে যাত্রা করিল। ইহাই স্বপ্নময়ী নাটকের আখ্যান।

গঠনরীতির এবং রচনারীতির দিক দিয়া স্বপ্নময়ী নাটক জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অপর তিনখানি নাটক হইতে স্বতন্ত্র। নাটকটিতে যে লিরিকাল ভাব প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অপর তিন নাটকে দেখা যায় নাই। এক হিসাবে সরোজিনীর এবং অশ্রুমতীর সঙ্গে স্বপ্নময়ীর একটা সুগভীর মিল আছে। তিনটি নাটকেই নায়িকার পিতৃবাৎসল্য সুকঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন। প্রথম নাটকে সরোজিনী পিতার আনুগত্য সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়াছে। দ্বিতীয় নাটকে অশ্রুমতী নিতান্ত পরোক্ষভাবে পিতার অপ্রিয় কার্য্যের হেতু হইয়াছে। তৃতীয় নাটকে স্বপ্নময়ী সাক্ষাৎভাবে পিতৃদ্রোহী হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার বিদ্রোহের মধ্যে সজ্ঞান পিতৃবিরুদ্ধতার চিহ্নমাত্র নাই, তাহার বিদ্রোহ পাগলের খেয়াল মাত্র।

স্বপ্নময়ী নাটকের চরিত্রচিত্রণ উৎকৃষ্টতর। কেবল স্বপ্নময়ীর ভূমিকাই কতকটা আড়ালে রহিয়া গিয়াছে। শুভসিংহ-সুরজমলের দেশোদ্ধারপ্রচেষ্টায় আমাদের দেশের রাষ্ট্রনৈতিক প্রচেষ্টার একদিকের ভবিষ্যৎচিত্র প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। নাটকীয় পরিকল্পনায় এবং রচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সুস্পষ্ট। সুরজমলের মধ্যে ঘরে-বাইরের সন্দীপের পূর্ব্বাভাস নিতান্ত ক্ষীণ হইলেও লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণরামের ভূমিকার ছায়া রবীন্দ্রনাথের একাধিক নাট্যরচনায়

পরিলক্ষিত হয়। রাজা পণ্ডিতবর্গ এবং রহিম খাঁ ভূমিকাগুলির দ্বারা নাটকটিতে যে কৌতুকরসের যোগান দেওয়া হইয়াছে তাহাও রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট পদ্ধতি। নাটকের পদ্যাংশ প্রায় সম্পূর্ণভাবে রবীন্দ্রনাথের লেখা বলিয়া অনুমান করি। কয়েকটি কবিতা রবীন্দ্রনাথের ভগ্নহৃদয়ের ও গানের-বইয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। একটি গান ("দেখে যা, দেখে যা, দেখে যা লো তোরা") শৈশব-সঙ্গীতেও সঙ্কলিত হইয়াছিল। চতুর্থ অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্যে যে দীর্ঘ কবিতাটি আছে ("দেখিছ না অয়ি ভারতসাগর, অয়ি গো হিমাদ্রি দেখিছ চেয়ে") তাহাতে অনতিদীর্ঘকাল পূর্ব্ববর্ত্তী দিল্লী-দরবারের প্রতি ইঙ্গিত আছে। স্বপ্নময়ী যখন লেখা হয় তখন রবীন্দ্রনাথ রুদ্রচণ্ড-পালা শেষ করিয়া সন্ধ্যাসঙ্গীতের আসর জাগাইতে শুরু করিয়াছেন। সম্ভবত তখন রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে চন্দননগরে ছিলেন। মনে হয় স্বপ্নময়ীর ভূমিকায় যেন সন্ধ্যাসঙ্গীতের কবির অন্তরেরই প্রতিধ্বনি শুনিতেছি।

স্বপ্নময়ীর পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আর কোন মৌলিক নাটক লিখেন নাই। 'হিতে বিপরীত' (১৮৯৬) প্রহসন ও 'পুনর্বসন্ত' (১৮৯৯), 'বসন্তলীলা' (১৯০০) এবং 'ধ্যানভঙ্গ' (১৯০০) এই তিনটি গীতিনাট্য সঙ্গীত-সমাজে অভিনয়ার্থ রচিত হইয়াছিল। স্বপ্নময়ীর পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ফরাসী ভাষা হইতে অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। মলিয়েরের 'ল বুর্জোয়া জ্যাঁতিয়ম' অবলম্বনে ইনি পূর্ব্বে 'হঠাৎ নবাব' (১৮৮৪) প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন।[১] পরে ইনি মলিয়েরের আর একটি প্রহসন 'মারিয়াজ ফোর্সে' অনুবাদ করিয়াছিলেন 'দায়ে পড়ে দারগ্রহ' নামে (১৩০৯)। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ফরাসী গল্পের ও কবিতারও কিছু অনুবাদ করিয়াছিলেন। এইগুলি 'ফরাসীপ্রসূন' (১৩১১) নামে সঙ্কলিত। ফরাসী হইতে অনূদিত অপর গ্রন্থ হইতেছে পিয়ের লোটির 'ভারতবর্ষ' (১৩১০), দ্য ল ম্যাজেলিয়রের 'ইংরাজবর্জ্জিত ভারতবর্ষ' (১৩১৫), ভিক্‌তর কুঁজ্যার 'সত্য, সুন্দর, মঙ্গল' (১৩১৮), এবং থিয়োফিল গোতিয়ের তিনখানি উপন্যাস 'শোণিতসোপান' (১৩২৭), 'অবতার' (১৩২৯) ও 'মিলিতোনা' (১৩৩০)।

তাহার পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মন গেল প্রাচীনতর সংস্কৃত নাটকগুলির

[১] বইটি প্রথমে "সম্পাদকের বৈঠক" শীর্ষকে 'দোকান্‌দার বড়লোক কিম্বা হঠাৎ নবাব' নামে ভারতীতে (মাঘ ১২৮৭ হইতে বৈশাখ ১২৮৮) প্রকাশিত হইয়াছিল।

বঙ্গানুবাদ। ভাসের নব-আবিষ্কৃত নাটকনাটিকাগুলি প্রকাশিত হইবামাত্র ইনি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিলেন—'অবিমারক' 'প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ' 'দরিদ্র-চারুদত্ত' 'মধ্যমব্যায়োগ' 'প্রতিমানাটক' ইত্যাদি। তাহা ছাড়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই নাটকগুলিও অনুবাদ করিয়াছিলেন—কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' (১৩০৬), মালবিকাগ্নিমিত্র' (১৩০৮) ও 'বিক্রমোর্ব্বশী' (১৩০৮); ভবভূতির 'উত্তর-চরিত' (১৩০৭), 'মালতীমাধব' (১৩০৭) ও 'মহাবীর-চরিত' (১৩০৮); শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' (১৩০৭) ও 'নাগানন্দ' (১৩০৯); বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' (১৩০৭); শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' (১৩০৮); আর্য্য-ক্ষেমীশ্বরের 'চণ্ডকৌশিক' (১৩০৮); ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার' (১৩০৮); কৃষ্ণমিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' (১৩০৮); রাজশেখরের 'বিদ্ধশালভঞ্জিকা' (১৩১০), 'প্রিয়দর্শিকা' (১৩১২) ও 'কর্পূরমঞ্জরী' (১৩১১); এবং কাঞ্চনাচার্য্যের 'ধনঞ্জয়বিজয়' (১৩১০)।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দুইটি ইংরেজি নাটকেরও অনুবাদ করিয়াছিলেন, একটি শেক্‌স্পিয়রের 'জুলিয়াস সীজার' (১৩১৪)[১] অপরটি 'রজতগিরি' (১৩১০)। ইংরেজি হইতে অনূদিত অপর নিবন্ধ হইতেছে 'এপিক্‌টেটসের উপদেশ' (১৩১৪) এবং 'মার্কস অরিলিয়সের আত্মচিন্তা' (১৩১৮)। ভারতী, বালক ও সাধনা পত্রিকায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যে-সকল মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার কতকগুলি 'প্রবন্ধমঞ্জরী'তে (১৩১২) সঙ্কলিত আছে। মারাঠী ভাষা এবং সাহিত্যেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অধিকার ছিল। ইনি তুকারামের কয়েকটি "অভঙ্গ" বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন। 'ঝাঁসির রাণী'ও (১৩১০) মারাঠী হইতে অনূদিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনের শেষ বড় কাজ হইতেছে টিলকের শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতারহস্যের অনুবাদ॥

৮

রোমান্টিক নাটকে রোমহর্ষক উদ্দীপনার নূতনত্ব আনিলেন উপেন্দ্রনাথ দাস (১২৫৫-১৩০২)। খুন-জখমের বাড়াবাড়ি এবং পিস্তল-বন্দুক-লাঠির হুড়াহুড়ি সমসাময়িক সমাজচিত্র-নাট্যে এই প্রথম দেখা গেল। দেশপ্রেমের উদ্দীপনা তো আছেই, সেই সঙ্গে দেশকে স্বাধীন করিবার উদ্দেশ্যে বৈপ্লবিক চেষ্টার

[১] প্রথম প্রকাশ ভারতীতে (১৩১১)।

ইঙ্গিতও রহিয়াছে। প্রথম নাটক 'শরৎ-সরোজিনী'তে (১৮৭৪, দ্বি-স ১২৮৩) লেখক "দুর্গাদাস দাস" এই ছদ্মনামের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছিলেন।

তরুণ জমিদার শরৎকুমার কলিকাতায় থাকিয়া উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চ্চায় এবং দেশোদ্ধারে ব্রতী হইয়াছে। বিবাহ করিতে একান্ত অনিচ্ছা এবং প্রেমের প্রতি বড়ই বিদ্বেষ। সে মনে করে প্রেমচর্চ্চা করিয়াই আমাদের দেশ অধঃপাতে গিয়াছে। সে বলে, "প্রণয়ে মত্ত হবার কি এই সময়? আমাদের ঘৃণা নাই? গরু গাধার মত দিবারাত্র শাসিত হচ্ছি, তা কি মনে থাকে না? পদে পদে ইংরাজদের বিজাতীয় অহঙ্কার দেখেও কি রক্ত ধমনীতে বিদ্যুতের মত ধাবিত হয় না? শরীর উত্তপ্ত হয় না? মনে ধিক্কার জন্মায় না? এখন অন্য ইচ্ছা? অন্য অভিলাষ?" শরৎবাবুর বাড়ী রিষড়া, সেখানে থাকে ভগিনী সুকুমারী এবং আশ্রিতা সরোজিনী। সরোজিনী সুন্দরী এবং শিক্ষিত। শরৎবাবু ও সরোজিনী পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত। সরোজিনী তাহা ভালো করিয়াই জানে, কিন্তু শরৎবাবু সে-ভাবকে আমল দিতে চাহে না। শরৎকুমারের বিমাতা রমাসুন্দরী মিথ্যা-অপবাদে গৃহত্যাগ করিয়াছে।

মতিলাল দে আর এক জমিদার এবং নাটকের পাষণ্ড। সে তাহার ভাইকে খুন করিয়া ভ্রাতৃবধূ ভুবনমোহিনীকে ভ্রষ্ট করিয়াছে এবং বন্ধুপুত্র বিনয়ের অভিভাবক হইয়া তাহার সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া তাহাকে মারিবার ফিকিরে আছে। মতিলালের স্ত্রী বিন্দুবাসিনী সাধ্বী সতী। মতিলালের মতলব টের পাইয়া বিনয় কলিকাতায় পলাইল। সেখানে তাহাকে রক্ষা করিতে গিয়া শরৎ পুলিশের হাতে লাঞ্ছিত হইল এবং মতিলালের রোষে পড়িল। এদিকে মতিলাল চায় শরতের ভগিনীকে বিবাহ করিতে। বিনয় রিষড়ায় আসিল। ঘনিষ্ঠ সাহচর্য্যের ফলে বিনয় ও সুকুমারী পরস্পর প্রেমাসক্ত হইল। শরৎও রিষড়ায় আসিয়াছে। মতিলাল ডাকাত পাঠাইয়া সুকুমারীকে অপহরণ করিতে চেষ্টা করিল। দুইটা পিস্তল লইয়া শরৎ দেশি ডাকাতদের হঠাইয়া দিল এবং একজন গোরা ডাকাতকে মারিয়া ফেলিল। দ্বিতীয় গোরা শরৎকে কাবু করিলে সরোজিনী শরতের হস্তভ্রষ্ট পিস্তল কুড়াইয়া লইল এবং "আর আমি থাকিতে পারি নে। আমি স্ত্রীলোক, কিন্তু অনাথের নাথ আমার সহায়! ইংরাজরাক্ষসের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার এ ভিন্ন

উপায় নাই", বলিয়া "উল্লিখিত ক্ষুদ্র পিস্তলদ্বারা গুলি করিয়া দ্বিতীয় গোরাকে শমনসদনে প্রেরণ" করিল। তাহার পর শরতের প্রতি তাহার ভালোবাসা আর চাপা যায় না বুঝিয়া সরোজিনী একদিন নিরুদ্দেশ হইল। সরোজিনীর অন্বেষণে শরৎ বাহির হইলে মতিলাল লাঠিয়াল লইয়া তাহার গৃহে চড়াও হইল এবং বিনয়-সুকুমারীকে অপহরণ করিল। সরোজিনীর খোঁজে শরৎ রাজমহল পাহাড়ের উপত্যকাভূমিতে আসিয়া একদল মুসলমান ডাকাতের হাতে পড়িল। ইহারা ইংরেজ-রাজত্ব লোপ করিয়া মুসলমান-রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার আয়োজনে ব্যাপৃত। তাহাদের উদ্দেশ্য শুনিয়া শরৎ হাসিয়া বলিল, "আপনাদের বৃথা চেষ্টা। আপনারা কখন সফল হবেন না। আমাদের দেশের কাপুরুষেরা এখনও স্বাধীনতার জন্য ব্যগ্র হয় নি—স্বাধীনতা প্রাপ্ত হলেও বা যে আমরা তা বহুদিন রক্ষা করতে পারব, তাও বিলক্ষণ সন্দেহের স্থল। আর স্বাধীনতার নামে আপনাদের অধীনতা স্বীকার করতে কেউ সম্মত হবে না।" বিদ্রোহীদের নেতা আমীর খাঁ শরতের নিকট চারি হাজার টাকা চাহিল। দিতে অস্বীকৃত হইলে শরতকে ভূগর্ভে বন্দী করিয়া রাখা হইল। কিছুকাল পরে বিজ্ঞানালোকবিস্তারিণী সভার সভ্য হরিদাস বাবু গবেষণার জন্য সেখানে ফসিল্ খুঁজিতে আসিলে তাহার কুলিরা মাটি খুঁড়িয়া ভূগর্ভ হইতে শরৎকে উদ্ধার করিল। এদিকে সরোজিনী একদল মাতালের হাতে পড়িয়া তাহাদের হাত হইতে উদ্ধারের উপায় না দেখিয়া গলায় ছুরি দিল। মাতালেরা তাহাকে মৃত বলিয়া ফেলিয়া দিলে সে রমাসুন্দরীর কৃপায় বাঁচিয়া উঠিল।

মতিলাল এখন বিনয়কে দিয়া তাহার সম্পত্তির দানপত্র লেখাইয়া লইবার জন্য বলপ্রকাশ করিতে লাগিল। এদিকে গোরা-মারার অপরাধে শরৎ অভিযুক্ত হইয়াছে। সে দোষ স্বীকার করিলেই মুক্তি পায় কিন্তু কিছুতেই রাজি নয়, বলে "উৎপীড়িত স্বদেশীয়দিগকে ধবলমূর্ত্তিদের অত্যাচার হতে রক্ষা করবার জন্য যদি আমার জীবন বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাও দেব।" বন্ধুবর্গের সাহায্যে পুলিশের হাত হইতে শরৎ উদ্ধার পাইল। শরৎকুমারের দেওয়ান ভগবানের সাহায্যে রমাসুন্দরী মতিলালকে ভয় দেখাইয়া তাহার সম্পত্তি যাহা মতিলাল হস্তগত করিয়াছিল তাহা আবার লিখাইয়া লইল এবং তাহার অসতীত্বের অপবাদ যে সম্পূর্ণ অমূলক সে-বিষয়ে তাহার স্বীকারোক্তি আদায় করিল। রমাসুন্দরীর হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া মতিলাল গৃহে আসিয়া বিনয়ের উপর পুনরায় অত্যাচার করিতে গেল। তখন ভুবনমোহিনী আর থাকিতে

না পারিয়া মতিলালকে মারিয়া নিজেও আত্মহত্যা করিল। স্বামীকে মরিতে দেখিয়া বিন্দুবাসিনীরও হার্টফেল হইল। আত্মঘাতিনী হইয়াছে ভাবিয়া শরৎ যখন সরোজিনীর সকল আশা ত্যাগ করিয়াছে তখন হঠাৎ একদিন সে আসিয়া মিলিল। রামসুন্দরীও নিজ গৃহে স্বস্থান পুনরধিকার করিল। শরৎ-সরোজিনীর এবং বিনয়-সুকুমারীর বিবাহ হইল। যবনিকা পড়িবার পূর্ব্বে পরীরা আসিয়া নাচিয়া গাহিয়া গেল,

> তোমাদের নিজ-দোষে, আছ সবে পরবশ,
> হীনবল, অপযশে ত্রিজগতে পূরিল।
> নরনারী পরস্পরে, ভারত-উদ্ধার-তরে,
> উদ্যোগী হও যত্নভরে, হও না তায় শিথিল॥

ইহাই শরৎ-সরোজিনীর কাহিনী।

রোমাঞ্চকর ঘটনার বাহুল্য এবং বৈচিত্র্যই শরৎ-সরোজিনী নাটকের প্রাণ। সুতরাং এই ষষ্ঠ্যঙ্ক নাটকখানিতে চরিত্রবিকাশের কোন অবকাশ নাই প্রত্যাশাও নাই। চরিত্র-চিত্রণে কোন রকম নৈপুণ্য বা বৈশিষ্ট্য নাই। তবে ইহা অভিনয়ে খুব জমিয়াছিল, এবং শিক্ষিত দর্শক ও পাঠকদের প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। যে-সময়ে নাটকখানি রচিত হইয়াছিল তখনকার দিনের স্বদেশপ্রিয় শিক্ষিত যুবকদের মনোভাবের পরিচয় ইহাতে স্পষ্টভাবে আছে। এইটুকুই শরৎ-সরোজিনীর প্রকৃত মূল্য। রচনারীতির সরলতা ও লঘুতা উপেন্দ্রনাথের নাটকের সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

উপেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় নাটক চতুরঙ্ক ‘সুরেন্দ্র-বিনোদিনী’র (১৮৭৫) কাহিনী বলিতেছি।

বংশবাটীর রাজচন্দ্র বসুর পৌত্রী বিনোদিনীর সহিত হুগলী-নিবাসী শিক্ষিত যুবক সুরেন্দ্রনাথের বিবাহ হইবে বলিয়া অনেকদিন হইতে স্থির আছে। উভয় পরিবারের মধ্যে বিশেষ অন্তরঙ্গতা। রাজচন্দ্রের দৌহিত্র হরিপ্রিয় শুদ্ধ কৌতুকের বশে পাকে-প্রকারে সুরেন্দ্র-বিনোদিনীর মনোভঙ্গ করিয়া দিল এবং স্বয়ং সুরেন্দ্রের ভগিনী বিরাজমোহিনীর প্রতি অনুরক্ত হইল। হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট ম্যাক্রেণ্ডেল্ দুরাচার লম্পট। সে সুরেন্দ্রের নিকট ছয় হাজার টাকা ধার করিয়াছিল কিন্তু পরে পরিশোধ করিবার ছলে হ্যাণ্ডনোটখানি হস্তগত করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে। সাক্ষ্যের বলে সুরেন্দ্র টাকা আদায় করিবে বলিলে ম্যাক্রেণ্ডেল্ উপহাস করিয়াছিল, “নির্ব্বোধ, আমি বাইবল চুম্বন করিয়া শপথ

পূর্ব্বক যাহা বলিব, তাহার বিরুদ্ধে তোমাদের দুইশত বাঙ্গালীর সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না। এতকাল ইংরাজের রাজ্যে বাস করিয়া এই সামান্য জ্ঞান উপলব্ধি কর নাই? তোমার অজ্ঞতা দেখিয়া আমি আন্তরিক দুঃখিত হইলাম।" তথাপি সুরেন্দ্র টাকার দাবি করিলে সাহেব তাহার ভগিনী-বিষয়ে অপমান-সূচক কথা বলিল। সুরেন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার বুকে লাথি মারিল। সাহেব উঠিয়া পিস্তলের গুলি ছুড়িয়া সুরেন্দ্রকে আহত করিল। সুরেন্দ্র প্রতিশোধ লইতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইল। সুরেন্দ্র একদিন হুগলীর সাধারণ উদ্যানে বসিয়া আছে এমন সময় ম্যাক্রেণ্ডেল্ তাহার কুকর্ম্মকারী অনুচর হুগলীর কারা-লয়াধ্যক্ষ কৃষ্ণদাসকে লইয়া সেখানে আসিল। বাঙ্গালী লোক সাহেবকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল না দেখিয়া ম্যাক্রেণ্ডেল্ চটিয়া গিয়া কৃষ্ণদাসকে বলিল, "এ সকল সাধারণ উদ্যানে অর্দ্ধসভ্য বাঙ্গালীদিগের প্রবেশ নিষেধের নিমিত্ত একটা বিশেষ রাজনিয়ম বিধিবদ্ধ হওয়া অতি আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।— আমি বরাবর বলিয়া আসিতেছি, উচ্চশিক্ষা বঙ্গ হইতে নির্ব্বাসিত না হইলে, এই সমস্ত অশিষ্টাচারের মূলে কখন কুঠারাঘাত হইবে না।" কাছে আসিয়া সুরেন্দ্রকে চিনিতে পারিয়া সাহেব তাহাকে জুতার ঠোকর মারিল এবং সুরেন্দ্র মুখ তুলিতেই এক ঘা চাবুক কশাইল। সুরেন্দ্র চাবুক কাড়িয়া লইয়া ম্যাক্রেণ্ডেলকে পদাঘাত করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া বেশ করিয়া চাবকাইয়া দিল। তাহার পর সে বাড়ী দেখিতে কলিকাতায় গিয়া অসুখে পড়িল। এই সুযোগে ম্যাক্রেণ্ডেল্ পুলিশকে দিয়া বিরাজমোহিনীর বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আনাইল। হারু গোয়ালা গুলি করিয়া সুরেন্দ্রকে আহত করিতে সাহেবকে দেখিয়াছিল। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হইল দুধে জল দিবার। বিচারে হারু গোয়ালার দশ ঘা বেত আর দুই মাস জেল হইল। বিরাজ-মোহিনীর বিচার মুলতবি রহিল। রাত্রিতে ম্যাক্রেণ্ডেল্ বিরাজকে গঙ্গাতীরে এক পুরাতন জীর্ণ বাড়ীতে আনাইয়া অত্যাচার করিতে উদ্যত হইলে সে কোন-রকমে দোতালার বারান্দা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পলাইল। সাহেব আবার তাহাকে ধরিয়া আনিল। দ্বিতীয়বার অত্যাচারের উপক্রম হইতেছে এমন সময় খবর আসিল হুগলী জেলের কয়েদীরা বিদ্রোহ করিয়াছে। বিরাজকে ফেলিয়া ম্যাক্রেণ্ডেল্ সেখানে ছুটিল। গুলি চালাইয়া দুই-চারিজন কয়েদীকে হত্যা করিবার পর সাহেব নিহত হইল। এদিকে হরিপ্রিয় সন্ধান পাইয়া সেই প'ড়ো-বাড়ীতে গিয়া বিরাজকে উদ্ধার করিয়া আনিল। তাহার পর

যথারীতি সুরেন্দ্র-বিনোদিনীর ও হরিপ্রিয়-বিরাজমোহিনীর বিবাহ হইয়া গেল।

সুরেন্দ্র-বিনোদিনীর কাহিনীর মধ্যে বাস্তব-অংশ হইতেছে হুগলীর ম্যাজিস্ট্রেটের ঘটনাটুকু। প্রধানত ইহার জন্যই সুরেন্দ্র-বিনোদিনীর অভিনয় অত্যন্ত জমিয়াছিল। পুলিশ ইহার মধ্যে সিডিশনের আঁচ পাইয়া অশ্লীলতার অভিযোগ আনিয়া নাটকটির অভিনয় বন্ধ করিতে চেষ্টা করে। সুরেন্দ্র-বিনোদিনীর অভিনয়কারী যে-সব অভিনেতা ও রঙ্গমঞ্চের কর্ত্তৃপক্ষ পুলিশের কবলে পড়িয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে লেখক (রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ হিসাবে) এবং অমৃতলাল বসু ছাড়া সকলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলিয়া লওয়া হয়। উপেন্দ্রনাথ ও অমৃতলাল হাইকোর্টে আপীলে খালাস পাইয়াছিলেন। অনন্যোপায় হইয়া গভর্ণমেণ্ট ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন জারি করিল। এইরূপে সুরেন্দ্র-বিনোদিনী বাঙ্গালাদেশে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে চিহ্ন রাখিয়া গেল।

চরিত্রচিত্রণ সম্বন্ধে শরৎ-সরোজিনীর সম্পর্কে যাহা বলিয়াছি এখানেও অতিরিক্ত বলিবার কিছু নাই। দুইটি ভূমিকা ভালো হইয়াছে। হরিপ্রিয়র ছেলেমানুষি স্বাভাবিক। নাটকের উপক্রমণিকায় এবং উপসংহারে ন্যায়রত্নের চকিত দর্শনটুকু উপভোগ্য। সাড়ে চারি সের সন্দেশ উদরস্থ করিবার পর ন্যায়রত্ন যখন বলিল, "কিঞ্চিৎ জলযোগ হইল। এক্ষণে দণ্ডদ্বয় কিছু ভোজন না করিলেও বিশেষ কোন কষ্ট হইবে না", তখন রাজচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা ন্যায়রত্ন মহাশয়, আপনি ক সের সন্দেশ খেতে পারেন, অর্থাৎ কত হলে আপনার বেশ পরিতৃপ্ত রকম আহার হয়, পেট্ সম্পূর্ণ ভরে?" ইহাতে ন্যায়রত্ন চক্ষুবিস্তার পূর্ব্বক উত্তর করিল, "হরি, হরি! পেট্ ভরার কথা কি বলেন, মহাশয়! পেট্ কখনই ভরেন্ না—কখনই না। ওটা আপনাদের—কুসংস্কার মাত্র। তবে, খাইতে, খাইতে, খাইতে, কালক্রমে চোয়াল ব্যথা করিলেও করিতে পারে, তাহা আমি অস্বীকার করিতে চাহি না।"

নিম্নে উদ্ধৃত সুরেন্দ্র-বিনোদিনীর "বিজ্ঞাপন"এ অর্থাৎ ভূমিকায়[১] লেখকের মনের কথার সরস প্রকাশ আছে।

> একদিন সন্ধ্যার সময়, সালিকাগ্রাম হইতে কলিকাতায় আগমনকালে, এক বটবৃক্ষমূলে এই পুস্তকখানি প্রাপ্ত হইয়াছি। পুস্তকাধিকারী কে, তাহা অদ্যাপি নিরূপণ করিতে সমর্থ হই নাই। ইহার এক প্রান্তে, হস্তাক্ষরে এই কয়েকটিমাত্র কথা লিখিত ছিল ঃ—

[১] শরৎ-সরোজিনীর "বিজ্ঞাপন"ও দ্রষ্টব্য।

"নবগোপাল মিত্র একটি প্রকাণ্ড জানোয়ার্—বৎসর বৎসর হিন্দুমেলা করিয়া কি হইতেছে? মৃতব্যক্তিকে কে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারে? আবার শুনিতেছি না কি 'কলিকাতা আসোসিয়েসন্' নামে একটি সভাস্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে। শিশির-কুমার ঘোষের শ্রাদ্ধ হইতেছে।—এ দিকে অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' করিতেছেন্! আমার পিণ্ড চট্‌কাইতেছেন। কে পড়ে?"...ইহার অর্থ কি! যাহা হউক্, পুস্তকস্বামীমহাশয় অনুগ্রহপুরঃসর আর্য্যদর্শন কার্য্যালয়ে পত্র লিখিবেন। পত্র-প্রাপ্তিমাত্র তাঁহার পুস্তক তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করা যাইবে।

পুস্তকখানি কিরূপ, দ্বিপদ বা চতুষ্পদ, তাহা দেখিবার জন্য একবার আর্য্যদর্শনের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ, মহাশয়কে অনুরোধ করিয়াছিলাম্। বাবুটি অতি ভদ্র ও সদ্বিবেচক। তিনি পুস্তকখানি উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া দণ্ডত্রয় ঘোর চিন্তা করিয়া, গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"মন্দ নহে। 'কি মজার শনিবার' প্রভৃতি পুস্তক অপেক্ষা নিশ্চয়ই কোন কোন অংশে শ্রেষ্ঠ।"

উপেন্দ্রনাথের তৃতীয় নাট্যরচনা 'দাদা ও আমি' (১২৯৫)।[১] সৌভ্রাত্রনাশের ভয়ে দুই ভাই বিবাহ করে নাই, অবশেষে বড় ভাই অনেক কৌশলে ছোট ভাইয়ের বিবাহ দেয় এবং নিজেও ভ্রাতৃবধূর সখীর প্রণয়মুগ্ধ হইয়া বিবাহবন্ধনে ধরা পড়ে। ইহাই এই রোমান্টিক নাটিকার কাহিনী। বইটি একটি ইংরেজি প্রহসন ('ব্রাদার জিল্ এণ্ড আই') অবলম্বনে বিলাতে বসিয়া লেখা। পূর্ব্ব দুই নাটকের তুলনায় দাদা-ও-আমি নিকৃষ্ট রচনা। দাদা-ও-আমিকে ব্যঙ্গ করিয়া অতুলকৃষ্ণ মিত্র 'গাধা ও তুমি' (১২৯৫) লিখিয়াছিলেন॥

৯

প্রমথনাথ মিত্রের (১৮৫৬-৮৩) 'নগ-নলিনী' (১৮৭৪) "ইতিহাসমূলক নাটক" লাঞ্ছন সত্ত্বেও রোমান্টিক নাটকই। লম্পট ভীল-সর্দ্দার কর্ত্তৃক এক রাজপুত-কন্যার অপহরণ এবং কৌশলে তাহার উদ্ধার নগ-নলিনীর বিষয়। নাটকরচনায় কোন কৌশলের বা লিপিচাতুর্য্যের পরিচয় নাই। নাটকটি প্রথম রচনা হইলেও "বিজ্ঞাপন"এ অর্থাৎ ভূমিকায় লেখক আত্মাভিমান চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই। তখনকার দিনের লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকদিগকে কটাক্ষ করিয়া ইনি লিখিয়াছেন,

পাঠক মহাশয়গণ! আমি এম্, এ,ও নই, বি, এ,ও নই,—বিদ্যালঙ্কারও নই, তর্কালঙ্কারও নই,—আমি রায়বাহাদুরও নই, ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটও নই,—আমি একজন সামান্য ব্যক্তি—সামান্য রকমই লেখাপড়া শিখিয়াছি, সুতরাং কখনই এরূপ ভরসা করি না যে, মদ্রচিত এ গ্রন্থ আপনাদের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে।

[১] বীণা থিয়েটারে অভিনীত।

দুই বছরের মধ্যে প্রথম সংস্করণের হাজার কপি বিক্রয় হওয়ায় লেখক গর্ব্ব করিয়া দ্বিতীয় সংস্করণের (১৮৭৬) বিজ্ঞাপনে উপেন্দ্রনাথ দাসের জনপ্রিয় নাটক দুইটিকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন,

> পাঠকগণ! নগ-নলিনী নাটক মধ্যে 'জয় ভারতের জয়' নাই, 'পাপিষ্ঠ ম্লেচ্ছ', 'দুরাচার যবন' নাই, 'হায়, স্বাধীনতা!' নাই, 'ফোর্ট উইলিয়ম' নাই, পিস্তল, বন্দুক, লাঠি প্রভৃতি কিছুই নাই ;—ইহারও যে আবার দ্বিতীয় সংস্করণ হইল, বড় আশ্চর্য্যের বিষয়!

নগ-নলিনীর মধ্যে অল্পস্বল্প পদ্যাংশ আছে, তাহাতে মধুসূদনের অনুকরণ সুস্পষ্ট।

প্রমথনাথের দ্বিতীয় নাটক 'জয়পাল' (১৮৭৬)। নগ-নলিনীর বিজ্ঞাপনে লেখক উপেন্দ্রনাথ দাসের ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশপ্রেমাত্মক নাটককে উপহাস করিয়াছিলেন, এবার স্বয়ং সেই দলে যোগ দিলেন। গজনীর সুলতান মামুদের সঙ্গে লাহোরের রাজা জয়পালের সংগ্রামের পটভূমিকায় এই দেশানুরাগ-মূলক রোমান্টিক নাটকখানি রচিত। কাহিনী এই—জয়পালের কন্যা স্বর্ণকুন্তলা বাল্যসখা বিজয়কেতুর প্রতি অনুরক্ত। জয়পালের ইচ্ছা যে স্বর্ণকুন্তলার সঙ্গে তাঁহার বর্ষীয়ান্ সেনাপতি সংগ্রামসিংহের বিবাহ হয়। সংগ্রামসিংহও রাজকুমারীর পাণিগ্রহণে সমুৎসুক। কিন্তু বিজয়কেতুর প্রতি স্বর্ণকুন্তলার অনুরাগ বুঝিয়া তাহার হৃদয় জ্বলিয়া উঠিয়াছে। রাজকুমারীর প্রেমের প্রতি বিজয়কেতুর বিশেষ আগ্রহ নাই। বিজয়কেতু সহকারী সেনাপতি এবং সংগ্রামসিংহের একান্ত অনুগত। রাজসংসারে পালিত যুবক সদানন্দ সংগ্রাম-সিংহের মন সর্ব্বদা যুদ্ধোন্মুখ করিয়া রাখিত। মামুদ সসৈন্যে পেশোয়ার আক্রমণ করিলে সংগ্রামসিংহ ও বিজয়কেতু যুদ্ধে যায়। যুদ্ধে সংগ্রামসিংহের পতন হইলে বিজয়কেতু পুরুষের ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া সংগ্রামসিংহের প্রতি তাহার গভীর অনুরাগ ব্যক্ত করে। জয়পালের মৃত ভ্রাতা বীরপালের কন্যা বিজয়াই ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া বিজয়কেতু নামে পরিচিত হইয়াছিল। সংগ্রাম-সিংহের প্রাণবিয়োগ হইলে বিজয়া যুদ্ধ করিয়া মরিল। বিজয়ার হত্যাকারী সদানন্দের হাতে প্রাণ দিল। জয়পাল যুদ্ধে গিয়া আহত হইয়া বন্দী হইল, সদানন্দ কৌশলে তাঁহার উদ্ধারসাধন করিল। বিজয়কেতু পুরুষ নহে জানিয়া স্বর্ণকুন্তলার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিল। রাজা লাহোরে ফিরিয়া আসিয়া পরাজয়-ক্ষোভে অগ্নিতে আত্মবিসর্জ্জন করিতে সংকল্প করিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি দুইবার মুসলমানের কাছে হার মানিয়াছিলেন। এই তৃতীয় অভিযানের

পূর্ব্বে তাঁহার গুরু তাঁহাকে যুদ্ধযাত্রায় নিষেধ করিয়া শাস্ত্রের শ্লোক বলিয়াছিলেন যে যবনদিগের হাতে বার বার তিনবার পরাজিত হইলে নরপতির কর্ত্তব্য অগ্নিপ্রবেশ। জয়পাল অগ্নিপ্রবেশ করিলে মহিষী ও কন্যা অনুগমন করিল। মনের দুঃখে সদানন্দ পূর্ব্বেই দেশত্যাগী।

জয়পালে লেখকের হাত কিছু পাকিয়াছে। নাট্যকাহিনীর গঠন এবং চরিত্রচিত্রণ মন্দ নয়। সংগ্রামসিংহের ও সদানন্দের ভূমিকা প্রশংসনীয়। তবে রচনারীতি গুরুভার ও আড়ষ্ট। অমিত্রাক্ষর পয়ারে রচিত দুই-একটি দীর্ঘ উচ্ছ্বাস আছে।

'বীর-কলঙ্ক নাটক' (প্রথম খণ্ড ১৮৭৯) প্রমথনাথের অসমাপ্ত রচনা। ইহাতে অভিমন্যুবধ অংশটুকু আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে জয়দ্রথবধ লিখিয়া নাটকটি সম্পূর্ণ করিবার ইচ্ছা ছিল। লেখকের মৃত্যুর পর তাঁহার বন্ধু, 'সাধকসংহার বা তরণীসেনবধ' (১৮৮২) নাটকের লেখক শরচ্চন্দ্র দেব দ্বিতীয় খণ্ড লিখিয়া সম্পূর্ণ করেন।[১] প্রমথনাথের 'শুম্ভসংহার' ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়। শেষ নাট্য-রচনা 'কর্ম্মবীর' বেঙ্গল থিয়েটারে রিহার্সাল হইবার সময় তিনি মারা যান। তাঁহার পর প্রমথনাথ বাণভট্টের কাদম্বরী অবলম্বন করিয়া 'প্রেম-পারিজাত বা মহাশ্বেতা' গীতিনাট্য (১৮৭৯, দ্বি-স ১৮৮০) রচনা করেন। তাহার পর মিত্রাক্ষর পয়ারে রচিত 'দৃশ্যকাব্য' 'শুম্ভ-সংহার' (১৮৮০)। উৎসর্গপত্রে লেখক স্বীকার করিয়াছেন যে নাটকখানির রচনায় তিনি রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'দানবদলন কাব্য' (১৮৭৩) হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। অজ্ঞাতনামা লেখকের 'পাষাণী' (১৮৮৩) প্রমথনাথের রচনা বলিয়া অনেকে মনে করেন।[২] রাণা প্রতাপের সময়ে চিতোর-অবরোধ কাহিনী অবলম্বনে এই ঐতিহাসিক নাটকটি লেখা।

প্রমথনাথ 'সপ্ত সম্বোধন' (প্রথম খণ্ড) নামে একখানি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।[৩] প্রমথনাথ ভালো অভিনেতা ছিলেন। বীণা থিয়েটারে তাঁহার বই অভিনীত হইত॥

[১] প্রমথনাথের গ্রন্থাবলীতে (১২৯১) মুদ্রিত।

[২] শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু এই কথা বলেন।

[৩] গ্রন্থাবলীতে পুনর্মুদ্রিত। রাজকৃষ্ণ রায়কে উৎসর্গিত।

১০

রজনীকান্ত গুপ্তের ভ্রাতা, সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারিক উমেশচন্দ্র গুপ্ত তিনখানি নাটক লিখিয়াছিলেন। 'হেমনলিনী' (১৮৭৪, দ্বি-স ১৮৮৪) পঞ্চাঙ্ক বিয়োগান্ত নাটক। নাটকের সংযোগস্থল উদয়পুর। ছদ্ম-ঐতিহাসিক পটভূমিকায় হেমনলিনী নাটকের গার্হস্থ্য আখ্যানের অবতারণা। শেক্‌স্পিয়রের ম্যাকবেথ ও রোমিও-জুলিয়েট হইতে কতকগুলি ঘটনা ও সংস্থান গৃহীত। দ্বিতীয় নাটক 'বীরবালা' (ঢাকা ১৮৭৫)[১] "সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক বীর সেলেউকস এবং মগধেশ্বরের যুদ্ধ" অবলম্বনে পরিকল্পিত। চন্দ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধে শিলবক্ষ (অর্থাৎ সেলেউকস) পরাজিত হয়। শিলবক্ষের কন্যা চন্দ্রগুপ্তের প্রতি অনুরাগিণী হয় এবং পরিশেষে উভয়ে পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ইহাই বীরবালা নাটকের আখ্যানবস্তু। চাণক্যের ভূমিকা অত্যন্ত অবান্তর। চাণক্য শুধু সিন্ধুরাজের এবং শিলবক্ষের মিত্র দেবপালের দুষ্ট অভিসন্ধি ধরিয়া দিয়াছিল। কি গ্রীক কি ভারতীয় সমস্ত স্ত্রী-ভূমিকা বাঙ্গালী মেয়ের ছাঁচে গড়া। চন্দ্রগুপ্তের মাতা দিগম্বরী পুরামাত্রায় বাঙ্গালী গৃহিণী।

তৃতীয় নাটক 'মহারাষ্ট্র-কলঙ্ক' (১৮৭৬) হইতেছে, লেখকের কথায়, "আরঙ্গজীবের সমসাময়িক প্রকৃত ঘটনাময় দৃশ্যকাব্য"। শিবজীর পুত্র শম্ভুজীর লাম্পট্য ও অন্তঃসারশূন্যতা এবং আরংজেব কর্তৃক তাহার শোচনীয় পরাজয় ও নিধন এই বিয়োগান্ত নাটকের বিষয়। মহারাষ্ট্র-কলঙ্কে নাট্যকারের গুণপনার কোনই পরিচয় নাই। "গ্রন্থ সম্বন্ধে একটি কথা" শীর্ষক ভূমিকায় লেখক উপেন্দ্রনাথ দাসের নাটককে প্রকারান্তরে ব্যঙ্গ করিয়া লিখিয়াছেন,

> জনৈক বন্ধু আমার বীরবালা গ্রন্থ উপহার প্রাপ্ত হইয়া আমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এই কএকটী কথা ছিল, 'নির্ব্বোধ! রুচির দিকে চাহিয়া এখন নাটক লিখিতে হয়, এখনকার রুচি, নায়ককে ডনকুইক্‌সটের মত সাজাইয়া এবং নায়িকাকে হারমনিয়ম বাজাইতে বাজাইতে গান করাইয়া পাঠকের এবং গ্রন্থ অভিনয়কালে দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখবর্ত্তী করা, দুই একটী জজ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে নায়ক দ্বারা কোন উপায়ে জুতা লাঠি পিস্তল মারা কিম্বা প্রাণে বধ করা, একটী বাঙ্গালী বালিকা কর্তৃক বহুসংখ্যক গোরা সৈনিকের প্রতি বন্দুক বা পিস্তল ছোড়া, এ সকল তোমার বীরবালাতে নাই, গতিকেই ইহা মিষ্ট লাগিলেও দুর্গন্ধ-যুক্ত।

উমেশচন্দ্র অনেকগুলি উপন্যাস ও বিবিধ গদ্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে কথাসরিৎসাগরের অনুবাদ উল্লেখযোগ্য॥

[১] এই নামে আর একটি নাটক ছাপা হইয়াছিল কলিকাতায়। নাটকটি বিয়োগান্ত ছদ্ম-ঐতিহাসিক। লেখক সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন।

১১

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রথম নাট্যরচনা হইতেছে 'বিধবার দাঁতে মিশি' (১৮৭৪) প্রহসন। শিক্ষিত সমাজে মদ্যপানের ও অন্যান্য উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতি কটাক্ষ করিয়া প্রহসনখানি লেখা। বইটির প্রথমেই উডুম্বর চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র কটাক্ষীকৃত। দ্বিতীয় রচনা 'যৌবনে যোগিনী'তে (১৮৭৬, দ্বি-স ১৮৮৩)[১] পৃথ্বীরাজ ও মহম্মদ ঘোরীর সংঘর্ষ উপলক্ষ্যে তৎকালীন ভারতবর্ষে গৃহবিচ্ছেদ লাম্পট্য এবং হিন্দু-বৌদ্ধ বিরোধ বর্ণিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ভূমিকা গুজরাটের রাজকন্যা "যৌবনে যোগিনী" মায়াবতীর পরিকল্পনায় বঙ্কিমের মৃণালিনীর প্রভাব আছে। এই গানটিতেও বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণ সুস্পষ্ট,

> প্রেমিক বিধানে, নবীন পরাণে, যৌবনে যোগিনী রে!
> শ্যামধন লাগি, গেহ সো তেয়াগি, আজু বিবাগিনী রে!...

মুসলমান শক্তির সহিত সংঘর্ষ উপলক্ষ্যে নাট্যকার ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থার কথাই মনে করিয়াছিলেন। "ভারতের জয়, গাও, ভারতের জয়,"—বইটির মর্ম্মকথা। পঞ্চদশ দৃশ্যে গিজনী কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ পৃথ্বীরাজের উক্তি স্মরণীয়,

> ...লুটচে, ঐ লুটচে, ভারতের সর্ব্বস্ব লুটচে। ভারতবাসিগণ! দুরাত্মা ম্লেচ্ছেরা ভারতের সর্ব্বস্ব লুটচে, চেয়ে দেখ। ওঠ, ওঠ, নিদ্রা ত্যাগ কর। তরবারি ধর, তরবারি ধর, জননী ভারতভূমিকে রক্ষা কর। সমরে প্রাণত্যাগ কর, বীরগতি লাভ হবে। ঐ নিলে, ম্লেচ্ছেরা ভারতের সর্ব্বস্ব নিলে! ভারতবাসিগণ! ঘুমায়োনা, ওঠ, ঐক্যতার হার পর, তরবারি ধর, সংগ্রাম কর; আর্য্যসন্তানগণ! ওঠ, তরবারি ধর।...

তৃতীয় নাট্য রচনা 'পাষাণ প্রতিমা'র (১৮৮৪)[২] বিষয় পঞ্জাবের রাজা ও স্বাধীন সর্দ্দারদের আত্মকলহ। নাটকটি অত্যন্ত রোমান্টিক। 'কামিনীকুঞ্জ' (১২৮৫)[৩] কৃষ্ণলীলাবিষয়ক গীতিনাট্য, 'নবযুগ' (১২৯৩) ক্ষুদ্র "নাট্যরাসক" বা রূপকনাট্য।

গোপালচন্দ্র একটি বড় "ইতিবৃত্তমূলক নবোন্যাস" লিখিয়াছিলেন, 'বীরবরণ' (১২৯০)। ইহাতে গৌড়ের বৌদ্ধ রাজার সহিত পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু রাজা

[১] গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত। [২] বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত।
[৩] গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত।

বীরসেনের সংঘর্ষ ও শেষোক্তের বিজয়লাভ বর্ণিত।[১] ইঁহার অপর গদ্যরচনা 'রুষীয়' (১৮৮৯), 'সচিত্র রাজস্থান', 'রাজ-জীবনী' (১৮৮২), 'ভিক্টোরিয়া-রাজসূয়' (১৮৭৯) ইত্যাদি।

দ্বিতীয় এক গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'চন্দ্রকলা নাটক' (১২৯১) নিতান্ত অক্ষম লেখকের প্রথম রচনা॥

১২

১৮৭৪-৭৫ খ্রীষ্টাব্দে যে-সকল নাটক রঙ্গালয়ে অভিনীত হইয়াছিল তাহার অনেকগুলি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে এবং কতকগুলি পরবর্ত্তী প্রস্তাবে আলোচিত হইবে। বাকি রচনাগুলির উল্লেখমাত্র এখানে করা যাইতেছে।

শ্রীনাথ চৌধুরীর 'আমি তো উন্মাদিনী'তে (১৮৭৪) এক মাতাল-লম্পটের পত্নীর দুর্দ্দশার কাহিনী বর্ণিত। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'মণিমালিনী' (১৮৭৪) পুরানো ধরণের রোমান্টিক নাটক। অপর এক হরিমোহন কাব্য এবং উপন্যাস লিখিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন; ইঁহার একমাত্র নাটক মিত্রাক্ষরে ও অমিত্রাক্ষরে রচিত 'প্রণয়-প্রতিমা' (১৮৮২)। স্থানে ও পাত্রে দেশি-বিলাতির খিচুড়ি পাকানো হইয়াছে। 'নকুড় বাবু' (১৩১৬) তৃতীয় হরিমোহনের রচনা; ইনি 'ভজহরি সর্দ্দার' উপন্যাসের রচয়িতা। অক্ষয়কুমার চৌধুরীর 'দুর্গাবতী নাটক' (১৮৭৪) ইতিহাসাশ্রিত। রঙ্গলালের পদ্মিনী-উপাখ্যান হইতে "ঐ শুন ভেরীর আওয়াজ হে" ইত্যাদি ছত্র ইহাতে উদ্ধৃত আছে। গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়ের 'তারা বাই'এর (১৮৭৪) আখ্যানবস্তুও টডের রাজস্থান হইতে গৃহীত। "বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য" নামে ইনি 'একেই কি বলে বাঙ্গালী সাহেব?' (১৮৭৪, দ্বি-স ১৮৮০) নাটক লিখিয়াছিলেন। শেষে একটি উদ্দীপনাময় গান আছে।

ভারতবর্ষে মুসলমান আক্রমণ ও অত্যাচার বিষয়ে অনেকগুলি নাট্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে এইগুলিও পড়ে—হরিমোহন ভট্টাচার্য্যের 'সমরে কাহিনী নাটক' (১৮৭৫), মহেন্দ্রলাল বসুর 'চিতোর রাজসতী পদ্মিনী' (১৮৮৫),[২] রাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর 'ভারতবিজয়' (প্রথমাংশ ১৮৭৫), নবীনচন্দ্র

[১] উপহার-পত্র, "স্বজাতীয় ভ্রাতৃবৃন্দের করকমলে জননী জন্মভূমির এই পূর্ব্বালেখ্য গ্রন্থকার কর্তৃক সসম্মানে উপহার প্রদত্ত হইল।"

[২] গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত। নাটকটিতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান ও রঙ্গলালের "স্বাধীনতা হীনতায়" আছে।

বিশ্বারম্ভের 'ভারতের সুখশশী যবনকবলে' (১৮৭৫), অজ্ঞাতনামা লেখকের 'বীরনারী' (১৮৭৫),[১] কালীচরণ পালের 'অস্তমিত সূর্য্য' (১৮৭৬), মনোরঞ্জন গুহের 'ভারত বন্দিনী' (বরিশাল ১৮৭৬), অজ্ঞাতনামা লেখকের 'ভারত অধিকার' (১২৮৪), ইত্যাদি।

হরিমোহন ভট্টাচার্য্যের সমরে কাহিনী নাটকের প্রধান ঘটনা হইতেছে সিন্ধুদেশের রাজা দাহির সিংহের সহিত "যবন সৈন্যাধ্যক্ষ" মহম্মদ কাসিমের যুদ্ধ এবং তাহাতে রানী কমলাদেবীর শৌর্য্যপ্রদর্শন। নাটকে দুইটি গান আছে, আদিতে সত্যেন্দ্রনাথের "মিলে সবে ভারত সন্তান" এবং শেষে দ্বিজেন্দ্রনাথের "মলিন মুখচন্দ্রমা"। মনে হয় সমরে-কামিনী হিন্দুমেলায় অভিনয়ের জন্য রচিত হইয়াছিল। বীরনারী নাটক এবং অঘোরনাথ ঘোষের 'ডাহির-সেনাপতি নাটক'ও (১২৮৫)[২] এই কাহিনী লইয়া লেখা। বিপিন-বিহারী ঘোষালের 'বঙ্গের পুনরুদ্ধার'এ (১৮৭৪) সুলতান গিয়াসুদ্দীন ও রাজা গণেশের সংঘর্ষ চিত্রিত।

ইতিহাসাশ্রিত এবং ইতিহাসকল্পিত নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য— কমললোচন মুখোপাধ্যায়ের 'হেমপ্রভা' (১৮৭২), কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রমথনাথ নাটক' (১৮৭৫), অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অপূর্ব্বসংযোগ বা ইন্দুমতী নাটক' (১৮৭৬), বিহারীলাল ঘোষালের 'ইরাবতী নাটক' (১২৮৫), রমেশচন্দ্র লাহিড়ীর 'গৌড়েশ্বর নাটক' (১২৮০),[৩] যদুনাথ সেনগুপ্তের 'উত্তর বুধসিংহ চরিত' (১৮৮৬), যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের 'অজয়েন্দু নাটক' (১৮৭৫), অজ্ঞাতনামা লেখকের 'সরফরাজ খাঁর পতন' (১২৮৬), যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যো-পাধ্যায়ের 'রক্তদন্তা বা আমাদনগর পতন' (১৮৮০) ও 'জয়াবতী' (১৮৮৪), সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'হামির' (১৮৮১), অজ্ঞাতনামা লেখকের 'যুগল নায়িকা নাটক' (১২৮৮), হরিশ্চন্দ্র হালদারের 'কালাপাহাড়' (১৮৮১), সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জগজ্জ্যোতি বা নূরজাহান' (১৮৮২), আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'সরোজিনী নাটক' (১৮৮২), অজ্ঞাতনামা লেখকের 'রাজপুত-পতন,[৪] মহেন্দ্রনাথ বিশারদের 'নাইকোপলিসের যুদ্ধ' (১২৯৩)[৫],

[১] বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত। নাটকটি স্বর্ণপ্রভা বসু ও বিধুমুখী রায়কে উৎসর্গিত।

[২] বঙ্গদর্শনে সমালোচিত। [৩] বঙ্গদর্শনে (১২৮১ কার্ত্তিক) সমালোচিত।

[৪] অ্যাডিসনের 'কেটো' অবলম্বনে রচিত।

[৫] "লভস্ অব দি হারেমের খালিল কথিত একটি গল্প হইতে নাটকাভিনীত।" লেখক মিল্‌টনের 'কোমস্'এর অনুবাদ করিয়াছিলেন।

ইত্যাদি। 'হামির' ছাপা হইয়া প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছিল। পদ্মিনীর গান ছাড়া অপর গানগুলি গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচনা। হরিশ্চন্দ্র হালদারের দ্বিতীয় নাট্যরচনা হইতেছে 'বেদবতী বা পতিপ্রাণা' (১৮৮৩)। বিষয়বস্তু ছদ্ম-পৌরাণিক। হরিশ্চন্দ্র ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু "হ. চ. হ"। ইনি ছবি আঁকিতে পারিতেন।

বিবিধ রোমান্টিক নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়ের 'শশিপ্রভা নাটক' (১৮৭২), শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'মধুমতী নাটক' (১৮৭৩), প্রিয়মাধব দের 'পিতার কি পতির' (১৮৭৪), শশিভূষণ ঘোষের 'চারুপ্রভা' (১৮৭৫), ব্রজেন্দ্রকুমার রায়ের 'প্রকৃত বন্ধু' (১৭৭৫), সত্যকৃষ্ণ বসু সর্ব্বাধিকারীর 'কর্ণাটকুমার' (১৮৭৫), অজ্ঞাতনামা লেখকের 'প্রণয়-পরিশোধ' (১৮৭৫), রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'বিজয়নগরাধিপ মহারাজা রাম' (১৮৭৫), বিশ্বেশ্বর বসুর 'প্রমোদ-মনোরমা' (বরিশাল ১৮৭৫), গগনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রণয়প্রকাশ' (মুর্শিদাবাদ ১৮৭৫), জগদ্বন্ধু ভট্টাচার্য্যের 'প্রণয়ের প্রতিফল' (ঢাকা? ১৮৭৬), মোহিনীমোহন ঘোষালের 'প্রণয়ের প্রতিফল' (ঢাকা? ১৮৭৬), রজনীকান্ত শর্ম্মার 'কুমুদকামিনী' (ঢাকা ১৮৭৬), অজ্ঞাতনামা লেখকের 'হেম-তমালিনী' (১৮৭৬), দ্বিজবর চেলের 'পঙ্কজ-তপস্বিনী' (১৩৮৪), "গজপতি রায়"-এর 'হীরালাল' (১২৮৪), অজ্ঞাতনামা লেখকের 'নগেন্দ্রবালা নাটক' (১৮৭৭),[১] রাধামাধব বসুর 'সে কি আমার' (১৮৭৭),[২] অজ্ঞাতনামা লেখকের 'শৈলজাকুমারী নাটক' (১৮৮০), শ্রীশচন্দ্র উপাধ্যায়ের 'হৈমবতী নাটক' (১৮৮১), কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায়ের 'লীলাবতী নাটক' (১২৮৮), রমাকান্ত সেনের 'ললিত-কুসুম' (১৮৮২), ইত্যাদি।

এই নাটকগুলি শেক্‌স্পিয়র অবলম্বনে লেখা—প্রমথনাথ বসুর 'অমরসিংহ' (১৮৭৪ ; হ্যামলেট), যোগেন্দ্রনারায়ণ দাস ঘোষের 'অজয়সিংহ-বিলাসবতী' (১৮৭৮ ; রোমিও-জুলিয়েট), তারকনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'ম্যাকবেথ' (বরাহনগর ১৮৭৫), অজ্ঞাতনামার 'মদনমঞ্জরী' (১৮৭৬ ; এ উইণ্টার্স টেল),

[১] লেখকের পিতার নাম উদয়চাঁদ মুখোপাধ্যায়, নিবাস দর্জ্জিপাড়া ষ্ট্রীট কলিকাতা।

[২] রাধামাধব বসু (১৮৪০-১৯০৫) বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধু এবং সহকর্ম্মী ছিলেন। ইনি স্ত্রীশিক্ষা ও বিবাহসংস্কার বিষয়ক দুইটি নিবন্ধ এবং 'মুসলমান দায়ভাগ' (১৮৭৪) রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার কনিষ্ঠ পুত্র পরলোকগত শ্রদ্ধাস্পদ হেমেন্দ্রমোহন বসু মহাশয়ের কাছে এই তথ্য পাইয়াছি।

প্যারীলাল মুখোপাধ্যায়ের 'সুরলতা' (১৮৭৭, মার্চেণ্ট অব্ ভিনিস), চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'প্রকৃতি নাটক' (১৮৮০ হইতে ১৮৮৪ মধ্যে ; টেম্‌পেষ্ট), ইত্যাদি।

অজ্ঞাতনামা লেখকের 'চারুশীলা নাটক' (১৮৭৬) প্রাচীন ধরণের রোমাণ্টিক নাটক হইলেও ইহার মধ্যে সমসাময়িক বাঙ্গালী-সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতার ছবি আছে। মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুইখানি নাটক পাওয়া যায়, 'হেমপ্রভা' (১৮৭৪) এবং 'প্রমোদকুমার নাটিকা' (১৮৭৬)। পঞ্চতন্ত্রে "লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ" ইত্যাদি শ্লোকঘটিত যে গল্প আছে তাহার সঙ্গে বিক্রমাদিত্য-ভানুমতী-কালিদাসের উপকথা মিশাইয়া প্রমোদকুমার নাটিকার কাহিনী পরিকল্পিত। নবদ্বীপচন্দ্র নন্দীর 'তিলোত্তমা নাটক'ও (১৮৭৪) বিক্রমাদিত্য-ঘটিত লৌকিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত। রাজকৃষ্ণ দত্ত 'দ্রৌপদী-হরণ নাটক' (১৮৭২) ও 'অরুন্ধতী নাটক' (১৮৭৭) ছাড়া একটি প্রহসন ও একটি নাট্যকাব্য রচনা করিয়াছিলেন, 'যেমন রোগ তেমনি রোঝা' (১২৮৮)[১] এবং 'চন্দ্রপ্রভা' (১২৯৩)। প্রমথনাথ বসুর 'অপূর্ব্বমিলন' (১৮৭৮) ছদ্ম-ঐতিহাসিক রোমাণ্টিক নাটক। গৌরচন্দ্র সিদ্ধান্তের 'ইন্দ্ররেখা নাটক' (১৮৭৮) "সাধারণের জন্য লিখিত হয় নাই" ; লেখকের পৃষ্ঠপোষক অনন্তলাল মুখোপাধ্যায়ের জন্যই বিশেষ করিয়া রচিত। তাই লেখক বিজ্ঞাপনে সাধারণ পাঠককে সাবধান করিয়া দিয়াছেন, "অনন্তবাবুর সহিত যাঁহাদের বৈপরীত্য বা অসাদৃশ্য লক্ষিত হইবে 'ইন্দ্ররেখা' তাঁহাদের প্রীতিপ্রদ হইবে না।" ডাক্তার দুর্গাদাস করের জ্যেষ্ঠপুত্র ডাক্তার রাধাগোবিন্দ (আর. জি. কর নামে বিখ্যাত) ন্যাশনাল থিয়েটারের একজন উদ্যোক্তা ছিলেন। মধ্যম, সেকালের বিখ্যাত অভিনেতা রাধামাধব কর, 'বসন্তকুমারী' (১৮৭৯) নামে একখানি বিয়োগান্ত রোমাণ্টিক নাটক গদ্যে পদ্যে রচনা করিয়াছিলেন। কনিষ্ঠ রাধামাধবও নাটক লিখিয়াছিলেন 'সরোজা' নামে।

রাধামাধব হালদার তিনখানি নাটক ও দুইটি প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন। 'শশিকলা' (১২৮১)[২] ও 'চন্দ্রলেখা' (১৮৭৫) রোমাণ্টিক নাটক। শেষেরটি

[১] মলিয়েরের 'ল মেদিস্যাঁ মাল্‌গ্রে লুই' প্রহসন অবলম্বনে। অজ্ঞাতনামার 'গোবৈদ্য', নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নিরুপায়ে চিকিৎসক' (১৯০২) এবং পরবর্ত্তী কালে কালীচরণ মিত্রের 'অম্লমধুর' ইত্যাদির মূলও এই বই। রাজকৃষ্ণ চণ্ডীর গদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন (১৮৯৬)।

[২] আদ্যন্ত গদ্যে লেখা, কোন গান নাই। ভূমিকায় লেখক বলিয়াছেন, "প্রসিদ্ধ ইংরাজি ট্রেজিডি যেরূপ পদ্ধতিতে লিখিত হইয়া থাকে, ইহাও সেই প্রণালী মত লিখিত হইয়াছে এবং ইহাতে রসের মিশ্রণ নাই।"

বিয়োগান্ত। 'শৈব্যাসুন্দরী' (১৮৭৬) পৌরাণিক নাটক, গদ্যে পদ্যে লেখা। প্রহসন দুইটি হইতেছে 'বেশ্যানুরক্তি বিষম বিপত্তি' (১৮৬৩) ও 'এই কলিকাল' (১৮৭৫)। 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' (১৮৮৬) এবং 'পাসকরা মাগ' (১২৯৫) প্রহসন রাধাবিনোদ হালদারের লেখা। ইনি তিনখানি উপন্যাস—'সরোজ-প্রতিমা', 'বনলতা' এবং 'প্রেমের হাট' (১২৯৯) এবং দুইখানি নাটকও লিখিয়াছিলেন। 'নাগযজ্ঞ' (১৮৮৬) পৌরাণিক নাটক, গিরিশচন্দ্রের অনুসরণে ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষরে রচিত। 'মহীকুলধ্বংস'ও পৌরাণিক নাটক।

'তারকবধ কাব্য'[১] রচয়িতা শ্রীনাথ কুণ্ডীর ষড়ঙ্ক নাটক 'বিজয়কুমারী' (১৮৭৩) পুরানো ধরণের রোমান্টিক নাটক। রচনা মন্দ নয়। ইঁহার 'গত নিকাশ ও হাল বন্দোবস্ত' (১৮৭৭) সমাজচিত্রঘটিত ক্ষুদ্র প্রহসন।

ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী ভট্টাচার্য্য প্রণীত দ্বাদশাঙ্ক 'যুগল-নায়িকা বা ষড়্‌রসামোদ নাটক' (১২৮৪) বিচিত্র রচনা। পাত্র-পাত্রী হইতেছে দেবদেবী ডাকিনী-যোগিনী হইতে টোলের অধ্যাপক ছাত্র পর্য্যন্ত। চতুষ্পাঠীর দৃশ্য কৌতুকাবহ। ইঁহার অপর নাট্যগ্রন্থ 'পণ্ডিত-মূর্খ প্রহসন'এর (১৮৮১) ভূমিকা হইতে জানা যায় যে নবদ্বীপ-বাসী লেখক বেঙ্গল থিয়েটারের অধ্যক্ষ শরৎচন্দ্র ঘোষের অনুরোধে আরো দুইখানি নাটক লিখিয়াছিলেন, 'গন্ধর্ব্ববনিতা বা কীচকবধ' এবং 'দ্রৌপদীর চিতারোহণ বা দুর্য্যোধনবধ'। প্রথম দুইখানি বেঙ্গল থিয়েটারে একাধিকবার অভিনীত হইয়াছিল। শরৎচন্দ্রের অকালমৃত্যুতে তৃতীয় নাটকটি অভিনীত হইতে পারে নাই। পঞ্চতন্ত্রে পণ্ডিতমূর্খের গল্পের সহিত বিক্রমাদিত্যের কাহিনী যোগ করিয়া পণ্ডিতমূর্খ প্রহসনের প্লট গঠিত। নৈয়ায়িক বৈদান্তিক জ্যোতিষী এবং কবিরাজ এই চারিটি পণ্ডিতমূর্খের ভূমিকায় বাঙ্গালী পণ্ডিতই উপহসিত। ব্রহ্মব্রত শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ করিয়াছিলেন (১৮৭৭)।

অজ্ঞাতনামা লেখকের 'কাদম্বরীর বিবাহ কি সম্বন্ধ' (১৮৭৯) বাণভট্টের কাদম্বরীর আখ্যানবস্তু অবলম্বনে পরিকল্পিত। রামলাল মুখোপাধ্যায়ের 'মহাশ্বেতাতাপসীবেশ' নাটকের (১২৮৫) বিষয়ও তাহাই॥[২]

[১] আর্য্যদর্শনে (জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৩) সমালোচিত।

[২] কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী ব্যাঘ্রটীকুরা গ্রামের নাট্যসমাজে অভিনয়ের উদ্দেশ্যে লেখা।

১৩

সমাজচিত্রঘটিত নাট্যগ্রন্থের কাহিনীতে প্রধানত পূর্ব্বতন ধারা, অর্থাৎ লাম্পট্য নেশাখুরি ইত্যাদি, অনুসৃত। সমসাময়িক ঘটনার মধ্যে তারকেশ্বরের মাধবগিরি-এলোকেশী-নবীনের মোকদ্দমা বটতলার লেখকদিগকে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া প্রহসন-নক্‌শার বিষয় যোগাইয়াছিল। কয়েকখানি প্রহসনে সমসাময়িক সমাজ-সংস্কারের ছোটবড় সমস্যা উপস্থাপিত হইয়াছিল।

টাকী-নিবাসী কৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরীর পঞ্চাঙ্ক 'অমরনাথ নাটক' (১৮৭৩) অশিক্ষিত সমাজের হীনচিত্র উদ্‌ঘাটিত করিয়া সংস্কারের এবং আধুনিকতার সমর্থন করিয়াছে। হুতোম-পঁ্যাচার-নক্‌শার সঙ্গে বইটির তুলনা চলে। একেই-কি-বলে-সভ্যতার এবং সধবার-একাদশীর প্রভাবও লক্ষণীয়। কিন্তু নাট্যরচনা হিসাবে বর্ণনাত্মক বইখানির কোন মূল্য নাই। কৃষ্ণচন্দ্রের অপর রচনা 'প্রণয়-প্রমাদ' (১৮৭৭) গার্হস্থ্য রোমান্টিক নাটক।

দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায় যে কয়খানি প্রহসন ও নাটক লিখিয়াছিলেন সেগুলির আখ্যানবস্তু বাস্তবঘটনা হইতে গৃহীত। ' "চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী" ' (১৮৭২) প্রহসনে দত্তকপুত্র গ্রহণের ব্যর্থতা চিত্রিত। বঙ্গদর্শনে (১২৮০) সমালোচনাপ্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "প্রথম অঙ্কে কলিকাতার কোন বিখ্যাত ভদ্র সংসারের গ্লানি আছে।" 'ভণ্ডতপস্বী' (১৮৭৪) তারকেশ্বরের মোহন্তের ব্যাপার লইয়া লেখা। পঞ্চাঙ্ক 'চা-কর দর্পণ নাটক'এর (১৮৭৫)[১] বিষয় হইতেছে চা-কুলীদের উপর চা-কুঠার শ্বেতাঙ্গ কর্ত্তাদের অত্যাচার। জেলের কয়েদীদের উপর অত্যাচার 'জেল-দর্পণ নাটক'এর (১৮৭৫) বিষয়।

বাঙ্গালী সমাজের কদাচার বিষয়ে 'সাক্ষাৎ-দর্পণ' নাটক রচিত হইয়াছিল (১৮৭১)। নাটকটি ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল। অজ্ঞাতনামা লেখকের বাল্যবন্ধু "শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল গুপ্ত সি. এস."কে বইটি উৎসর্গিত।

প্রসন্নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'পল্লীগ্রাম দর্পণ'এ (১৮৭৩) নাটকত্ব কিছু নাই।

[১] মুখপাতে চা-কর সাহেব কর্ত্তৃক কুলী রমণীর নির্য্যাতনের একটি লিথো ছবি আছে।

তবে কলিকাতার নিকটে গঙ্গাতীরবর্ত্তী গ্রামের দুর্দ্দশার স্বাভাবিক চিত্র আছে প্রস্তাবনার কবিতায় বর্ষার বর্ণনা মন্দ নয়,

চাটুর্য্যে মুখুর্য্যে দাদা	আজানুচুম্বিত কাদা,	সম্বিত লম্বিত কোঁচা সব।
ছাতি ঘাড়ে হেলে হেলে,	ফিরে ফিরে এলে এলে,	বলিছেন কি করহে সব।
মেঘে করে কড়মড়	বাড়ি পড়ে হড়মড়,	পথে ইট গড়াগড়ি যান।
বৃষ্টি পড়ে টুপটাপ	ড্যাল পড়ে ঝুপঝাপ,	ছেলে-বলে "নদী এল বাণ"

মুসলমান লেখকদের মধ্যে প্রথম নাট্যকার মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২) দুইটি নাটক ও একটি প্রহসন লিখিয়াছিলেন। তিন-অঙ্ক 'বসন্তকুমারী নাটক'এর (১৮৭৩, দ্বি-স ময়মনসিংহ ১২৯৪) কাহিনী রোমান্টিক। প্রস্তাবনা সংস্কৃত নাটকের মত। দৃশ্যের নাম "রঙ্গস্থল"। সহজ সংলাপময় রচনা। মাঝে-মাঝে অমিত্রাক্ষর ছত্র আছে। কয়েকটি গানও আছে। 'জমীদার দর্পণ নাটক'ও (১৮৭৩) তিন অঙ্কে বিভক্ত। পাড়াগাঁয়ের এক মুসলমান জমিদারের অত্যাচার-কাহিনী নাটকটির বিষয়। ইহাতে বুড়-সালিকের-ঘাড়ে-রোঁ-র প্রভাব আছে। বাস্তবচিত্র হিসাবে নাটকটি মূল্যহীন নয়। প্রস্তাবনায় লেখক সূত্রধারের মুখে বলাইয়াছেন, "আপনি কি শুনেন নাই 'জমিদার দর্পণ নাটক' যে নক্‌সাটি এঁকেছে তার কিছুই সাজানো নয়, অবিকল ছবি তুলেছে।" ভাষা সরল কথ্য। ইহাতেও অমিত্রাক্ষর ছত্র কিছু আছে এবং গান আছে। বঙ্গদর্শনে (ভাদ্র ১২৮০) সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র জমীদার-দর্পণের ভাষায় এবং কোন কোন দৃশ্যের প্রশংসা করিয়াছিলেন। মশাররফ হোসেনের অপর নাট্য-রচনা 'এর উপায় কি' (? ১৮৭৫) প্রহসন এবং 'বেহুলা গীতাভিনয়' (১৮৮৯)। 'বান্ধব'এর (শ্রাবণ-ভাদ্র ১২৮৩) সমালোচনা হইতে মনে হয় প্রহসনখানি পূর্ব্ব দুই নাটকের মত হয় নাই।

মশাররফ হোসেনের পর দুইজন মুসলমান নাট্যকারের রচনার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে—মোহম্মদ আবদুল করিমের 'জগৎমোহিনী' (১৮৭৫) এবং কাদের আলীর 'মোহিনী প্রেমপাশ' (১৮৮১)। দুইখানিই রোমান্টিক নাটক।

বালেশ্বর-নিবাসী রাধানাথ বর্দ্ধনের 'সরোজিনী নাটক' (১৮৭৩)[১] ছদ্ম-ঐতিহাসিক নাটকের মত হইলেও ইহার মধ্যে দীনবন্ধু মিত্রের প্রভাব বিশেষ করিয়া পড়িয়াছে। বইটির ভাব ও ভাষা সর্ব্বত্র ভদ্র নয়। বারুইপুর-নিবাসী

[১] বঙ্গদর্শনে (১২৮০ ভাদ্র) সমালোচিত।

নিমচন্দ্র মিত্রের 'শরৎকুমারী নাটক'এ (১৮৭৩) লাম্পট্যের ও নারীলাঞ্ছনার চিত্র আছে। দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' নাটকে (১২৮০)[১] দেখান হইয়াছে যে শিক্ষা পাইলে বাঙ্গালীর মেয়ের পক্ষে বিপথে যাইবার সম্ভাবনা প্রবল হয়।

তারকেশ্বরের মোহন্ত মাধবগিরি গৃহস্থ-কন্যা এলোকেশীর উপর অত্যাচার করিয়া জেলে যায়। এই ব্যাপারে তখন দেশে যে প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছিল তাহার ইন্ধনরূপে বটতলা ও অন্যান্য সস্তা প্রেস হইতে এই বিষয়ে অসংখ্য প্রহসন বাহির হইতে থাকে। নিমাইচাঁদ শীলের তীর্থমহিমা নাটকের ও দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের ভণ্ড-তপস্বী প্রহসনের উল্লেখ করিয়াছি। অপরঞ্চ এই নাটক প্রহসনগুলি লেখা হইয়াছিল—'মোহন্তের এই কি কাজ !!' (১৮৭৩); 'মোহন্তের যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' (১৮৭৩); 'বীরেন্দ্রবিনাশ নাটক' (১২৮২) রচয়িতা হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়ের 'মহন্ত পক্ষে ভূতো নন্দী' (১২৮০); যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের 'মোহন্তের এই কি দশা !!' (১২৮০) এবং 'উঃ ! মোহন্তের এই কাজ !!' (১৮৭৩, তৃ-স ১৮৭৪)[২]; 'মোহন্তের যেসা কি তেসা' (১৮৭৪); 'মোহন্তের শেষ কান্না' (১৮৭৪); তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়ের 'মোহন্তের কি দুর্দ্দশা' (১৮৭৪); চন্দ্রকুমার দাসের 'মোহন্তের কি সাজা' (১৮৭৪); ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় 'মোহন্তের চক্রভ্রমণ' (১৮৭৪); সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যমালয়ে এলোকেশীর বিচার' (১৮৭৩), 'মোহন্তের দফারফা' (১৮৭৪), 'তারকেশ্বর নাটক' (১৮৭৪) এবং 'মোহন্তের কারাবাস' (১৮৭৪); মহেশচন্দ্র দাস দের 'মোহন্ত এলোকেশী' (১৮৭৫); নন্দলাল রায়ের 'মোহন্ত-এলোকেশী'; রাজেন্দ্রলাল ঘোষের 'নবীন মহন্ত' (১৮৭৪) ও 'নবীনের খেদ' (১৮৭৪); জহরিলাল শীলের 'নবীন নাটক' (১৮৭৬); ইত্যাদি।

যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের 'কেরাণী-দর্পণ' (১৮৭৪) ন্যাশনাল ও বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল। ইহাতে কলিকাতার কেরানি-জীবনের বাস্তব চিত্র আছে। কেরানির গৃহজীবন, তাহার আপিসের পরিবেশ, খাস বিলাতি বড়-সাহেব এবং ফিরিঙ্গি ছোট-সাহেব, ছোট বড় কেরানিবাবু—সবই যেন মূর্ত্তিমান্

[১] বঙ্গদর্শনে (১২৮১) নির্ম্মমভাবে সমালোচিত। দেবেন্দ্রনাথ নগেন্দ্রনাথ ও কিরণচন্দ্র তিন ভাই-ই রঙ্গালয়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিরণের রচনার পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি, নগেন্দ্রের রচনার পরিচয় পরে দ্রষ্টব্য।

[২] চারিখানি লিথো ছবি আছে।

হইয়াছে। নীলদর্পণ নাটকের সঙ্গে কেরাণী-দর্পণের তুলনা করা চলে, তবে ইহা দীনবন্ধুব নাটকের মত গ্রাম্যরসাশ্রিতও নয় এবং দুঃসহ ট্রাজেডি-ভারাক্রান্তও নয়। কেদারনাথ ঘোষের 'পাপের প্রতিফল নাটক' (১২৮২) গার্হস্থ্য ট্রাজেডি। বিষয় পিতাপুত্রের বিরোধ ও শেষে পুত্র কর্তৃক পিতৃহত্যা।

ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তীর 'হীরক অঙ্গুরীয়ক' ক্ষুদ্র নাট্য (১৮৭৫)। ইহাতে কলিকাতাবাসী বাঙ্গালী ভদ্রলোকের লাম্পট্য-কাহিনী চিত্রিত। 'হেমচন্দ্র'এ (১৮৭৬) জমিদারের অত্যাচারের বর্ণনা। লেখকের 'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসে এই দুইটি নাট্যেরই বীজ লভ্য।

প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী "সুকুমারী দত্ত" (গোলাপী) প্রণীত ও প্রকাশিত 'অপূর্ব্ব সতী নাটক'এর (১৮৭৫) বিষয় এক পতিতা-দুহিতার প্রণয়নিষ্ঠার কাহিনী। হরমণি বেশ্যার কন্যা নলিনী শিক্ষা পাইয়া মাতৃব্যবসায়কে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে। সুবর্ণপুরের জমিদার-পুত্র চন্দ্রকেতুর সঙ্গে হরমণি নলিনীর পরিচয় করিয়া দিলে নলিনী তাহাকে ভালোবাসিয়া ফেলে। তরুণ চন্দ্রকেতুর কাছে অর্থের আশা নাই দেখিয়া হরমণি তাহাকে আসিতে নিষেধ করে। তখন বন্ধু ব্রজেন্দ্রের সহায়তায় চন্দ্রকেতু নলিনীকে লইয়া কাশী পলাইয়া যায়। খবর পাইয়া চন্দ্রকেতুর পিতা তাহাকে জোর করিয়া বাড়ীতে লইয়া আসে। নলিনী তখন আত্মহত্যা করিয়া জ্বালা জুড়ায়। ইহাই কাহিনী। বইটির রচনারীতি একেবারেই ভালো নয়। মুখবন্ধ হইতে জানা যায় যে আশুতোষ দাস গ্রন্থরচনায় সহায়তা করিয়াছিলেন। সম্ভবত ইনিই আসল লেখক।[১]

"জনৈক ডাক্তার প্রণীত" পঞ্চাঙ্ক 'ডাক্তার বাবু নাটক' (১৮৭৫) ভালো নাট্যরচনা। ইহাতে কলিকাতার কোন কোন ডাক্তার যেরূপভাবে অসাধু উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করে—যেমন ঝাঁঝালো তেজি ঔষধ বলিয়া ব্রাণ্ডি দেওয়া, নিজের ডিস্‌পেন্‌সারি হইতে ঔষধ লইতে বাধ্য করা, মিথ্যা সার্টিফিকেট দেওয়া ইত্যাদি—তাহার যথাযথ চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। লেখক প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতার সাহায্যে বইটি লিখিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণনায় অতিরঞ্জন দোষ লক্ষিত হয় না। ভূমিকায় লেখক বলিয়াছেন,

> আমি পাঠকদিগকে চমৎকৃত করিতে চেষ্টা করি নাই, কেবল সাবধান করিবার নিমিত্ত লিখিয়াছি। আমার রচনা পড়িয়া আমোদ হইতে না পারে, কিন্তু উপকার হইতে

[১] ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির ক্যাটালগে বইটি আশুতোষ দাস ও সুকুমারী দত্তের যুক্ত রচনা বলিয়া উল্লিখিত।

পারিবে, ইহাতে রসোদয় হইতে না পারে, কিন্তু জ্ঞানোদয় হইতে পারিবে। পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, যদি আমার এই 'ডাক্তারবাবু নাটক' পড়িয়া, সমাজের কিছুমাত্র উপকার হয়, তাহা হইলেই আমি আমার যত্ন, পরিশ্রম ও সম্প্রদায়বিশেষের আশঙ্কিত অপ্রিয়ভাজনতা সার্থক বলিয়া জ্ঞান করিব।

বিরাজমোহন চৌধুরীর 'বঙ্গবিধবা' রূপক (বহরমপুর ১২৮২) বিধবাবিবাহ-ঘটিত।[১] ইঁহার 'সরস্বতী পূজা' (ঐ ১৮৭৫) ইংরাজি-শিক্ষার বিরুদ্ধে লেখা। অজ্ঞাতনামা লেখকের 'মেয়ে মনষ্টার মিটিং প্রহসন'এ (১২৮১) স্ত্রীস্বাধীনতা উপহসিত হইয়াছে। "কোন ভুক্তভোগিপ্রণীত" 'হাসিও আসে কান্নাও পায়' (১৮৭৪) "মেলেরিয়া জ্বর-সংক্রান্ত প্রহসন"। কানাইলাল সেনের 'কলির দশ দশা !!' প্রহসন (১২৮২) ও "বঙ্গদর্শনসম্পাদকস্য অনুমত্যনুসারেণ কেনচিদ্ গ্রাহকেন বিরচিতম্" 'বলদমহিমা নাটক' (ঢাকা ১২৮১) উল্লেখযোগ্য।

সোমড়া-নিবাসী দুর্গাচরণ রায় 'দুঃখনিশি অবসান বা শৈলবালা' (১২৮৩) নাটক ও 'পাশ করা ছেলে !!' (১৮৭৯) প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা ভূগোল ও ইতিহাস বর্ণনাচ্ছলে সরস ভ্রমণ-কাহিনী 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন'। দুঃখনিশি-অবসান গার্হস্থ্য রোমান্টিক নাটক। অধিকাংশ ভূমিকা নিতান্ত স্বাভাবিক। জগদম্বার ভূমিকা অতিমাত্রায় বাস্তব। সমসাময়িক জীবনচিত্র হিসাবে নাটকটিকে সার্থক রচনা বলা যায়। কৌতুক-রসের অবতারণা ভালোই।

'কাব্যকানন' (১৮৭৪) প্রণেতা হীরালাল ঘোষের 'রোকা কড়ি চোকা মাল' প্রহসন (১২৮৬) "বঙ্গরঙ্গভূমির অভিনেতৃগণের অনুমত্যনুসারে" প্রকাশিত হইয়াছিল। 'চারুপ্রভা' (১৮৭৪) ও 'অপূর্ব্ব পরিণয়' নাটক প্রণেতা শশিভূষণ ঘোষ সম্ভবত ইঁহার আত্মীয় ছিলেন। অজ্ঞাতনামা লেখকের 'প্রতিমা-বিসর্জ্জন' (১৮৭৭) বিয়োগান্ত গার্হস্থ্য নাটক।

সমাজ ও গার্হস্থ্য চিত্র-সংবলিত রোমান্টিক-অরোমান্টিক উল্লেখযোগ্য অপর নাট্যগ্রন্থ হইতেছে বটকৃষ্ণ রায়ের 'বাসরকৌতুক-রহস্য নাটক' (১৮৭৫),[২] কৃষ্ণপ্রসাদ মজুমদারের 'রামের বিয়ে' প্রহসন (১৮৭৬), দয়ালকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'সুশীলা সরলাসুন্দরী নাটক' (১৮৭৩ ; বহুবিবাহের বিরুদ্ধে), নিত্যানন্দ শীলের

[১] বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গিত। "বহরমপুর (এমেটিয়ার) নাট্যসমাজ" কর্তৃক প্রকাশিত।

[২] ইহাতে ঠাকুরবাড়ীতে রুক্মিণীহরণ নাটকের উল্লেখ আছে। ঐ নাটক হইতে একটি গানও উদ্ধৃত হইয়াছে।

'আর যেন কেহ না করে' (শ্রীরামপুর ১৮৭৩), অজ্ঞাতনামার 'মা এয়েচেন !!' (১৮৭৪ ; বেশ্যাসক্তি বিষয়ক প্রহসন), রামচন্দ্র দত্তের 'বাল্যবিবাহ' (১২৮১), প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কুসুমে কীট' (১৮৭৪), কিশোরলাল দত্তের 'হায়রে পয়সা' (১৮৭৬), মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'এই কলিকাল' (১৮৭৫), অজ্ঞাতনামার 'সমালোচক' (১৮৭৫), যদুনাথ দাসের 'পাপের উচিত দণ্ড' (১৮৭৫), "গিরিগোবর্দ্ধন"এর 'একেই বলে বাঙ্গালী সাহেব' (১৮৭৬), অজ্ঞাতনামার 'ঘোঁটমঙ্গল' (১৮৭৭), "বিষ্ণুশর্ম্মা"র 'কপালে ছিল বিয়ে' (১৮৭৮)[১], অজ্ঞাতনামার 'বউঠাকরুন্' (১৮৮১), অম্বিকাচরণ গুপ্তের 'কলির মেয়ে ছোট বউ' (১৮৮১), অজ্ঞাতনামার 'গ্রন্থকার প্রহসন' (১৮৭৫)[২], সুরেন্দ্রনাথ বসুর 'কর্ম্মকর্ত্তা' (১২৮৮), হেমচন্দ্র দত্তের 'শালাবাবুর আক্কেল' (১৮৮১), বঙ্গবিলাস মজুমদারের 'হাতে হাতে ফল' (১৮৮২), যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'ভণ্ড দলপতি দণ্ড' (তৃ-স ১৩০২), সারদাকান্ত লাহিড়ী প্রকাশিত 'ঘোষের পো !' (১২৯৫), কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের 'বৌবাবু' (১২৯৬, দ্বি-স ১৩১২), বিপিনবিহারী বসুর 'শ্রীবৃদ্ধি' (১৮৯০)[৩] ও 'মাণিকযোড়' (১৮৯০), ইত্যাদি। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যেমন দেবা তেম্নি দেবী নাটক' (১৮৭৭), প্যারীলাল মুখোপাধ্যায়ের পঞ্চাঙ্ক 'নলিনীভূষণ নাটক' (১৮৭৮), প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'সভ্যতা সোপান' (১৮৭৮), অজ্ঞাতনামা লেখকের 'নব্য উকীল' (হরিনাভি ১২৮২)[৪], "জনৈক পাণ্ডা" কর্তৃক প্রণীত 'বারইয়ারী পূজা' (১৮৭৮), "প্রজাহিতাকাঙ্ক্ষিণা কেনাচিদ্বান্ধবেন প্রণীতম্" 'সভ্যতা সোপান' (১৮৭৮), শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়ের 'তুমি যে সর্ব্বনেশে গোবর্দ্ধন নাটক' (১২৮৬), জয়কুমার রায়ের 'এঁরা আবার সভ্য কিসে' (ঢাকা ১৮৭৯), মহেন্দ্রনাথ ঘোষালের 'আর্য্য সমাজ নাটক' (১৮৮৪), রামকমল দত্তের 'শৈলেশ্বরী বা বিষময় পরিণয় নাটক (১২৮৬), অজ্ঞাতনামা লেখকের 'কলির সঙ বা তুই গোলাপ' (১৮৮০), মহিমচন্দ্র গুপ্তের 'রাজা হওয়া বিষম দায়' (১৮৮০), অজ্ঞাতনামা লেখকের 'পাঁচ পাগলের ঘর' (১৮৮০), অজ্ঞাতনামা লেখকের 'এই এক প্রহসন' (১৮৮৮),

[১] কুচবিহারের রাজার সঙ্গে কেশবচন্দ্র সেনের কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে কটাক্ষ করিয়া লিখিত।

[২] জ্ঞানাঙ্কুরে (জ্যৈষ্ঠ ১২৮২) প্রশংসিত।

[৩] শেরিডানের 'রাইভালস্' অবলম্বনে।

[৪] ইঁহার অপর নাট্যরচনা 'রামনির্ব্বাসন', 'সীতানির্ব্বাসন' ও 'হরিঘোষের গোয়াল' (১২৯২) প্রহসন।

কালীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর 'চক্ষুঃস্থির প্রহসন' (১২৮২) ও 'গোলকধাঁধাঁ' (১২৮২), গোপালকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গদর্পণ' (১৮৮৫)[১] ও 'বাঙ্গালীর মুখে ছাই' (১৮৭৫), পল্‌তা-নিবাসী প্রাণকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কেরাণি-চরিত' (১২৯২), ইত্যাদি। 'বারইয়ারী পূজা' প্রহসনের রচয়িতার নাম শ্যামাচরণ ঘোষাল। বাস্তবচিত্র হিসাবে প্রহসনখানি মন্দ নহে। "বেচুলাল বেণিয়া" প্রণীত 'হনুমানের বস্ত্রহরণ' (১২৯২)[২] এবং অজ্ঞাতনামা লেখকের 'বেল্লিক বামন' জঘন্যরুচির প্রহসন।

হরিপদ চট্টোপাধ্যায় কয়েকখানি ছোট ছোট প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন, 'পিণ্ডদান' (১২৮৮), 'আক্কেল গুড়ুম, বা কুলের প্রদীপ' (১২৮৯), 'গুঁপো গুম্বুজ বা রসরত্ন' ইত্যাদি। ইঁহার অপর নাট্যরচনার মধ্যে 'নন্দকুমারের ফাঁসী' (দ্বি-স ১২৯৩, চ-স ১২৯৬) উল্লেখযোগ্য।

প্রিয়নাথ পালিতের 'গুপ্তবৃন্দাবন'এ (১৮৭৮, দ্বি-স ১৮৯০) পাই "বৃদ্ধস্য তরুণীভার্য্যা"র কাহিনী। ব্রাহ্মধর্ম্মের পক্ষপাতী শিক্ষিত যুবকের গোপন লাম্পট্যের চিত্রও আছে। গ্রন্থকার "এম-এ, বি-এল্" হইলেও ভাব সর্ব্বত্র রুচিসঙ্গত নয়। ইঁহার 'টাইটেল-দর্পণ' (১২৯১) ছোট প্রহসনে সরকারি-খেতাবলোভী জমিদারের চিত্র অঙ্কিত।

ডাক্তার দুর্গাদাস করের কনিষ্ঠ পুত্র রাধারমণ করের 'সরোজা' নামক ক্ষুদ্র গার্হস্থ্য নাটকটিতে বাঙ্গালী-সংসারের বিধবা ননদের বধূবিদ্বেষের একটি উজ্জ্বল স্বাভাবিক চিত্র পাইতেছি। রচনায় নাট্যকৌশলের ও লিপিচাতুর্য্যের বিশেষ পরিচয় আছে। সরোজা এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল।

কলিকাতার কোন কোন প্রাইভেট স্কুলে শিক্ষাদানবিষয়ে যে শৈথিল্য এবং অর্থাগমের প্রতি যে অতিরিক্ত দৃষ্টি দেখা যায় তাহার চিত্র রহিয়াছে "জনৈক ঘরসন্ধানে" প্রণীত 'স্কুল মাষ্টার' (১৮৮৯) প্রহসনে ॥

[১] ভূমিকায় লেখক বলিয়াছেন, "আত্ম-মন-বিনাশক 'অসুখের শেষ' চাকরীতে যাহাতে আমাদের বীতরাগ এবং স্বাধীন ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রভৃতিতে অনুরাগ বৃদ্ধি হয়, এইজন্যই আমার এইখানি প্রণয়ন করা।"

[২] কয়েকখানি লিথোচিত্র আছে।

১৪

আলোচ্য যুগে নারী-নাট্যকারের সংখ্যা বাড়িয়াছে।[১] লক্ষ্মীমণি দেবীর 'চির সন্ন্যাসিনী' (১৮৭২) গার্হস্থ্য নাটক। "জনৈক ভদ্র মহিলা প্রণীত" 'ত্র্যম্বক সন্তাপিনী নাটক'ও (১৮৭৬) ইহার রচনা বলিয়া মনে করি।[২] নাটকটিতে বৈশিষ্ট্য আছে। ইহাতে দ্বিপত্নীকত্বের দোষ এবং বিধবাবিবাহের যৌক্তিকতা প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং যে-বিবাহ সমাজপ্রথাবহির্ভূত হইলেও ধর্ম্মের চক্ষে নিন্দনীয় নয় সে-বিবাহ অস্বীকার করা দুঃশীলতার পরিচায়ক ইহাও দেখান হইয়াছে। অন্তঃপুরচিত্র বেশ বাস্তব এবং মনোরম। অবান্তর ভূমিকাগুলি জীবন্ত। মেয়েলি ছড়ার ছড়াছড়ি এবং নারীসুলভ বাগ্‌ভঙ্গি হইতে মনে হয় যে রচনাটি পুরুষের বেনামি নয়। ঈষৎ ব্যঙ্গের ঝাঁঝ থাকায় সুখপাঠ্য।

মহিলা-রচিত ক্ষুদ্রকায় অপর নাট্যরচনা হইতেছে, "শ্রীমতী" স্বর্ণলতার 'শূববালা সুরবালা' (হরিনাভি ১৮৭৮), নয়নতারা দের 'মণিমোহিনী' (১২৮৬), মণিমোহিনীর 'বিনোদকানন' (১৮৮০), প্রফুল্লনলিনী দাসীর 'ষষ্ঠীবাঁটা প্রহসন' (১২৯৪) ইত্যাদি। নারীরচিত যাত্রা-পালার মধ্যে বিশিষ্ট হইতেছে তরঙ্গিণী দাসীর 'সুগ্রীব-মিলন যাত্রা' (১৮৭৯)। বলা বাহুল্য এই রচনাগুলির অধিকাংশ পুরুষের বেনামি হওয়া সম্ভব। এ যুগের শ্রেষ্ঠ লেখিকা স্বর্ণকুমারী দেবীর ক্ষুদ্র গীতিনাট্য 'বসন্ত-উৎসব' (১৮৭৯) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার অপর নাট্যরচনা হইতেছে 'বিবাহ উৎসব' কৌতুকনাট্য (১৯০১), 'দেবকৌতুক' (১৩১২) কাব্যনাট্য, 'কনে-বদল' (১৩১৩), 'পাকচক্র' (১৩১৮), 'রাজকন্যা' (১৩১৮), 'নিবেদিতা' (১৩২৪), 'যুগান্ত' কাব্যনাট্য (১৯১৮) ও 'দিব্যকমল' (১৯৩০)। এসব রচনা অনেক উচ্চস্তরের॥

১৫

গীতিকার প্রবর্ত্তন করিলেন হরিমোহন রায় (কর্ম্মকার), রঙ্গমঞ্চে তাহা জমাইয়া তুলিলেন অভিনেতা নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। নগেন্দ্রনাথের রচনা 'সতী কি

[১] ইঁহারা সকলেই আসল লেখক না হইতে পারেন। পুরুষের লেখা মেয়ের নামে চালানো তখনকার একরকম রীতি ছিল।

[২] পরিশেষে বাইশ ছত্র পয়ার আছে। তাহা হইতে অনুমান হয় যে লেখিকার নাম লক্ষ্মী। "যেই রমণীর বাস কমলের দলে, সেই ভামিনীতে থাকে স্থলে আর জলে,...যেই ললনাতে হয় ভিষ্মকনন্দিনী, যেই নিতম্বিনী হয় গোলকবাসিনী, যেই ক্ষীণাঙ্গিনী হয় অসিতাবরণী, সেই দিল এই নাম জন্ম সন্তাপিনী।" নাটকখানি মহারাণী স্বর্ণময়ীকে উৎসর্গিত।

কলঙ্কিনী বা কলঙ্ক-ভঞ্জন' (১৮৭৪) গ্রেট ন্যাশনাল ও বেঙ্গল থিয়েটারে বিশেষ অভিনয়সাফল্য লাভ করিয়াছিল। নগেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত "গীতিকা" বা "নাট্যরাসক" (অর্থাৎ গীতিনাট্য) আদ্যোপান্ত গানে গাঁথা নয়। গানের প্রাচুর্য্য আছে বটে তবে মাঝে মাঝে গদ্যও আছে। রাধার কলঙ্কভঞ্জন ইহার বিষয়। নগেন্দ্রনাথ কৃষ্ণকালীবিষয়ে আরও একটি গীতিনাট্য লিখিয়াছিলেন, 'পারিজাত হরণ বা দেব-দুর্গতি' (১২৮১)। বড়োদার রাজা মল্‌হর রাও গায়কোয়াড়ের রাজ্যচ্যুতি সে-সময়ে তারকেশ্বরের মোহন্তের মোকদ্দমার মত শিক্ষিত জনসাধারণের চিত্তে বিক্ষোভের সঞ্চার করিয়াছিল। এই বিষয় লইয়া অন্তত চারিখানি নাট্যনিবন্ধ ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। সুরেশচন্দ্র মিত্রের সহযোগিতায় নগেন্দ্রনাথ 'গুইকোয়ার নাটক' (১২৮২) লিখিয়াছিলেন।[১]

বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চে "নাট্যরাসক" বা "গ্র্যাণ্ড অপেরা", এবং "নাট্যগীতি" বা "অপেরা কমিক" ও "অপেরা বুফ", এই দুইশ্রেণীর গীতিনাট্যেরই প্রচলনে ছিল রামতারণ সান্ন্যালের কৃতিত্ব। সঙ্গীতে নৃত্যে গানরচনায় সুরসংযোগে এবং নাট্যগীতিরচনায় রামতারণ সমধিক দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। রামতারণের সহায়তাই গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রথম গীতিনাট্যগুলির সাফল্যের প্রধান হেতু। রাধানাথ মিত্র প্রভৃতির গীতিনাট্যেও ইনি সুরলয়-সংযোগ করিয়াছিলেন। রামতারণ এই পৌরাণিক গীতিনাট্যগুলি রচনা (অথবা তাহাতে সুরসংযোগ) করিয়াছিলেন—'আদর্শসতী' (১৮৭৬)[২], 'আনন্দমিলন' (১৮৭৭), 'প্রভাত-কমল' (১২৮৫), 'নিশাকুসুম' (১৮৮৭)[৩], 'প্রমোদকানন' (১৮৭৮), 'রাসলীলা' (১৮৮০), 'শিবের বিবাহ' (দ্বি-স ১৮৮১), 'প্রণয় পারিজাত' (১৮৮১) ইত্যাদি। 'অকালবোধন' (১৮৭৭) রামতারণ এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ ("মকুটাচরণ মিত্র" ছদ্মনামে) উভয়ে মিলিয়া লিখিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া ইনি বিনোদবিহারী দত্তের 'কনক-কানন' (১৮৭৯), গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'মায়াতরু' (১৮৮১), 'মোহিনী-প্রতিমা' (১৮৮১) প্রভৃতি গীতিনাট্যে গান ও সুর সংযোগ করিয়াছিলেন।

কুঞ্জবিহারী বসুর তিনটি নাটকের উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি। ইনি কয়েকটি

[১] অপর তিনখানি নাটক হইতেছে অমৃতলাল বসুর 'হীরকচূর্ণ নাটক', উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের 'গুইকোয়ার নাটক' এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গুইকোয়ারের বিলাপ'।

[২] অতুলকৃষ্ণ মিত্রের লেখা। [৩] কুঞ্জবিহারী বসুর লেখা।

গীতিনাট্যও রচনা করিয়াছিলেন—'আনন্দ-মিলন' (১৮৭৭), 'বসন্তলীলা' (১৮৮০), 'কাঞ্চন কুসুম বা গোলেবকায়লী' (১৮৮১), 'কৃষ্ণলীলা বা মথুরা-বিহার' (১৮৮৪), শকুন্তলা নাট্যগীতিকা' (১৮৮৯), 'শ্রীরামনবমী' (১৮৯২), 'শ্রীবৎস-চিন্তা' (১৮৮৪ ?)। কাঞ্চন-কুসুমের গানগুলি কাশীশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের লেখা।

অতুলকৃষ্ণ মিত্র (১৮৫৭-১৯১২) গ্রেট-ন্যাশন্যাল এমারেল্ড প্রভৃতি রঙ্গালয়ে অভিনয়ের জন্য বহু ছোট ছোট গীতিনাট্য এবং নাটক-প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন। 'প্রণয়কানন' (১৮৭৬), 'নির্ব্বাপিত দীপ' (১২৮৩)[১], 'পিশাচিনী' (১২৮৪), 'আগমনী' (১৮৮০), 'বিজয়া' (১৮৭৮), 'অপ্সর-কানন বা রত্নবেদী' (১৮৮০), 'নন্দোৎসব', 'গোপীগোষ্ঠ' (১২৯৬), 'নন্দবিদায়', 'আমোদ-প্রমোদ', 'বুড়ো বাঁদর', 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না', 'বক্কেশ্বর', দুই খণ্ড 'ধর্ম্মবীর মহম্মদ' (১২৯২), 'মা বা ফুল্লরা', 'ভীষ্মের শরশয্যা', 'তুলসী-লীলা', 'বালি-বধ', 'নন্দকুমারের ফাঁসী', 'বাপ্পারাও', 'হিরন্ময়ী' (যুগলাঙ্গুরীয় অবলম্বনে), 'শিরীফরহাদ', 'গাধা ও তুমি' (১২৯৫)[২], 'বিধবা কলেজ', 'ঠিকে ভুল', 'পাষাণে প্রেম', 'রংরাজ', 'শাহাজাদী', 'লুলিয়া' (১৩১৪), 'তুফানী' (১৩১৫)[৩], 'দমবাজ' (১৩১৫), 'হিন্দা-হাফেজ' (১৩১৫), 'আয়েষা' (১৩১৬), 'মোহিনী-মায়া' (১৩১৮), 'প্রাণের টান' (১৩১৮), 'আসল ও নকল' (১৩১৯)[৪] ইত্যাদি। অতুলকৃষ্ণের কয়েকখানি গীতিনাট্য রঙ্গমঞ্চে বিশেষ জমিয়াছিল, তাহার মধ্যে সর্ব্বাধিক জনপ্রিয় হইয়াছিল নন্দবিদায়।

রাধানাথ মিত্র দুই একখানি নাটক এবং অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পৌরাণিক ও রোমান্টিক গীতিনাট্য রচনা করিয়াছিলেন। নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 'শ্রীবৎস-চিন্তা' (১২৯১)। গীতিনাট্য—'উষাহরণ' (১৮৮০), 'আগমনী'

[১] লেখকের নাম ছিল না। এই "অপেরাটিক ড্রামা"টি নানা ফড়নবীশ ও ঝান্সীর রানীকে লইয়া পরিকল্পিত দেশপ্রেমাত্মক রচনা। বারোটি গান আছে। দ্বিতীয় অঙ্কের এই চারিছত্রে প্রকাশ্য ব্রিটিশ-বিদ্বেষ লক্ষণীয়,

> উচ্ছলিত হোক আজি অনন্ত সাগর,
> ধরুক প্রচণ্ড মূর্ত্তি প্রচণ্ড ভাস্কর,
> শত শত ইরম্মদ ফেলুক অম্বর,
> দগ্ধ হ'ক একেবারে ইংরাজ-নিকর।

[২] পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য। [৩] মলিয়ারের 'ল্ এতুর্দি' অবলম্বনে।

[৪] শেরিডানের 'স্কুল অব্ স্ক্যাণ্ডাল' অবলম্বনে।

(১৮৮০), 'বিজয়া' (১৮৮০), 'প্রণয়পারিজাত বা মন্মথ-মনোরমা' (১২৮৭), 'মেঘেতে বিজলী বা হরিশ্চন্দ্র' (১৮৮২), 'মায়াবতী' (১৮৮২), 'কমলে কামিনী' (১৮৮২), 'হরবিলাপ', 'নববাসর', 'বণিক্-দুহিতা' (১২৯১) এবং 'আশালতা' (১৮৮৮)। মায়াবতী ও কমলে-কামিনী চণ্ডীমঙ্গল অবলম্বনে লেখা। বণিক্-দুহিতার মূল হইতেছে বেহুলার কাহিনী। গ্রেট ন্যাশনালে অভিনয়ের জন্য বণিক্-দুহিতা রামতারণ সান্ন্যাল কর্তৃক "সুরলয়ে গঠিত" হইয়াছিল। রাধানাথের রচিত কয়েকটি গান জনপ্রিয় হইয়াছিল।

উল্লেখযোগ্য অপর গীতিনাট্য হইতেছে যদুগোপাল বসুর 'সুভদ্রাহরণ' গীতাভিনয় (১২৮৩); 'মানসপ্রসূন' রচয়িতা নগেন্দ্রনাথ ঘোষের 'কৈলাসকুসুম' (দ্বি-স ভবানীপুর ১২৮৬), 'মণিমন্দির' (ভবানীপুর ১২৮৭), 'দানলীলা' ও 'প্রমীলার পুরী' (ভবানীপুর ১৮৮০)[১]; কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় (কাব্য-বিশারদ) প্রণীত 'বিষাদ প্রতিমা' (১২৮৭); যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মানভিক্ষা' (১৮৭৭) এবং 'আমি তোমারই' (১৮৭৯); মহেন্দ্রলাল খানের 'মানমিলন' (১৮৭৮) ও 'শারদোৎসব' (১৮৮১); বটকৃষ্ণ রায়ের 'রামাভিষেক' (১২৮৫); গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'প্রণয়-কুসুম' (১২৮৫); গোপালচন্দ্র মিত্রের 'সুখ-পরিণয় বা রামের বিবাহ' (১২৮৬)[২]; বিনোদবিহারী দত্তের 'কনককানন গীতিনাট্য' (১৮৭৯); প্রিয়নাথ রায়ের 'নন্দোৎসব' (১৮৮০); লালবিহারী দের 'বাসরযামিনী' (চ-স ১১৯৩); ইত্যাদি।

বৈকুণ্ঠনাথ বসু (১৮৫৩ ?) কয়েকখানি ভাল প্রহসন গীতিনাট্য ও নাটক রচনা করিয়াছিলেন। এগুলি রয়াল বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল। ইহার নাট্যগ্রন্থের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 'নাট্য-বিকার' (১২৯৮), 'পৌরাণিক পঞ্চরং' (১২৯৮)[৩], 'রামপ্রসাদ' (১২৯৮), 'বার-বাহার' (১২৯৮), 'মান' (১৩০১)[৪], 'বসন্ত-সেনা' (১৩০৬) ইত্যাদি। নাট্যবিকারে

[১] ইহার অপর নাট্যরচনা—'বিমুক্তবেণীবন্ধন' (১৮৮৬, বেণীসংহার অবলম্বনে), 'বারাণসীবিলাস' (১২৯৫) ও 'কোনটা কে ?' (ক্লাসিক থিয়েটারে ৮ মাঘ ১৩১১ তারিখে অভিনীত)।

[২] ইঁহার অপর নাট্যরচনা—'আসল ভারতবিলাপ যাত্রা' (১৮৭৯) ও 'বাঁদীর বেটা পদ্মলোচন' (১৮৭৯)। 'পারিজাতহরণ' (১৮৭৭) ও 'চন্দ্রকান্ত নাটক'ও (১৮৭৯) ইঁহার রচনা হওয়া সম্ভব।

[৩] প্রসিদ্ধ কয়েকটি পদাবলীর (ভনিতা-বর্জিত) মালা ক্ষীণ কথাসূত্রে গাঁথা। প্রথম অভিনয় এমারেল্ড থিয়েটার (২৩ অগ্রহায়ণ ১৩০১)।

[৪] প্লাউতুসের 'আম্‌ফাইট্রেওন্'এর ইংরেজি অনুবাদ অবলম্বনে।

সমসাময়িক রঙ্গমঞ্চের ও অভিনয়ের চিত্র পাওয়া যায়। কাহিনী রবীন্দ্রনাথের মানভঞ্জন গল্পের মত।

কলিকাতা সিমুলিয়া-নিবাসী কুমারকৃষ্ণ মিত্রের পুত্র ভুবনকৃষ্ণ মিত্র কয়েকখানি পৌরাণিক নাটক, গীতিনাট্য ও প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন। 'ধর্ম্মপরীক্ষা' (১৮৮৬) নাটকের আখ্যানবস্তু মহাভারত হইতে গৃহীত। ইহা গিরিশচন্দ্রের অনুসরণে ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষরে রচিত। 'দাতাপরীক্ষা নাটক' (১২৯৬) লক্ষ্মীর অনুগ্রহ বিষয়ে একটি উপকথা অবলম্বনে রচিত। ইহাতেও ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে। 'নিকুঞ্জবিহার' (১২৯৭) রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক গীতিনাট্য। 'কলির অবতার', 'যমের শেসন', 'কলির কীচক' ও 'নাট্যকবির মেলা' (১৮৯৫) প্রহসন। শেষোক্ত বইটিতে সমসাময়িক রঙ্গমঞ্চের ও অভিনয়ের প্রতি কটাক্ষ আছে।

প্রচলিত পুরানো ধর্ম্মঘটিত ও আধুনিক আদিরসাত্মক কাব্যকাহিনী অবলম্বনে যে-সকল নাটক-গীতিনাট্য লেখা হইয়াছিল তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে—দক্ষিণ বর্দ্ধমানের আড়ুই-নিবাসী কালিদাস মুখোপাধ্যায়ের অষ্টাঙ্ক 'মৎস্যধরা নাটক, (১৮৭৩; রামেশ্বরের শিবায়ন অবলম্বনে); শ্যামলাল বসাকের 'সুশীলা-শ্রীপতি' (১৮৭৬ কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল অবলম্বনে); তিনকড়ি বিশ্বাসের 'কামিনীকুমার নাটক' (১৮৭৬, দ্বি-স ১৮৭৭, তৃ-স ১৮৮০); উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের 'জীবনতারা নাটক' (১৮৭৮); গোপালচন্দ্র মিত্রের 'চন্দ্রকান্ত নাটক' (১৮৭৯); বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসুন্দর নব-নাটক' (১২৮২); ব্রজনাথ দের 'বিদ্যাসুন্দর গীতাভিনয়' (১৮৭৭); কালিদাস সান্যালের 'বিদ্যাসুন্দর অভিনয়' (বর্দ্ধমান ১৮৮১); অজ্ঞাতনামার 'শর্ম্মিষ্ঠা নাট্যগীতিকা' (বর্দ্ধমান ১৮৮১); ইত্যাদি।

পৌরাণিক বিবিধ নাট্যরচনার মধ্যে এগুলিরও নাম করিতে হয়—মহেশচন্দ্র দত্তের 'মানার্ণব' (ঢাকা ১৮৭২), চাঁদগোপাল গোস্বামীর 'নিমাই সন্ন্যাস বা চৈতন্যলীলা গীতাভিনয়' (১২৯১), নন্দলাল রায়ের 'অর্জ্জুনবধ' (১৮৭৯), চন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সিন্ধুবধ' (১৮৭৯), নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'সীতা কি অসতী' (১৮৭৯), কিশোরীলাল করের 'বেদবতী নাটিকা' (১৮৮২), সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জয়দ্রথ-বধ' (১৮৮৪), 'পাগলিনী নাটক' (১৮৮২) রচয়িতা যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'চন্দ্রহংস নাটক', 'কাননকথা'-প্রণেতা

যোগেন্দ্রনাথ তর্কচূড়ামণির 'মহাপ্রস্থান নাটক' (১৮৮৭), রমাকান্ত সেনের ক্ষুদ্র ছদ্ম-রোমান্টিক নাটক 'ললিতকুসুম' (বীণা যন্ত্র ১২৮৮), নিমাইচাঁদ কবিরত্নের 'নীলাম্বর ঠাকুর' (১৮৯৩), নিত্যসখা মুখোপাধ্যায়ের 'লীলা-বিলাস' (১৮৯৩), রাইচরণ ঘোষের 'আশামুকুরভঙ্গ' (১২৮৯), কমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' (১৮৮৭), হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাঞ্চালী-বরণ' ও 'মদনভস্ম' (১২৮৯), বেণীলাল চক্রবর্ত্তীর 'তপতী' (১৮৮৪), রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'ভরত-বিলাপ নাটক' (১৮৮৪), নৃত্যলাল শাহার 'অপূর্ব্ব সতী বা জালন্ধরবধ' (১২৯৪), হরিভূষণ ভট্টাচার্য্যের 'কুমারসম্ভব নাটক' (১৮৮৭), শারদাপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'প্রেমমন্দাকিনী নাটক' (১২৮৮), অঘোরনাথ ঘোষের 'কীচকবধ' (দ্বি-স ১২৯১), অঘোরনাথ তত্ত্বনিধির 'সতীবিয়োগ নাটক' (১২৮৯), জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রভাসযজ্ঞ-যাত্রা' (তৃ-স ১২৯০), ধনঞ্জয় সরকারের 'রামবনবাস' (১২৯০), উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সমুদ্রমন্থন' (১২৯১), তারাপদ ভট্টাচার্য্যের 'হরিশ্চন্দ্র' (১২৯৩), ভড়া নিবাসী "দ্বিজ" নন্দলাল রায়ের 'ধ্রুবচরিত্র' (১২৯৩), নবদ্বীপ-নিবাসী পার্ব্বতীচরণ ভট্টাচার্য্যের 'গোপীদের বস্ত্রহরণ' (১৩০৯), নবীনকিশোর মিত্রের 'নিঃক্ষত্রিয়া ধরণী বা গণেশের দন্তভঙ্গ' (শ্রীরামপুর ১২৯৫) ; বর্দ্ধমান কোকশিমলা নিবাসী অহিভূষণ ভট্টাচার্য্যের 'তুলসীলীলা' (১৩০৪), 'দণ্ডীপর্ব্ব' (১৩০৬), 'উত্তরা-পরিণয়' (১৩০৮), 'রাই-উন্মাদিনী' (১৩০৮), 'সুরথোদ্ধার' ও 'রামাশ্বমেধ' (১৩১১) ইত্যাদি।

পৌরাণিক নাটকের মধ্যে এক বিচিত্র বস্তু হইতেছে প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'পঞ্চমবেদ বা মহাভারত নাট্যকাব্য' (১৮৮৯, দ্বি-স ১৮৯৬)। এখানে ইনি গিরিশচন্দ্রের ধরণে প্রায় সমগ্র আঠারো পর্ব্ব মহাভারতকে পর্ব্বানুপর্ব্ব ধরিয়া নাট্যরূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইঁহার অপর নাট্যরচনা—'অন্ধবিলাপ' (১৮৮৩), 'তোমারই' ! (১৯০১) এবং 'তমালী' (১৯০৮)।

রাজকৃষ্ণ রায়ের সহযোগী শরচ্চন্দ্র দেবের নাট্যরচনা হইতেছে 'শ্রীমন্তের শ্মশান বা কমলে কামিনী', 'বাল্মীকি চরিত্র', 'সাধক-সংহার ও 'শাক্যসিংহ প্রতিভা বা বুদ্ধদেব-চরিত' (১২৯৫)[১] ॥

[১] পরে দ্রষ্টব্য।

১৬

গদ্যপদ্য রচনায় অনায়াস-চাতুর্য্যের পরিচয়ের জন্য বিশিষ্ট ছিলেন রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-৯৪)। তাঁহার মত অমন অবিশ্রান্ত লেখক আর কেহ তখন ছিল না। পাঠ্যপুস্তকের বাহিরে বাঙ্গালা লিখিয়া জীবিকা-অর্জ্জন ব্যাপারে রাজকৃষ্ণই এদেশে প্রথম পথপ্রদর্শক। অথচ বিদ্যালয়ে পড়িবার কোন সুযোগ তিনি পান নাই। কাব্য-নাটক প্রহসন ও উপন্যাস-গল্প ইনি অনেকগুলিই রচনা করিয়াছিলেন, এবং রামায়ণ ও মহাভারত অনুবাদ করিয়াছিলেন। রাজকৃষ্ণ 'বীণা' নামক কবিতাময় মাসিকপত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন (১২৮৫) এবং বীণা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই নাট্যশালায় স্ত্রীলোকের ভূমিকা বালকদিগের দ্বারা অভিনীত হইত। ইঁহার অনেক নাট্যনিবন্ধ বীণা থিয়েটারে অভিনয়ের জন্যই রচিত হইয়াছিল।

রাজকৃষ্ণের অধিকাংশ নাটক-নাট্যগীতি পৌরাণিকবিষয়ঘটিত। সাবিত্রী-সত্যবান্ কাহিনী অবলম্বনে ইঁহার প্রথম নাট্যরচনা 'পতিব্রতা' (১৮৭৫) নাট্যগীতি লেখা। পরে আরো কতকগুলি গান যোগ করিয়া এটিকে গীতাভিনয়ের রূপ দেওয়া হইয়াছিল। পতিব্রতার ভূমিকায় সমসাময়িক রঙ্গ-ভূমির সম্বন্ধে কিছু স্পষ্ট কথা আছে। পতিব্রতার পর ক্ষুদ্র গীতিনাট্য 'নাট্যসম্ভব' (১৮৭৬) লেখা হয়। অসুর কর্ত্তৃক শচী অপহৃত হইলে ইন্দ্রের যে নিদারুণ মনোবেদনা হইয়াছিল তাহা অপনোদন করিবার উদ্দেশ্যে ভরতমুনি নাট্যের সৃষ্টি করেন। ইহাই নাট্যসম্ভবের যৎকিঞ্চিৎ কাহিনী। হয়ত ইহাই রবীন্দ্রনাথকে বাল্মীকি-প্রতিভা রচনার নির্দ্দেশ দিয়াছিল। 'ভারত-সান্ত্বনা' নিতান্ত ক্ষুদ্র "কবিতাত্মক দৃশ্যরূপক"।

হরধনুর্ভঙ্গ পাঁচ-ছয় দিনের মধ্যে লেখা, কয়েকজন বিশিষ্ট অভিনেতার অনুরোধে বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য। ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষরে নাটক রচনা এইই প্রথম।[১] মেঘনাদবধের অভিনয় দেখিয়া রাজকৃষ্ণ বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষরে হরধনুর্ভঙ্গ রচনা। রাজকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্র ঘোষকেও এই ছন্দে নাটক রচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

[১] ভঙ্গ-অমিত্রাক্ষরের স্রষ্টা রাজকৃষ্ণ। "আমি ১২৮০ সালে 'নিভৃত-নিবাস' নামে একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকাশ করি। তাহার দ্বিতীয় সর্গের কিয়দংশ এইরূপ ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষরের ছন্দে লিখিয়াছিলাম।" (হরধনুর্ভঙ্গ ভূমিকা)

হরধনুর্ভঙ্গ

পৌরাণিক-ইতিবৃত্ত-মূলক দৃশ্য কাব্য।

"কোদণ্ডভগ্নাম্বুধরীকৃতাংশং
বরং বরেণ্যং জনকাত্মজায়াঃ।
অনঙ্গসানাঙ্গধনুর্বিলাসং
নমামি তং লোকবিসর্পিকীর্ত্তিং ॥"

"কূজন্তং রামরামেতি মধুরং মধুরাক্ষরম্।
আরূঢ়কবিতাশাখং বন্দে বাল্মীকি-কোকিলম্ ॥"

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত।

বেঙ্গল থিয়েটরে অভিনীত

কলিকাতা
৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট—ঠনঠনিয়া—বীণাযন্ত্রে
শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
৭ নং কালেজ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

মেঘনাদবধের অভিনয় বাঙ্গালা নাট্য-কলাকে যে কতটা প্রভাবিত করিয়াছিল তাহা জানিতে পারি হরধনুর্ভঙ্গের ভূমিকা হইতে। রাজকৃষ্ণ লিখিয়াছেন,

> সেই প্রথম অভিনয়ের সময় আমরা অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের মুখে উক্ত ছন্দের উচ্চারণ ও প্রয়োগাদি যেরূপ শুনিয়াছিলাম, তাহা আজিও মনে জাগিয়া রহিয়াছে। সেই উচ্চারণ ও প্রয়োগাদিকে আমরা মেঘনাদবধ কাব্যের নূতন ও সুন্দর অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করি। অভিনয়কাবিদিগের অভিনয়কালে মেঘনাদবধের চতুর্দ্দশাক্ষরাত্মক অমিত্রাক্ষরছন্দ, অঙ্গভঙ্গি ও বাগ্‌ভঙ্গির অনুগত হইয়া, আমাদের কর্ণে কেবল একতর নূতন ছন্দের ছাঁচ গড়িয়া দিয়াছিল।

'তারক-সংহার' (১৮৮০) আদ্যন্ত গদ্যে লেখা। 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' (? ১৮৮৪) রাজকৃষ্ণের সবচেয়ে জনপ্রিয় নাটক। বেঙ্গল থিয়েটারে ইহার অভিনয়ে দর্শকের ভিড় বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব ঘটনা।

'অনলে বিজলী'র (১৮৭৮) বিষয় সীতার অগ্নিপরীক্ষা। প্লটের পরিকল্পনায় দক্ষতার পরিচয় আছে। মন্দোদরীর ভূমিকা ভালোই। বিভীষণের ভূমিকাও সুলিখিত। বইটি প্রধানত অমিত্রাক্ষর পয়ারে রচিত। কতক অংশ মিত্রাক্ষর পয়ার-ত্রিপদীতে লেখা। গদ্য অংশ নগণ্য। রাজকৃষ্ণ পরে রামায়ণ-কাহিনী অবলম্বন করিয়া আরো কয়খানি ছোট ছোট নাটক রচনা করিয়াছিলেন— 'হরধনুর্ভঙ্গ' (১৮৮১), 'দশরথের মৃগয়া বা বালক সিন্ধু বধ' (১৮৮৫), 'রামের বনবাস' (১৮৮২), 'তরণীসেন-বধ' (১২৯১) ইত্যাদি। এই নাট্যনিবন্ধগুলি ভঙ্গ-অমিত্রাক্ষরে রচিত। 'নরমেধ-যজ্ঞ' (১৮৯১) ষ্টার থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য লেখা হইয়াছিল। পিতৃভক্তির সঙ্গে মানবিকতার বিরোধ নাটকটির বীজ। যযাতির চরিত্র মন্দ ফুটে নাই। নাটকটি ভক্তিরসাত্মক, তবে ভক্তিরসের বাড়াবাড়ি নাই। অপর পৌরাণিক নাটক হইতেছে 'বামনভিক্ষা' (১৮৮৫), 'চন্দ্রহাস' (১২৯৫), 'প্রহ্লাদ-মহিমা' (১২৯৭), 'যদুবংশধ্বংস' (১২৯০) ইত্যাদি। 'রাজা বংশধ্বজ' (১৮৯১) ও 'সত্যমঙ্গল' (১৮৯০) সত্যনারায়ণ-কাহিনী লইয়া লেখা। শেষেরটি ফরমায়েসি রচনা। অপৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটকের মধ্যে প্রধান হইতেছে 'রাজা বিক্রমাদিত্য' (১৮৮৪)। নাটকটির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা আদ্যোপান্ত "পদ্য পঙ্‌ক্তি গদ্য"এ অর্থাৎ ছন্দঃস্পন্দিত গদ্যে লেখা। বামন-ভিক্ষা প্রভৃতি পরবর্ত্তী কয়েকখানি নাট্যগ্রন্থও এই ছন্দে রচিত। ভক্তিমূলক নাটকের মধ্যে 'মীরাবাই' (১২৯৬, তৃ-স ১৩০২), 'হরিদাস ঠাকুর' (১২৯৫) এবং 'লক্ষহীরা' (১৮৯১)

উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক বিষয় লইয়া রাজকৃষ্ণ প্রথম নাটক লিখিয়াছিলেন 'লৌহকারাগার' (১৮৮০)। বনোয়ারীলাল রায়ের 'জয়াবতী' কাব্য হইতে নাটকটির উপাদান গৃহীত। চিতোরের রানা সঙ্গসিংহের বিরুদ্ধে তাঁহার সামন্ত অম্বরপতি সূর্য্যসিংহের ষড়যন্ত্র এই বিষাদান্ত নাটকের বীজ। লৌহকারাগার প্রধানত অমিত্রাক্ষর পয়ারে রচিত। "ভয়ানক রৌদ্র-বীর-হাস্য-করুণ রসাশ্রিত" 'বনবীর' (১২৯৯) নাটকে ধাত্রী পান্নার স্বার্থত্যাগ কাহিনী বর্ণিত। বনবীরের ভূমিকায় কর্ত্তব্যবোধের সঙ্গে লোভের দ্বন্দ্ব বেশ ফুটিয়াছে। বনবীরের মাতা শীতলদেবী লেডি ম্যাকবেথের অনুরূপ। বনবীর অংশত ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষরে লেখা। গান আছে। নাটকটি ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল।

রাজকৃষ্ণের গীতিনাট্যের মধ্যে দুইটি ফারসী গল্প অবলম্বনে লেখা, 'লয়লা-মজনু' (১২৯৮, দ্বি-স ঐ) "করুণরসাত্মিকা গীতিনাটিকা", এবং বেনজীর বদ্‌রেমুনির' (১৮৯৩)[১]। লয়লা-মজনু ষ্টারে অভিনীত। বেশির ভাগ ছড়া ও ছন্দে রচিত, তাহার মধ্যে হিন্দীও আছে। গান আছে, কোন কোন গানে ভানুসিংহের পদাবলীর প্রতিধ্বনি। হিন্দী অংশের একটু উদাহরণ দিই।[২]

আব্‌দুল্লা। বন্দেগি দর্‌বেস, ম্যাঁয় এন্তেজার তুমারে।
কায়েস্‌। ক্যা হ্যায় তেরা নাম, মুঝে বাতা রে ?
আব্‌দুল্লা। আব্‌দুল্লা নাম, ম্যাঁয় কায়েস্‌কা গুলাম।
কায়েস্‌। কেঁও ইঁহা আয়ে হো, ক্যা হ্যায় তেরা কাম ?
আব্‌দুল্লা। শুনা হ্যায় হাম্‌, শাজাদে হামারা।
লয়লা কি আশ্নাই সে হুয়া হ্যায় মতুয়ারা॥
বাপ মাতারি বাদ্‌শাহি ছোড়্‌কে।
ভগ্‌ কর্‌ আয়া হ্যায় জঙ্গল্‌ মে তড়্‌কে॥
কায়েস্‌। হাঁ হাঁ, ম্যাঁয়্‌ জান্তা হুঁ উও ইঁহা আয়া।
এহি অঙ্গুঠি উও মুঝ্‌কো দে গেয়া॥

পৌরাণিক কাহিনী ও কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে রচিত—'চন্দ্রাবলী' (১৮৯০), 'হরিহর-লীলা', 'চতুরালী' (প-স ১৩০৩), 'ঋষ্যশৃঙ্গ' (১২৯৯, দ্বি-স ১৩০২)।[৩] 'হীরে মালিনী' (১৮৯১) বিদ্যাসুন্দর কাহিনী অবলম্বনে। 'জন্মাষ্টমী' (১২৯৭) বীণা থিয়েটারে অভিনীত। রচয়িতা "বীণা থিয়েটারের সহকারী শিক্ষক ও অভিনেতা" পান্নালাল শীল, রাজকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সংশোধিত।

[১] এই ধরণের প্রথম রচনা হইতেছে পরমেশ্বর বেদরত্ন কৃত 'মসনবী নাটক' (বর্দ্ধমান ১৮৭৬)।
[২] দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্য। [৩] "আদি করুণ হাস্যরসাশ্রিত ঐতিহাসিক নাটক," ষ্টারে অভিনীত।

রাজকৃষ্ণ অনেকগুলি ছোট ছোট প্রহসন লিখিয়াছিলেন। এগুলির অধিকাংশই বীণায় অভিনীত। 'উৎকট বিরহ—বিকট মিলন বা আগমনী-বিজয়া', 'দ্বাদশ গোপাল' (১৮৭৮), 'কলির প্রহ্লাদ' (১২৯৫), 'কানাকড়ি' (১২৯৫), 'ডাক্তারবাবু' (১৮৯০), 'লোভেন্দ্র-গবেন্দ্র' ("সামাজিক ব্যঙ্গনাটক"), 'জগাপাগলা' (১২৯৭), 'টাটকা-টোটকা' (১৮৯০), 'বউবাবু' (১২৯৭)। 'খোকাবাবু' (১২৯৬), 'বেলুনে বাঙালী বিবি' (১৮৯০) ও 'জুজু' (১৮৯০) —তিনটি প্রহসনে একই বিষয়ের অনুবৃত্তি, আদুরে ছেলের উৎকট আবদার। রাজকৃষ্ণের প্রহসনে গ্রাম্যতা নাই।

রাজকৃষ্ণের নাট্যরচনায় অসাধারণ উৎকর্ষের কোন পরিচয় নাই। তবে ইঁহার হাতে পৌরাণিক নাটকের কিছু যে উন্নতি হইয়াছিল তাহা স্বীকার্য্য। রাজকৃষ্ণের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য লঘু ও স্বচ্ছন্দ ভাষা। দোষের মধ্যে অপটুতা অপেক্ষা অনবধানেরই পরিচয় বেশি। কোন কোন রচনায় ছড়ার ছন্দের ব্যবহার উপভোগ্য। রাজা-বিক্রমাদিত্যে গদ্য-ছন্দের প্রয়োগ সাহসের পরিচায়ক। রাজকৃষ্ণের নাট্যরচনার মধ্যে ভালো গান কিছু আছে॥

১৭

বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বাধিক যশস্বী নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২) সাধারণ-রঙ্গমঞ্চ-প্রতিষ্ঠাতাদের দলে ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের নাট্যরচনাশক্তির প্রেরণা আসে তাঁহার অভিনয়দক্ষতা হইতে। নটখ্যাতি বিস্তৃত হইবার বেশ কিছু পরে ইনি রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে নাটক-রচনায় প্রবৃত্ত হন। এ বিষয়ে ইঁহার প্রথম প্রচেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা-মৃণালিনীর নাট্যরূপ দান।[১] এগুলি বিশেষ করিয়া রঙ্গমঞ্চে ব্যবহারের জন্যই লেখা হইয়াছিল বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রণযোগ্য বিবেচিত হয় নাই।[২] ইহার পূর্ব্বে গিরিশচন্দ্র কিছু কিছু গান রচনা করিয়াছিলেন।

[১] পরবর্ত্তী কালেও গিরিশচন্দ্র দুইএকটি উপন্যাসকে নাট্যরূপ দিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উল্লেখযোগ্য। "সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ রবীন্দ্রবাবুর 'চোখের বালি' নাটকাকারে পরিণত করিয়াছেন। ক্লাসিক থিয়েটারে শীঘ্রই 'চোখের বালি' অভিনীত হইবে।" (সাহিত্য কার্ত্তিক ১৩১১ পৃ ৪৬০)।

[২] পরবর্ত্তী কালেও গিরিশচন্দ্রের নাটক প্রথম অভিনয়ের অনেক কাল পরে ছাপা হইত। কারণ স্পষ্ট, প্রতিদ্বন্দ্বী রঙ্গালয়ের অনুকৃতির আশঙ্কা।

এইখানে একটা কথা বলা আবশ্যক। বিলাতে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত ৯৪ পৃষ্ঠাত্মক 'ধ্রুবতপস্যা নাটক' (১৮৭৩, দ্বি-স ১৮৭৪, তৃ-স ১৮৭৮) গ্রন্থের তিন সংস্করণ আছে।[১] গিরিশচন্দ্রের গ্রন্থাবলীতে এই নাটক মুদ্রিত হয় নাই এবং তাঁহার জীবনীতে এই নাটকের কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং ধ্রুবতপস্যা নাটক অন্য কোন গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচনা বলিতে হয়। বেঙ্গল থিয়েটারের উদ্যোক্তাদের মধ্যে একজন গিরিশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন। অমৃতলাল বসু তাঁহার স্মৃতিকথায় ইঁহাকে "ন্যাদাড়ু গিরিশ" বলিয়াছেন। ইনিই কি নাটকটির লেখক? নাটকটির একটু পরিচয় দিই।

ধ্রুব-চরিত্র চারি অঙ্কে বিভক্ত, প্রত্যেক অঙ্কে একাধিক গর্ভাঙ্ক।[২] গর্ভাঙ্কের মধ্যেও দৃশ্যান্তর আছে। রচনা সাধু গদ্যে, কদাচিৎ পয়ার আছে। যেমন,

কহ কহ বিধুমুখি! তুমি কোন্ জন।
কি লাগি করিছ আসি অরণ্যে রোদন॥
কি লাগি শুকায়ে গেছে তব চন্দ্রানন।
কি লাগি নাহিক তব সঙ্গে কোন জন॥
কি ভাবনা ভাবিতেছ বললো আপনি।
কেবা তুমি কোথা বাস কাহার রমণী॥
দেবী কি মানবী তুমি হওলো রূপসী।
রূপের তুলনা নহে গগনের শশী॥

নাটকটিতে স্বগতোক্তির অত্যন্ত বাহুল্য। অনেক সময় এক স্বগতোক্তি দুইতিন পাতা জুড়িয়া। যেমন, দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্ক, নিবিড় বন, সুনীতির প্রবেশ। সুনীতি (স্বগত)

এই তো বনে আগমন করিলাম। সম্মুখে ঐ পর্ব্বত গহ্বর নিঃসৃত বারিধারা পতিত হইয়া কি অনুপম ঝরঝর শব্দে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিতেছে! উঃ কি ভয়ানক পথ! সমস্ত প্রস্তরময় এই পথ দিয়া আগমন করিতে করিতে আমার পাদস্ফোট হইয়াছে, আর চলিতে পারি না। যাই ঐ শিলাতলে ক্ষণেক উপবেশন করিয়া শ্রান্তি দূর করি (উপবেশন ও ইতঃস্ততঃ দর্শন করিয়া) আহা! এই রমণীয় বনের কি অপরিসীম শোভা!! ইহা নানাবিধ জন্তুগণে সমাকীর্ণ, পাদপসমূহে আবৃত ও লতাগুল্মে আচ্ছন্ন। ইহার কোন স্থলে কোকিল-ময়ূর প্রভৃতি বিহঙ্গমগণ সুমধুর স্বরে কলরব করিতেছে। ইহার কোন বৃক্ষই ফলপুষ্পহীন দেখিতেছি না। আহা! এই বিহগকুল নিনাদিত ও নানাবিধ সুগন্ধি কুসুমে শোভিত মনোহর বিপীনে

[১] শ্রীমান্ তারাপদ মুখোপাধ্যায় প্রথম সংস্করণের বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। নামপত্র এইরূপ,—"ধ্রুব-তপস্যা নাটক। পুরাণ হইতে সংগৃহীত হইয়া। শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক প্রণীত। কলিকাতা নং ২২২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্। প্রাচীন ভারত যন্ত্র ১২৭৯। মূল্য ॥০

[২] প্রথম অঙ্কে দুই, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কে পাঁচ আর চতুর্থ অঙ্কে তিন গর্ভাঙ্ক।

মোহিনী প্রতিমা।

OR

THE MAGIC STATUE.

(গীতি-নাট্য)

শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

ও

শ্রীরামতারণ সান্যাল কর্ত্তৃক

সুর লয়ে গঠিত।

ন্যাশন্যাল থিয়েটরের অভিনয়ার্থে

শ্রীধর্ম্মদাস সুর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১৩৭ নং, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, —[illegible] প্রেসে

[illegible] দ্বারা মুদ্রিত।

পৃ ৩০৩ক

প্রবেশ করিবামাত্র অন্তঃকরণে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দের ও সেই সর্ব্বশক্তিমান বিশ্বপতির বিশ্বরচনার কৌশলের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তির উদয় হয়। এই স্থানে সুশীতল ও সুগন্ধ গন্ধবহ বহুবিধ পুষ্পের সৌগন্ধ বহন করিয়া ঘ্রানেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিতেছে।…

ধ্রুব-চরিত্রকে আসলে গার্হস্থ্য নাটকই বলিতে হয়। সপত্নীবিদ্বেষ স্ত্রৈণতা ও পাতিব্রাত্য—ইহাই প্রধান প্রতিপাদ্য। মুখ্য চরিত্র উত্থানপাদ ও সুনীতি, একেবারে শেষের দিকে ধ্রুব। 'ধ্রুব-তপস্যা' নাম সত্ত্বেও ধ্রুব-তপস্যা ব্যাপার কাহিনীর ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। শেষের দিকে অবশ্য ভক্তিরসেরই প্রবলতা।

গান আছে একটি, নারদের মুখে। সেটি এই, রাগিণী ভৈরোঁ—তাল একতালা,

কেন রে মন অকারণ বিষয়রসেতে মগন।
অখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথে কর সদা অর্চ্চন ॥
পুতনা নিধন, কালীয় দমন, সহজে করেন যে জন,
তাঁহার ত্যজিয়ে বিষয় লাগিয়ে, ক্ষিপ্ত হও রে কি কারণ।

এমন নাটকেরও অন্তত তিনটি সংস্করণ হইয়াছিল !

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস দুইটির অভিনয় হইয়া গেলে গিরিশচন্দ্র গীতিনাট্য লিখিতে আরম্ভ করেন। তখন রঙ্গমঞ্চে "অপেরা" বা নাট্যগীতির হিড়িক পড়িয়াছে। ইহার প্রথম দুই গীতিনাট্য 'আগমনী' (১৮৭৭) ও 'অকালবোধন' (১৮৭৭) নিতান্ত ক্ষুদ্র রচনা। গীতিনাট্য দুইটিতে লেখকের ছদ্মনাম ছিল "মকুটাচরণ মিত্র"। অকালবোধনে রামতারণ সান্নালেরও নাম ছিল। ইহার পর গিরিশচন্দ্র 'দোললীলা' (১৮৭৮)[১], 'মায়াতরু' (১৮৮১) ও 'মোহিনীপ্রতিমা' (১৮৮১) গীতিনাট্য লেখেন। ইতিমধ্যে ইনি বঙ্কিমের বিষবৃক্ষ ও দুর্গেশনন্দিনী, মধুসূদনের মেঘনাদবধ, নবীনচন্দ্রের পলাশির-যুদ্ধ, এবং দীনবন্ধুর যমালয়ে-জীবন্ত-মানুষ বইগুলিকে অভিনয়যোগ্য রূপ দিয়াছিলেন। এই পর্য্যন্ত (১৮৭৩-৮১) গিরিশচন্দ্রের সাহিত্যসাধনার প্রথম স্তরে অনুবাদ-গীতিনাট্যের পর্ব্ব।

দ্বিতীয় স্তরের উপক্রম মৌলিক-নাটকরচনার প্রচেষ্টায় (১৮৮১-৮৪)। ইহা প্রধানত তাঁহার পৌরাণিক নাট্যের পর্ব্ব। এ সময়েও কয়েকখানি গীতিনাট্য ও প্রহসন রচিত হইয়াছিল, 'ব্রজবিহার', 'ভোটমঙ্গল', 'মলিনমালা' (১২৮৯) ও 'হীরার ফুল' (১২৯১)। গিরিশচন্দ্রের প্রথম মৌলিক নাটক

[১] লেখকের নাম ছিল না। অনেকগুলি গান হিন্দী-ভাঙ্গা।

(গ্রেট ন্যাশনালে অভিনীত) 'আনন্দ রহো'তে (১২৮৮) "ঐতিহাসিক নাটক" ছাপ থাকিলেও শুধু আকবর মানসিংহ ইত্যাদি নাম ছাড়া, ঐতিহাসিকত্ব কিছু নাই, নাটকত্বও নাই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অশ্রুমতী বোধ হয় গিরিশচন্দ্রকে আনন্দ-রহো রচনা করিতে প্রেরণা দিয়াছিল। কাহিনী ছাড়া-ছাড়া, ভাষাও ছেঁড়া-ছেঁড়া। নাটকের কেন্দ্রীয় ভূমিকা বেতাল (যাহার বুলি "আনন্দ রহো") সার্থক হয় নাই।

"ঐতিহাসিক নাটক" রচনায় ব্যর্থকাম হইয়া গিরিশচন্দ্র রাজকৃষ্ণ রায়ের অনুসরণে পৌরাণিক-নাট্যরচনায় হাত দিলেন। গিরিশচন্দ্রের প্রথম পৌরাণিক নাটক 'রাবণবধ'এ (১২৮৮) তাঁহার নাটকরচনার সমস্ত বৈশিষ্ট্যের পূর্ব্বাভাস দোষগুণসমেত প্রকটিত। গিরিশচন্দ্রের নাট্যাবলীর একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার। রাবণবধ আগুন্ত এই "গৈরিশ" ছন্দে লেখা। ইহার পূর্ব্বে এই ছন্দ ব্রজমোহন রায় দানববিজয় নাটকে এবং রাজকৃষ্ণ রায় নিভৃতনিবাস কাব্যে ব্যবহার করিয়াছিলেন।[১] তবে গিরিশচন্দ্রের দ্বারাই এই ছন্দের ব্যাপক ও সার্থক প্রয়োগ হইয়াছিল। রাবণবধ নাটকের নায়ক মানী রাবণ রক্ষোবংশধ্বংস হইবে জানিয়াও যুদ্ধার্থে উগুত। রামেরও মানের দায়, তবে তাহা ততটা বীরসম্মানের নয় যতটা ভক্তবৎসলতা-খ্যাতির। তৃতীয় অঙ্কে অকস্মাৎ রাবণকে প্রচ্ছন্ন ভক্ত করিয়া দেখাইয়া নাট্যকার রাবণ এবং রাম দুই ভূমিকাই একসঙ্গে মাটি করিয়া দিয়াছেন। রামের অস্ত্রাঘাতে রাবণ মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া তাঁহার স্তব করিলে রাম গেলেন গলিয়া। তখন রামকে যুদ্ধ-বিমুখ দেখিয়া প্রচ্ছন্ন ভক্ত রাবণ স্বগত বলিতেছে,

> শুনিয়া মিনতি রঘুপতি করেছেন দয়া,
> এ রাক্ষস-দেহ-ভার কত দিন র'ব আর,
> করি কটুবাক্যে উত্তেজিত বোধ।

এই ধরণের ভক্তিরসসিক্ততা যাত্রা-পালায় জমে, নাটকে নয়। ভক্তি-মগ্নতাই রাবণচরিত্রের শেষ কথা নয়। পরম রামভক্ত হইয়াও রাবণ মধ্যে মধ্যে আত্মবিস্মৃত হইয়া যায়, এমন কি সীতার প্রতি তাহার লালসা মাঝে মাঝে উগ্রভাবে জাগে। যে প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষ রাক্ষসদেহভার-বহনে অক্ষম হইয়া তাঁহার আরাধ্য দেবতাকে কটূক্তি করিয়া উত্তেজিত করিতেছে সেই আবার পরক্ষণে আরাধ্যদেবের ভার্য্যাকে কামনা করিতেছে! এমন বিরুদ্ধ

[১] হরধনুর্ভঙ্গেও আছে। এটি রাবণবধের সমসাময়িক রচনা।

মনোভাব মনোবিজ্ঞানে অসম্ভব না হইতে পারে, কিন্তু নাটকে তাহার আয়োজন কই। ত্রিজটার সঙ্গে হনুমানের চাপল্য দৃশ্যে রাজকৃষ্ণ রায়ের অনলে-বিজলী নাটকের স্পষ্ট প্রভাব আছে।

রাবণবধের পর 'সীতার বনবাস' (১২৮৮), 'অভিমন্যুবধ' (১২৮৮), একাঙ্ক 'লক্ষ্মণ-বর্জ্জন' (১২৮৮), 'সীতার বিবাহ', 'রামের বনবাস' (১২৮৯) এবং 'সীতাহরণ' (১২৮৯)। ইহার পর রামায়ণ-কাহিনী লইয়া গিরিশ আর কোন নাট্যনিবন্ধ রচনা করেন নাই। 'ব্রজবিহার' ও 'মলিন মালা' (১২৮৯) গীতিনাট্য এবং 'ভোটমঙ্গল' (১২৮৯) প্রহসন ইতিমধ্যে রচিত হয়। এই সময়ে গিরিশ রমেশচন্দ্রের মাধবীকঙ্কণকে নাট্যরূপ দেন। অভিমন্যুবধের পর 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' (প্রথম অভিনয় ১ মাঘ ১২৮৯) লইয়া মহাভারত-কাহিনীর অনুবৃত্তি চলে। দ্রৌপদীর ভূমিকা ভালো। কিন্তু বালিকা উত্তরাকে প্রথম হইতেই কৃষ্ণভক্তিরসাতুর করায় নাট্যরসের হানি হইয়াছে।

পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস অভিনয়ের পর গিরিশ গ্রেট ন্যাশনাল ছাড়িয়া ষ্টার থিয়েটারে যোগ দিলেন। এখানে আসিয়া তিনি 'দক্ষযজ্ঞ'[১] রচনা করিলেন। গিরিশচন্দ্রের পরবর্ত্তী সকল নাটকে যে প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষের কেন্দ্রীয় ভূমিকা দেখা যায় তাহার সূত্রপাত হইল এখানে। দক্ষযজ্ঞের তপস্বিনী এইরূপ ভূমিকা এবং ইহার মূলে আছে মনোমোহন বসুর সতী-নাটকের শান্তে পাগলা। 'ধ্রুব-চরিত্র'[২] এবং 'নলদময়ন্তী' (জুলাই ১৮৮৭)[৩] নাটকের বিদূষক-ভূমিকাও এইরূপ। অতঃপর 'কমলে-কামিনী',[৪] 'বৃষকেতু'[৫] এবং 'শ্রীবৎস-চিন্তা'[৬] রচিত হইয়া দ্বিতীয় পর্ব্বের অবসান ঘটিল।

গিরিশচন্দ্রের নাট্যরচনার তৃতীয় স্তরে (১৮৮৪-৮৯) পাই "অবতার মহা-পুরুষ" নাটক। এই সময়ে মাত্র একখানি প্রহসন লেখা হইয়াছিল, 'বেল্লিক-বাজার'। এই সময় হইতে গিরিশচন্দ্রের নাটকে ও নাট্যাভিনয়ে যে প্রচুর সৌভাগ্য দেখা গেল তাহাতে কয়েকটি বিশিষ্ট অভিনেত্রীর দক্ষতা বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছিল। চৈতন্যলীলায় বিনোদিনী (নিমাই ভূমিকায়) ও গঙ্গামণি (নিতাই ভূমিকায়), প্রহ্লাদে কুসুমকুমারী, ম্যাকবেথ জনা পাণ্ডবগৌরব করমেতি-বাই সৎনাম ভ্রান্তি ইত্যাদিতে তিনকড়ি—অভিনয়

[১] প্রথম অভিনয় ৬ শ্রাবণ ১২৯০। [২] ঐ ২৭ শ্রাবণ ১২৯০। [৩] ঐ ৬ পৌষ ১২৯০। সচিত্র প্রকাশিত। [৪] ঐ ১৭ চৈত্র ১২৯০। [৫] ঐ ৫ বৈশাখ ১২৯১। [৬] ঐ ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৯১।

জমাইয়া তুলিয়াছিল।[১] এই স্তরের প্রথম নাটক হইতেছে 'চৈতন্যলীলা'[২]। ইতিপূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যের জীবনীবিষয়ে একটিমাত্র নাটক বাহির হইছিল, অজ্ঞাত-নামা লেখকের 'নিমাই-সন্ন্যাস' (১২৮৯)। গিরিশচন্দ্রও 'নিমাই-সন্ন্যাস'[৩] লিখিয়াছিলেন চৈতন্যলীলার দ্বিতীয় ভাগ রূপে। নাটক হিসাবে চৈতন্য-লীলাকে ভালো বলা যায় না। প্রথম হইতেই তাঁহাকে অবতার বলিয়া ধরিয়া লওয়ায় নাট্য-কৌতূহল অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়াছে। চৈতন্যলীলা ও নিমাইসন্ন্যাসের মাঝখানে পাই দ্ব্যঙ্ক 'প্রহ্লাদচরিত্র'। তাহার পর 'প্রভাস-যজ্ঞ'[৪] এবং 'বুদ্ধদেব-চরিত' (এপ্রিল ১৮৮৭)।[৫] বুদ্ধদেব-চরিত এডুইন আর্নল্ডের 'লাইট অব এসিয়া' কাব্য অবলম্বনে রচিত, এবং সেইজন্য এই "অবতার"-নাটকখানির গঠনে কিছু বাধুনি দেখি। মারের দলবলের ক্রিয়া-কলাপ লঘুতার সঞ্চার করিয়া বৈচিত্র্য আনিয়াছে। নাটকের গোড়াতেই বুদ্ধের অবতারত্ব ধরিয়া লওয়ায় নাট্যরস ব্যাহত হইয়াছে। বুদ্ধদেব-চরিত প্রধানত ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষরে রচিত এবং ইহার ভাষা ও যতি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা উন্নত। ইহাতে কয়েকটি ভালো গান আছে। বুদ্ধদেব-চরিতের পর 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর'[৬] লেখা হয়। ইহা গিরিশের আদর্শ "মহাপুরুষ"-নাটক। ভক্তমালে প্রথিত বিল্বমঙ্গল-কাহিনীর সঙ্গে সুরদাসের জীবনী মিলাইয়া নাটকটির কাহিনী গঠিত। প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষ পাগলিনীর ভূমিকা দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উপদেষ্টা ব্রাহ্মণীর আদর্শে পরিকল্পিত বলিয়া মনে হয়। অতিথিসেবা এবং পতি-আজ্ঞাপালন এই দুইটি উপদেশ আদ্যন্ত ভক্তিরসাপ্লুত বিল্বমঙ্গল-ঠাকুরের প্রতিপাদ্য। শেষে প্রায় সকল চরিত্রই জীবন্মুক্ত হইয়া বৃন্দাবন আশ্রয় করিয়াছে। ভক্তিরসের এই বাহুল্যের জন্যই বিল্বমঙ্গল-ঠাকুরেব নাটকীয় মূল্য নির্দ্ধারণ অসম্ভব হইয়াছে। 'রূপসনাতন'এ[৭] নাট্যরস জমে

[১] এই প্রসঙ্গে সেকালের কয়েকজন বিশিষ্ট অভিনেত্রীর উল্লেখ করিতে পারি। বেঙ্গল থিয়েটারে নাম করিয়াছিল এলোকেশী, জগৎতারিণী, শ্যামাসুন্দরী ও গোলাপ ("সুকুমারী")। সুকুমারী ছিল শিক্ষিতা, সুগায়িকা এবং সু-অভিনেত্রী। বেঙ্গল থিয়েটারের অধ্যক্ষ ইঁহাকে বিবাহ দিয়া গৃহস্থ করিয়া দেন। ন্যাশনাল থিয়েটারে নাম করিয়াছিল কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি, হরিমতী, লক্ষ্মীমণি, নারায়ণী এবং পরে বিনোদিনী। ষ্টেটস্‌ম্যান (১৭ জুলাই ১৮৭৮, পুনর্মুদ্রিত ১৭ জুলাই ১৯৫৫) হইতে জানা যায় যে নারায়ণী তৎকালে এদেশে জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী বলিয়া খ্যাত ছিল। [২] প্রথম অভিনয় ১৯ শ্রাবণ ১২৯১। [৩] ঐ ১৬ মাঘ ১২৯১। [৪] ঐ ২১ বৈশাখ ১২৯২। [৫] ঐ ৪ আশ্বিন ১২৯২। [৬] ঐ ২০ আষাঢ় ১২৯৩। কমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' (১৮৮৭) নামে নাটক রচনা করিয়াছিলেন। [৭] প্রথম অভিনয় ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪।

নাই, যদিও এই মহাপুরুষ ভ্রাতৃদ্বয়ের জীবনীতে নাটকোচিত উপাদানের অভাব ছিল না। উত্তর ভারতে যোগী গোরক্ষনাথ ও রাজা রসালু সম্বন্ধীয় যে-সকল উপকথা প্রচলিত আছে তাহারই একটি অবলম্বন করিয়া 'পূর্ণচন্দ্র'[১] লেখা। স্বাধীন-রানী সুন্দরার ভূমিকায় ঔচিত্য নাই। কলিকাতার বস্তি-বাসিনী ইতরশ্রেণীর স্ত্রীলোকে যে-ভাষায় সঙ্গিনীদের সঙ্গে রসিকতা করে সুন্দরা তাহার সঙ্গিনী সারীর সঙ্গে সেই ভাষাতেই কথা কয়। কয়েকটি ভালো গান আছে।

পূর্ণচন্দ্র রচনার পর 'বিষাদ', 'নসীরাম' এবং 'প্রফুল্ল'—এই তিনখানি বিয়োগান্ত নাটক লেখা হয়। ভক্তিরসাত্মক "মহাপুরুষ"-নাটক বলিয়া বিষাদের ও নসীরামের ট্রাজেডির গুরুত্ব খর্ব্ব হইয়াছে। 'বিষাদ'এর (১২৯৫) কাহিনীতে কিছু মৌলিকত্ব আছে। ভক্তমালে যে পতিব্রতা নারীর কাহিনী আছে তাহার সহিত বিলাতি নাটকের কিছু ভাব-কল্পনা মিশাইয়া বিষাদের প্লট গঠিত। বিল্বমঙ্গল-ঠাকুরের সঙ্গে বিষাদের বেশ মিল আছে, তবে ইহার পরিণতি বিয়োগান্ত। নাটকের যিনি কেন্দ্রীয় চরিত্র, মাধব, তাঁহার বুঝিবার দোষেই নাটকঘটনার এইরূপ পরিণতি। বিষাদ-ভূমিকার পরিকল্পনায় বোমণ্ট-ফ্লেচারের 'ফিলাষ্টার' নাটকের বেল্লারিও-বেশী ইউফ্রেসিয়ার ছায়া পড়িয়াছে। (গিরিশের আদর্শ বিয়োগান্ত নাটকের অঙ্কুর বিষাদে—সেখানে দুইটি মাত্র হত্যাকাণ্ডের পর যবনিকাপতন হইয়াছে, এবং বিকাশ নসীরামে—যেখানে নাট্যের উপসংহারে একটি হত্যা একটি আত্মহত্যা এবং একটি পতন ও মৃত্যু আছে)। 'নসীরাম'এর (১৩০৩)[২] কেন্দ্রীয় চরিত্র হইতেছে মহা-মহাপুরুষ "পাগলা" নসীরাম। ইঁহার মুখে গিরিশচন্দ্র পরমহংসদেবের উক্তি কিছু দিয়াছেন বলিয়া নাটকটিকে "ভগবদ্বাক্য-মূলক" ছাপ দিয়াছেন। নসীরামের ভূমিকায় পরমহংসদেবের প্রতিবিম্বন এই পর্য্যন্তই। নাটকের দ্বিতীয় মহৎচরিত্র সোনা কথাবার্ত্তায় কলিকাতার বস্তি-বাসিনী কার্য্যে দেবদূতী। বিল্বমঙ্গলের মত নসীরামের উপসংহারেও উদ্বৃত্ত ভূমিকাগুলি পরমবৈষ্ণব হইয়া গিয়াছে।

চতুর্থ স্তরে (১৮৮৯-১৯০৫) পাই প্রধানত গার্হস্থ্য ট্রাজেডি এবং বিয়োগান্ত পৌরাণিক নাটক। প্রকৃতপক্ষে এই স্তরের শুরু 'বিষাদ' হইতে। এই সময়ে কয়েকখানি গীতিনাট্য প্রহসন এবং মিলনান্ত নাটকও রচিত হইয়াছিল।

[১] ঐ ৫ চৈত্র ১২৯৪। [২] ঐ ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫।

এইযুগের প্রথম নাটক 'প্রফুল্ল' (১৮৮৯)[১] গিরিশচন্দ্রের প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ সম্পূর্ণাঙ্গ বিয়োগান্ত নাটক। নাটকের আরম্ভ পাইকারি বিপৎপাতে এবং শেষও পাইকারি "পতন ও মৃত্যু"-তে। কলিকাতার মধ্যবিত্ত ভদ্রসংসারের অবনতির কাহিনী লইয়া নাটকটি রচিত। অমানুষিক ভ্রাতৃবিদ্বেষ এবং পৈশাচিক লোভ নাটকটির বীজ। অতিরিক্ত রঙ চড়ানো না হইলে কাহিনী সত্যকার ট্রাজেডি হইতে পারিত। রমেশ-ভূমিকায় অতিরঞ্জন এত বেশি যে তাহাতে রক্ত-মাংসের মানুষ বলা চলে না। যোগেশ-ভূমিকা অধিকতর বাস্তব, কিন্তু ইহার বাস্তবতা আরো গ্রহণীয় হইতে পারিত যদি লেখক যোগেশের কথা সবটাই তাহার মুখে প্রকাশ না করিতেন। প্রফুল্ল কেন্দ্রীয় মহাপুরুষস্থানীয়, এবং অত্যন্ত বর্ণহীন। জ্ঞানদার ভূমিকা প্রথমদিকে স্বাভাবিক কিন্তু পরিণামে অস্বাভাবিক। উমাসুন্দরীর ভূমিকার শেষের দিকে নীলদর্পণের ছায়াপাত হইয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয় সামাজিক নাটক 'হারানিধি'র (১৮৯০)[২] প্লট কতক অংশে প্রফুল্ল নাটকের মত। প্রফুল্লে ভ্রাতার বিশ্বাসঘাতকতা, হারানিধিতে বাল্যবন্ধুর। হারানিধিতে কোন বাস্তব ভূমিকা নাই। মোহিনী পাকা পাষণ্ড, শেষে অনুতাপ করিয়া সাধু বনিয়া গিয়াছে। অঘোর ছদ্ম-পাষণ্ড অর্থাৎ বাহিরে পাষণ্ডের ভাব অন্তরে সাধুর। ছোট ভূমিকাগুলিও সব অসম্ভবরকম সাধু অথবা অত্যন্ত ভালোমানুষ। নব হইতেছে কেন্দ্রীয় নির্লিপ্ত মহাপুরুষ-ভূমিকা, যাহার দ্বারা ঘটনা-প্রবাহ সুনির্দ্দিষ্ট পরিণতির দিকে আগাইয়া যাইতেছে। এই কার্য্যে কাদম্বিনীরও সহায়তা আছে। নাটকের ঘটনাবলীর যেন কোন যুক্তিযুক্ততা নাই। নারী-ভূমিকার সংলাপ বাস্তব।

'চণ্ড'[৩] নাটকের কাহিনী টডের রাজস্থান হইতে গৃহীত। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের হাতে আখ্যানটি যে রূপ পাইয়াছে তাহাতে এটিকে ঐতিহাসিক নাটক বলা চলে না। বিমাতার বিদ্বেষ নাটককাহিনীর বীজ। শেষ অবধি ভ্রাতৃবাৎসল্য জয়লাভ করিয়াছে।

তাহার পর 'মলিনা-বিকাশ' (১২৯৭) গীতিনাট্য এবং 'মহাপূজা' (ঐ) রূপকনাট্য। ইহার পর গিরিশচন্দ্র মিনার্ভা থিয়েটারে যোগ দিলেন। সেখানে প্রথমে ইহার অনূদিত 'ম্যাকবেথ' (১৩০৬)[৪] ও মিলনান্ত নাটক 'মুকুলমুঞ্জরা'[৫]

[১] ঐ ১৬ বৈশাখ ১২৯৬ (?)। [২] ঐ ২৪ ভাদ্র ১২৯৬। [৩] ঐ ১১ শ্রাবণ ১২৯৭।
[৪] ঐ ১৬ মাঘ ১২৯৯। [৫] ঐ ২৪ মাঘ ১২৯৯।

অভিনীত হয়। তাহার পর 'আবুহোসেন' (১৩০৩)[১] এবং 'সপ্তমীতে বিসর্জ্জন'[২] রচিত হইয়াছিল। মুকুলমুঞ্জরা গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ মিলনাত্মক নাটক। রচনায় স্থানে স্থানে কবিত্বের প্রকাশ আছে। আখ্যানবস্তু সম্পূর্ণ মৌলিক নয়, রেনল্ড্‌সের 'ওয়াগ্‌নার দি ওয়্যারউলফ্‌' আখ্যায়িকার প্রভাব কিছু আছে।

অতঃপর পাই গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাটক, সম্ভবত ইহার শ্রেষ্ঠ নাট্যরচনা, 'জনা' (১৮৯৪)।[৩] জনার উদ্দেশ্য হইতেছে হরিভক্তি গঙ্গাভক্তি ও মাতৃভক্তি প্রখ্যাপন। প্রথম অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কেই নাটকের পরিণতির পরিপূর্ণ ইঙ্গিত রহিয়াছে। নাট্যরস জমিয়া উঠিবার পক্ষে একটি প্রধান বাধা কৃষ্ণের অবতারত্ব। কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, সুতরাং তাঁহার সহিত যুদ্ধ ভাণ মাত্র। জনা স্বামীকে যুদ্ধার্থে উত্তেজিত করিয়া বলিতেছে, "অরিরূপে নারায়ণ আসিয়াছে ঘরে।" তেজস্বিনী নারীরূপে জনা-ভূমিকায় বিশেষ কিছু অসঙ্গতি নাই, তবে পুত্রের মৃত্যুর পর তাহার প্রতিহিংসাপরায়ণতা ও মস্তিষ্কবিকৃতি বিসদৃশ হইয়াছে। জনা জানে যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, তাই সে রাজাকে বলিয়াছিল, "রণে যেতে পুত্রে আমি কভু না বারিব", এবং "হরিভক্তি নহে রাজা হীনতাস্বীকার"। তাহার উপর কৃষ্ণ যে ভগবান্ সে কথাও সে ভুলে নাই। সুতরাং "জনা চলে প্রতিবিধিৎসিতে"—অর্জ্জুনের প্রতি জনার এই ক্রোধের কোন হেতু নাটকের মধ্যে দেখানো হয় নাই। শেষে জনার এই যে আড়ম্বর-উচ্ছ্বসিত স্বগতোক্তি তাহাও তাহার মত বিকৃতমস্তিষ্ক নারীর পক্ষে স্বাভাবিক নয়,

> যথা নিবিড় আঁধারে
> ঘোর রোলে পরমাণু ঘূর্ণ্যমান।
> যথা জড়জড়িমায় প্রকৃতি জড়িত
> ঘোর ধূমমাঝে
> চলে প্রলয় জীমূতশ্রেণী
> বজ্র-অগ্নিধারা ঝরে।

জনা নাটকের পরিকল্পনায় গিরিশচন্দ্র মধুসূদনের 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' কবিতার কাছে বিশেষভাবে ঋণী। জনা-ভূমিকার প্রথমাংশে মহাভারতের গান্ধারী-চরিত্রের এবং শেষাংশে বৃত্রসংহারের ঐন্দ্রিলা-চরিত্রের কিছু প্রভাব আছে।

[১] ঐ ১৩ চৈত্র ১২৯৯। [২] ঐ ২২ আশ্বিন ১৩০০। [৩] ঐ ৯ পৌষ ১৩০০।

প্রবীর যোদ্ধা, তবে ধ্রুব-প্রহ্লাদের মত বাল্যাবধি হরিভক্ত। অথচ তাহার আচরণ মাতৃ-অঞ্চলচ্ছায়ালালিত আদর্শ বঙ্গসন্তানের মতই। পুত্রের মাতৃ-পরায়ণতার গৌরব করিয়া জনা বলিতেছে,

> আমা বিনে সে কারে নাহি জানে,
> কার্য্যান্তরে রহি যদি ভোজনসময়,
> অন্ন নাহি খায়, মা বলে সঘনে ডাকে।
> বধূরে রাখিয়া একা আসে রজনীতে,
> কত ভুলাইয়ে
> বাছায় পাঠাই পুনঃ শয়ন-আগারে!

প্রবীর মহারথ যোদ্ধা, কিন্তু নিজবলে নহে, মাতৃভক্তিই তাহার শক্তিব অক্ষয়ভাণ্ডার—"ধরি তোর পদধূলি শঙ্করে না ডরি", এবং "মাতৃ-নাম কবচ আমার"। কৃষ্ণার্জ্জুনকে নরনারায়ণের অবতার বলিয়া জানে বলিয়াই যুদ্ধে প্রবীরের এত আগ্রহ। এইসব কারণে নাটকের বীররসের বাস্তবতা তলাইয়া গিয়াছে।

কৃষ্ণের আচরণ সর্ব্বত্র সঙ্গত নয়। মহাভক্ত প্রবীরকে হত্যা করিবার যে কারণ তিনি দেখাইতেছেন তাহা একান্ত দুর্ব্বল,

> মহাবীর প্রবীর না পতন হইলে,
> পাণ্ডবের সমকক্ষ বীর রবে ভবে।

রাবণবধে রাম যেমন রাবণের মুখে নিজের স্তব শুনিয়া গলিয়া গিয়াছিলেন, জনায় কৃষ্ণের আশঙ্কা অর্জ্জুনও তাহাই করিবে। অতএব তিনি এমন কাজে উদ্যত হইলেন যাহা মহাভারত-সূত্রধার পার্থ-সারথির পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত।

> নীর হেরি নারীচক্ষে দয়া না করিব,
> প্রবীরে বধিব।
> শুনি মম নাম-গান,
> সদয়-হৃদয়—
> পার্থ নাহি প্রবীরে নাশিবে…

বৃষকেতুকে জনার রোষবহ্নির ইন্ধন করায়ও কৃষ্ণের মাহাত্ম্য খর্ব্ব হইয়াছে।

শিব কর্ত্তৃক প্রবীরের প্রলোভন দৃশ্য না থাকিলেই ভালো হইত। ইহাতে প্রবীর-চরিত্র নষ্ট হইয়াছে, শিবের মাহাত্ম্য উজ্জ্বল হয় নাই, নাট্যকাহিনীও অবাস্তব হইয়া গিয়াছে। রাবণবধে রাবণের সীতা-লালসার সঙ্গে জনায় প্রবীরের নারী-লালসার মিল আছে। গিরিশচন্দ্রের অধিকাংশ পৌরাণিক নাটকে যেমন এখানেও তেমনি বিদূষকই সরলহৃদয় প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষ।

জনার পর গিরিশচন্দ্র তিনটি "পঞ্চরং" (বিদ্রূপাত্মক প্রহসন)—'বড়দিনের বকশিশ' (১৯৯৪), 'সভ্যতার পাণ্ডা' (ঐ) ও 'পাঁচ কনে' (১৮৯৬), এবং দুইটি গীতিনাট্য—'স্বপ্নের ফুল' (১৮৯৪) ও 'ফণির মণি' (১৮৯৬) রচনা করেন। ইহার মধ্যে একটি "মহাপুরুষ"-নাটকও লেখা হইয়াছিল, 'করমেতি-বাই' (১৩০২)। নাটকটিতে ভক্তিরসের প্লাবনে স্বর্গমর্ত্ত্য একাকার হইয়া গিয়াছে।

মিনার্ভা ছাড়িয়া গিরিশ ষ্টারের নাট্যাচার্য্য বা ড্রামাটিক ডাইরেক্টার হইয়া আসিলেন। এখানে আসিয়া লিখিলেন 'কালাপাহাড়' নাটক (১৮৯৬)[১] ও 'হীরক জুবিলী' (১৮৯৭) এবং 'পারস্যপ্রসূন' (ঐ) গীতিনাট্য। অতঃপর গিরিশের তৃতীয় সামাজিক নাটক 'মায়াবসান' (১৩০৪)[২] লেখা হইল। বিশুদ্ধ জ্ঞানের উপরে ক্ষমা-দয়া-জীবপ্রেমের জয়খ্যাপন ইহার মর্ম্মকথা। ভ্রাতৃবিরোধ এবং তাহার ফলে উকীল-এটর্নি-টাউটের ইন্ধনে গৃহস্থ-সংসারের ধ্বংস এই নাটকেরও আখ্যানবস্তু। এখানে শুভবুদ্ধির প্রচেষ্টায় বিরোধের অবসান হইল বটে কিন্তু বিপৎপাত এড়ানো গেল না। উপসংহারে তিনটি মৃত্যু—অন্নপূর্ণার, রঙ্গিণীর এবং গণপতির। সরলহৃদয় সদাশয় কালীকিঙ্করের শিষ্য এবং তাঁহার প্রতি সঙ্গোপনে প্রণয়শীল বৈষ্ণব-দুহিতা রঙ্গিণী নাটকের কেন্দ্রস্থানীয় মহাপুরুষ-চরিত্র। সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা স্বাভাবিক। বিবেকানন্দের প্রভাব কালীকিঙ্কর-ভূমিকায় এবং নিবেদিতার প্রভাব রঙ্গিণী-ভূমিকায় কিছু পড়িয়াছে। ভৃত্য শান্তিরামের মহৎ চরিত্র মনোরম। অন্নপূর্ণা প্রথম দিকে স্বাভাবিক, কিন্তু শেষের দিকে অত্যন্ত নাটকীয়।

মায়াবসানের পর গিরিশচন্দ্র ক্লাসিক থিয়েটারে[৩] যোগ দিলেন এবং 'দেলদার' (১৮৯৯) গীতিনাট্য ও 'পাণ্ডবগৌরব' নাটক (১৯০০)[৪] লিখিলেন। নাটকের প্রধান প্রতিপাদ্য আশ্রিতরক্ষণ উপক্রমেই ব্যাখ্যাত। শক্তি যে বৈষ্ণবেরও উপাস্য তাহা অন্যতম প্রতিপাদ্য। জৈমিনীয়-সংহিতায় এবং পদ্মপুরাণের ক্রিয়াযোগসারে যে দণ্ডী রাজার কাহিনী আছে তাহাই নাটকটির বিষয়। মন্দিরের দৃশ্য অর্থহীন। ঘেসেড়া-ঘেসেড়ানীর দৃশ্য কতকটা স্বাভাবিক বটে কিন্তু ইহাতে নাটককাহিনীর গুরুত্ব নষ্ট হইয়াছে। অষ্টবজ্র-সম্মিলনের

[১] ঐ ১১ আশ্বিন ১৩০৩। [২] ঐ ৪ পৌষ ১৩০৪।

[৩] অমরনাথ দত্ত এমারেল্ড থিয়েটার ইজারা লইয়া ক্লাসিক থিয়েটার নাম দিয়াছিলেন (১৮৯৬)। প্রথমে অভিনীত হয় হারানিধি। [৪] ঐ ৬ ফাল্গুন ১৩০৬।

কোন অর্থ নাই। জনার সঙ্গে পাণ্ডবগৌরবের কিছু মিল আছে। সুভদ্রা জনারই সগোত্র। পাণ্ডবদের সহিত কৃষ্ণের বিরোধে চোখ-ঠারাঠারি রহিয়াছে। দণ্ডীর ভূমিকা একেবারেই ফোটে নাই। উর্ব্বশীও তথৈবচ, তবে মর্ত্ত্যভূমির সংস্পর্শে তাহার স্পর্শকাতরতা বেশ ফুটিয়াছে। ভীম প্রবীরের রূপান্তর,

জানি আমি কৃষ্ণ তুষ্ট যায়
দণ্ডীরে অভয় দিছি তার প্রীতিহেতু।

বৃন্দাবনলীলার পুনঃপুনঃ উল্লেখে মহাভারতীয় কৃষ্ণ-চরিত্রের গম্ভীর মর্য্যাদা নষ্ট হইয়াছে। এই দোষ গিরিশচন্দ্রের অপর পৌরাণিক নাটকেও আছে। কঞ্চুকী প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষ। কিন্তু বিদূষকের উপযোগী জিহ্বাচাপল্য বৃদ্ধ রাজ-প্রতিহারীর উপযুক্ত হয় নাই।

পাণ্ডবগৌরবের পর গিরিশ কয়েক মাসের জন্য মিনার্ভায় আসেন, তাহার পর আবার ক্লাসিকে যোগ দেন। মিনার্ভায় আসিয়া তিনি বঙ্কিমের সীতারামকে নাট্যাকারে পরিণত করেন এবং 'মণিহরণ' ও 'নন্দদুলাল' (১৯০০) গীতিনাট্য রচনা করেন এবং একটি নিতান্ত ক্ষুদ্র গীতিনাট্য 'অশ্রুধারা' (১৯০১) লিখেন রানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু উপলক্ষ্যে। তাহার পর পারস্য-উপন্যাসের একটি গল্প লইয়া 'মনের মতন' (১৩০৮)[১] নামে লঘুরীতির মিলনান্ত নাটক রচনা করেন। প্লটের শেষের দিকে শেক্‌স্পিয়রের 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট'এর ক্ষীণ প্রভাব দেখা যায়।

তাহার পর 'অভিশাপ' গীতিনাট্য।[২] অদ্ভুত-রামায়ণের তৃতীয়-চতুর্থ সর্গে অম্বরীষের কন্যা শ্রীমতীর যে স্বয়ংবরকাহিনী আছে তাহাই ইহার বিষয়। অতঃপর বুয়র-যুদ্ধ লইয়া ক্ষুদ্র রূপক গীতিনাট্য 'শান্তি' রচিত হইল, তাহার পর রোমান্টিক নাটক 'ভ্রান্তি' (১৩০৯)।[৩] ভ্রান্তিতে ঐতিহাসিক পাত্র-পাত্রী দুইএকটি থাকিলেও ইহার ঐতিহাসিকতা নগণ্য। প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষ রঙ্গলাল এবং নর্ত্তকী গঙ্গা ভ্রান্তি দুই কেন্দ্রীয় ভূমিকা।

তাহার পর লেখা হইল "সামাজিক নক্‌সা" 'আয়না',[৪] তাহার পর 'সৎনাম' বা 'বৈষ্ণবী' নাটক (১৩১১)।[৫] অতি ক্ষীণ ঐতিহাসিক সূত্র লইয়া ইহার

[১] ঐ ৭ বৈশাখ ১৩০৮। [২] ঐ ১২ আশ্বিন ১৩০৮। [৩] ঐ ৩ শ্রাবণ ১৩০৯। সৎনামের অভিনয়ে মুসলমান দর্শকেরা অসন্তুষ্ট হওয়ায় অভিনয় কিছুদিন বন্ধ থাকে। তাহার পর ন্যাশনাল থিয়েটারে 'ভারত-গৌরব' নামে অভিনীত হয়।

[৪] ঐ ১০ পৌষ ১৩০৯। [৫] ঐ ১০ বৈশাখ ১৩১১।

আখ্যানবস্তুর পরিকল্পনা। সৎনামে গিরিশচন্দ্রের দেশস্বাধীনতা-কামনার প্রথম প্রতিফলন দেখা গেল। প্রধান ভূমিকা বৈষ্ণবী জোয়ান অব্‌ আর্কের ছাঁচে গড়া। ভূমিকাটির বিকাশে প্রধান ত্রুটি হইতেছে আকস্মিকতা। নাটকের প্রারম্ভে তাহাকে দেখি উন্মাদিনী বালিকার বেশে, যদিও তাহার পাগলামিতে মাঝে মাঝে বেশ কাব্যরসের ছিটা আছে। যেমন,—"আমি বটতলায় বসে আকাশ দেখি গে আর ভাবি গে"। নিহত পিতাকে দেখিয়া তাহার মাথা তো সঙ্গে সঙ্গে ঠিক হইয়া গেলই, উপরন্তু মুখে নাটকীয় বক্তৃতা ছুটিল,—"আমায় ধরো না, আমি মূর্চ্ছা যাবো না, আমি এই রক্তে স্নান করলেম।...আমি পাগলী, আমি চিরকাল পিতাকে যন্ত্রণা দিয়েছি,..."। সৎনাম গিরিশের আদর্শ "ট্রাজেডির" অন্যতম। কম-সে-কম সাতটি মৃত্যুকাণ্ডের পর তবে যবনিকাপাত।

সৎনামের পর গিরিশচন্দ্র মিনার্ভায় আসিলেন এবং শিবায়ন-কাহিনী অবলম্বনে দ্ব্যঙ্ক নাটিকা 'হরগৌরী' (১৯০৫)[1] ও সামাজিক বিয়োগান্ত নাটক 'বলিদান' (১৩১২)[2] লিখিলেন। বলিদানের বিষয় মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী-ঘরে কন্যাদায়-সমস্যা। উপক্রমণিকা এবং উপসংহার যথাক্রমে প্রফুল্লর ও নীল-দর্পণের আদর্শে গঠিত—আদৌ সমূহ বিপৎপাত, অন্তে সমষ্টিগত মৃত্যু। অতঃপুরিকাদের এবং করুণাময়ের ভূমিকা স্বাভাবিক। প্রফুল্লর রমেশের মত বলিদানের মোহিনীমোহন অমানুষিক পাষণ্ড। দুলালচাঁদের ভূমিকা সর্ব্বত্র স্বাভাবিক নয়। পিতার সহিত তাহার সংলাপ অত্যন্ত অশোভন। প্রচ্ছন্ন মহৎ-চরিত্র হইতেছে জোবি পাগলিনী।

গিরিশচন্দ্রের নাট্যরচনার পঞ্চম স্তর (১৯০৫-১১) আরম্ভ হইল 'সিরাজদ্দৌলা'য়। ইতিমধ্যে দেশে স্বদেশী আন্দোলন বঙ্গভঙ্গের বিক্ষোভে প্রচণ্ডতা লাভ করিয়াছে। স্বাধীনতার ক্ষুধা বাঙ্গালীকে পাইয়া বসিয়াছে। সাহিত্যে তাহার প্রতিফলন হইল স্বদেশী গানে এবং দেশপ্রেমাত্মক ঐতিহাসিক নাটকে। এখানে গিরিশচন্দ্র অগ্রণী। মহৎ-চরিত্রে দেশপ্রেম ও প্রাচীন ভারতের আদর্শখ্যাপন এই স্তরের নাট্যরচনায় বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে এবং ভক্তির অপেক্ষা তপস্যা ও ক্ষমার আদর্শই বড় প্রতিপন্ন হইয়াছে। সম্ভবত এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে বিবেকানন্দের মতবাদের প্রভাব ক্রিয়াশীল ছিল।

[1] ঐ ২০ ফাল্গুন ১৩১১। [2] ঐ ২৬ চৈত্র ১৩১১।

ইতিমধ্যে বাঙ্গালাদেশে স্বদেশী আন্দোলন ভালো করিয়া জমিয়া উঠিয়াছে। সৎনামে দেশপ্রেমের যে ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন ছিল এখন অনুকূল আবহাওয়ায় তাহা পরিস্ফুট হইল। গিরিশ পরপর তিন বৎসরে তিনখানি দেশপ্রেমমূলক নাটক রচনা করিলেন—'সিরাজদ্দৌলা' (১৩১২),[১] 'মীরকাসিম' (১৩১৩)[২] এবং 'ছত্রপতি (শিবাজী)' (১৩১৪)।[৩] প্রথম দুইখানির রচনায় গিরিশচন্দ্রের প্রধান অবলম্বন ছিল অক্ষয়কুমার মৈত্রের রচিত 'সিরাজদ্দৌলা' এবং 'মীর-কাসিম'। ছত্রপতি লিখিত হইয়াছিল সত্যচরণ শাস্ত্রীর 'ছত্রপতি শিবাজী' অবলম্বন করিয়া। ছত্রপতি গদ্যে লেখা। অপর দুইটি নাটকও প্রধানত তাই, তবে ক্বচিৎ সিরাজের ও কাসিমের মুখে ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছত্র আছে। গান সবগুলিতেই আছে। সিরাজদ্দৌলার মধ্যস্থ ভূমিকা হইতেছে নাট্যকারেরই প্রতিনিধিস্থানীয় কামিনীকান্ত ওরফে "করিমচাচা"। মীর-কাসিমের কেন্দ্রীয় চরিত্র উদাসিনী তারার অবাস্তব ভূমিকা নাটকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব খর্ব্ব করিয়া দিয়াছে। ছত্রপতির কেন্দ্রীয় ভূমিকা শিবাজীর কনিষ্ঠ পত্নী পুতলা নাটকখানিকে লঘু করিয়া দিয়াছে। মীর-কাসিমের শেষে স্বামী-স্ত্রীর "পতন ও মৃত্যু" এবং ছত্রপতির শেষে স্বামী-স্ত্রীর যুগল ইচ্ছামৃত্যু অসঙ্গত হইয়াছে নাট্যরসের দিক দিয়া। সিরাজদ্দৌলায় এইরূপ অসঙ্গতি নাই বলিয়া ঘটনার ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়াও নাটকটির ঐতিহাসিক রস জমিয়াছে।

সিরাজদ্দৌলার পর লেখা হইল "আর্য্যরাজ-মহিমা-কীর্ত্তিত গীতপ্রধান নাটক" 'বাসর' (১৯০৬)।[৪] পঞ্চতন্ত্রে "লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ" ইত্যাদি শ্লোক-ঘটিত যে গল্প আছে তাহার সহিত রূপকথা মিশাইয়া বাসরের আখ্যানবস্তু পরিকল্পিত হইয়াছে হিন্দুধর্ম্মের নবজাগরণের পোষকতা করিয়া। মীর-কাসিমের পর মলিয়েরের 'ল্'আমুর মেদিস্যাঁ'র ইংরেজি অনুবাদ অবলম্বনে 'য্যায়সা-কা-ত্যায়সা' (১৩১৩)[৫] লিখিলেন। ছত্রপতির পর লেখা হইল সামাজিক বিয়োগান্ত নাটক 'শাস্তি কি শান্তি ?' (১৩১৫)[৬]। এটিকে বলিদানের দ্বিতীয় খণ্ড বলিতে পারি। বিষয় তরুণী বিধবার সমস্যা। বিধবার বিবাহ দিলে সব সময় যে ফল ভালো হয় না তাহাই প্রতিপাদ্য। গিরিশের সামাজিক নাটকে ব্যভিচার প্রভৃতি দুর্নীতির উল্লেখ থাকিবেই, আলোচ্য নাটকেও আছে,

[১] ঐ ২৫ ভাদ্র ১৩১২। [২] ঐ আষাঢ় ১৩১৩। [৩] ঐ ৩২ শ্রাবণ ১৩১৪।
[৪] ঐ ১১ পৌষ ১৩১২। [৫] ঐ ১৭ পৌষ ১৩১৩। [৬] ঐ ২২ কার্ত্তিক ১৩১৫।

এবং সকল দুর্ঘটনাই নাটকের উপক্রমণিকায় প্রায় একসঙ্গে ঘটিয়া গিয়াছে। গিরিশের ট্রাজেডির আর একটি বড় লক্ষণও ইহাতে আছে, সাংসারিক দুর্ঘটনায় গৃহিণীর পরিবর্ত্তে কর্ত্তার চিত্তবিকৃতি ও ধৈর্য্যহীনতা। প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষ হইতেছে ছদ্মবেশী পাগল। ইনি এবং ইহার স্ত্রী ভিখারিণী নাটকটির দুই কেন্দ্রীয় ভূমিকা।

'শঙ্করাচার্য্য' (১৩১৬)[১] লইয়া গিরিশ পুনরায় প্রাচীন যুগের অবতার-নাট্যে ফিরিয়া আসিলেন। ইহাতে অবতার-নাটক অলৌকিক-নাটকে রূপান্তরিত হইয়াছে। তাহার পর 'অশোক' (১৯১১)[২]। অশোকাবদানে অশোকের যে কাহিনী আছে তাহাই ইহার বিষয়। প্রতিপাদ্য ক্ষমা ও অহিংসা। অশোক-ভূমিকায় মূল কাহিনীর মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে। অন্যান্য ভূমিকাও সুচিত্রিত। তবে মারের ভূমিকা প্রয়োজনাতিরিক্ত স্থান গ্রহণ করায় নাট্যরসের হানি হইয়াছে। প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষ আকালের ভূমিকা সম্পূর্ণ কল্পনা-প্রসূত, এবং নাট্যকাহিনীর পক্ষে অপরিহার্য্য নয়।

গিরিশচন্দ্রের শেষ নাটক 'তপোবল' (১৩১৮)[৩]। ইহা বৌদ্ধ যুগেরও পূর্ব্বেকার, বৈদিক যুগের কাহিনী লইয়া লেখা। বশিষ্ঠের সহিত বিশ্বামিত্রের বিরোধ তপোবলের আখ্যানবস্তু। প্রতিপাদ্য তপস্যার উপর ক্ষমাগুণের প্রাধান্য।

গিরিশচন্দ্রের শেষের তিন নাটকে ভক্তিরসের আতিশয্য নাই—ধর্ম্মের প্রাচীনতর আদর্শ, জ্ঞান তপস্যা এবং ক্ষমা—এই তিন গুণের উপরই জোর পড়িয়াছে। ব্রাহ্মণের প্রকৃত আদর্শ তপস্যা ও ক্ষমা তপোবলের প্রধান বক্তব্য হইলেও নাট্যকার তাঁহার পূর্ব্বতন পৌরাণিক নাটকের রীতিরই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন ব্রহ্মণ্যদেব ও বেদমাতা ভূমিকা দুইটির দ্বারা। পূর্ব্বতন শ্রীকৃষ্ণ এখন হইলেন ব্রহ্মণ্যদেব, বেদমাতা তাঁহারই শক্তি। প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষ সদানন্দের ভূমিকা মনোমোহন বসুর সতী-নাটকের শান্তে পাগলার কথা মনে করাইয়া দেয়।

নাট্যরচনার সংখ্যাধিক্যে গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালার নাট্যকারগণকে হারাইয়াছিলেন। কিন্তু বৈচিত্র্যহীনতার জন্য এই সংখ্যাধিক্যের মূল্য বেশি নয়। গীতি-নাট্যের কথা বাদ দিলে তাঁহার প্রায় পঁয়তাল্লিশখানি নাটকের বদলে চার পাঁচখানি মাত্র লিখিলে তাঁহার যশের হানি হইত না।

[১] ঐ ২ মাঘ ১৩১৬। [২] ঐ ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৭ [৩] ঐ ২ অগ্রহায়ণ ১৩১৮।

গিরিশচন্দ্রের নাট্যরচনার মূল্য নির্দ্ধারণের পূর্ব্বে এই কথা অবশ্য স্মরণীয় যে তিনি ছিলেন সুদক্ষ অভিনেতা, তাঁহার সহকারী সুযোগ্য অভিনেত্রী ছিল। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের উপযোগী করিয়াই তিনি নাটক লিখিতেন, এবং সাধারণ দর্শকের মন কিসে ভুলিত তাহা তিনি বেশ জানিতেন। পরমহংসদেবের সান্নিধ্যে আসিয়া তাঁহার মনে যে ভক্তিধর্ম্মের আদর্শ জাগিয়াছিল তাহা তিনি নাটকের মধ্যে রূপ দিতে প্রযত্ন করিয়াছেন। এইখানেই পূর্ব্বতন ও সমসাময়িক নাট্যকারদের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের প্রধান এবং সুস্পষ্ট পার্থক্য। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের স্নেহ-আশীর্ব্বাদ পাইয়া গিরিশ ধন্য হইয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার জীবনের সব চেয়ে বড় কথা। পরমহংসদেবের সঙ্গে পরিচয়ের পর হইতে গিরিশের নাটকে প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষ-ভূমিকা অপরিহার্য্য লক্ষণ হইয়া দাঁড়ায়। যদিও এখানে গিরিশচন্দ্রের মৌলিকত্বের দাবি বেশি নয়, কেননা অনেককাল পূর্ব্বে মনোমোহন বসু তাঁহার সতী-নাটকে এইরূপ চরিত্রের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। তবুও এ বিষয়ে পরমহংসদেবকে আদর্শ করিয়া গিরিশচন্দ্র যে কতকটা নূতন পথে চলিয়াছিলেন তাহা স্বীকার করিতে হয়। তবে ইহাও বলিব যে ভক্তিরসের প্রবলতা গিরিশের রচনাকে জনপ্রিয় করিয়াছিল, তাঁহার শিল্পকে উন্নত করিতে পারে নাই। পৌরাণিক-নাটককে সামাজিক-নাটকের সঙ্গে মিলাইয়া দেওয়া গিরিশের এক কৃতিত্ব।

নাট্যরচনার আদর্শ গিরিশ পাইয়াছিলেন প্রধানত মনোমোহন বসু ও দীনবন্ধু মিত্রের কাছে। ভক্তিরসময় পৌরাণিক-নাটকরচনার সূত্রপাত করেন মনোমোহন। গিরিশচন্দ্র এ বিষয়ে তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছিলেন। ট্রাজেডির আদর্শ গিরিশ পাইয়াছিলেন দীনবন্ধুর লেখা হইতে। নীলদর্পণ নাটকের অভিনয়ের দ্বারা যেমন সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা তেমনি গিরিশের অভিনয়-কুশলতারও প্রতিষ্ঠা। নীলদর্পণের প্রভাব গিরিশের বিয়োগান্ত নাটকে বিশেষভাবে পড়িয়াছে, বিশেষ করিয়া আত্মহত্যা-মৃত্যুবহুল উপসংহারে। অপর নাট্যকারের মধ্যে ব্রজমোহন রায় এবং রাজকৃষ্ণ রায় গিরিশচন্দ্রের লেখাকে অল্পস্বল্প প্রভাবিত করিয়াছিলেন। ব্রজমোহনের গীতাভিনয়ের রচনা-ভঙ্গির অনুসরণ গিরিশচন্দ্রের প্রথম পৌরাণিক নাটকগুলিতে দেখা যায়। গিরিশচন্দ্রের কয়েকটি গানও ব্রজমোহনের অনুসরণে লেখা। রাজকৃষ্ণ রায়ের অনলে-বিজলী গিরিশচন্দ্রকে তাঁহার প্রথম পৌরাণিক নাটক রাবণবধের রচনায়

প্রবৃত্তি দিয়াছিল। অনলে-বিজলীর উপক্রমে রাবণ-বিনাশে রামের যে দ্বিধা-ভাবের ইঙ্গিত আছে তাহাই রাবণবধ নাটকের বীজ।

পূর্ব্বগামীদের কাছে গিরিশচন্দ্রের ঋণ তত ভারি নয়, যত ভারি তাঁহার কাছে অনুবর্ত্তীদের ঋণ। "গৈরিশ" ছন্দ গিরিশচন্দ্রের আবিষ্কার নয়, তাঁহার পূর্ব্বে ব্রজমোহন রায় নাটকে এবং রাজকৃষ্ণ রায় কাব্যে ভাঙ্গা মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর পয়ার ছন্দের অল্পস্বল্প ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের দ্বারাই নাটকে ও অভিনয়ে এই ছন্দের সার্থক প্রয়োগ হইয়াছিল, এবং গিরিশ-চন্দ্রের এই কৃতিত্ব সমসাময়িক নাট্যকারগণের দ্বারা অনুকৃত হইতে বিলম্ব হয় নাই। গিরিশচন্দ্রের অনুকরণে ভক্তিরসময় পৌরাণিক নাটক বইয়ের বাজার এবং রঙ্গমঞ্চ ছাইয়া ফেলিয়াছিল।

গিরিশচন্দ্রের নাট্যরচনার সাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রধানত চারিটি। এক, ভক্তি-ভাব এবং পৌরাণিক আদর্শের আনুগত্য। সাধারণ বাঙ্গালীর মনে ধর্ম্মভীরুতা এবং ন্যায়ান্যায় বিষয়ে যে স্থির ধারণা আছে গিরিশের আদর্শ তাহারই অনুগত। তবে পরমহংসদেবের প্রভাবে ধর্ম্ম ও আচার বিষয়ে উদারতা গিরিশ-চন্দ্রের ধর্ম্মবিশ্বাসের মধ্যে বড় স্থান লইয়াছিল। সমাজসংস্কারে গিরিশচন্দ্রের মন সম্পূর্ণ অনুদার না হইলেও অনেকটাই সংস্কারবিমুখ ছিল। কার্য্যগতিকে তাঁহাকে পতিতাদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিতে হইত বলিয়া তাহাদের উপেক্ষিত জীবনের ভালো দিকটাও তাঁহার চোখে পড়িয়াছিল। তাঁহার নাটকে পতিতাদের প্রতি সহানুভূতির যথেষ্ট পরিচয় আছে, যদিও সে সহানুভূতি অনুকম্পারই সামিল। দুই, গিরিশচন্দ্রের নাটকে উপদেশ ও নীতিকথা প্রচ্ছন্ন রাখিবার চেষ্টা নাই। নাট্যকারের কাজ যে শুধু জীবনের অভিনয়-আলেখ্য আঁকা নয়, শিক্ষাদানও বটে—এই আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন গিরিশচন্দ্র। এই কারণে গিরিশের নাটকের প্রধান ভূমিকাগুলি প্রায়ই অতিরঞ্জনের জন্য বাস্তবতাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। যেন কতকগুলি অসম্ভবরকম ভালো ও অসম্ভবরকম মন্দ লোক অসম্ভব রকম কার্য্য করিয়া যাইতেছে। তিন, গিরিশচন্দ্র উপক্রমণিকায় নাট্য-কাহিনীর পরিণতি সুস্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে রঙ্গালয়ের সাধারণ দর্শকবৃন্দ পরিতৃপ্ত হইতে পারে কিন্তু নাট্যরসিকের কাছে ইহা প্রীতিপ্রদ নয়। আভাসে যাহা নাটককে উপাদেয় করিত প্রকাশে তাহা স্বাদহীন করিয়া দিয়াছে। এই দোষ পৌরাণিক ও অবতার-মহাপুরুষ

নাটকে সর্ব্বাধিক পরিস্ফুট। চার, গিরিশের নাটকে এমন এক বা একাধিক কেন্দ্রীয় মহৎচরিত্র বা মহাপুরুষ ভূমিকা থাকিবেই, যিনি মূল নাট্যকাহিনীর সহিত অসম্পৃক্ত থাকিয়া ঘটনাবলীকে সুনির্দ্দিষ্ট পরিণতির দিকে চালাইয়া লইয়া যাইতেছেন। পৌরাণিক নাটকে সাধারণত বিদূষক বা কঞ্চুকী এইরূপ কেন্দ্রীয় চরিত্র। অবতার-মহাপুরুষ ও সামাজিক নাটকে সাধারণত পাগল-পাগলিনী এই কার্য্যসাধন করে।

এই চারিটি ছাড়া আরও দুইটি বৈশিষ্ট্য গিরিশের অধিকাংশ নাটকে পাওয়া যায়। পাঁচ, ঘটনার অত্যধিক বাহুল্য অনেক সময় নাট্যরসের পক্ষে বিঘ্নকর এবং নাট্য-রসিকের পক্ষে পীড়াদায়ক হইয়াছে। সামাজিক ও অবতার-মহাপুরুষ নাটকে এই দোষ বিশেষভাবে দেখা গিয়াছে। ছয়, নাট্যকারের সমসাময়িক সংসারচ্ছবি যাহা নাট্যে প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা শুধু কলিকাতার সাধারণ গৃহস্থঘরের। কিন্তু গৃহস্থনারীর চরিত্রচিত্রণ নাই বলিলেই হয়। (ইহার একটা কারণ হইতেছে তখনকার অভিনেত্রীদের এই ধরণের চরিত্র-অভিনয়ে অযোগ্যতা। গৃহস্থনারীর ভূমিকা অভিনয়ে যাহাদের যোগ্যতা ছিল না তাহারা পাগলিনীর ভূমিকায় উৎকর্ষ দেখাইয়াছে। গিরিশের নাটকের প্রধান নারী-ভূমিকাগুলি অভিনেত্রীদের উপযোগিতা স্মরণ করিয়াই পরিকল্পিত হইয়াছিল।) কলিকাতার বাহিরের পল্লীজীবন গিরিশের কোন নাটকে স্থান পায় নাই। কলিকাতার জীবনচরিত্রের মধ্যে শুধু অন্তঃপুরিকাদের কথাবার্ত্তায় বাস্তবতার আভাস মেলে। পুরুষচরিত্রে বাস্তবতা নাই বলিলে অন্যায় হয় না। তবে অবান্তর ভূমিকায় ইহা দুর্লক্ষ্য নয়। উত্তর-কলিকাতার ইতর-জীবন সম্বন্ধে গিরিশের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কিছু ছিল, এবং এই অভিজ্ঞতা তিনি ভালোভাবে কাজে লাগাইয়াছেন।

গিরিশের নাটকগুলি তিন প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—পৌরাণিক, অবতার-মহাপুরুষ, এবং সামাজিক। রোমান্টিক নাটক গিরিশ অতি অল্পই লিখিয়াছিলেন, এবং তাহাতে অনেকটা বিলাতি আদর্শেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। ইঁহার যে-সকল নাট্যরচনা ঐতিহাসিক নাটক নামে পরিচিত সেগুলি সবই দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। পৌরাণিক নাটকগুলির প্রধান লক্ষণ ভক্তিরস-বাহুল্য। দ্বিতীয় লক্ষণ ভূমিকায় ঈশ্বর ও দেবচরিত্রের অবতারণা। এই কাজ পূর্ব্ববর্ত্তী নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি করিয়াছেন, তথাপি গিরিশের নাটকে

দেব-ভূমিকার যেমন প্রাধান্য এমন আর কোথাও নয়। তৃতীয় লক্ষণ স্ফুট উপদেশাত্মকতা। অবতার-মহাপুরুষ নাটকের প্রধান বিশেষত্ব উপোদ্‌ঘাতেই অবতারত্ব-প্রখ্যাপন। মহাপুরুষ-ভূমিকাগুলির অধিকাংশে নাট্যকারের দৃষ্ট একাধিক মহৎচরিত্রের আংশিক প্রতিবিম্বন হইয়াছে। সামাজিক নাটকের প্রথম বিশেষত্ব হইতেছে যে ইহাতে কলিকাতার মধ্যবিত্ত গৃহস্থজীবনের কিছু কিছু সঙ্কীর্ণ কাহিনী মাত্র স্থান পাইয়াছে। দ্বিতীয় বিশেষত্ব—ব্যাঙ্ক ফেল, ঋণের দায়ে ডিক্রিজারি, চাকুরি-হানি, গৃহবিক্রয়, চুরির অভিযোগ, কন্যার বৈধব্য ইত্যাদি সমস্ত বিপৎপাত যুগপৎ ঘটিয়া গিয়াছে এবং তাহাতে গৃহকর্ত্তা স্ত্রীলোকের অধিক মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে। তৃতীয় বিশেষত্ব—বিপৎপাতের মূলীভূত চক্রান্তের অধ্যক্ষ হইতেছে নায়কের ভ্রাতা, বাল্যবন্ধু অথবা ভ্রাতৃস্থানীয় স্নেহাস্পদ ব্যক্তি। তাহার সঙ্গে উকীল-এটর্নি-দালালের যোগ থাকিবেই। ভাগ্যহত নায়ক বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়াও ঘটনাবলীর পরিণতি সহজ মানুষের মতই অনুধাবন করিবে। চতুর্থ বিশেষত্ব—নীলদর্পণের আদর্শে নাটকের শেষে আত্মহত্যা হত্যা এবং "পতন ও মৃত্যু" ইত্যাদির প্রাচুর্য। নাটকের ভাগ্যহত পাত্র-পাত্রীকে সংসারভূমি হইতে একেবারে নিকাশ করিয়া দিয়া তবেই যবনিকা-পাতন হইতেছে গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব নাট্যকৌশল।[১] কিন্তু ঘটনা ট্রাজিক হইলেই কিছু নাটক ট্রাজিক হয় না। ট্রাজেডি জমিয়া উঠে নায়ক-নায়িকায় বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব আশ্রয় করিয়া। গিরিশচন্দ্রের ট্রাজেডিতে নায়ক-নায়িকার ব্যক্তিত্বের বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ছাপ বড় দেখি না।

গিরিশ যখন নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হন তখন দেশ "নাটক"-নামক আবর্জ্জনায় ছাইয়া গিয়াছিল। যে দুইচারিজন নাট্যকারের রচনায় কিছু ক্ষমতার পরিচয় ছিল তাঁহাদের লেখাও এই আবর্জ্জনার বন্যায় ভাসিয়া যাইবার যো হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের লেখনী এই সঙ্কটমুহূর্ত্তে বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চে ও নাট্যরচনায় নূতন উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়াছিল। বাঙ্গালা সাহিত্য কাব্যে-উপন্যাসে তখন যতটা উন্নত হইয়াছিল ততটা উন্নত নাটকের পক্ষে অসম্ভাবিত ছিল। বাঙ্গালীর জীবনে বৈচিত্র্য নাই, প্রাণেও উন্মাদনা নাই, সুতরাং স্বভাবতই তাহার সাহিত্যরসবোধ নাটকের মধ্য দিয়া সার্থকতার পথ পায় নাই। তবুও যে তখন অজস্র নাটক তৈয়ারি হইতেছিল তাহার একটা কারণ রঙ্গালয়ের অভিনব

১ তাই তিনি দুর্গেশনন্দিনীর নাট্যরূপে উপসংহারে আয়েষাকে নিকাশ করিয়াছিলেন।

মোহকরতা, আর একটা কারণ রচনার সুগমতা। পাত্র-পাত্রীর সংলাপ গাথিয়া দিলেই হইল নাটক আর সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাহা বেশ সুবোধ্য। সুতরাং নাটকের লেখক ও পাঠক দুইয়েরই অভাব ছিল না। যে দুইচারিজন নাট্যকার এই সময়ে বাঙ্গালা নাটককে সাময়িক তুচ্ছতার ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিলেন তাঁহাদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র অগ্রগণ্য।[১] গিরিশচন্দ্র নাট্যরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন খেয়ালখুশির বশে নহে, প্রয়োজনের তাগিদে। এই প্রয়োজন প্রধানত ছিল রঙ্গালয়ের প্রয়োজন। কিন্তু গিরিশের মনে যে একটা সুস্পষ্ট নাট্য এবং নৈতিক আদর্শ জাগ্রত ছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না। বাঙ্গালাদেশে তখন হিন্দুধর্ম্মের নব অভ্যুদয়ের হিড়িক পড়িয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় এই আন্দোলনের একটা দিকের বুদ্ধিমূলক ব্যাখ্যার চেষ্টা আছে। গিরিশচন্দ্র সেদিক দিয়া যান নাই। পরমহংস-বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের দ্বারা যে উদার জাগৃতি সম্ভাবিত করিল গিরিশের নাটকে তাহারই একটা ক্ষীণ প্রতিভাস।

গিরিশের নাটকে উঁচুদরের সাহিত্যশিল্পের পরিচয় নাই। যাহাদের জন্য গিরিশ নাটক লিখিতেন তাহাদের রসবোধের পরিধি তাঁহার গোচর ছিল। সুতরাং সস্তা ভাবোচ্ছ্বাসিত প্রেক্ষাগৃহের প্রশংসাধ্বনি তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই। তবে গিরিশের নাটকে ইহার অতিরিক্তও কিছু আছে। সে আন্তরিকতা। গিরিশ ইচ্ছা করিয়া অথবা অক্ষমতাবশত রচনায় ফাঁকি চালান নাই,[২] নিজের আদর্শকে মানিয়াই তিনি সাহিত্যের ও রঙ্গালয়ের সেবা করিয়াছিলেন। গিরিশের লেখার প্রধান গুণ সারল্য এবং স্বাচ্ছন্দ্য। রচনারীতি সর্ব্বত্র উন্নত নয় বটে কিন্তু কুণ্ঠার খোঁচও নাই। পদ্যে মাঝে মাঝে ভালো ছত্র আছে, কিন্তু অতিনাটকীয়তার জন্য কাব্যরস কোথাও জমে নাই। অতি-নাটকীয়তা এবং "কলকাতাই" ইতরতার জন্য ভাষাও সর্ব্বত্র শোভন নয়॥

[১] অতুলকৃষ্ণ মিত্র, অমৃতলাল বসু, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নাট্যকারদের রচনাও অভিনয়ের প্রয়োজনে গিরিশচন্দ্রের হাতে পরিমার্জ্জিত হইয়াছিল।

[২] গিরিশের অভিনয়ের গুণে তাঁহার রচনার অনেক ত্রুটি ঢাকা পড়িত। এই কারণে যাঁহারা তাঁহার অভিনয় দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন তাঁহাদের পক্ষে তাঁহার নাটকের সাহিত্যিক বিচার সম্ভবপর নয়।

১৮

অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯) গিরিশচন্দ্র ঘোষের মত সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠায় বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র যেমন নাটকে নূতনত্বের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন অমৃতলাল তেমনি প্রহসনে এবং বিদ্রূপাত্মক নক্‌শায় ("স্যাটায়র"এ) বৈচিত্র্য আনিয়া দেন। অমৃতলাল কয়েকখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন বটে কিন্তু প্রহসন-নক্‌শার উপরই ইঁহার যশের প্রতিষ্ঠা। প্রহসনে অমৃতলাল যেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ শিষ্য। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' এবং 'এমন কর্ম্ম আর করব না' প্রহসন দুইটির প্রভাব অমৃতলালের একাধিক প্রহসন-নক্‌শায় লক্ষিত হয়। ভাঁড়ামির ও ইতরতার আবর্জ্জনা হইতে সমসাময়িক প্রহসনকে উদ্ধার করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাহাতে যে বিশুদ্ধ সরস কৌতুকের ধারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন অমৃতলালের রচনায় তাহা খানিকটা পুষ্টিলাভ করে। অমৃতলালের রচনারীতিতে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়েরও প্রভাব কিছু আছে।

অমৃতলালের প্রথম রচনা[১] 'হীরকচূর্ণ নাটক' (১৮৭৫)।[২] বরোদা রাজ্যের ইংরেজ রেসিডেণ্টকে হীরকচূর্ণ মিশ্রিত মদ্যপান করাইয়া হত্যা করাইবার চেষ্টার অভিযোগে মল্‌হর রাও গায়কোয়াড়ের রাজ্যচ্যুতি ও নির্ব্বাসন সে সময়ে দেশে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহাই অমৃতলালের নাটকের বিষয়। অমৃতলালের অপর নাটক হইতেছে 'তরুবালা' (১২৯৭), 'বিমাতা বা বিজয়বসন্ত' (১৩০০), 'হরিশ্চন্দ্র' (১৩০৬), 'আদর্শবন্ধু' (১৩০৭), 'খাসদখল' (১৩১৮), 'নবযৌবন'

[১] ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সহযোগিতায় অমৃতলাল 'কামাকানন' রচনা করিয়াছিলেন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য। পুরাতন-প্রসঙ্গ (দ্বিতীয় পর্য্যায়) পৃ ১৩৪ দ্রষ্টব্য।

[২] প্রথম সংস্করণে কেবল নামপত্রে 'হীরকচূর্ণ নাটক' নাম আছে, অন্যত্র সর্ব্বত্র 'গাইকোয়াড় নাটক'। অমৃতলালের বই বাহির হইবার পূর্ব্বেই একটি 'গুইকোয়ার নাটক' প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া এই নামপরিবর্ত্তন। প্রথম সংস্করণে লেখকের নাম ছিল প্রকাশকরূপে। প্রথম অভিনয় গ্রেট ন্যাশনালে ২৫ ডিসেম্বর ১৮৭৫। নাটকটির রচনা-প্রসঙ্গে অমৃতলাল পরে লিখিয়াছিলেন,

> লিখেছি "হীরকচূর্ণ" পূর্ণপাত্র করে
> বয়স বাইশ যবে বসি 'কর'-ঘরে।
> প্রথম নাটক তাতে লেখার আদর
> বারুণীপূজার সাথে বীণাপাণি কর।
> সাধু লেখে যোগী লেখে মুখে বলে কবি
> লেখনী না চলে যদি সুধা ঢালে গবি।

(১৩২০) এবং ‘যাজ্ঞসেনী’ (১৩৩৫)। তরুবালায় প্রহসনের উপাদান বেশ আছে। বিমাতা রূপকথা অবলম্বনে রচিত। দুর্জ্জয়ময়ীর ভূমিকা সুচিত্রিত। হরিশ্চন্দ্রের মূল সংস্কৃত নাটক চণ্ডকৌশিক।[১] গ্রীক সাহিত্যে যে দুই মিত্র ড্যামন ও পাইথিয়াস-এর কাহিনী আছে তাহা অবলম্বন করিয়া প্রধানত ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষরে রোমান্টিক নাটক আদর্শবন্ধু লেখা। ইহাতে গিরিশচন্দ্রের প্রভাব কিছু দেখা যায়। চটগাঁই-ভূমিকা গিরিশচন্দ্রের মধ্যস্থ মহাপুরুষের অনুরূপ। খাসদখলে বিধবাবিবাহের পক্ষপাতীদের প্রতি কটাক্ষ আছে। ডাক্তারদের উপরেও আছে। নিতাই-ভূমিকা উপভোগ্য, তবে একটু সংযত হইলে ভালো হইত। ঠাকুরদা-ভূমিকায় লেখকের নিজের ছায়া পড়িয়াছে। গিরিবালা-ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবির কমলার আভাস অনুমান হয়। রোমান্টিক নাটিকা নবযৌবনে বিলাতি ছাঁচ লক্ষিত হয়। অমৃতলালের শেষ নাট্যরচনা যাজ্ঞসেনীতে দ্রৌপদীর বিবাহের পূর্ব্ব হইতে কুরু-সভায় অপমান পর্য্যন্ত কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। নাটকটি আগাগোড়া ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষরে রচিত, মধ্যে মধ্যে পংক্তির দৈর্ঘ্য আটাশ অক্ষরও ছাড়াইয়া গিয়াছে। রচনায় ছড়ার ভঙ্গি ও ভাষা অসঙ্গত হইয়াছে। অধিকাংশ ভূমিকায় অপেক্ষিত পৌরাণিক গাম্ভীর্য্যের ও মহিমার অভাব আছে।

অমৃতলালের অন্য নাট্যরচনাকে পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—বিশুদ্ধ প্রহসন, শিক্ষাত্মক প্রহসন-নক্শা, বিদ্রূপাত্মক প্রহসন-নক্শা, চিত্রনাট্য, এবং গীতিনাট্য।

বিশুদ্ধ প্রহসন হইতেছে—‘চোরের উপর বাটপাড়ি’ (১২৮৩), ‘ডিস্‌মিস্‌’ (১২৮৯), ‘চাটুয্যে ও বাঁড়ুয্যে’ (১৮৮৬), ‘তাজ্জব ব্যাপার !’ (১২৯৭) এবং ‘কৃপণের ধন’ (১৩০৭)। চোরের-উপর-বাটপাড়ির আখ্যানবস্তু সুরুচিসঙ্গত নয়। এক দুশ্চরিত্র বিষয়ী ভদ্রলোক একটি যুবকের সাহায্যে পাড়ার এক ভদ্র স্ত্রীলোককে ফুসলাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহার নিজের স্ত্রীর সঙ্গেই যুবকটির যোগাযোগ হইয়া যায়। ইহাই কাহিনী। ইহার মূল মিলে বোকাৎ-সিয়োর গল্পে। ডিস্‌মিসের কাহিনীর মূলও বিদেশি। তবে ইহাতে রুচি-হীনতার পরিচয় নাই। দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অমূলক সন্দেহ হইতেছে ডিস্‌মিসের আখ্যানবস্তু। কৃপণের-ধন দীর্ঘতর রচনা। কৌতুকরসে

[১] হরিশ্চন্দ্রের আখ্যাপত্রে অমৃতলালের নাম আছে প্রকাশকরূপে। বইটি ইহার রচনা না হইতে পারে।

আবিলতা নাই। মলিয়েরের 'ল্' আভার্'এর প্রভাব আছে। স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রীস্বাধীনতা চরমে উঠিলে নারীপুরুষের কার্য্যক্ষেত্র বদলাইয়া যাইবে, নারী ঘুরিবে বাহিরে পুরুষ থাকিবে অন্তঃপুরে—এই উদ্ভট কল্পনা তাজ্জব-ব্যাপার "গীতিরঙ্গ"টিতে কৌতুকরস যোগাইয়াছে।

শিক্ষাত্মক প্রহসন হইতেছে—'বিবাহবিভ্রাট' (১২৯১), 'একাকার' (১৩০১) এবং 'গ্রাম্যবিভ্রাট' (১৩০৪)। বিবাহ-বিভ্রাট অমৃতলালের শ্রেষ্ঠ রচনার অন্যতম। ইহার অভিনয়ের পর হইতে কৌতুকনাট্যকাররূপে অমৃতলালের খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়। অল্পশিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকের বিলাতে গিয়া সাহেব হইবার নেশা, বাঙ্গালী মেয়ের ইংরেজি শিক্ষা পাইয়া ফিরিঙ্গি মেম সাজা, বিলাতফেরত অকালকুষ্মাণ্ডের আত্মগরিমা, এবং সর্ব্বোপরি পুত্রের বিবাহে অর্থ-আদায়ের পৈশাচিক জুলুম, এই প্রহসনখানির অনেকটা জমাট এবং কতকটা সস্তা কৌতুকরসের মধ্যে প্রতিফলিত। সে-সময়ের প্রহসনে ব্রাহ্মমতাবলম্বী ও ব্রাহ্মভাবাপন্ন যুবকদের প্রতি কটাক্ষ প্রায়ই থাকিত। বিবাহ-বিভ্রাটেও তাহার কশুর নাই। কলেজি বিদ্যার নূতন নেশায় ভরপুর নন্দর ভূমিকা চমৎকার ফুটিয়াছে। মিষ্টার সিং-এর ভূমিকা উপভোগ্য। বিলাত হইতে আসিয়া মিষ্টার সিং পাকা সাহেব বনিয়া গিয়াছেন। নন্দ বলিল, "আপনার সুটটা ঠিক আমার গায়ে ফিট হয়ে গেছে", মিষ্টার সিং উত্তর করিলেন, "ইংরেজের চখে ধরা পড়বে, নেটিভের বাবারও সাধ্যি নাই যে ধত্তে পারে, ড্রেসের কি জানে ওরা!" কিন্তু উপসংহারে ঝিয়ের মুখে যখন তাঁহার বাল্যলীলা শুনি তখন অজ্ঞাতসারে আমাদের সমবেদনা প্রবাহিত হইয়া সিং-এর সঙ্-মূর্ত্তির তলায় যে মানুষটি চাপা পড়িয়া গিয়াছে তাহাকে মুহূর্ত্তের জন্য দীপ্যমান করিয়া দেয়।—"ও সাহেব কোথা! বুঝেছ গা মেয়ের বাপ, ও কলুটোলার তিতু সিঙ্গির ছেলে, ওদের বাড়ী আমি অনেককাল ছিলুম। ঐ ছোঁড়াকে বল্‌তে গেলে হাতে ক'রে মানুষ করেছি; 'ঝীমা লুকিয়ে একটা নালকোলনাউ দেনা' সে সব এখন ভুলে গ্যাছে, এখন আমাকে কোন্ ছ্যায়।"

আধুনিক বাঙ্গালীর অনেক দুর্ব্বলতার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে একাকারে। জাতি-ব্যবসায়, কৃষি, বাণিজ্য ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া চাকুরির জন্য লালসা এবং আত্মসম্মানবিসর্জ্জন, মিউনিসিপ্যাল শাসনের ব্যর্থতা, আর স্বদেশ-হিতৈষিতার নামে আত্মম্ভরিতা ইহার প্রতিপাদ্য। প্রথম অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কে

কলিকাতার বিলাতি সদাগর আপিসের বড়বাবুর ছবিখানি পরিপূর্ণরূপে বাস্তব। গ্রাম্যবিভ্রাটে পল্লীগ্রাম অঞ্চলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রবর্ত্তনে ভোটাভুটির ফলে যে বিচ্ছেদ এবং বৈর দেখা দেয় তাহার কৌতুকচিত্র উপভোগ্য। এই প্রহসনের একস্থানে অমৃতলাল বাঙ্গালী ভদ্রলোকের ব্যবহারে যে নাক-সিঁটকানো স্থায়ী অসন্তোষ ও নিরানন্দের ভাব দেখা যায় তাহা স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "আমাদের ভিতর কি যে একটা অসন্তোষের হাওয়া এসেছে, বাড়ীতে দুর্গোৎসব হচ্ছে—তাও মুখ বেজার! ছেলের বে দিচ্ছি, তাতেও বল্‌ছি—এই লোক-গুলো ভাই খাইয়ে দিলেই বাঁচি! যাত্রা শুনতে বসেছি, তাতেও হয়—সেকালের মতন একালের গাওনা হয় না ব'লে নাক সিটকাচ্ছি, আর নয় বল্‌ছি, আমার আর এসব ভাল লাগে না, খালি পাঁচজনের উপরোধে বসা। প্রাণ খুলে হাসিটা আমোদ করাটা যেন মহাপাতকের কাজ হয়েছে!"

অমৃতলালের বিদ্রূপাত্মক প্রহসন-নকশা সংখ্যায় কম নয়—'তিলতর্পণ' (১৮৮১), 'সম্মতিসঙ্কট' (১৮৯১), 'রাজা বাহাদুর' (১২৯৮), 'কালাপানি' (১২৯৯), বাবু' (১৩০০), 'বৌমা' (১৩০৩), 'অবতার' (১৩০৮), 'ব্যাপিকা বিদায়' (১৩৩৩), 'দ্বন্দ্বে মাতনম্' (১৩৩৩) ইত্যাদি।

তিলতর্পণে সমসাময়িক রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয়-পদ্ধতির এবং ঐতিহাসিক-রোমান্টিক নাটকের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ আছে। গিরিশচন্দ্রের উপরে কটাক্ষ,

> ঐ যে শৈলেশ্বর ঘোষ ভারি বই লেখেন, কে দুর্গেশনন্দিনীতে কি কল্লেন? যে ভুল সে ভুল। ওরা বঙ্কিমবাবুব ভুল কেটে, আয়েষাকে মেরে ফেলে দিলেন, বঙ্কিমবাবুও মলেন।

সমসাময়িক বাঙ্গালা নাটক সম্বন্ধে,

> নাটকের অর্থ হচ্চে দৃশ্যকাব্য অর্থাৎ যে কাব্য দেখা যায়। বিভ্রম উৎপাদন হচ্চে এর জীবন, অঘটন ঘটান, অসম্ভবকে সম্ভব করা অর্থাৎ এক কথায় যা নয় তাই করান, এই হচ্চে নাটক। আর ব্যাকরণেই এর বিশেষ প্রমাণ রয়েছে, তা ত আর আপনার অবিদিত নাই। নাটকের ব্যুৎপত্তি হচ্চে যেমন—ন আটক নাটক, যাতে কিছু আটক নাই।

'কালাপানি বা হিন্দুমতে সমুদ্রযাত্রা'য় নকশায় হিন্দুত্বের ঠাট বজায় রাখিয়া অহিন্দু আচরণ করিবার ভণ্ডামির উপর বিদ্রূপ-বর্ষণ আছে। অশিক্ষিত সঙ্কীর্ণহৃদয় স্তাবকতাপ্রিয় ধনিসন্তানের আদর্শ দুলালচাঁদ। তিনকড়ি-ভূমিকা হইতেছে নাট্যকারের প্রতিনিধিস্থানীয় স্পষ্টবক্তা। আমাদের দেশের অধিকাংশ আন্দোলন যে হুজুগ বলিয়াই নেতৃগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া থাকে তাহাই

কালাপানির বক্তব্য—"হুজুগ জমে গেছে নাম বেজে গেছে, এখন গেলেও চলে না গেলেও চলে"। ইংরেজিওয়ালা সংস্কৃতনবীশের প্রতি কটাক্ষ উপভোগ্য,

> গাঁজা খেয়ে তিনুমামা সব ভুলে টুলে গেছে, ও শাস্ত্র-টাস্ত্র এখন বুঝবে না, বিশেষতঃ ইংরাজী বেদ টেদের যে সব ট্রান্স্লেশন হয়েছে, সে সব ওঁর তত দেখা শুনা নাই।

পোলিটিকাল ও ধর্ম্মঘটিত আন্দোলনের পিছনে যে সাধারণত ভণ্ডামি স্বার্থপরতা ও ভীরুতা লুক্কায়িত থাকে তাহা উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে 'বাবু'তে। প্লটের শেষাংশে যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর একটি ব্যঙ্গ উপন্যাসের প্রভাব আছে। বাবুর কটাক্ষের বিশেষ লক্ষ্য হইতেছে নববিধান ব্রাহ্মসমাজ। দুর্গতদের সাহায্যের নামে চাঁদা উঠিলে তাহা প্রায়ই উদ্যোক্তাদের ভাণ্ডারজাত হয়, সেকথা নাট্যকার বাঞ্ছারামকে দিয়া বলাইয়াছেন,

> প্রেমের কি অপার মহিমা, কিছুই বুঝা যায় না, অথচ দুর্ভিক্ষ বন্যা প্রভৃতি দেশের কোন অমঙ্গল হ'লেই আমার অন্নকষ্ট থাকে না, বরং কিছু সঞ্চয় হয়, দুর্ভিক্ষের জন্য প্রার্থনা কর, সকল বাসনা পূর্ণ হবে।

"দেশহিতৈষী বাবু" ষষ্ঠীকৃষ্ণ বটব্যালের ভূমিকা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করিয়া পরিকল্পিত। শিশু-বিদ্যালয়ের ছাত্র ঘনশ্যাম পথে পিতৃবন্ধু গোবিন্দবাবুকে উপহাস করিয়া বলিয়াছিল,

> আপিস যাচ্চ যাও না, মিছে ফ্যাচাং কর কেন? তোমরা যেমন গোলামী কর, আপিসের সাহেবের বকুনির ধার ধার, আমরা অমন মাষ্টারের বকুনির তোয়াক্কা রাখিনে, এক কথা ব'ল্লে অমনি ঝাঁ ক'রে নাম কাটিয়ে যাব, আমাদের ক্লাশে ইউনিটি আছে, সকলে এককাট্টা হ'য়ে মাষ্টারকে একদিন ছুটীর পর রাস্তায় খুব ঠ্যাঙ্গানি দেব, তারপর গিয়ে ঝাঁ ক'রে ষষ্ঠীবাবুর স্কুলে ভর্ত্তি হব, তিনি ব'লেছেন আমাদের মত মর‍্যালকরেজওয়ালা ছেলে পেলে এক ক্লাশ উপরে ভর্ত্তি ক'রবেন, আর আমি যদি দশটা ছেলে নিয়ে যেতে পারি, আমাকে ফ্রি ক'রে নেবেন, বাবার কাছে মাসে মাসে ঠিক মাইনে আদায় ক'রব, তাতে খুশ মজা ওড়ান যাবে।

নাট্যকার এখানে ভবিষ্যদ্‌বক্তা।

নভেল পড়িয়া নিজেকে রোমান্‌সের নায়িকা কল্পনা করিলে বাঙ্গালী ঘরের বৌয়ের যে অবস্থা হইতে পারে তাহার কৌতুকচিত্র আঁকা হইয়াছে 'বৌমা'য়। বলা বাহুল্য ব্রাহ্মভাবাপন্ন সমাজের পতি কটাক্ষ আছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'এমন-কর্ম্ম-আর-করব-না'র অনুসরণ ও বঙ্কিমের লেখার প্যারডি আছে, রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রতি কটাক্ষ আছে। যেমন,

> সুরুচিসম্পন্ন কোন কবির কথায়,
> করে ধরে প্রাণনাথ বলে গো আমায়,

দাঁড়াতে বিশ্বের মাঝে ফেলিয়া বসন,—
(ছাদেতে নিরালা নয় বুঝ বিচক্ষণ)
জোছনা ঢালিবে অঙ্গে চাঁদ সারারাত,
"লাজহীন পবিত্রতা" দেখিবেন নাথ !

ভানুসিংহ-ঠাকুরের-পদাবলীর "গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝে" গানের প্যারডি,

তপত কচুরী গিয়েতে ভাজে,
পুরত সিঙাড়া আলুয়া সাজে,
করব গরাস তেয়াগি লাজে,
শাশুড়ী লেয়াও লেয়াও লো !...

'রাজা বাহাদুর'এ মূর্খ উপাধিলোলুপ ক্ষুদ্র জমিদারের ব্যঙ্গচিত্র স্থান পাইয়াছে। ব্লকম্যান ফিশ্ ভূমিকায় শেক্স্পিয়রের 'টেমিং অব্ দি শ্রু' নাটকের শ্লাই-ভূমিকার অনুকরণ আছে।

'অবতার'এ এক বিখ্যাত ভক্ত বৈষ্ণব সাংবাদিক-নেতাকে উপহাস করা হইয়াছে। আরো কয়েকটি ভূমিকায় সমসাময়িক ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত আছে।

দরখাস্তের জোরে রাজনৈতিক কিস্তিমাতের প্রচেষ্টাকে ধিক্কার দেওয়া হইয়াছে 'বাহবা বাতিক'এ।[১] কৌতুকরসের অবতারণায় রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ আছে।[২] যেমন,

> যে রঘুপালের কেল্লার এখন চিহ্নমাত্র নাই, যাঁর রাজপ্রাসাদ কোথায় ছিল, এখন কেউ বলতে পারে না, যে রঘুপাল নিজ ভুজবলে কোন্ রাজ্য জয় করিয়াছিলেন তার সাক্ষ্য ইতিহাসে পর্যান্ত নাই, যিনি পরম হিন্দু ছিলেন ব'লে কোন নির্দ্দিষ্ট খৃষ্টাব্দে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসনে উপবেশন করেন নাই, যে রঘুপালের রাজপতাকায় দাম্পত্যপ্রেমের পবিত্র চিহ্ন ঘুঘুপক্ষী অঙ্কিত থাকিত, আমি সেই জগদ্বিখ্যাত রঘুপালের অকিঞ্চিৎকর বংশধর।

অমৃতলালের চিত্রনাট্যগুলি নিতান্ত ক্ষুদ্র রচনা এবং বৈশিষ্ট্যবর্জ্জিত। 'বিলাপ' (১২৯৮) বিদ্যাসাগরের স্বর্গগমন এবং 'বৈজয়ন্ত-বাস' (১৩০৭) রানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু উপলক্ষ্যে রচিত। মিউনিসিপাল আইনের সংশোধন-বিলের প্রতিবাদে নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব প্রমুখ আটাশ জন কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনর পদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই উপলক্ষ্যে 'সাবাস আটাশ' (১৩০৬) লেখা। মিউনিসিপাল শাসনের কুৎসিত দিক্ এই নক্শাটিতে ভালো করিয়া দেখানো হইয়াছে। 'সাবাস বাঙ্গালী' (১৩১২) দীর্ঘতর রচনা। ইহাতে স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থন আছে। 'নবজীবন'এ (১৩০৮)

[১] গ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত (১৯০৪)। [২] 'ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী' (নবজীবন ১২৯১) দ্রষ্টব্য।

দেশপ্রেমের উত্তেজনা আছে। তবে কোন ধারাবাহিক কাহিনী নাই। ইহাতে সত্যেন্দ্রনাথের "মিলে সবে ভারত সন্তান", দ্বিজেন্দ্রনাথের "মলিন মুখচন্দ্রমা" এবং রবীন্দ্রনাথের "অয়ি ভুবন-মনোমোহিনী" গান তিনখানি আছে। 'নিমাইচাঁদ' বাঙ্গালায় "ভাণ" নাট্যের একটি ভালো নিদর্শন।

অমৃতলালের নাটক গীতিবহুল নয়, কিন্তু তাঁহার প্রহসনে ও নকশায় প্রায়ই গানের প্রাচুর্য্য আছে এবং এই সব রচনার প্রস্তাবনা গানে। গীতিনাট্য অমৃতলাল বেশি লিখেন নাই। তাঁহার প্রথম গীতিনাট্য 'ব্রজলীলা' (১২৮৯)। দীর্ঘতর রচনা 'যাদুকরী' (১৩০৭) আরব্য-উপন্যাসের একটি কাহিনী লইয়া লেখা।

গিরিশচন্দ্রের নাটকে জীবনের গভীরতর আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিবার চেষ্টা আছে। অমৃতলালের নাটক-প্রহসনে তাহা নাই। থাকিবার কথাও নয়, কেননা অমৃতলালের উদ্দেশ্য কৌতুকরসের সৃষ্টি এবং হাসির ছলে জাতীয় ও সামাজিক অসঙ্গতির দিকে শিক্ষিত সাধারণের চোখ ফেরানো। অমৃতলালের কৌতুকনাট্যে কখনো কখনো ব্যক্তিবিশেষ উদ্দিষ্ট হইলেও বিদ্বেষবিষজ্বালা নাই। নাট্যকারের সহানুভূতি তাঁহার কৌতুকপাত্রকে অনেক সময়েই মানুষের মর্য্যাদা দিয়া উপহাসের তুচ্ছতার উর্দ্ধে স্থাপন করিয়াছে। বিবাহবিভ্রাটের মিষ্টার সিং-এর কথা বলিয়াছি। কৃপণের-ধনের পুরোহিত লোভী মূর্খ হইলেও মানুষ নিশ্চয়ই। কৃপণ স্বামীর হাতে পুরোহিতের লাঞ্ছনা দেখিয়া দয়াময়ী বলিয়াছিল, "আমি বৈশাখী সংক্রান্তিতে তোমায় লুকিয়ে যত পারি চাল ডাল দেব", পুরোহিত উত্তর দিয়াছিল, "এই চাল ডাল তুমি যত পার অপহরণ করো, তবে চুরিটুরি করো না। আমার পিতাপিতামহ তোমাদের বংশ থেকে অনেক পেয়েছেন; তোমার স্বামী একটু কার্পণ্য করেন বলে কি আমি বংশ-পরম্পরাগত উপকার ভুলে যাব।" এখানে সরসতা বাগ্‌বৈদগ্ধ্যকে ছাড়াইয়া হিউমারে উন্নীত॥

১৯

গিরিশচন্দ্রের নট-নাট্যকার জীবনের প্রথম দিকে তাঁহার একজন বড় সহযোগী ছিলেন কেদারনাথ চৌধুরী। গিরিশচন্দ্রের গীতিনাট্য 'মোহিনী-প্রতিমা' প্রথম সংস্করণের (১৮৮১) প্রস্তাবনারূপে কেদারনাথ চৌধুরীর স্বাক্ষরে "পাঠক ধীমান্"-কে সম্বোধন করিয়া এই কবিতাটি আছে,

পাষাণে প্রেমের স্থান, পাষাণের(ও) গলে প্রাণ,
পাষাণে প্রেমের খেলা কোথা তার সীমা ?
প্রতিদিন আসে যায়, পাষাণ ফিরিয়া চায়,
পাষাণে অঙ্কিত দেখে মোহিনী প্রতিমা।

কেদারনাথ দুইখানি পৌরাণিক নাটক লিখিয়াছিলেন, 'পাণ্ডব-নির্ব্বাসন' ও 'ছত্রভঙ্গ'। বই দুইটি এমারেল্ড্ থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল এবং পরে যতীন্দ্রমোহন দত্ত সম্পাদিত জন্মভূমি পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল।[১]

ইহার পূর্ব্বে কেদারনাথ রবীন্দ্রনাথের 'বৌঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসখানিকে নাট্যরূপ দিয়াছিলেন 'রাজা বসন্তরায়' নামে। ইহাতে গানগুলি সব রবীন্দ্রনাথের। অভিনয়ে রাজা-বসন্তরায় বেশ জমিয়াছিল, এবং এই অভিনয়ের জন্যই রবীন্দ্রনাথের গান সাধারণের মধ্যে প্রথম ছড়াইয়া পড়ে। সেকালের বটতলা-প্রকাশিত গানের বইগুলিতে ইহার প্রচুর সাক্ষ্য মিলিবে॥

২০

পেশাদার রঙ্গমঞ্চ স্থাপয়িতাদের অন্যতম ছিলেন বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (১৮৪০-১৯০১)। তাহার আগেই ইনি অভিনেতারূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া বিহারীলাল বেঙ্গল (পরে রয়াল বেঙ্গল) থিয়েটারের অধ্যক্ষ ছিলেন। বিহারীলালের প্রথম দুইটি রচনা 'মেঘনাদবধ ব্যঙ্গকাব্য' (১৮৭৮) এবং 'আচাভূয়ার বোম্বাচাক' (১৮৮০) "নাদাপেটা হাঁদারাম" এই ছদ্মনামে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর 'অহল্যাহরণ' গীতিনাট্য (১৮৮১) এবং 'রাবণবধ' নাটক (১৮৮২) বাহির হয়। ইঁহার অন্যান্য পৌরাণিত নাট্যরচনা হইতেছে, 'দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর' (১২৯১), 'রাজসূয় যজ্ঞ', 'সীতা স্বয়ম্বর', 'নন্দবিদায়', 'প্রভাসমিলন' (১২৯৪), 'পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ' (১২৯৫), 'জন্মাষ্টমী' (১২৯৬, দ্বি-স ১৩০১), 'হরি-অন্বেষণ' (১৩০১), 'নরোত্তম ঠাকুর' (১৩০৩), 'ধ্রুব' (১৩০৩), 'পাণ্ডব নির্ব্বাসন', 'দুর্য্যোধনবধ', 'ভীষ্মমহিমা', 'ব্যাসকাশী', 'গোলোকবিহার', 'সুভদ্রাহরণ', 'বাণযুদ্ধ' ইত্যাদি। বিহারীলালের পৌরাণিক নাট্যরচনার একটি প্রধান বিশেষত্ব হইতেছে যাত্রার ধরণে দীর্ঘ বক্তৃতা ও স্বগত-উক্তি। 'মিলন' (১৩০০) গার্হস্থ্য রোমান্টিক নাটক। 'মুই হ্যাঁদু' (১৮৯৪), 'খণ্ড প্রলয়' (১৩০০), 'যমের ভুল' (১৩০১), 'রক্ত গঙ্গা' (১৩০২),

[১] শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসুর কাছে এই তথ্য পাইয়াছি।

'নবরাহা' (১৮৯৭) ইত্যাদি "পঞ্চরং" বা নকশা। এগুলির রচনায় কোন বৈশিষ্ট্য নাই। পৌরাণিক ভক্তিরসময় নাটকে গিরিশচন্দ্রের অনুসরণ সুস্পষ্ট ॥

২১

রঙ্গমঞ্চের দুর্নিবার আকর্ষণে অল্পবয়সেই অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৭৬-১৯১৬) নট ও নাট্যাধ্যক্ষ রূপে দেখা দিয়াছিলেন। পরে নাট্যরচনাতেও হাত দিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশে প্রথম রঙ্গমঞ্চ-সম্পর্কিত পত্রিকা বাহির করার কৃতিত্বও ইহারই।[১] নিজের থিয়েটারে (মিনার্ভা ১৯০০) দর্শক বাড়াইবার জন্য ইনি মাইকেল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লেখকদের গ্রন্থাবলী উপহার দিতে শুরু করিয়াছিলেন।[২] অমরেন্দ্রনাথের বড় কাজ হইতেছে সুদৃশ্য হ্যাণ্ডবিলের ব্যবস্থা এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বেতন বৃদ্ধি। নট হিসাবে তাঁহার উল্লেখযোগ্য কাজ রঙ্গমঞ্চে কোন কোন নায়ক-ভূমিকায় সমুজ্জ্বল অভিনয়।

অমরেন্দ্রনাথ প্রথমে ইণ্ডিয়ান থিয়েটার নামে সখের দল গঠন করেন এব করিন্থিয়ান রঙ্গমঞ্চ ভাড়া করিয়া একরাত্রি 'পলাশীর যুদ্ধ' মঞ্চস্থ করেন। নিজে সিরাজের ভূমিকায় নামিয়াছিলেন। এইভাবে এখানে-ওখানে দুইচারিবার অভিনয় করিয়া ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে অমরেন্দ্রনাথ এমারেল্ড্ রঙ্গমঞ্চ ইজারা লইয়া ক্লাসিক থিয়েটার নাম দিয়া গিরিশচন্দ্রের 'হারানিধি' লইয়া রীতিমত অভিনয় শুরু করিলেন এবং নগেন্দ্রনাথ চৌধুরীর 'হরিরাজ' (শেক্স্পিয়রের হ্যামলেট অবলম্বনে লেখা)[৩] লইয়া ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চ জমাইয়া তুলিলেন। তাহার পর ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'আলিবাবা' একেবারে মাত করিয়া দিল। হোসেনের ভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথ, মর্জিনার ভূমিকায় কুসুমকুমারী আর আলিবাবার ভূমিকায় পূর্ণচন্দ্র ঘোষ দর্শকদের মনপ্রাণ হরণ করিয়াছিল। অমরেন্দ্রনাথের নটজীবনের ইহাই মধ্যদিন।

[১] ১৩০৮ সালে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় অমরেন্দ্রনাথ সাপ্তাহিক পত্রিকা 'রঙ্গালয়' বাহির করিয়াছিলেন। ইহা বছর ছয়েক চলিয়াছিল। গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলালের সহযোগিতায় ইনি ১৩১৬ সালে 'নাট্যমন্দির' মাসিক পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন।

[২] উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই রঙ্গালয়ের উপহার গ্রন্থাবলীর প্রকাশক ছিলেন। বসুমতী গ্রন্থাবলীর এইখানেই সূত্রপাত।

[৩] কাহিনী সম্ভবত নগেন্দ্রনাথ বসুর পরিকল্পনা। নগেন্দ্রনাথ বসু ম্যাকবেথ অবলম্বনে 'কর্ণবীর' (১৮৮৫) লিখিয়াছিলেন। অপর নাটক 'ধর্ম্মবিজয় বা শঙ্করাচার্য্য' (১২৯৫)।

অমরেন্দ্রনাথের নামে অনেকগুলি নাট্যরচনা আছে, তাহার সব কয়টিই ইঁহার লেখনীনিঃসৃত না হওয়া সম্ভব। প্রথম রচনা দুইটি হইতেছে গীতিনাট্য 'ঊষা' (১৮৯৩) ও 'শ্রীরাধা বা মানকুঞ্জ' (১৮৯৪)। একটি প্রচলিত গল্পকে অবলম্বন করিয়া বিল্বমঙ্গলের আদর্শে লিখিয়াছিলেন 'নির্ম্মলা' (১৩০৫) নাটিকা। 'প্রণয় না বিষ?' (১৯০৬?) যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রণয়-পরিণাম' উপন্যাসের নাট্যরূপ। 'দলিতা ফণিনী'ও (১৩১৫) যোগেন্দ্রনাথের উপন্যাস অবলম্বনে লেখা। 'জীবনে মরণে' (১৩১৮) রবীন্দ্রনাথের 'দালিয়া' গল্প লইয়া রচিত। 'আশা কুহকিনী' (১৩১৯) বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী। অপর নাটিকা 'ফটিক জল', 'রঙ্গালয়ের উপহার'এ সঙ্কলিত।

অমরেন্দ্রনাথ কয়েকখানি গীতিনাট্য ও রঙ্গনাট্য লিখিয়াছিলেন,—'শিবরাত্রি' (১৮৯৬), 'দুটী প্রাণ', 'শ্রীকৃষ্ণ' (১৮৯৯), 'দোললীলা' (১৩০৪), 'কেয়া মজাদার' (১৩১৫), 'কিস্‌মিস্‌', 'রোকশোধ', 'বড় ভালবাসি' এবং 'প্রেমের জেপলিন' (১৯১৫)। দুইখানি রূপক নাট্য,—'এস যুবরাজ' (১৯০৫), ও 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ' (১৯০৫)। বাকিগুলি নক্‌শা-পঞ্চরং (extravaganza) ধরণের,—'কাজের খতম' (১৮৯৮), 'মজা' (১৯০০), 'থিয়েটার', 'ভক্তবিটেল', 'চাবুক', 'ঘুঘু', 'আহামরি' ইত্যাদি। এ সবই বৈশিষ্ট্যবর্জ্জিত রচনা।

অনেকগুলি প্রসিদ্ধ উপন্যাসকে নাট্যরূপ দিয়া মঞ্চস্থ করিয়াছিলেন অমরেন্দ্রনাথ। যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস দুইটি ছাড়া,—বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ('ভ্রমর' নামে), 'দেবী-চৌধুরাণী', 'সীতারাম', 'ইন্দিরা' ও 'যুগলাঙ্গুরীয়'; রমেশচন্দ্র দত্তের 'জীবনসন্ধ্যা'; হারাণচন্দ্র রক্ষিতের 'বঙ্গের শেষবীর', 'কামিনী ও কাঞ্চন' এবং 'রানী ভবানী'॥

২২

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) প্রথমে "বার্লেস্ক" ধরণের প্রহসন লইয়া নাট্যরচনায় প্রবৃত্ত হন। প্রথম প্রহসন 'সমাজবিভ্রাট ও কল্কি অবতার'এ (১৩০২) ইঁহার প্রথম গদ্য রচনা (নক্‌শা) 'একঘরে'র (১২৯৪) মত প্রাচীনপন্থী এবং নব্যপন্থী হিন্দুসমাজের উপর ব্যঙ্গবাণ বর্ষিত হইয়াছে। ব্রাহ্ম ও বিলাতফেরত সমাজও বাদ যায় নাই।[১] কল্কি-অবতার আদ্যন্ত ছড়ার মত

[১] "বর্ত্তমান সমাজের চিত্র সম্পূর্ণ করিবার জন্য সমাজের সর্ব্বশ্রেণীর অর্থাৎ পণ্ডিত, গোঁড়া, নবহিন্দু, ব্রাহ্ম, বিলেত-ফেরত এই পঞ্চ সম্প্রদায়ের চিত্র অপক্ষপাতিতার সহিত এই প্রহসনের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।"

মুক্ত ছন্দে রচিত।[১] কয়েকটি হাসির গান আছে। সরসতা লঘু এবং কতকটা খেলো হইলেও সংযত ও উপভোগ্য।

প্রস্তাবনা একটি কবিতা, নাট্যরচনাটির বিশেষত্বের নির্দ্দেশক। যেমন,

তৃতীয়তঃ, মানি এ নাটকখানি
সনাতন প্রথাত্যাগী—প্রায় পদ্যের মতন,
বিশেষ মিত্রাক্ষরে—বটে, এটা খুব 'নতুন'।
আবার মিত্রাক্ষরও কিছু নূতনতরো,—
অক্ষরের বিপর্য্যয় গরমিল হোল এ—
এছত্রটা তেরোয়, ওটা বিশে, সেটা ষোলয়,
পূর্ব্বতন প্রথা হয়েছে অন্যথা
এরূপে,—হাঁ অস্বীকার করি না এ কথা।

দ্বিতীয় প্রহসন 'বিরহ' (১৩০৪), হাসির গানগুলি বাদ দিলে বৈশিষ্ট্য-বর্জ্জিত। 'ত্র্যহস্পর্শ বা সুখী পরিবার'এ (১৩০৭) অমৃতলাল বসুর রাজা-বাহাদুরের অনুসরণ আছে। প্লট জমাট বাধে নাই। হাসির গান কয়টিই উপভোগ্য। 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৩০৮) সংশোধিত হইয়া 'বহুৎ আচ্ছা' নামে ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল। পরে এই সংশোধিত সংস্করণটিই মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে। লেখকের মতে বইটি মলিয়েরের ধরণের নাট্যরচনা, কিন্তু আসলে ইহা বার্লেস্ক ছাড়া কিছু নয়। প্রায়শ্চিত্তে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রতি কঠিন কটাক্ষ আছে। চরিত্রচিত্রণ স্বভাবসঙ্গত নয়। কৌতুক-রসতারল্য হাসির গানের প্রাচুর্য্যের দ্বারা কতকটা নিরাকৃত হইয়াছে। 'আনন্দ বিদায়' ("প্যারডি") প্রথমে (১৯০২?) সংক্ষিপ্ত রূপে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল পরে পুস্তিকা-আকারে পরিবর্দ্ধিত হয় (১৯১২)। লেখক বইটিকে প্যারডি বলিয়াছেন[২] কিন্তু আসলে ইহা তীব্র ব্যক্তিগত স্যাটায়ার। রচনাটি বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের 'নন্দবিদায়'এর ব্যঙ্গ-অনুকৃতি। প্রথমে ইহার ব্যঙ্গের উদ্দেশ্য ছিল কড়ি-ও-কোমল। পরিবর্দ্ধনের সময়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতি দ্বিজেন্দ্রলাল ঘোরতর বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিদ্বেষের একটা প্রধান সূত্র ছিল পঞ্চাশদ্‌বয়ঃপূর্ত্তি উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের অভিনন্দন-সমারোহ। পরিবর্দ্ধিত আনন্দ-বিদায়ে এই বিদ্বেষ-বিষ

[১] "পদ্যগুলি অবিকল গদ্যের মত পড়িতে হইবে।"

[২] "বাঙ্গালা ভাষায় বোধ হয় এই প্রথম 'প্যারডি' নাটিকা। ইয়ুরোপীয় অথবা সংস্কৃত সাহিত্যে প্যারডি নাটিকার অস্তিত্ব আমি অবগত নহি।"

পরামাত্রায় উদ্‌গীর্ণ হইয়াছে।[১] বইটি ষ্টার থিয়েটারে অভিনয়ের কালে শিক্ষিত দর্শক উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং অভিনয় ভাঙ্গিয়া যায়। প্লট ভালো নয়, রুচিও সর্ব্বত্র শোভন নয়। কয়েকটি সুপরিচিত হাসির গান (রবীন্দ্রনাথের গানের প্যারডি) থাকিলেও সবশুদ্ধ আনন্দ-বিদায় দ্বিজেন্দ্রলালের অত্যন্ত অক্ষম রচনা। 'পুনর্জ্জন্ম' (১৯১১) নিতান্ত লঘু রচনা, ইংরেজি হইতে নেওয়া।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনগুলিতে প্রায়ই কপটাচারের প্রতি ধিক্কার আছে। সংলাপে কৌতুকের চেষ্টা আছে কিন্তু সে চেষ্টা সর্ব্বত্র সফল নয়। তবে হাসির গানগুলি থাকায় অভিনয়ে কতকটা কৌতুকাবহ।

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার নাটকগুলিতে নাট্যরস জমাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন মানসিক দ্বন্দ্বের দ্বারা। তিনি নায়কের ভূমিকায় বীরোচিত রঙ লেপিতে প্রয়াস করিয়াছেন এবং নায়ক-প্রতিনায়ককে সাধারণত নাস্তিক অথবা অধর্ম্মাচারী করিয়াছেন। বিদূষকের ভূমিকা একেবারে বর্জ্জিত। স্বগতোক্তি সঙ্গত হয় নাই। অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহারে দক্ষতার পরিচয় নাই। সংলাপের বৈসাদৃশ্য, বিশেষত কবিত্বোচ্ছ্বাস, প্রবলতম দোষ। পৃথক্‌ভাবে কোন কোন দৃশ্য ভালো হইলেও নাটকের মধ্যে দৃশ্যগুলি অখণ্ড এবং সমবায়ী হইয়া উঠিতে পারে নাই। মোটের উপর মনে হয় নাট্যরচনা যেন কয়েকটি বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের সমষ্টি।

দ্বিজেন্দ্রলালের দুইখানি নাটক বা নাট্যকাব্য রামায়ণ-কাহিনী অবলম্বনে লেখা,—'পাষাণী' (১৩০৭) অমিত্রাক্ষরে 'সীতা'[২] মিত্রাক্ষরে। পাষাণীর ছন্দে রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থ অনুকরণ-প্রয়াস আছে। ইহাতে পৌরাণিকত্বের ছাপ একেবারেই নাই। ইন্দ্র যেন তরুণ লম্পট জমিদার এবং তাঁহার পরিকর চাটুকার মাত্র। বিশ্বামিত্রের ভূমিকা অস্বাভাবিক। তবে গৌতম-ভূমিকা সুপরিকল্পিত। অহল্যা সাধারণ অসতী নারীর মত। চিরঞ্জীবের ও মাধুরীর ভূমিকা গিরিশচন্দ্রের অনুকরণে কল্পিত। কয়েকটি গান আছে। সেগুলিও প্রায়ই রবীন্দ্রনাথের গানের অনুকৃতি। পঞ্চাঙ্ক নাট্যকাব্য সীতায় দ্বিজেন্দ্রলাল

[১] যেমন, একটা গানের অংশ,

একাধারে কবি, অধিকারী, ঋষি,—কিবা ত্যাগ কিবা দান,
"পরিষৎ" জল ছিটায়ে দিলেই (কবিবর) স্বর্গে উঠিয়া যান।

[২] প্রথম প্রকাশ 'নবপ্রভা'য় (১৩০৯)। পুস্তক-আকারে কিছু সংশোধিত।

রামায়ণ-কাহিনীকে যে-ভাবে গড়িয়া লইয়াছেন তাহাতে কৃতিত্বের পরিচয় আছে। গান না থাকায় ভালোই হইয়াছে। সীতা দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ নাট্যরচনা।

অতঃপর ইতিবৃত্ত-ইতিহাসমূলক রোমান্টিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল দুইখানি "মেলোড্রামা" গোছের নাট্যকাব্য লেখেন অংশত অমিত্রাক্ষরে,—'তারাবাই' (১৩১০) ও 'সোরাব-রুস্তম' (১৩১৫)। তারাবাইএর প্লট রাজস্থান হইতে গৃহীত। সূর্য্যমল রায়মল এবং তারা, এই তিন ভূমিকা ছাড়া চরিত্রচিত্রণে সঙ্গতির অভাব আছে। শেষের দুই ভূমিকাও সঙ্গতিবিহীন। সূর্য্যমলের পত্নী তমসা লেডি ম্যাক্‌বেথের অক্ষম অনুকরণ। শেষে তাহার একেবারে সাধু বনিয়া যাওয়ার কোন মানে নাই। পৃথ্বীরাজ এবং প্রভুরাও পরাজিত লম্পট জমিদার। সংলাপে মধ্যে মধ্যে বেশ অসঙ্গতি আছে। গানের বাহুল্যে, বিশেষ করিয়া কয়েকটি হাসির গান ও কৌতুকদৃশ্য থাকায়, নাটকের গাম্ভীর্য্য নষ্ট হইয়াছে। অমিত্রাক্ষরে রচিত অংশে পদমাধুর্য্যের ও ছন্দোলালিত্যের পরিচয় নাই। সোরাব-রুস্তমেও গানের প্রাচুর্য্য। ইহা অপেরাও নয়, নাটিকাও নয়। লেখক বলিয়াছেন "নাট্যরঙ্গ", আসলে কিন্তু রোমান্টিক মেলোড্রামা।[১] বইটি প্রধানত পদ্যে রচিত। গান আছে, কমিক গানও। ছন্দ প্রায়ই অমিত্রাক্ষর, এবং রবীন্দ্রনাথের অনুকৃতি। দুই রাজার ভূমিকা ক্যারিকেচার মাত্র। রুস্তম বিলাসী যুবা। আফ্রিদ হেঁয়ালি বিশেষ। অপর ভূমিকা প্রায়ই প্রহসনোচিত। সোরাব ভূমিকা মন্দ নয়, কিন্তু তাহাকে আঁকা হইয়াছে অভিমন্যুর আদর্শে। তাহার মাতাও সুভদ্রার মত। ইতিহাসোচিত মহিমান্বিত ভূমিকা দুইটি মাত্র, পারস্যের নারী এবং আফ্রিদ। বিদূষকের ভূমিকা আছে। তুরাণ-রাজান্তঃপুরের নারীরা, তামিশ ও তাহার সঙ্গিনীরা, গান করিতেছে "ভারতবর্ষের শ্রীকৃষ্ণের" বিষয়ে! সোরার-রুস্তম মিনার্ভায় অভিনীত হইয়াছিল।[২]

অতঃপর দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক প্রায় সবই গদ্যে,[৩] এবং শেষের একটি সম্পূর্ণ ও একটি অসম্পূর্ণ নাটক ছাড়া সবগুলিই ভারতবর্ষের ইতিহাস-কাহিনী

[১] "এক কথায়—ইহা অপেরায় আরম্ভ হইয়া ক্রমে ক্রমে নাটকে শেষ হইয়াছে।"

[২] প্রথম অভিনয় ৩ আশ্বিন ১৩১৫।

[৩] সিংহল-বিজয়ে মধ্যে মধ্যে দুই চারি ছত্র অমিত্রাক্ষর আছে।

অবলম্বনে। এই নাটকগুলি উপেন্দ্রনাথ দাসের নাটকের মত অত্যন্ত মেলো-ড্রামাটিক। এইসব নাটকে যে দেশপ্রীতিমূলক গান আছে সেগুলির বিলাতি গৎ-ভাঙ্গা অভিনব সহজ সুর এককালে সাধারণ শ্রোতাকে মাতাইয়াছিল এবং নাট্যরচনাগুলিকে জনপ্রিয় করিয়াছিল। পাঁচখানি নাটকের মূল পাই মোগল ও রাজপুত ইতিহাসে, 'প্রতাপসিংহ'[১] (১৩১২), 'দুর্গাদাস' (১৩১৩), 'নূরজাহান' (১৩১৪), 'মেবারপতন' (১৩১৫) এবং 'সাজাহান' (১৩১৭)। দুইখানি নাটকের প্লট প্রাচীন ইতিহাস অবলম্বনে পরিকল্পিত—'চন্দ্রগুপ্ত' (১৩১৮ ?) ও 'সিংহল-বিজয়' (১৩২২)। নাটকগুলিতে বাঙ্গালাদেশের সমসাময়িক দেশ-প্রেমোচ্ছ্বাসের চিহ্ন আছে। কিন্তু কোনটিতেই ঐতিহাসিক রস জমে নাই। কি ঘটনাবিন্যাসে কি নামকরণে কি সংলাপে কি চরিত্রচিত্রণে দ্বিজেন্দ্রলাল ইতিহাসের বিন্দুমাত্র মর্য্যাদা রক্ষা করেন নাই। উপরন্তু কৌতুকরসের যোগান থাকায় ইতিহাসের মর্য্যাদা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্রতাপসিংহকে নাট্যোপন্যাস বলিলেই ঠিক হয়। কাহিনী চলিয়াছে উপন্যাসের মত গদ্যে। যেমন,

> শক্ত স্তম্ভিত হইলেন, ইহার পর কি উত্তর দিবেন! ভাবিলেন, সে কি! আমি ভ্রান্ত? নহিলে এই ক্ষুদ্র বালিকার ক্ষুদ্র প্রশ্নের উত্তর দিতে পাচ্ছিনে! কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে কহিলেন—'ইরা! আমি এর কি উত্তর দেবো বুঝে উঠতে পাচ্ছিনে! ভেবে দেখবো।'

দুর্গাদাসে উচ্ছ্বসিত দেশপ্রেমের উপরে চরিত্রবলের প্রাধান্য দেখাইবার চেষ্টা আছে। নূরজাহানে কৌতুকদৃশ্য নাই বলিলেই হয়। নাম-ভূমিকায় সঙ্গতি নাই। নূরজাহান স্বামীকে ভালবাসে নাই, জাহাঙ্গীরকেও নয়, অথচ তাহার মনোভাব-পরিবর্ত্তনের কোন স্বাভাবিক হেতু দেখানো হয় নাই। নূরজাহানের কন্যার ভূমিকা যৎপরোনাস্তি অবাস্তব। রবীন্দ্রনাথের রীতি অনুকরণ করিতে গিয়া লেখক মধ্যে মধ্যে সামলাইতে পারেন নাই। যেমন জাহাঙ্গীরের উক্তি,

> সেদিন গবাক্ষপথে দেখ্‌লাম—কি সে মূর্ত্তি!—যেন তুষারের উপর উষার উদয়; যেন স্তব্ধ নিশীথে ইমনের প্রথম ঝঙ্কার, যেন মনুষ্যের প্রথম যৌবনে প্রেমের প্রভাত!

মেবারপতনের প্লটে ঐতিহাসিকত্ব যৎকিঞ্চিৎমাত্র। রাষ্ট্রীয়-শক্তি মূল ঐক্যের মধ্যে—ইহাই নাটকের প্রতিপাদ্য। সংলাপ অসঙ্গত। দ্বিজেন্দ্রলালের "ঐতিহাসিক নাটক"এর মধ্যে 'সাজাহান' শ্রেষ্ঠ। সাজাহানের ভূমিকা নিষ্ক্রিয় সাক্ষীর। ট্রাজেডির দিক দিয়াও সাজাহান নামকরণের সার্থকতা আছে বলিয়া

[১] 'রাণা প্রতাপ' নামে ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত।

বোধ হয় না। জাহানারা সর্ব্বাপেক্ষা স্ফুট ও বলিষ্ঠ ভূমিকা। তাহার নাম দিলে বোধ করি ঠিক হইত। ঔরঙ্গজীবের ভূমিকা খুব স্ফুট না হইলেও মন্দ নয়। সংলাপে বেশ অসঙ্গতি আছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের চন্দ্রগুপ্ত উমেশচন্দ্র গুপ্তের বীরবালার অনুসরণে লেখা। ইহাতে সংলাপের অসঙ্গতি চরমে উঠিয়াছে। অত্যধিক নাটকীয় ঘটনার স্রোতে পড়িয়া কোন চরিত্রই বিকশিত হইতে পারে নাই। বাচালতায় নায়ক চাণক্যের ভূমিকা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কাহিনীতে ইতিহাসের মর্য্যাদা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত। সিংহল-বিজয়ের প্লট ঐতিহাসিক নয়, পারিবারিক ষড়যন্ত্রের কাহিনী মাত্র। বৈশিষ্ট্যবর্জ্জিত রচনা।

শেষকালে দ্বিজেন্দ্রলাল সামাজিক ঘটনা লইয়া দুইখানি নাটক লিখিয়াছিলেন। 'পরপারে' (১৩১৯) কিশোরপ্রিয় উৎকট রোমান্টিক মেলোড্রামা মাত্র, সামাজিক নাটক নয়। পার্ব্বতী, ভবানী ইত্যাদি ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রভাব আছে। সংলাপ অত্যন্ত অসঙ্গত, এবং সকলেই পিস্তল ছুঁড়িতেছে, মায় বারাঙ্গনা পর্য্যন্ত। ক্বচিৎ ভাষায় ইংরেজি ঢঙ উৎকটভাবে প্রকট। যেমন,

> উন্মাদের প্রলাপ বলে' এমন একটা ভীষণ সত্য, এমন একটা নিষ্ঠুর পরিত্যাগ, এমন একটা মহাশয়তানী উড়িয়ে দিতে চাও!
>
> তুমি একটা অনিয়ম, তুমি একটা অপচার, তুমি একটা ব্যাধি, তুমি একটা আবর্জ্জনা!

'বঙ্গনারী'র (১৩২২)[১] আকার অভিনয়োপযোগী না হওয়ায় ইহারই একটি আখ্যান অবলম্বনে পরপারে লেখা হইয়াছিল। বঙ্গনারীর কাহিনীর মূল কতকটা গিরিশচন্দ্রের বলিদান। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক আরো রোমান্টিক এবং উপসংহার বিষাদান্ত নয়। কাহিনী অবাস্তব এবং স্থানে স্থানে অসঙ্গত হইলেও মোটের উপর মন্দ নয়॥

২৩

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের (১৮৬৩-১৯২৭) প্রথম নাট্যরচনা 'ফুলশয্যা' (১৮৯৪) কল্পিত ইতিহাসকাহিনী অবলম্বনে প্রধানত রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে অমিত্রাক্ষরে লেখা "বিয়োগান্ত দৃশ্যকাব্য"। দ্বিতীয় রচনা 'প্রেমাঞ্জলি' (১৮৯৬) পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে চতুরঙ্ক রঙ্গনাট্য। 'আলিবাবা' (১৩০৪)

[১] সিংহল-বিজয় ও বঙ্গনারী লেখকের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত।

ক্ষীরোদপ্রসাদের তৃতীয় এবং সার্থকতম নাট্যরচনা। এই গীতিনাট্য ক্লাসিক থিয়েটারে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক অভিনীত হইয়া ক্ষীরোদপ্রসাদের যশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।[১] পূর্ণচন্দ্র ঘোষের প্রদত্ত সুর আলিবাবার গানগুলিকে অভিনবত্ব দান করিয়াছে। বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চে আলিবাবার অভিনয়সিদ্ধি বহুকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

আরব্য-উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনে লেখা আলিবাবার অভিনয়সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া অনুরূপ কাহিনী অথবা ইরান-তুরান-তুর্কিস্থানের পটভূমিকা আশ্রয় করিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ আরো কয়েকখানি নাট্যনিবন্ধ রচনা করিয়াছেন, 'জুলিয়া' (১৩০৬), 'সপ্তম প্রতিমা' (১৩০৯), 'বেদৌরা' (১৩০৯), 'আলাদিন' (১৩১৪), 'দৌলতে দুনিয়া' (১৩১৫, সপ্তম প্রতিমার নূতন রূপ), 'পলিন' (১৩১৭), 'মিডিয়া' (১৩১৯), 'রূপের ডালি' (১৩২০) ও 'বাদসাজাদী' (১৩৯২)। বিবিধ নাট্যগীতি ও রঙ্গনাট্যের মধ্যে পড়ে 'কুমারী' (১৩০৫), 'প্রমোদরঞ্জন' (১৩০৫) 'বৃন্দাবন-বিলাস' (১৩১০), 'রক্ষঃ ও রমণী' (১৩১৩), 'বরুণা' (১৩১৫), 'ভূতের বেগার' (১৩১৫), 'বাসন্তী' (১৩১৫) ও 'কিন্নরী' (১৯১৮)। 'দাদা ও দিদি' (১৩১৪) রূপক রঙ্গনাট্য। কুমারীর উপসংহারে গিরিশচন্দ্রের প্রভাব আছে। ভূতের-বেগারে বাঙ্গালীর চাকুরি-পরায়ণতার উপর কটাক্ষ আছে। রঙ্গমঞ্চে কিন্নরীর সাফল্য আলিবাবার পরেই। এই কাহিনী লইয়া পূর্ব্বে কয়েকখানি নাট্যনিবন্ধ রচিত হইয়াছিল। যেমন, হরচন্দ্র ঘোষের রজতগিরি-নন্দিনী ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের রজতগিরি।

ক্ষীরোদপ্রসাদ ছয়খানি পৌরাণিক নাটক-নাটিকা লিখিয়াছিলেন, 'বভ্রুবাহন' (১৩০৬), 'সাবিত্রী' (১৩০৯), 'উলূপী' (১৩১৩), 'ভীষ্ম' (১৩২০), 'মন্দাকিনী' (১৩২৮) ও 'নরনারায়ণ' (১৩৩৩)। এগুলির কাহিনী মহাভারত

[১] এইসময়ে প্রমথনাথ দাসও 'আলিবাবা' (১৮৯৭) নামে একটি গীতিনাট্য রচনা করিয়াছিলেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ নভেম্বর তারিখে ইহা মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল অতুলকৃষ্ণ মিত্রের প্রযোজনায়। দেবকণ্ঠ বাগচি সুরলয় সংযোগ করিয়াছিলেন। বইটি অতুলকৃষ্ণ মিত্রকে উপহৃত। ক্ষীরোদপ্রসাদের রচনার সঙ্গে প্রমথনাথের রচনার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। রচনাকালের পৌর্ব্বাপর্য্য স্থির না হইলে কে কাহার কাছে ঋণী বলা দুষ্কর। ক্ষীরোদপ্রসাদের আলিবাবায় সুরসংযোগ করিয়াছিলেন পূর্ণচন্দ্র ঘোষ এবং নৃত্যশিক্ষা দিয়াছিলেন নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু। অমরেন্দ্রনাথ দত্তের তত্ত্বাবধানে ইহা ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। "অভিনয়ের উপযোগী করিবার জন্য" তিনি বইটির "স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন করিয়া" লইয়াছিলেন। আলিবাবার জনপ্রিয়তার মূলে ইঁহাদের কৃতিত্বও স্বীকার্য্য। প্রমথনাথ দাসের অপর গীতিনাট্য হইতেছে 'রাধাকুঞ্জ' (১৮৯৭)।

হইতে নেওয়া। উলূপীর পরিকল্পনায় নবীনচন্দ্রের কুরুক্ষেত্র কাব্যের কিছু প্রভাব আছে। উলূপী ও সাবিত্রী একটানা গদ্যে লেখা। ভীষ্ম অংশত গদ্যে এবং অংশত ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষরে লেখা। মন্দাকিনী প্রধানত পূরা ও ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষরে লেখা।

অপৌরাণিক ভক্তিমূলক নাটক দুইখানি মাত্র, 'রঞ্জাবতী' (১৩১১) এবং 'রামানুজ' (১৩২৩)। রঞ্জাবতীতে ধর্মমঙ্গলের লাউসেন-কাহিনীর সঙ্গে প্রচুর কল্পনা মিশানো হইয়াছে। বইটি গদ্যে ও ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর পদ্যে লেখা। পদ্যাংশ মধ্যে মধ্যে মন্দ নয়।

'নিয়তি' (১৩২০) চলিত রূপকথা অবলম্বনে গদ্যে রচিত রোমান্টিক নাটিকা। কোন গান নাই। 'রত্নেশ্বরের মন্দিরে'র (১৯২১) আখ্যানবস্তু সম্পর্ণভাবে কল্পিত, এবং তাহাতে সিনেমা-নাট্যের প্রভাব পড়িয়াছে। নায়ক রত্নেশ্বরের সংলাপ কখনো রবীন্দ্রনাথের নাটকের বাউলের মত এবং কখনো বা শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নায়কের মত, এবং আচরণ তাহার কখনো ইন্দ্রনাথ-শ্রীকান্তের মত, কখনো সাধারণ সিনেমা-নায়কের মত। নায়িকা সুরমা সম্পূর্ণভাবে শরৎচন্দ্রের আদর্শে গড়া।

দুইখানি নাটক বৌদ্ধ যুগের কাহিনী লইয়া লেখা, 'অশোক' (১৩১৪) এবং 'বিদুরথ' (১৩২৯)। অশোকে ইতিহাসের মর্যাদা অক্ষুন্ন নাই বটে, তবে কাহিনীর পরিকল্পনায় কিছু কুশলতা আছে।

পরবর্তী কালের ইতিহাস-কাহিনী অবলম্বনে পরিকল্পিত রোমান্টিক নাটক অনেকগুলি লেখা হইয়াছিল,—'পদ্মিনী' (১৩১৩), 'চাঁদবিবি' (১৩১৪), 'বঙ্গের প্রতাপ-আদিত্য' (১৩১৩), 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' (১৩১৩), 'নন্দকুমার' (১৩১৪), 'বাঙ্গালার মসনদ' (১৩১৭) ও 'আলমগীর' (১৩২৮)। প্রতাপ-আদিত্যে ঘটনাবাহুল্য নাট্যশৃঙ্খলে গ্রথিত হইতে পারে নাই। ভূমিকায়ও পরিণতির এবং পূর্ণতার অভাব আছে। চাঁদবিবিতে রোমান্টিকতার বাড়াবাড়ি। বাঙ্গালার-মসনদ চাঁদবিবিরই যেন বৃহত্তর সংস্করণ। বাঙ্গালার-মসনদের সরফরাজ ও রাবিয়া যথাক্রমে চাঁদবিবির ইব্রাহিম ও মরিয়মের রূপান্তর। বাঙ্গালার-মসনদে নাট্যরস জমাইবার চেষ্টা হইয়াছে নায়কের অন্তর্দ্বন্দ্বে—এক-দিকে ব্রাহ্মণ-রক্তের টান এবং উদার স্বভাব, অপর দিকে রাজসভার চক্রান্ত ও আশাহীনতা। নায়ক সরফরাজের চরিত্র কিছু জটিল—কখনো হারুন-অল্‌রসিদ,

কখনো ছদ্মবেশী দরবেশ। এই ভূমিকার পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ চেষ্টা আছে। রোমান্টিক নাটক হিসাবে বাঙ্গালার-মসনদ মন্দ নয়, তবে প্লট শ্লথ এবং সকল ভূমিকাই অপরিণত। আলমগীর ক্ষীরোদপ্রসাদের ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করিতে পারে। ঘটনার ভিড় এবং ভূমিকার বাহুল্য না থাকিলে ভালো হইত। ঔরঙ্গজেবের দ্বৈতব্যক্তিত্ব মন্দ ফুটে নাই। উদিপুরীর চরিত্রের বিভিন্ন দিকও বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। মোগল-অন্তঃপুরের আলেখ্যে ঐতিহাসিকতার অভাব আছে। সংলাপে (বিশেষত নারী-ভূমিকায়) কাব্যের ভাষা জমে নাই।

কল্পিত ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত রোমান্টিক নাটক হইতেছে 'রঘুবীর' (১৩১০), 'খাঁজাহান' (১৩১৯), 'আহেরিয়া' (১৩২০) এবং 'বঙ্গে রাঠোর' (১৩২৪)। রঘুবীর গদ্যে-পদ্যে লেখা। পদ্যাংশ কতক রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে অমিত্রাক্ষর পয়ার, কতক গিরিশচন্দ্রের অনুকরণে ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর। বাঙ্গালার-মসনদের মত এখানেও নায়কের হৃদয়দ্বন্দ্বই প্রধান। আর্য্য (ব্রাহ্মণ্য) শিক্ষা ও আদর্শের সঙ্গে অনার্য্য প্রবৃত্তি ও কর্ত্তব্যবোধের অনিবার্য্য সংঘর্ষ হইতেছে রঘুবীরের একমাত্র সমস্যা। রঘুবীর এবং অনন্ত রাও, এই দুই ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের বিসর্জ্জন নাটকের ছায়া পড়িয়াছে। সখারাম গিরিশচন্দ্রের নাটকের ছদ্মবেশী মহাপুরুষের মত। নারী-ভূমিকার প্রাধান্য নাই। কৌতুক-রসের লঘুতার জন্য কয়েকটি ছোট ভূমিকা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সংলাপেও কাব্যের ভাষা অনুচিত হইয়াছে। বঙ্গে-রাঠোরের কাহিনী মন্দ নয়, তবে ভক্তিরসের বাহুল্য কতকটা রসভঙ্গ করিয়াছে। সংলাপের অনৌচিত্যতা বেশ আছে। যেমন বালক পুত্রের প্রতি পিতার উক্তি,

> কৃষ্ণ-তৃতীয়ার চাঁদ দিগন্তরাল থেকে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছে। পশ্চিমাকাশের নীলিমা পূর্ব্বাকাশের পলায়নপর নীলিমাকে বুকে আশ্রয় দিয়ে দেখতে দেখতে নিবিড় হয়ে উঠল।

ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্যরচনার প্রধান বিশেষত্ব হইতেছে কাহিনীর মনোহারিত্ব অর্থাৎ প্লটের গল্পরস। গিরিশচন্দ্র যে ভক্তিরসোচ্ছ্বাসের বন্যা আনিয়াছিলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ তাহা প্রতিরোধ করিলেন কাহিনীতে রোমান্সের গাঢ়তা আনয়ন করিয়া। দ্বিজেন্দ্রলাল ইহা পারেন নাই। আলোচ্য যুগের নাট্যরচয়িতাদের মধ্যে শুধু ক্ষীরোদপ্রসাদই রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ করিবার

প্রয়াস করিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাবে পড়িয়া ক্ষীরোদচন্দ্র কয়েকটি নাটকে সংলাপের ঔচিত্যের হানি করিয়াছেন ॥

২৪

রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট বড় নাট্যনিবন্ধগুলির অধিকাংশই মিনার্ভা ক্লাসিক প্রভৃতি থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল। যেমন, 'মানস-মোহিনী' "নাট্যগীতি" (ভবানীপুর ১২৯০),[১] 'অশ্রুপুঞ্জ' (১২৯১)[২], 'কমলা' (ভবানীপুর মাঘ ১২৯৯)[৩], 'কষ্টিপাথর' (১৮৯৭), 'নাচ' (১৩০৯), 'প্রেম-পাশ' (১৯০২), 'কাল-পরিণয়' (১৩১০), 'পেয়ার' (১৯০৪) ইত্যাদি। রামলালের নাট্য-নিবন্ধের প্রধান বিশেষত্ব গানের প্রাচুর্য্য ও পদ্যের বাহুল্য।

দুর্গাদাস দের (১৮৬৫-১৯১১) নাট্যরচনা ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল। "বড়দিনের পঞ্চরং" 'ছবি'তে (১৩০৩) অমৃতলাল বসুর প্রভাব আছে। ইঁহার অপর নাট্যনিবন্ধ হইতেছে 'স-বাবু' (১৩০৪), 'শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা'[৪] ইত্যাদি।

হেমচন্দ্র মিত্র লিখিয়াছিলেন 'নরসিংহ' (১২৯৫),[৫] 'অমরসিংহ নাটক' (১৮৮৯) ও 'পতিদান' (১৩০৪)[৬]। সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু লিখিয়াছিলেন 'কর্ম্মকর্ত্তা (প্রহসন)' (১৮৮১), 'লালা গোলোকচাঁদ' (১২৯৮) ও 'পরিতোষ' (১৯০৩)। সিদ্ধেশ্বর ঘোষ লিখিয়াছিলেন 'চন্দ্রনাথ' (১৮৯৪) ও 'লণ্ডভণ্ড'। যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'ভক্তিপরীক্ষা' (১৩০২, দ্বি-স ১৩০৭)[৭] বীণা থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল। অঘোরনাথ পাঠকের প্রথম রচনা 'লীলা' (গীতিনাট্য), (১২৯৮)[৮] সিটি থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল। চাঁদগোপাল গোস্বামী লিখিয়াছিলেন 'নিমাই-সন্ন্যাস বা চৈতন্যলীলা-গীতাভিনয়' (১২৯১)।

অন্যান্য নাট্যনিবন্ধ—কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের 'বৌবাবু' (১২৯৬), 'সর্ব্বাণী' (১৮৯৪) ও 'ভথেলো' (১৯০৪); আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'বড় ঘরের

[১] নলদময়ন্তী-কাহিনী অবলম্বনে। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয়। প্রচুর গান।

[২] লর্ড রীপনের বিদায় উপলক্ষ্যে লেখা। এটিকে কবিতা বলাই সঙ্গত।

[৩] চতুরঙ্ক রোমান্টিক নাটক। প্রচুর গান।

[৪] 'রঙ্গালয়ের উপহার' দ্বিতীয় খণ্ডে (১৯০১) সঙ্কলিত।

[৫] ইংরেজি অবলম্বনে।

[৬] একটির লেখক দ্বিতীয় হেমচন্দ্র মিত্র হইতে পারেন। প্রথম দুইটির লেখক "এম-এ, বি-এল"।

[৭] গিরিশচন্দ্রের প্রভাব আছে। [৮] গিরিশচন্দ্রকে উৎসর্গিত।

বড় কথা' (১২৮৯) ; সানুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কংসবিনাশ নাটক' (১২৯৫) ; হরিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যুবরাজ টীকেন্দ্রজিৎ' (১৮৯৬)[১] ; অন্নদাপ্রসাদ বসুর 'অনঙ্গরঙ্গিনী' (১৩০৪)[২] ; কেদারনাথ দাসের 'আমারই' (১৩০৮)[৩] ; আশুতোষ বিদ্যাভূষণের 'মায়াবিনী' ও 'চোখের নেশা' (১৯০৫) ; ইঁহার ভাই নিত্যবোধ বিদ্যারত্নের 'দিলবাহার', 'একাদশ বৃহস্পতি' (১৯০২), 'প্রেমের পাথার' (১৩১১), 'কুসুমে কীট' (১৩১৬) ও 'লক্ষ্মণ সেন' ; বিহারীলাল দত্তের 'মজা কি সাজা' ; হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের 'বঙ্গবিক্রম' ; ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের 'আক্কেল সেলামী' (১৩০৭) ও 'অনিলা বা বরবদল' (১৩১৭) ; সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'চণ্ডীরাম' (১৯০১), 'জাহানারা' (১৩১০), 'নতুন বাবু' (১৩১১), 'শ্রীরাধা' ; চুনিলাল দেবের 'ফটিকচাঁদ' (১৩০৪), 'আসমান' (১৩০৯), 'কুব্জ ও দরজী', 'নসীব' (১৩১১) ও 'তিনটি আপেল' (১৩১৫), হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের 'ঔরঙ্গজেব' (১৩১১) ; যশোদানন্দন সরকারের 'অঙ্গুরীয়-বিনিময়' (১৩০২)[৪] ; হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ("শ্রীবাট") 'হরি-দা' (১৩০৪) ; হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'দাতা কর্ণ' (১৩০৪) ইত্যাদি ; বঙ্কুবিহারী ধরের 'যাদব-কলঙ্ক' (১৮৯৭) ও 'উর্ব্বশী-উদ্ধার' ; হরনাথ বসুর 'বেহুলা', 'স্বর্ণহার' (১৯০৬), 'বীরপূজা', 'চক্রে চাকী', ও 'জাগরণ' ; মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শ্রীগীতগোবিন্দ' ও 'মালতী' (১৩১৬) ; মহেন্দ্রনাথ মিত্রের 'কপালিনী' (১৩১০) ; মনোমোহন গোস্বামীর 'রোশিনারা' (১৯০১), 'সংসার' (১৩১০), 'মুরলা' (১৩১১), 'পৃথ্বীরাজ' (১৩১২), 'কর্ম্মফল', 'সমাজ', 'সাধনা', 'গুরুদক্ষিণা' ও 'ধর্ম্মবিপ্লব' ; মনোমোহন রায়ের 'রিজিয়া' (১৩১০)[৫], 'ঐন্দ্রিলা', 'মালবের রাণী' ও 'জীবনযুদ্ধ' ; ইত্যাদি।

জ্ঞানশরণ কাব্যানন্দের 'মধ্যলীলা' (১৩২৩) চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা অবলম্বনে লেখা ॥

[১] মণিপুরের আধুনিক ইতিহাস অবলম্বনে।

[২] শেক্‌স্‌পিয়ারের 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট' অবলম্বনে।

[৩] মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত। প্রথমে নাম ছিল 'মাইরি', পুলিশ কমিশনারের আদেশে বদলাইয়া হয় 'আমারই'।

[৪] ভূদেবের গল্প অবলম্বনে।

[৫] স্কটের 'কেনিল্‌ওয়ার্থ' অবলম্বনে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

প্রবীণ কবিতা

১

অষ্টম-নবম দশকে মধুসূদনের অনুকরণে এবং অল্পবিস্তর দেশি-বিদেশি ছাঁচ মিলাইয়া মহাকাব্য-খণ্ডকাব্যের রচনা যথেষ্ট এবং যথেচ্ছ চলিয়া আসিয়াছিল। মধুসূদনের প্রদর্শিত "মহাকাব্যের" পথ অবলম্বনে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন প্রভৃতি মুখ্য কবিতা-লেখকেরা যথাসাধ্য নূতনত্বের দিকে ঝোঁক দিয়াছিলেন। তবুও তাঁহাদের পদ্ধতি গতানুগতিকই, এবং এ পদ্ধতিতে কাব্য-রচনা যান্ত্রিক ধরণে নিতান্ত সহজ হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সাধারণ পাঠকের কাছে এই কবিতার বাজারদর বিন্দুমাত্র কমে নাই, কেননা ইহার স্বাদে অপরিচয়ের বিসদৃশতা ও অনভ্যাসের কঠিনত্ব কিছু ছিল না। তাই বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী যখন অন্তরঙ্গ গীতিকাব্যের নূতন পথ ধরিলেন তখন প্রায় কেহই তাঁহার কাব্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারে নাই। আশীর কোঠা শেষ হইবার পূর্ব্বেই রবীন্দ্র-প্রতিভার উদয় হইয়াছিল। তাহা না হইলে গতানুগতিকতার চক্রাবর্ত্তে অন্তরঙ্গ কাব্যের তরী কোথায় তলাইয়া যাইত। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা কাব্যে যে অভূতপূর্ব্ব অভাবিতপূর্ব্ব অপরূপ বিচিত্র স্বাদ ও মহিমা আনিয়া দিল তাহার মর্ম্ম ও মূল্য দুই একদিনে বোঝা গেল না। কিন্তু তাহার পাশে পুরাতন কাব্য-কবিতা বড়ই নিষ্প্রভ হইয়া দেখা দিল। রবীন্দ্র-সাহিত্যের রস যাহারা ভালো করিয়া পাইল না তাহারাও এটুকু জানিল যে কেবলমাত্র সরল অর্থ-গ্রহণের মধ্যেই কাব্যের রস নিঃশেষ হয় না। অর্থের অতিরিক্ত যে অন্-অর্থ টুকু থাকে তাহাতেই কাব্যের প্রাণ। সে প্রাণের স্পন্দন পনেরো-আনা গতানুগতিক কবিতায় ছিল না।

গতানুগতিক ধারায় যে একেবারেই ভালো কবিতা লেখা হয় নাই এমন কথা বলি না। কিন্তু সে ধারায় কবিপ্রতিভা আপনার পথ চিনিতে পায় নাই। দেশি-বিদেশি কাব্যের মরীচিকা-অনুগতি সে সব ভালো কবিতার বিষয়ে ও শিল্পে সহজ সজীবতা আনিতে পারে নাই। আড়ম্বর ও অনুকরণ এই ধারার কাব্যরচনাকে ব্যর্থ না করিলেও তুচ্ছ করিয়াছে। সাময়িকব্যাপারঘটিত সরস

কবিতায় অনেক সময় ভাবের ও ভাষার যে সহজ স্ফূর্ত্তি দেখা যায় তাহা গম্ভীর কবিতায় অনুসৃত হইলে ভালো হইত ॥

২

মধুসূদনের অব্যবহিত পরবর্ত্তী কাব্য ও কবিতা-রচয়িতাদের মধ্যে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) অগ্রণী। হেমচন্দ্রের প্রথম কাব্য 'চিন্তা-তরঙ্গিণী'র (১৮৬১) রচনারীতি ঈশ্বরচন্দ্র-রঙ্গলালের ধরণের। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হওয়ায় বইটি সমাদর লাভ করিয়াছিল। হেমচন্দ্রের এক প্রতিবেশী বাল্যবন্ধুর আত্মহত্যা ঘটনা চিন্তাতরঙ্গিণীর বিশিষ্ট আখ্যানবস্তু যোগাইয়াছিল।

চিন্তাতরঙ্গিণী লিখিয়া কিছু কবিখ্যাতি লাভ করিয়া হেমচন্দ্র প্রথমে 'অবোধবন্ধু' ও পরে 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় নিয়মিতভাবে কবিতা লিখিতে লাগিলেন। 'বীরবাহু কাব্য'এর (১৮৬৪) বিজ্ঞাপনে লেখক বলিয়াছেন, "উপাখ্যানটী আদ্যোপান্ত কাল্পনিক, কোন ইতিহাসমূলক নহে। পুরাকালে হিন্দুকুলতিলক বীরবৃন্দ স্বদেশরক্ষার্থ কি প্রকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, কেবল তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ এই গল্পটী রচনা করা হইয়াছে। অতএব এই ঘটনার কাল নির্ণয়ার্থ হিন্দুদিগের পুরাবৃত্ত অনুসন্ধান অনাবশ্যক।" বীরবাহুর প্লটে সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও সংহতি নাই। মাঝখানে রূপকথার মত অনেক কিছু অসম্ভাবিত ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। এই কাব্যেও রঙ্গলালের অনুসরণ আছে, তবে রচনাপারিপাট্যে এবং স্বদেশপ্রীতির প্রকাশে হেমচন্দ্র গুরুকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। রঙ্গলালের কাব্যে স্বদেশপ্রীতির প্রকাশ পশ্চাত্তাপে, এবং তাহা নিষ্ক্রিয়গোছের ও দৈবনির্ভরশীল। বীরবাহুতে স্বদেশপ্রেম সক্রিয়। নায়কের মনোবেদনার মধ্যে লেখকের মনোবেদনাই মুখর—"এবে সেই দেশমাঝে ভারতবক্ষেতে, ম্লেচ্ছকুল পদে দলে"।

> লক্ষ তরি ভাসাইব, ম্লেচ্ছদেশ মজাইব,
> বাণিজ্য করিব ছারখার।
> তোর সিংহাসন পাত ম্লেচ্ছকুল ভস্মসাৎ,
> প্রেয়সীরে করিব উদ্ধার ॥

নায়কের এই আশা তখনকার ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকের মনে জাগিতেছিল।

বীরবাহুতে হেমচন্দ্র যে সক্রিয় দেশপ্রিয়তা মুখরিত করিলেন তাহা শীঘ্রই প্রথমে চৈত্রমেলা-হিন্দুমেলায় ও পরে জাতীয় আন্দোলনে প্রতিধ্বনিত হইল এবং প্রাণনাথ দত্ত, হরলাল রায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির নাট্যরচনায় বিশেষভাবে স্ফূর্তি পাইল। হেমচন্দ্রের পরবর্ত্তী কয়েকটি কবিতায় এই ভাব স্পষ্টতর হইয়াছে।

বীরবাহু বর্ণনাত্মক কাব্য। বর্ণনায় লালিত্য এবং পারিপাট্য আছে। যেমন,

দুটি ফুল কাছে কাছে, একটি তাব শুখায়েছে,
একটি উৰ্দ্ধে একটি অধোভাগে,
ছায়া পড়ি দুটি কালো, তাব মাঝে কিছু আলো,
পড়িয়াছে একটি অগ্রভাগে।

এডুকেশন-গেজেটে ও অবোধবন্ধুতে হেমচন্দ্রের যে খণ্ড-কবিতাগুলি বাহির হইয়াছিল সেগুলি প্রথম খণ্ড 'কবিতাবলী'তে (১৮৭০, দ্বি-স ১৮৭১) সঙ্কলিত হয়। প্রথম সংস্করণে চৌদ্দটি কবিতা ছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে একটি ("ভারত সঙ্গীত") পরিত্যক্ত হয় এবং সাতটি নূতন কবিতা যুক্ত হয়।[১] রচনার সৌষ্ঠব ও ছন্দের লালিত্য 'হুতাশনের আক্ষেপ' 'যমুনাতটে' 'লজ্জাবতী' 'জীবন-মরীচিকা' 'ভারতবিলাপ' 'প্রিয়তমার প্রতি' প্রভৃতি কবিতায় প্রকৃত লিরিকের রূপ দিয়াছে। কয়েকটি কবিতা ইংরেজির অনুবাদ বা অনুসরণ। যেমন, 'ইন্দ্রের সুধাপান' (ড্রাইডেন), 'জীবন সঙ্গীত' (লঙ্ফেলো),[২] 'মদন পারিজাত' (পোপ), 'চাতক পক্ষীর প্রতি' (শেলি) ও 'নববর্ষ' (টেনিসন)। 'ভারতসঙ্গীত' হেমচন্দ্রের সর্ব্বাপেক্ষা সমাদৃত কবিতা।[৩] ভারতসঙ্গীতের দ্বারা জাতীয়-আন্দোলনের পরিপুষ্টি সাধন হইয়াছিল। বীরবাহুতে যে-সুরের সূত্রপাত ভারতসঙ্গীতে (১৮৬৯) তাহারই পরিণতি। দেশপ্রেমের এমন উচ্ছ্বাসপূর্ণ ও উত্তেজনাময় প্রকাশ খুব কম বাঙ্গালা কবিতায় আছে। দ্বিতীয় খণ্ড কবিতাবলীতে (১২৮৬) 'কাশী-দৃশ্য' 'শিশুর হাসি' 'গঙ্গার মূর্ত্তি' 'চিন্তা' 'গঙ্গা' 'বিন্ধ্যগিরি' 'মণিকর্ণিকা' 'ইউরোপ এবং আসিয়া' 'পদ্মফুল'

[১] তৃতীয় সংস্করণে (১২৮৩) কবিতাসংখ্যা ৩২, পঞ্চম সংস্করণে ৩৪।

[২] সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর আগে অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (বৈশাখ ১৭৮৯) প্রথম প্রকাশিত এবং সুশীলা-বীরসিংহ নাটকের শেষে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল।

[৩] গভর্ণমেণ্টের অসন্তুষ্টির জন্য কবিতাবলীর দ্বিতীয় সংস্করণে বাদ গিয়াছিল। 'কবি হেমচন্দ্র,' অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৩১৮), পৃ ১০ দ্রষ্টব্য।

'রেলগাড়ী' 'বিশ্বেশ্বরের আরতি' এবং 'বাঙালীর মেয়ে'—এই বারোটি কবিতা সঙ্কলিত হইয়াছিল।

ভারতসঙ্গীত লিখিয়া হেমচন্দ্র দেশের রাজশক্তির কাছে যে অপরাধ করিয়াছিলেন তাহা 'ভারতভিক্ষা' (১৮৭৫) লিখিয়া ক্ষালন করিতে হইল। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্স্-এর আগমন উপলক্ষ্যে দেশে রাজভক্তির যেন একটা প্রবাহ বহিয়া যায়। তখনকার দিনের লব্ধপ্রতিষ্ঠ এবং অজ্ঞাতনামা কতিপয় কবি সেই উৎসবে সুরোচ্ছ্বাস তুলিয়াছিলেন, পুরস্কারলোভে অথবা কর্ত্তব্যজ্ঞানে। হেমচন্দ্রের ভারতভিক্ষাও এই উপলক্ষ্যে লেখা।[১]

হেমচন্দ্রের প্রধানতম রচনা 'বৃত্রসংহার' "মহাকাব্য"[২] দুই খণ্ডে বাহির হইয়াছিল (১-১১ সর্গ ১৮৭৫, ১২-২৫ সর্গ ১৮৭৭)। বৃত্রসংহারে পুরাকাহিনী যথাযথ অনুসৃত হয় নাই। গল্পের কাঠামো মাত্র পৌরাণিক, বাকি কতকটা হেমচন্দ্রের নিজস্ব কতকটা ইংরেজি কাব্যের অনুকরণ।

ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া বৃত্র স্বর্গ অধিকার করিয়াছে। ভাগ্যবিড়ম্বিত ইন্দ্র নিয়তির আরাধনায় কুমেরু-শিখরে তপস্যায় নিরত। শচী মর্ত্ত্যে আশ্রয় লইয়াছে। দেবতারা পাতালে গিয়া লুকাইয়া আছে। এই অবস্থায় কাব্য-কাহিনীর আরম্ভ। দেবতারা পাতালে নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া অতিষ্ঠ হইয়াছে, সর্ব্বদা ভাবনা কি করিয়া স্বর্গের পুনরুদ্ধার হয়। অবশেষে সকলে মন্ত্রণা করিয়া ঠিক করিল যে অসুরের সহিত অবিরত সংগ্রামে লিপ্ত থাকা কর্ত্তব্য, কেন না "নিয়তি স্বতঃ কি কভু অনুকূল কারে?" ধীর বিচক্ষণ প্রচেতা বলিল, ইন্দ্রের পুনরাগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত, কেননা আমাদের শক্তিবৃদ্ধি কিংবা অসুরের শক্তিক্ষয় হয় নাই। প্রচেতার পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া দেবতারা

[১] অপর কাব্যকারের অনুরূপ রচনা হইতেছে নবীনচন্দ্র সেনের 'ভারত-উচ্ছ্বাস', রাজকৃষ্ণ রায়ের 'ভারত-যুবরাজ', হরিশ্চন্দ্র নিয়োগীর 'ভারতে সুখ', অম্বিকাচরণ গুপ্তের 'ভারতলক্ষ্মী', মহেশচন্দ্র দাস দের 'যুবরাজ-আগমন', হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যুবরাজের ভারতভ্রমণ', গোপালচন্দ্র দের 'রাজোপহার', কাশীশ্বর মুখোপাধ্যায়ের 'কুমারমঙ্গল', আমিনচন্দ্র দত্তের 'যুবরাজ-আগমনে জয়ধ্বনি', মধুসূদন সরকারের 'ভারতে যুবরাজ', নীলকান্ত গোস্বামীর 'ভারতে কুমার', ব্রজলাল সাহার 'যুবরাজ-আগমন', ইত্যাদি।

[২] হেমচন্দ্র তাঁহার কাব্যকে "মহাকাব্য" বলেন নাই "কাব্য"ই বলিয়াছেন। বর্ত্তমান আলোচনা হেমচন্দ্রের জীবৎকালে প্রকাশিত শেষ সংস্করণ (হিতবাদী গ্রন্থাবলী) অবলম্বনে।

অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ চালানোই স্থির করিল। দ্বিতীয় সর্গে ইন্দ্রালয়ে বৃত্র-পত্নীর বিলাসচিত্র উদ্ঘাটিত। ঐন্দ্রিলার একটিমাত্র অপূর্ণ অভিলাষ তাহার অতুল সুখ-ঐশ্বর্য্যকে ব্যঙ্গ করিতেছে। ইন্দ্রাণীর ভোগসম্ভার আয়ত্ত করিয়াও ঐন্দ্রিলা ভুলিতে পারিতেছে না যে শচী এখনো তাহার দাসী হয় নাই। অগত্যা বৃত্রকে প্রতিশ্রুত হইতে হইল, "শচীসহ শচীসহচরী অচিরে তোমার পূরিবে আশ"।

দ্বিতীয় সর্গে অসুর-সভায় বৃত্রের আগমন।

> ত্রিনেত্র, বিশালবক্ষ, অতি দীর্ঘকায়,
> বিলম্বিত ভুজদ্বয়, দোদুল্য গ্রীবায়
> পারিজাত পুষ্পহার বিচিত্র শোভায়।
> নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস,
> পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ—

সভাতে বসিয়াই বৃত্র মন্ত্রীকে আজ্ঞা দিল নৈমিষারণ্য হইতে শচীকে ধরিয়া আনিবার জন্য ভীষণকে পাঠাইতে। মন্ত্রী বলিল, দেবতারা আবার যুদ্ধার্থে আসিয়াছে, সুতরাং এখন ভীষণকে পাঠানো যুক্তিযুক্ত হইবে না। বৃত্র উত্তর করিল, ইন্দ্র যখন আসে নাই তখন দেবতাদিগকে ভয় কি? শিব-প্রদত্ত ত্রিশূল স্পর্শ করিয়া বৃত্র সংকল্প করিল, দেবতাদের ভৃত্য করিয়া রাখিবে। শচীকে ধরিয়া আনিতে ভীষণ মর্ত্ত্যে প্রেরিত হইল। দৈত্যসেনা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইতে লাগিল। চতুর্থ সর্গে নৈমিষারণ্যে সখী চপলার কাছে শচী বিলাপ করিতেছে, "নয়নের কাছে কাছে, সতত বেড়ায় আছে, স্বরগের মনোহর কায়া।" এমন সময় কন্দর্প আসিয়া দেখা দিয়া শচীকে জানাইল যে বৃত্র ভীষণকে পাঠাইতেছে তাহাকে স্বর্গে লইয়া গিয়া ঐন্দ্রিলার দাসী করিবার জন্য। শচী পুত্র জয়ন্তকে স্মরণ করিল। মনে মনে জননীর ডাক শুনিয়া জয়ন্ত অস্ত্রসজ্জা করিয়া পৃথিবীতে চলিয়া আসিল। পঞ্চম সর্গে মাতা-পুত্রের মিলন। পুত্রের অঙ্গে অসুরের অস্ত্রাঘাত চিহ্ন দেখিয়া শচী বলিল, আমাকে উদ্ধার করিয়া কাজ নাই, বরং ঐন্দ্রিলার দাসীগিরি করিব তবু তোমার শরীরে অস্ত্রাঘাত দেখিতে পারিব না। জয়ন্ত ভীষণকে দেখিতে পাইয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাহাকে নিহত করিল। ভীষণের সঙ্গী বৃত্রকে সংবাদ জানাইতে চলিল।

ষষ্ঠ সর্গে দেবাসুরের যুদ্ধবিরতি এবং বৃত্রের পুত্র রুদ্রপীড়ের শচী-অপহরণ প্রচেষ্টা। সপ্তম সর্গে কুমেরু-শিখরে ইন্দ্রের তপস্যা।

পাষাণমূরতি, দৃষ্টি অতি নিরদয়।
মাধুর্য্য কি সহৃদ্যতা কিম্বা দয়া-লেশ
বদন, শরীর, নেত্র, গাত্র, কি ললাটে,
ব্যক্ত নহে বিন্দুমাত্র, নিত্য নিরীক্ষণ
করতলস্থিত ব্যাপ্ত ভবিতব্য-পটে!

এই মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া নিয়তি ইন্দ্রকে ইঙ্গিত জানাইল,

ব্রহ্মার দিবার অন্তে বৃত্রের বিনাশ,—
জানিবে বিশেষ তথা যাও শিব পাশে।

স্বপ্নদেবকে দিয়া দেবতাদের কাছে এই সুসংবাদ পাঠাইয়া ইন্দ্র শিবের কাছে গেল। দেবতারা সসৈন্যে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইতে লাগিল। দৈত্যেরাও "প্রাচীর শিখরে তুলিল পতাকা শিব-ত্রিশূল-অঙ্কিত"।

অষ্টম সর্গে রুদ্রপীড়-পত্নী ইন্দুবালা ও রতির সংলাপ। ইন্দুবালা কোমলহৃদয়, বীরপত্নীর গৌরব সে বোঝে না। সে ভাবে, "পতি যোদ্ধা যার তাহার অন্তরে কত যে সতত ভয়"। নির্য্যাতিত শচীর দুঃখ তাহার অন্তর স্পর্শ করিয়াছে। নবম সর্গে রুদ্রপীড়ের সহিত যুদ্ধে জয়ন্তের পরাজয় এবং শচীর অপহরণ বর্ণিত হইয়াছে। মৃতকল্প জয়ন্তকে দেখিয়া শচীর স্তব্ধ গভীর শোক,

অন্তরে প্রবাহ ধায়,
হৃদয় ভাঙ্গিতে চায়,
নির্গত হইতে নারে সে শোক-নির্ঝর,
যেন কলকল করি,
গহ্বর সলিলে ভরি,
পর্ব্বত নির্ঝর ভ্রমে বেষ্টিত প্রস্তর।

দশম সর্গে ইন্দ্রের কৈলাসে আগমন। দেবতাদের দুর্গতিতে কাতর হইয়া দুর্গা শিবকে বৃত্রের নিধন উপায় নির্দ্দেশ করিতে অনুরোধ করিলেন। শিব ধ্যানে জানিলেন যে অপহৃতা শচী তাঁহাকে স্মরণ করিতেছে। রুদ্রের ক্রোধ উদ্দীপিত হইয়া উঠিল, "হায় রে বৃত্রাসুর! শিবের প্রদত্ত বর ঘৃণিত করিলি?"

বলিতে বলিতে ক্রোধ হইল মহেশে,
ব্রহ্মাণ্ডের বিম্ব যত শূন্যে মিলাইল,
পরশিল জটাজুট অনন্ত আকাশে,
গরজিল শিরে গঙ্গা বিভীষণ নাদে।

বৃত্রের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া শিব ইন্দ্রকে বৃত্র-হত্যার উপায় বলিয়া দিলেন,

বদরী আশ্রমে ঋষি দধীচি এক্ষণে
তপস্যা করিছে, বিষ্ণু আরাধনা ধরি,
সেইখানে, সুরপতি ইন্দ্র, কর গতি,
অস্থি লভি বৃত্রাসুরে বিনাশ বজ্রেতে।

একাদশ সর্গে শচীর স্বর্গে আগমন। পুত্র রুদ্রপীড়ের মুখে শচীর রূপবর্ণনা শুনিয়া ঐন্দ্রিলার ঈর্ষ্যার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে বৃত্রকে বলিল, "এখনি আনহ শচী কিঙ্করীর বেশে।" মাতার নীচতায় ক্ষুব্ধ হইয়া রুদ্রপীড় বলিল,

দাসী হতে আসিয়াছে, হইবে সে দাসী,
মহত্ব হারাও কেন লঘুত্ব প্রকাশি ?

পুত্রের কথায় মাতার ক্রোধ বাড়িয়া গেল। ঐন্দ্রিলা প্রতিজ্ঞা করিল, "অলক্তে রঞ্জিবে শচী আজি এ চরণ।" তাহাতে শচীর দুঃখে দেবীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। এ কথা দুর্গা শিবকে জানাইলেন। শুনিয়া "মহেশের ক্রোধানল জ্বলিল প্রদীপ্ত করি গগনমণ্ডল"। শিবের ক্রোধে প্রলয়ের উপক্রম হইল।

চমকিল ব্যোমমার্গে ভাস্করের রথ,
অতল ছাড়িয়া কূর্ম্ম উঠে অদ্রিবৎ,
বাসুকি গুটায় ফণা, মেদিনী কম্পিত,
উত্তাল উল্লোলময় সিন্ধু বিধূনিত,
ভয়েতে ভুজঙ্গকুল পাতালে গর্জ্জয়,
সদ্যোজাত শিশু মাতৃস্তন ছাড়ি রয়,
বিদীর্ণ বিমানমার্গ, গিরিশৃঙ্গ পড়ে,
চেতনে জড়ের গতি, গতিপ্রাপ্ত জড়ে,

ঐন্দ্রিলার হাতের কাঁকণ খসিয়া পড়িল, রুদ্রপীড়ের রোমহর্ষণ হইল, বৃত্রের নিষ্পলক নেত্রে পলক পড়িল। বৃত্র বুঝিল, রুদ্র কুপিত হইয়াছেন।

দ্বাদশ সর্গে বৃত্রের ভাবনা "শিবের ক্রোধাগ্নি কি এ?" ঐন্দ্রিলা বৃত্রকে স্তোকবাক্যে ভুলাইতে চেষ্টা করিলে বৃত্র মৃদু ভৎর্সনা করিয়া বলিল,

বৃত্রের সম্বল—চন্দ্রশেখরের দয়া,
চিরদীপ্ত চিরন্তন প্রাক্তন-বিভাগ,
সকলি হইল ব্যর্থ তোমা হতে বামা—
দানবি—দৈত্যের কুল উন্মূল তো হতে!

শেষে ঐন্দ্রিলার অব্যর্থ ব্যঙ্গোক্তি,

> ফিরে দাও শচী তার পতির নিকটে
> নিজে ভেটবাহী হয়ে, নিঃশঙ্ক দানব !
> নহে কহ আমি তার দাসী হয়ে যাই,
> করযোড়ে ইন্দ্রাণীরে সঁপি ইন্দ্র করে !

বৃত্রের মন টলিল কিন্তু সংশয় জাগিয়া রহিল। সে স্থির করিল, যাহাই ঘটুক "শচীরে ছাড়িব আমি তুষিতে মহেশ"।

ত্রয়োদশ সর্গে দধীচির আশ্রম বর্ণনা। দধীচির আত্মত্যাগী মনোভাবের বিস্তৃত পরিচয় দিয়া তাঁহার তনুত্যাগ-ঘটনা অল্প কথায় বলা হইয়াছে— "দধীচি ত্যজিল তনু দেবের মঙ্গলে"। চতুর্দ্দশ সর্গে বৈজয়ন্তে শচীর বন্দিনী-দশার বিবরণ। রতির মুখে ইন্দুবালার মহৎ মনের পরিচয় শুনিয়া শচীর সাধ হইল তাহাকে দেখিতে। ইন্দুবালাও তাহাকে দেখিতে চায়। শচীর আশঙ্কা, ইন্দুবালার মনোভাব জানিতে পারিয়া পাছে ঐন্দ্রিলা তাহাকে পীড়া দেয়। রতির মুখে শচী সুসংবাদ পাইল, শিব বৃত্রের প্রতি বিরূপ হইয়াছেন।

পঞ্চদশ সর্গে দেবাসুরের যুদ্ধ। অসুরেরা দেবগণকে আঁটিতে পারিতেছে না। শেষে বৃত্র শিবপ্রদত্ত অব্যর্থ ত্রিশূল দেখাইয়া দেবগণকে রণক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়া দিল এবং দৈত্যগণের বিজয়পতাকা ধূলিলুণ্ঠিত দেখিয়া ভবিষ্যৎ-ভাবনায় চিন্তাকুল হইয়া গৃহে ফিরিল।

ষোড়শ সর্গে ঐন্দ্রিলা সাজসজ্জায় লীলালাস্যে বৃত্রকে মোহিত করিয়া শচীকে পীড়া দিবার অনুজ্ঞা আদায় করিল। সপ্তদশ সর্গে রুদ্রপীড়ের যুদ্ধযাত্রা। পূর্ব্বদিনের যুদ্ধে অগ্নির কাছে পরাজিত হইয়া রুদ্রপীড় আত্মধিক্কারে পীড়িত হইতেছে। পিতার নিকট আসিয়া সে পুনরায় যুদ্ধে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে বৃত্র প্রথমে একমাত্র পুত্রকে ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে দিতে সম্মত হইল না, শেষে পুত্রের নির্ব্বন্ধে রাজি হইল। যুদ্ধ-যাত্রার পূর্ব্বে রুদ্রপীড় মাতাকে অনুরোধ করিল,

> ও পদযুগলে, মাতঃ, এ মিনতি মম
> রেখো মা, চরণে ইন্দুবালা সরলারে।

ঐন্দ্রিলার হৃদয় বৃত্রের মত কোমল ও ব্যথাতুর নয়। সে আশীর্ব্বাদ করিয়া পুত্রকে বিদায় দিল। পত্নীর কাছে রুদ্রপীড় বিদায় লইতে গেলে ইন্দুবালা

বাঙ্গালী মেয়ের মত যুদ্ধের নাম শুনিয়াই ভাঙ্গিয়া পড়িল। মূর্চ্ছিত পত্নীকে সখীগণের কাছে রাখিয়া রুদ্রপীড় চলিয়া গেল। মূর্চ্ছাভঙ্গে ইন্দুবালা পতির কল্যাণে শিবপূজা করিতে বসিলে পূজায় বিঘ্ন ঘটিল। তাহাতে ইন্দুবালা নিজের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আশঙ্কিত হইলে রতি তাহাকে শচীর তুলনা দিয়া সান্ত্বনা দিল।

অষ্টাদশ সর্গে ইন্দুবালা শচীর পায়ের কাছে বসিয়া বৈজয়ন্তধামের অতীত গৌরবকাহিনী শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া গিয়াছে। সে শচীকে কারাবাস ছাড়িয়া তাহার কাছে আসিয়া থাকিতে বলিতেছে এমন সময় রতি খবর দিল, চেড়ীদল লইয়া ঐন্দ্রিলা আসিতেছে। রতি ইন্দুবালাকে লুকাইতে বলিলে সে অস্বীকৃত হইল। শচী চপলাকে অগ্নির কাছে পাঠাইয়া দিল। ঐন্দ্রিলা আসিয়া ইন্দ্রাণীর সজ্জাহীন রূপ দেখিয়া ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হইল তাহার পর তাহার ঈর্ষ্যা জ্বলিয়া উঠিল। শচীর কাছে ইন্দুবালাকে দেখিয়া সে ক্রোধে তিরস্কার করিয়া শচীর বুক লক্ষ্য করিয়া পা উঠাইল, কিন্তু তাহার অলক্ষ্য প্রতাপে পদাঘাত করিতে পারিল না, তাহার পা পড়িল শচীর ছায়ার উপরে। রতির কাছে সংবাদ পাইয়া অগ্নি ও জয়ন্ত ছুটিয়া আসিল। শচী ইন্দুবালাকে রক্ষা করিবার ভার অগ্নির উপর দিল। জয়ন্ত ঐন্দ্রিলাকে বন্দী করিবার অনুমতি মায়ের কাছে চাহিতেছে এমন সময় শিবের দূত বীরভদ্র আসিয়া শচী ও ইন্দুবালাকে লইয়া সুমেরু পর্ব্বতে চলিয়া গেল, যাইবার সময় ঐন্দ্রিলাকে জানাইয়া দিল, "অসুরনিধন নিকট অতি"।

ঊনবিংশ সর্গে ভূগর্ভে বিশ্বকর্ম্মার শিল্পশালার বর্ণনা। ইন্দ্রের অনুরোধে বিশ্বকর্ম্মা দধীচির অস্থি লইয়া বজ্র গড়িয়া দিল। বিংশ সর্গে রুদ্রপীড়ের যুদ্ধ। ইন্দুবালা ও চপলা সুমেরুশিখর হইতে যুদ্ধ দেখিতেছে। রুদ্রপীড়ের শৌর্য্যে দেবতারা অস্থির, এমন সময় ইন্দ্রের আগমনে তাহাদের মনে আশার সঞ্চার হইল। একবিংশ সর্গে বৃত্রের অদৃষ্টলিপিখণ্ডন বর্ণনা। ঐন্দ্রিলা কর্ত্তৃক শচীর অবমাননায় দুঃখিত হইয়া দেবী ব্রহ্মার কাছে চলিলেন। পথে দেখিলেন কত নূতন নূতন ব্রহ্মাণ্ড, নূতন নূতন জীব ও আত্মা সৃষ্ট হইতেছে। দেবীকে লইয়া ব্রহ্মা গেলেন বিষ্ণুর কাছে। তিনজনে কৈলাসে শিবের নিকটে আগমন করিলেন। শিব তখন ধ্যানে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতিলয় অনুধাবন করিতেছেন। ঐন্দ্রিলার দম্ভ ও অপরাধ শুনিয়া বিষ্ণু ও ব্রহ্মাকে শিব বলিলেন, "কর যাহে

বৃত্রাসুর নাহি জীয়ে আর"। তাহার পর তিনি ত্রিগুণাত্মক দেব পরব্রহ্মরূপে ক্ষণকালের জন্য প্রকাশিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে দৈববাণী হইল "বৃত্রের অদৃষ্টলিপি অকালে খণ্ডিত"। বৈকুণ্ঠের এক প্রান্তে ভাগ্যদেব নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ জীবের ভাগ্যপট খুলিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি সেই দৈববাণী শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়া দেখিলেন,

> বৃত্রের বিনাশ-চিত্র, কালিমামণ্ডিত,
> মিশাইছে ধীরে ধীরে—শোভা বিরহিত!

দ্বাবিংশ সর্গে রুদ্রপীড়ের সহিত দেবগণের যুদ্ধ ও ইন্দ্র-হস্তে রুদ্রপীড়ের বিনাশ। ত্রয়োবিংশ সর্গে রুদ্রপীড়ের মৃত্যুসংবাদে বৃত্র-ঐন্দ্রিলার শোক। চতুর্ব্বিংশ সর্গে ইন্দ্রের সহিত বৃত্রের যুদ্ধ। জয়ন্তকে লক্ষ্য করিয়া শৈব ত্রিশূল নিক্ষেপ করিলে যখন তাহা লক্ষ্যে না পড়িয়া শূন্যে অদৃশ্য হইয়া গেল তখন বৃত্র বুঝিতে পারিল যে রুদ্র তাহার প্রতি বাম হইয়াছেন। বৃত্র ক্ষিপ্তবৎ প্রলয়কাণ্ড করিতে লাগিলে ইন্দ্র হতচেতন হইল। তখন ত্রিভুবন চীৎকার করিয়া ইন্দ্রকে বলিতে লাগিল, "দম্ভোলি নিক্ষেপি বধ বৃত্রে—বধ শীঘ্র—বিশ্ব লোপ হয়"! বৃত্রের বুকে ইন্দ্র বজ্র হানিলে অসুর পড়িল, "বিন্ধ্যধরাধর যেন পড়িল ভূতলে"! পুত্রের নাম লইতে লইতে বৃত্র শেষনিঃশ্বাস ছাড়িল। পতিপুত্রের শোকে ঐন্দ্রিলা উন্মাদিনী হইয়া গৃহত্যাগ করিল। কাব্যকাহিনীতে যবনিকা পড়িল।

মধুসূদনের অনুসরণে যাঁহারা "মহাকাব্য" রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার শ্রেষ্ঠ। সাধারণ পাঠকের কাছে বৃত্রসংহারকে ছন্দের সহজ লালিত্য, রচনার প্রাঞ্জলতা এবং ভাবের সরলতা সবিশেষ সহজবোধ্য করিয়াছিল। কোন কোন সমসাময়িক সমালোচক বৃত্রসংহারকে মেঘনাদবধের উপরে স্থান দিয়াছিলেন। বৃত্রসংহারের আখ্যান-বস্তুতে মহাকাব্যোচিত যে বিশালতা আছে তাহা মেঘনাদবধে নাই। এই কারণেই কিশোর রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধের তুলনায় বৃত্রসংহারকে উচ্চতর স্থান দিয়াছিলেন, "স্বর্গ-উদ্ধারের জন্য নিজের অস্থিদান, এবং অধর্ম্মের ফলে বৃত্রের সর্ব্বনাশ—যথার্থ মহাকাব্যের বিষয়"।[১] কিন্তু বৃত্রসংহারের আখ্যানবস্তুর বিশালতা কাব্যের মধ্যে কতটা প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক। দধীচির অস্থিদান বৃত্রসংহার-কাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে প্রধান ঘটনা।

[১] সমালোচনা (১২৯৪) পৃ ৩৪।

কিন্তু হেমচন্দ্রের কাব্যে এই ঘটনা নেপথ্যেই ঘটিয়া গিয়াছে। দধীচির মহত্ত্বের পরিচয় কাব্যে প্রকটিত হয় নাই। দ্বিতীয়ত বৃত্রসংহারের বৃত্রের অপরাধ এমন গুরুতর নয় যাহাতে তাহার অকালনিধনের জন্য এত আড়ম্বরের প্রয়োজন হইতে পারে। ঐন্দ্রিলার অপরাধে বৃত্রের অমন শাস্তিও কাব্যোচিত হয় নাই। কাব্যের নাম যদি 'ঐন্দ্রিলা-পরাভব' রাখা হইত তবে হয়ত অন্যায় হইত না। বৃত্রসংহারে অনেকগুলি ভালোমানুষ-চরিত্র আছে বটে কিন্তু যথার্থ মহৎচরিত্র নাই। একমাত্র মহৎচরিত্র দধীচি কাব্যে একান্তভাবে উপেক্ষিত রহিয়া গিয়াছে। দেবতা-চরিত্রগুলিতে ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠ প্রকাশ নাই। বৃত্রের ভূমিকায় বৈদিক ও পৌরাণিক ইন্দ্রশত্রু অসুরের গম্ভীর মহিমার পরিচয় নাই। বৃত্র সাধারণ মানুষের মতই, এমন কি সাধারণ ভালোমানুষের অপেক্ষাও কোমলহৃদয়। রণোন্মুখ পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে গিয়া সে কাঁদিয়া ফেলে,

"পাল বীরধর্ম্ম—ভাগ্যে যা থাকে আমার।"
বলি কৈলা আশীর্ব্বাদ অশ্রুবিন্দু মুছি।

পৌরাণিক বৃত্রাসুরের মহিমা হেমচন্দ্রের কাব্যে বড় পাই না। বৃত্রসংহারের নায়ক শিবের বরপ্রাপ্ত ভক্ত মাত্র, "বৃত্রের সম্বল চন্দ্রশেখরের দয়া"। ভাগ্যের উপর তাহার অসীম বিশ্বাস। সে জানে,

এই ভাগ্য যতদিন থাকিবে বৃত্রের,
জগতে কাহার সাধ্য নাহি সে আমায়
সমরে পরাস্ত করে—কিম্বা অকুশল,

এইখানে হেমচন্দ্রের বৃত্র মধুসূদনের রাবণের কাছে নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে।

ঐন্দ্রিলার ভূমিকায় অসুরমহিষীর দৃপ্ত মহিমা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তবে অভিমানের ভাগ একটু কম হইলে ভালো হইত। শচীর ঐশ্বর্য্য ঐন্দ্রিলা অধিকার করিয়াছে, কিন্তু শচীর গৌরবমহিমা যতদিন না তাহার কাছে মাথা নত করিতেছে ততদিন তাহার মনে শান্তি নাই। তাহার চিত্তের এই অশান্তিই কাব্যকাহিনীর বীজ। দ্বাদশ সর্গে সংশয়মগ্ন বৃত্রকে ঐন্দ্রিলা যে ভাবে উত্তেজিত করিতেছে তাহার মধ্যে যেন শেক্স্পিয়রের লেডি ম্যাকবেথের কথার প্রতিধ্বনি শুনিতেছি,

আমি যদি দৈত্যপতি তোমার আসনে
হতেম, দেখিতে তবে আমার কি পণ!—
ভয়, চিন্তা, দ্বিধা, দয়া, আমার হৃদয়ে
স্থান না পাইত পণ অসিদ্ধ থাকিতে!

রুদ্রপীড় যখন যুদ্ধযাত্রার প্রাক্‌কালে পিতার নিকট বিদায় লইতেছে তখন বৃত্র কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিয়াছে, কিন্তু যখন ঐন্দ্রিলার কাছে গেল তখন সে দৈত্যেন্দ্রমহিষীর মত অক্ষুব্ধহৃদয়ে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিল, "যাও রণে, রণজয়ী অরিন্দম বীর।" শচীর সম্বন্ধে ঐন্দ্রিলার ঈর্ষ্যা অমানুষিক, তবে ইতরতা অবধি পৌঁছায় নাই। কিন্তু দ্বাবিংশ সর্গে ঐন্দ্রিলার যে চাতুরী বর্ণিত হইয়াছে তাহা কাব্যের পক্ষে নিরর্থ। "সহিতে হইল প্রভু, স্বর্গজয়িজায়া হয়ে শচী-পদাঘাত!" এই হীন মিথ্যা কথা ঐন্দ্রিলা-ভূমিকার গৌরবহানি করিয়াছে। তবে মোটের উপর ঐন্দ্রিলা-চরিত্রে মহত্ত্ব না থাকিলেও গৌরব আছে।

ইন্দুবালার ভূমিকা বাঙ্গালী ঘরের নববধূর মত। বৃত্রাসুরের পুত্র রুদ্রপীড়ের পত্নীর মর্য্যাদা তাহার নাই। রুদ্রপীড় ভূমিকা অপরিস্ফুট। সমস্ত দেবতা-চরিত্রও তাহাই। ইন্দ্রের মহত্ত্ব ও শচীর গৌরব নিতান্ত নেতিবাচক। শচীর ভূমিকায় ব্যক্তিত্বের আভাস মাত্র আছে। আসলে ঐন্দ্রিলা ছাড়া বৃত্র-সংহারের কোন চরিত্রই পরিস্ফুট অথবা বলিষ্ঠ নয়।

মধুসূদনের প্রবহমাণ অমিত্রাক্ষরের শক্তি বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া হেমচন্দ্র তাঁহার কাব্যে মধুসূদনের ছন্দ অবলম্বন করেন নাই। বোধ করি একঘেয়েমি এড়াইবার জন্যই তিনি অমিত্রাক্ষরেও সংস্কৃতের অনুকরণে চারি চরণে স্তবক করিয়াছেন এবং যতিতে পয়ারের ঠাট অনুসরণ করিয়াছেন, কেবল শেষ ছত্রার্দ্ধে একান্তরিত চরণে ২+২+২ ও ৩+৩ অক্ষরের পদ্যাংশ ব্যবহার করিয়াছেন। ছন্দোবৈচিত্র্যের জন্যই তিনি মিত্রাক্ষর ছন্দও যথেষ্ট প্রয়োগ করিয়াছেন।[১] হেমচন্দ্রের অমিত্রাক্ষর আসলে মিলহীন পয়ার এবং তাহাও প্রায়ই চারিছত্রের স্তবকে গড়া। যেমন বৃত্রসংহারের আরম্ভ,

> বসিয়া পাতালপুরে ক্ষুব্ধ দেবগণ,—
> নিস্তব্ধ, বিমর্ষভাব, চিন্তিত আকুল;
> নিবিড় ধূমান্ধ ঘোর পুরী সে পাতাল,
> নিবিড় মেঘাড়ম্বরে যথা অমানিশি।[২]

বৃত্রসংহারের ভাষায় মধুসূদনের প্রভাব নিতান্ত কম নয়। হেমচন্দ্র নাম-

[১] "প্রথমবারের বিজ্ঞাপন"এ হেমচন্দ্র এই কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন, "নিরবচ্ছিন্ন একই প্রকার ছন্দঃ পাঠ করিলে লোকের বিতৃষ্ণা জন্মিবার আশঙ্কা করিয়া পয়ারাদি ভিন্ন ভিন্ন ছন্দঃ প্রস্তাব করিয়াছি। এই গ্রন্থে মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর উভয়বিধ ছন্দঃই সন্নিবেশিত হইয়াছে।"

[২] প্রথম সংস্করণের পাঠ—"ক্ষুব্ধ" স্থানে "সর্ব্ব", "ভাব" স্থানে "ভাবে" এবং "ধূমান্ধ" স্থানে "ধূম্রল"।

ধাতুর ব্যবহারে সংযত হইয়াছেন, কিন্তু “ইরম্মদ” “দম্ভোলি” “যাদঃপতি” প্রভৃতি আভিধানিক শব্দ বাদ দিতে পারেন নাই। প্যারেন্‌থেসিসের ব্যবহার এবং “যথা” “হায়রে যেমতি” “কিম্বা” ইত্যাদি শব্দের সাহায্যে উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগ মধুসূদনের অনুকরণ। মেঘনাদবধের “কর্ব্বুরগৌরবরবি চিররাহুগ্রাসে” বৃত্রসংহারে রূপান্তরিত হইয়াছে “দৈত্যকুলোজ্জ্বলরবি গেছে অস্তাচলে”।

বৃত্রসংহারের চতুর্থ সর্গ মেঘনাদবধের চতুর্থ সর্গের ছাঁচে ঢালা। মেঘনাদ-বধের সীতা ও সরমা বৃত্রসংহারে শচী ও চপলা হইয়াছে। মধুসূদন তাঁহার কাব্যের প্রারম্ভে বাগ্‌দেবতাকে সম্বোধন করিয়াছেন, আর হেমচন্দ্র করিয়াছেন কাব্যের মধ্যভাগে, দ্বিতীয় খণ্ডের প্রারম্ভে।

> কহ, মাতঃ শ্বেতভুজে, স্বয়ম্ভুনন্দিনি,
> কি হইলা অতঃপর বৈজয়ন্ত-ধামে!

বৃত্রসংহারের অষ্টাদশ সর্গে ঐন্দ্রিলার শচী-সন্নিধানে যাত্রা মেঘনাদবধে প্রমীলার লঙ্কাপ্রবেশের সংক্ষিপ্ত অনুকরণ। রুদ্রপীড়ের নিধনবার্ত্তা শুনিয়া বৃত্রের অবস্থা মধুসূদন-বর্ণিত পুত্রশোকাহত রাবণের কথা মনে পড়াইয়া দেয়। এইরূপ খুঁটিনাটি অনুকরণ বৃত্রসংহারে অনেক আছে। মেঘনাদবধে রাম-রাবণের প্রতি দুর্গা-শিবের যে মনোভাব বৃত্রসংহারে তাহাই অনুকৃত হইয়াছে। বৃত্রসংহারে স্বপ্নদেবের কল্পনাও মধুসূদনের কাব্য হইতে গৃহীত। সর্ব্বোপরি বৃত্রের ট্রাজেডিতে ঠিক রাবণের ট্রাজেডিরই অনুকরণ করা হইয়াছে—ভবিতব্যের অলঙ্ঘনীয়তায়।

বৃত্রসংহারে স্থানে স্থানে ইংরেজি কাব্যের ভাব সঙ্কলিত হইয়াছে। কবিও স্বীকার করিয়াছেন,

> বাল্যাবধি আমি ইংরাজি ভাষা অভ্যাস করিয়া আসিতেছি এবং সংস্কৃত ভাষা অবগত নহি, সুতরাং এই পুস্তকের অনেক স্থলে যে ইংরাজি গ্রন্থকারদিগের ভাবসঙ্কলন এবং সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞতাদোষ লক্ষিত হইবে তাহা বিচিত্র নহে।

ভাষাতেও ইংরাজির ছোপ কিছু কিছু আছে।

বৃত্রসংহারে ছন্দোবৈচিত্র্য থাকায় বিশেষ লাভ হয় নাই, বরং বিষয়োচিত গাম্ভীর্য্য ও উদাত্ততার হানি হইয়াছে। বিশেষত্বহীন “লিরিক” অংশ কমাইয়া দিলে বৃত্রসংহারের মহাকাব্যোচিত আকার কমিত কিন্তু গৌরব বাড়িত।

পদলালিত্য মধ্যে মধ্যে আছে। কিন্তু হেমচন্দ্র বাগ্‌যত হইতে পারেন নাই। শব্দের প্রয়োগও সর্ব্বত্র শোভন নয়। যেমন, "দেব-নাসিকায় বহে সঘন নিশ্বাস", "নাসারন্ধ্রে বহে শ্বাস বিকট উচ্ছ্বাসে" ইত্যাদি। প্রথম সংস্করণে (প্রথম খণ্ডে) শব্দপ্রয়োগে অনেক দোষ ছিল, তাহা পরবর্ত্তী সংস্করণে শোধরানো হইয়াছে। বৃত্রসংহারের ভাষার প্রধান দোষ হইতেছে মধ্যে মধ্যে গদ্যবৎ ছত্রের ব্যবহার। যেমন, "স্বর্গের সমীপবর্ত্তী পর্ব্বতসমূহে", "কীর্ত্তিমান জনকের পুত্র হওয়া বৃথা!" "তুমি ত যুদ্ধ জান না", ইত্যাদি।

বৃত্রসংহারের পর হেমচন্দ্র যে দুইখানি কাব্য রচনা করিলেন তাহাতে দেখি যেন কবির মন চিন্তাতরঙ্গিণীর যুগে ফিরিয়া গিয়াছে। 'আশাকানন' (১৮৭৬) "সাঙ্গরূপক কাব্য", "মানবজাতির প্রকৃতিগত প্রবৃত্তিসমূহ প্রত্যক্ষী-ভূত করাই এই কাব্যের উদ্দেশ্য", দশ "কল্পনা"য় বিভক্ত এবং আগাগোড়া লঘুত্রিপদী ছন্দে রচিত। রচনায় বিশেষত্ব কিছু নাই। "ছায়াময়ী" (১৮৮০) সাত "পল্লব"এ বিভক্ত, দান্তের 'দিভিনা কোমোদিয়া'র অনুসরণে রচিত। ছন্দে বৈচিত্র্য আছে। প্রস্তাবনায় ভয়ানকরসের উদ্বোধন মন্দ নয়। নরকে পাপী-অনুতাপীদের মধ্যে পুরাণের শকুনি, কংস ও তারা, বাঙ্গালা-কাহিনীর বিদ্যা এবং ইতিহাসের সিরাজুদ্দৌলার নাম পাই।

এই সময়ের লেখা 'বিবিধ কবিতা'য় (১৩০০) কয়েকটি সরল ও ব্যঙ্গ কবিতার সঙ্কলন আছে। সাময়িক ঘটনামূলক সরস ও ব্যঙ্গাত্মক কবিতা-গুলিতেই হেমচন্দ্রের রচনাশক্তির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। হাল্‌কা নাচাড়ী ছন্দে এবং কথ্যভাষায় লেখা এই কবিতাগুলিতে উচ্চ কবিকল্পনার কিছু পরিচয় নাই এবং সেগুলির স্থায়ী মূল্যও বেশি নয়। কিন্তু সমসাময়িক কৃত্রিম কাব্যের এক-ঘেয়েমির মধ্যে এগুলি ভালোই লাগে। কবিতাগুলির কোন-কোনটিতে ব্যঙ্গ আছে, কিন্তু তাহা কখনো মর্ম্মভেদী নয়। কবির সমবেদনা ও সরল কৌতুক-হাস্যের স্নিগ্ধতা এই ব্যঙ্গকবিতাগুলিকে হৃদ্য করিয়াছে।

> হায় কি হোল ?—কলম ছুঁতে হাসি এল দুখে!
> ভেবেছিলুম মনের কথা লিখ্‌বো ছাতি ঠুকে!

হাসির ছলে কবি এই কবিতায় যতটা আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন তাহা তাঁহার মহাকাব্যেও পাই না। "নাচের পুতুল হয় কি মানুষ, তুল্লে উঁচু করে"—এই

ছত্রে দেশপ্রিয় কবির অন্তরের গভীর ক্ষোভের প্রকাশ আছে যাট বৎসরের পূর্ব্বে যেমন আজও কতকটা তেমনি একথা সমভাবে সত্য,

হায় কি হোল—দলাদলি বাধলো ঘরে ঘরে !
পার্টি খেলা ঢেউ তুলেছে ভারত-রাজ্য পরে।
সবাই "লীডর"—কর্ত্তা স্বয়ং আপনি বাহাদুর,
কতই দিকে তুলছে কতো কতই-তরো সুর !

'বাজিমাৎ'এর মিষ্ট মধুর ব্যঙ্গ উপভোগ্য,

আমি স্বদেশবাসী আমায় দেখে লজ্জা হোতে পাবে।
বিদেশবাসী রাজার ছেলে লজ্জা কি লো তারে ?

'বাঙ্গালীর মেয়ে'-কবিতায় কটাক্ষ কিছু তীব্রতর,

রান্নাঘরে হাওয়া খাওয়া, গাড়ী মুদে যাওয়া
দেশশুদ্ধ লোকের মাঝে গঙ্গাঘাটে নাওয়া
বাসর ঘরে ঝুমুর-কবি চোখের মাথা খেয়ে,
প্রভাত হলে পিস্‌শাশুড়ী ঘোমটা মুখে চেয়ে !

'হুতোম প্যাঁচার গান'এ[১] বিদ্যাসাগর-ভূদেব-কৃষ্ণমোহন প্রভৃতি কতিপয় স্বনামধন্য পুরুষের কীর্ত্তিখ্যাপন হইয়াছে। ইহাই হেমচন্দ্রের শেষ ব্যঙ্গকবিতা।

'দশমহাবিদ্যা'র (১৮৮২) বিষয় পৌরাণিক। কাব্যটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে প্রায়শ মাত্রাছন্দের ব্যবহার, যেমন পুরানো ব্রজবুলিতে বা মৈথিল পদাবলীতে পাই। 'চিত্তবিকাশ'এ (১৩০৫) কতকগুলি নীতিমূলক ও চিন্তাগর্ভ কবিতা সঙ্কলিত হইয়াছে। কবির শেষ জীবনের দুর্গতির প্রকাশ আছে কয়েকটি কবিতায়। 'কল্পনা' কবিতায় বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর প্রভাব পাই। চিত্তবিকাশের কবিতাগুলিতে হেমচন্দ্রের কাব্যপ্রতিভার দীপ্তি ম্লানতর হইয়াছে।

হেমচন্দ্র শেক্‌স্পিয়ারের দুইখানি নাটকের অনুবাদ বা রূপান্তর করিয়াছিলেন, 'টেম্‌পেষ্ট' অবলম্বনে 'নলিনীবসন্ত' (১২৭৫) এবং 'রোমিও-জুলিয়েত' (১৮৯৫)। কয়েকজন বন্ধুকে উপলক্ষ্য করিয়া হেমচন্দ্র একটি ক্ষুদ্র কৌতুকনাট্য রচনা করিয়াছিলেন, 'নাকে খৎ'।[২]

'ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী পূজা', 'অন্নদার শিবপূজা' এবং 'ভারত ভিক্ষা' এই তিনটি

[১] নবজীবন (আশ্বিন ১২৯১)।

[২] পুরাতন-প্রসঙ্গের পরিশিষ্টরূপে পুনর্মুদ্রিত (পৃ ২৪১-২৬৩)। উপোদ্‌ঘাতে বিপিনবিহারী গুপ্ত কৃষ্ণকমলের কাছে কৌতুকনাট্যরচনাটির ইতিহাস সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

কবিতায় হেমচন্দ্র ইংরেজি "লীরিক ওড্"-এর অনুকরণ করিয়াছেন। "ষ্ট্রোফি" "অ্যান্টিষ্ট্রোফি" এবং "ইপোড্" হইয়াছে যথাক্রমে "প্রয়োগ" অথবা "আরম্ভ", "শাখা" এবং "পূর্ণ কোরস"।

হেমচন্দ্রের কবি-প্রতিভা যেমনই হোক পদ্য লিখিবার ক্ষমতা ছিল। বাঙ্গালা কাব্যে হেমচন্দ্রের বিশেষ দান হইতেছে স্বদেশপ্রেমের উত্তেজনা সঞ্চার। ইহাতে খাঁটি বীররসের হয়ত অভাব আছে, হতাশা ও কাঁদুনির সুরও থাকিতে পারে, কিন্তু আবেগের মধ্যে কোথাও কৃত্রিমতার বেসুর বাজে নাই। ভারতের স্বাধীনতাহীনতা ও আনুষঙ্গিক দুরবস্থা কবির যৌবনের দিনে যে ক্ষোভের সঞ্চার করিয়াছিল তাহার মধ্যে ভবিষ্যৎ আশার আশ্বাসও ছিল।

সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখনও বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যাচল এখনও উন্নত,
সে জাহ্নবী-বারি এখনও ধাবিত,
কেন সে মহত্ত্ব হবে না উজ্জ্বল ?

কিন্তু বয়সবৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে আশা কবির হৃদয় হইতে ক্রমশ মিলাইয়া গেল।

পরের অধীন দাসের জাতি "নেসন" আবার তারা!
তাদের আবার "এজিটেসন্"—নরুন উঁচু করা।

হেমচন্দ্র কোন কোন কবিতায় হতাশার সুর লক্ষ্য হয়। এই হতাশা তাঁহার ব্যক্তিজীবনের, কবিজীবনের নহে। প্রকৃত কবির মতই হেমচন্দ্র জীবনরসের রসিক ছিলেন, তাই 'সংসার'এ লিখিয়াছিলেন,

আমারে চরণতলে, মথিস্ যতই বলে,
যতই গরল তুই করিস্ উদ্‌গার,
সংসার, তোরই মুখে, চাহিয়া থাকিব দুখে,
তোরে ছাড়ি এ জগতে কি দেখিব আর ?

ছন্দোলালিত্য হেমচন্দ্রের কাব্যকলার প্রধান গুণ। অমিত্রাক্ষর পয়ারে হেমচন্দ্র কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই, কিন্তু মিত্রাক্ষরছন্দ রচনায় তাঁহার দক্ষতা ছিল। হেমচন্দ্রের ছন্দে কচিৎ পরবর্ত্তী কালের ছন্দোবিদগ্ধ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নৈপুণ্যের পূর্ব্বাভাস পাই। যেমন,

চলেছে অচলরাজি ধারানীর অঙ্গে,
কোথায় চলেছ তুমি হেন রূপে গঙ্গে ?

হেমচন্দ্রের কবিতায় আন্তরিকতা আছে। কয়েকটি ব্যঙ্গ কবিতায় ইহা অধিকতর স্পষ্ট। এই হিসাবে হেমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের জ্যেষ্ঠ উত্তরাধিকারী ॥

৩

শিবনাথ (ভট্টাচার্য্য) শাস্ত্রী ছিলেন দিগ্‌ভ্রষ্ট সাহিত্যিক। ইঁহার অন্তরবাসী কবি-মানুষটি নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিবার মত সুযোগ ও সুবিধা পায় নাই। শিক্ষক ও সংস্কারক বনিয়া গিয়া শিবনাথ এক হিসাবে স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়াছিলেন। শিবনাথের উপন্যাসের আলোচনায় তাঁহার যে অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করিয়াছি তাহা তাঁহার কবিতায়ও দেখা যায়। শিবনাথের স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল পদ্য রচনায়, কিন্তু সে ক্ষমতা বিকশিত হইবার সুযোগ লাভ করে নাই। শিবনাথের প্রথম কাব্য 'নির্ব্বাসিতের বিলাপ' (১৮৬৮, দ্বি-স ১৮৮১)[1] চারি কাণ্ডে বিভক্ত। বিষয়, আন্দামানে নির্ব্বাসনগামী দণ্ডিতের খেদোক্তি। দ্বিতীয় কাব্য 'পুষ্পমালা' (হরিনাভি ১৮৭৫, প-স ১২৯৫) একশত খণ্ড-কবিতার সঙ্কলন।[2] তৃতীয় কাব্য 'হিমাদ্রি-কুসুম'এ (১৮৮৭) চারিটি বড় ও একটি ছোট কবিতা আছে। চতুর্থ কাব্য 'পুষ্পাঞ্জলি' (১৮৮৮)। পঞ্চম 'ছায়াময়ী-পরিণয়' (১৮৮৯) "রূপক কাব্য",—আত্মনিবেদন, বিস্মৃতি, বিচ্ছেদ, প্রস্থান, তীর্থযাত্রা, কামপুরী বা প্রলোভন, এবং পরিণয় এই সাত পরিচ্ছেদে বিভক্ত। ভাষা সহজ, ছন্দ লঘু। আরম্ভ,

> ছায়াময়ী স্বর্ণলতা বাপ-সোহাগী মেয়ে,
> রূপের প্রভায় উঠ্‌লো ফুটে যৌবনে পা দিয়ে।

এখানে হেমচন্দ্রের প্রভাব আছে ॥

৪

নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) হেমচন্দ্রের বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও সাহিত্যক্ষেত্রে সমসাময়িক। কাব্যরচনার প্রথম পর্ব্বে নবীনচন্দ্র শিবনাথ শাস্ত্রীর সহায়তা পাইয়াছিলেন। নবীনচন্দ্রের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অবকাশরঞ্জিনী'র (১২৭৮, ১৮৭১) প্রথমভাগে বাইশটি কবিতা আছে। সবার আগে লেখা 'বিধবা কামিনী' (রচনাকাল ১৮৬৪) কবিতাটি মন্দ নয়। যেমন,

> এখনও দেখি যেন নয়নের কাছে,
> দীনভাবে, ম্লানমুখে, বসিয়া দুঃখিনী।

[1] প্রথমপ্রকাশ সোমপ্রকাশে (ক্ষুদ্রাকারে)।
[2] সোমপ্রকাশ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রথমপ্রকাশিত।

ভাবিতেছে এ সংসারে কার ভাবে বাঁচে,
নীরবে বিরলে বসি, কাঁদে অনাথিনী।

অবকাশরঞ্জিনীর অধিকাংশ কবিতায় কবির নিজের কথাই প্রধান। রোমান্টিক প্রেমে হতাশার সুরও বাজিয়াছে বেশির ভাগ কবিতায়। 'পিতৃহীন যুবক' ও 'পতিপ্রেমে দুঃখিনী কামিনী' কবিতা দুইটির ভাবে ও ভাষায় মধুসূদনের অনুকরণ খুব স্পষ্ট। 'হৃদয়-উচ্ছ্বাস'এ হেমচন্দ্রের প্রভাব আছে। 'বিষন্ন কমল'এ বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর অনুকরণ অস্বীকার করা যায় না। প্রথম ভাগ অবকাশরঞ্জিনীর কবিতাগুলিতে মধ্যে মধ্যে লিরিক কল্পনার স্পর্শ দেখা যায়। তবে যত্নের অভাবে অধিকাংশ কবিতা শ্লথবন্ধ। বাচালতা ও আতিশয্য সত্ত্বেও বর্ণনা মাঝে মাঝে সরল ও মনোরম।

'অবকাশরঞ্জিনী' দ্বিতীয় ভাগে (১২৮৮) তেতাল্লিশটি কবিতা আছে। তাহার মধ্যে দুইটি আলাদা ছাপা হইয়াছিল, 'ভারত-উচ্ছ্বাস' (১৮৭৫) ও 'ক্লিওপেট্রা' (১২৮৪)[১]। রানী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্রের আগমন উপলক্ষ্যে প্রথম কবিতাটি লিখিয়া নবীনচন্দ্র পঞ্চাশ গিনি পুরস্কার পাইয়াছিলেন।[২] দ্বিতীয়ভাগের অনেকগুলি কবিতার বিষয় সাময়িক ঘটনা। কবির নিজের কথাও কয়েকটি কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে। দুই একটি কবিতায় দেশের রাষ্ট্রীয় সমস্যার প্রতি নবীনের মনোভাবের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। অবকাশরঞ্জিনী প্রথমভাগে তাঁহার দৃষ্টি ছিল সমস্যার উপর নিবদ্ধ, এবং তখন কবির নিজের সমস্যাই ছিল প্রধান। দেশের অতীত গৌরবের স্মৃতি নবীনকে মর্ম্মপীড়া দিয়াছে কিন্তু তাহা বাহিরে প্রকাশ পায় নাই। "আর্য্যামি"তেই কবির স্বাধীনতা-কল্পনা সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয়ভাগে দেখি যে হেমচন্দ্রের উদ্দীপনা নবীনচন্দ্রকেও স্পর্শ করিয়াছে। "রাণী যিনি, কহ তাঁরে এ সব যাতনা" না বলিয়া এখন কবি বলিতেছেন,

হ'বে কি সে দিন,—কে করে গণনা,
যেই দিন দীনা ভারত তনয়
শিখি' রণনীতি, করি' বীরপণা,
রক্তাক্ত শরীরে ফিরিবে আলয়?

ভাবের শৈথিল্য ও ভাষার অসংযম দ্বিতীয় ভাগে স্ফুট ও প্রবলতর। প্রণয়-কবিতাগুলিতে বাসনার তীব্রতা ব্যক্ত হইয়াছে। 'কেন দেখিলাম?'

[১] প্রথমপ্রকাশ বঙ্গদর্শনে (১২৮২)। [২] 'আমার জীবন' দ্রষ্টব্য।

দৈহিক ভালোবাসা কদর্য্য বাস্তবের পর্য্যায়ে নামিয়া গিয়াছে। দুই-একটি কবিতায় লিরিক লালিত্যের পরিচয় আছে। যেমন, 'কি করি' কবিতায়,

> জ্বলিবে, নিবিবে উর্ম্মি, হাসিবে, নাচিবে,
> সেই প্রতিবিম্ব-তলে
> অনন্ত আশায় জলে,
> সেই নৃত্য সেই ক্রীড়া দেখিয়া দেখিয়া,
> আশাজলে দেহ-তরী দিব ভাসাইয়া।

ঐতিহাসিক গাথা-কাব্য 'পলাশির যুদ্ধ' (১৮৭৬)[১] প্রকাশের পর নবীনের কবিখ্যাতি সহজে প্রতিষ্ঠালাভ করিল। কাব্যটির প্রসার সর্ব্বাগ্রে হইয়াছিল পূর্ব্ববঙ্গে পাঠ্যপুস্তকরূপেও আদৃত হইতে বিলম্ব হয় নাই। প্রকাশিত হইবার এক বৎসরের মধ্যেই ঢাকা ও বরিশাল হইতে যথাক্রমে অজ্ঞাতনামার 'পলাশির যুদ্ধের ব্যাখ্যা' ও রামমোহন চক্রবর্ত্তীর 'পলাশির যুদ্ধে টীকা' বাহির হইয়াছিল।

কাব্যটি পাঁচ সর্গে লেখা। প্রথম সর্গে সিরাজের বিরুদ্ধে জগৎশেঠ-কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতির মন্ত্রণা। দ্বিতীয় সর্গে কাটোয়ায় ব্রিটিশ শিবিরে ক্লাইবের চিন্তা ও দেবী ব্রিটানিয়া কর্ত্তৃক আশ্বাস দান,

> ধর, বৎস ! এই ন্যায়পরতা-দর্পণ
> বিধিকৃত, বৃটিশের রাজ্য-নিদর্শন !

তৃতীয় সর্গে যুদ্ধের পূর্ব্বরাত্রে পলাশির মাঠে বিলাসমগ্ন সিরাজের আতঙ্ক এবং রণোৎসাহী ক্লাইবের সংশয়। চতুর্থ সর্গে পলাশির যুদ্ধ, মীরজাফরের নিমকহারামির জন্য পরাজয় এবং মুমূর্ষু মোহনলালের খেদ। মোহনলাল কবির কথাই বলিয়াছে,

> ভারতেরো নহে আজি অসুখের দিন !
> আজি হ'তে যবনেরা হ'ল হতবল,
> কিবা ধনী, মধ্যবিত্ত, কিবা দীন-হীন,
> আজি হ'তে নিদ্রা যাবে নির্ভয়ে সকল।

পঞ্চম সর্গে বিজয়ী ইংরেজের উৎসব, সিরাজের হত্যা বর্ণনা এবং কাব্যের পরিসমাপ্তি।

বায়রনের পরোক্ষ প্রভাব পলাশির-যুদ্ধের স্থানে স্থানে আছে, সেই-সময়ে

[১] বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গিত (মাঘ ১২৮২)। ঢাকায় মণ্ডলা বক্স কর্ত্তৃক মুদ্রিত বইয়ে (১৮৭৭) সংস্করণের উল্লেখ নাই।

লেখা অন্য কবিতায়ও আছে। পলাশির-যুদ্ধ ইংরেজি স্পেনসরীয় স্তবকের অনুকরণে দশ পয়ার-ছত্রবিশিষ্ট স্তবকে রচিত। চরিত্রকল্পনায় কোন বৈশিষ্ট্য নাই। লিরিক উচ্ছ্বাস কাব্যের আদ্যন্ত জুড়িয়া আছে। ছন্দে লালিত্য আছে। রচনারীতিও মন্দ নয়, তবে স্থানে স্থানে শব্দপ্রয়োগে অনৌচিত্যতা দেখা যায়। যেমন, "সকালে সকালে যদি না কর বিনাশ", "একই" (ত্র্যক্ষর), "দূরে বহিতেছে গঙ্গা রহিয়া রহিয়া", "বোধ হয় ঠিক যেন বিরল বিজন।"

রঙ্গলাল-হেমচন্দ্রের রচনায় ভারতের স্বাধীনতাহীনতার ক্ষোভ মুসলমান-শাসনের পটভূমিকায় জনান্তিকে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। পলাশির মাঠে ইংরাজের কাছে বাঙ্গালীর স্বাধীনতা বিনাশ তখনকার শিক্ষিত যুবকদের মনে যে লজ্জা জাগাইতে শুরু করিয়াছিল বাঙ্গালা কাব্যে তাহার স্পষ্ট প্রকাশ হইল নবীনচন্দ্রের পলাশির-যুদ্ধে। অবশ্য নবীনচন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে সিরাজদ্দৌলার সমর্থন করেন নাই। কেননা তখনও সিরাজের ইতিহাস একতরফাই জানা ছিল—ইংরেজ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে। প্রধানত চাকুরির খাতিরে ক্লাইবের বিরুদ্ধে কিছু বলাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। অগত্যা মোহনলালকে কাব্যের নায়ক করিয়া নবীনচন্দ্রকে দুই কুল রক্ষা করিতে হইয়াছিল। রাজপুত-ইতিবৃত্তের বকলম এড়াইয়া নবীনচন্দ্র তাঁহার কাব্যে দেশের পরাধীনতার যে মর্ম্মবেদনা ধ্বনিত করিলেন তাহা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার বিশিষ্টতার পরিচায়ক।

পলাশির-যুদ্ধের পর নবীনচন্দ্র 'ক্লিওপেট্রা' (১৮৭৭) লিখিলেন, তাহার পর স্কটের আদর্শে আখ্যায়িকা-কাব্য 'রঙ্গমতী' (১৮৮০)। কাব্যের নায়ক বীরেন্দ্রের জন্মভূমি পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি ("রঙ্গমতী")। বীরেন্দ্রের পিতা মুকুটরায় "দক্ষিণ পূর্ব্ববঙ্গে, সমুদ্রের তীরে" "মোগলের প্রতিনিধি" হইয়া "শাসয়ে সমুদ্র-রাজ্য দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে"। সপত্নীর ঈর্ষ্যায় বিতাড়িত হইয়া বীরেন্দ্রের মাতা অরণ্যে দেবমন্দিরে পলাইয়া আসেন, সেখানে বীরেন্দ্রের জন্ম হয়। বীরেন্দ্রের পাঁচ বৎসর বয়সের সময় তাহার মাতা মানসিক শোধ দিবার জন্য বারাণসী গিয়া নিরুদ্দিষ্ট হইয়া যান। মাতার বাল্যপরিচারক বৃদ্ধ শঙ্করের স্নেহে বীরেন্দ্র মানুষ হইতে থাকে। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বীরেন্দ্র মাতার অনুসন্ধানে কাশী যায়। সেখানে আর্য্যজাতির পুরাকীর্ত্তি এবং মুসলমান রাজার অপকীর্ত্তি দেখিয়া তাহার চিত্তে স্বাধীনতালিপ্সা বলবতী হয়। পোর্তুগীস-মোগলের হাত

হইতে পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে রণনীতি-শিক্ষার্থ বীরেন্দ্র মোগল সৈন্য-বাহিনীতে যোগ দিয়া মহারাষ্ট্র অভিযানে যায়। সেখানে শিবজীর হাত হইতে সেনাপতি শায়েস্তা খাঁকে রক্ষা করিতে গিয়া বন্দী হয়। শিবজীর সংস্পর্শে আসিয়া বীরেন্দ্র আর্য্যস্বাধীনতা পুনরুদ্ধারব্রতে দীক্ষিত হয়। শিবজী তাহাকে দেশে পাঠাইয়া দিয়া কহেন, আমার বাহিনী শীঘ্রই তোমার সাহায্যে যাইতেছে। কুসুমিকা বীরেন্দ্রের বাল্যসখী ও প্রণয়িনী। বীরেন্দ্র দেশে ফিরিলে উভয়ের বিবাহ হইবে এইরূপ স্থির ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে মকটরায় প্রচার করিয়াছিল যে বীরেন্দ্র জাতিত্যাগ করিয়াছে। বীরেন্দ্র দেশে আসিলে কুসুমিকার অভিভাবক মাতুল তাহার সহিত বিবাহ দিতে রাজি হয় নাই। এই পর্য্যন্ত কাব্য-কাহিনীর পূর্ব্বকথা।

প্রথম সর্গে বীরেন্দ্র শঙ্করের সঙ্গে নৌকায় চলিয়াছে। হঠাৎ ঝড় উঠিয়া নৌকা ডুবিয়া গেলে সে শঙ্করকে লইয়া নদীতে ঝাঁপ দিল এবং তীরে উঠিয়া দেখিল যে শঙ্করের কোন উদ্দেশ নাই। বীরেন্দ্র যেখানে উঠিয়াছে তাহা সুন্দরবনের প্রান্তভূমি। সেখানে এক বৃদ্ধা তপস্বিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। দ্বিতীয় সর্গে অসুস্থ বীরেন্দ্র তপস্বিনীর যত্নে প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহার কাছে নিজের জীবনকাহিনী ব্যক্ত করিল। তৃতীয় সর্গের দৃশ্য চন্দ্রশেখর-তীর্থ। কুসুমিকা দেবদর্শনে আসিয়াছে। মোহন্ত তাহার উপর অত্যাচার করিবার মন্ত্রণা করিতেছে এমন সময় বীরেন্দ্র আসিয়া কুসুমিকাকে উদ্ধার করিল। তৃতীয় সর্গের দৃশ্য রঙ্গমতী বন। বাল্যস্মৃতিপরিপূর্ণ উপবন-দৃশ্যের মধ্যে বসিয়া বীরেন্দ্র মনে মনে অতীত জীবনকাহিনীর রোমন্থন করিতেছে। অকস্মাৎ ব্যাঘ্র-কবলিত ব্যক্তির তীব্র আর্ত্তনাদে তাহার ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। বীরেন্দ্র ব্যাঘ্র মারিয়া দেখিল যে মুমূর্ষু ব্যক্তি হইতেছে চন্দ্রশেখরের সেই মোহন্ত। মোহন্তের প্রাণত্যাগ হইলে তাহার মৃতদেহের পাশে বসিয়া বীরেন্দ্র অদৃষ্টের অচিন্তনীয় পরিণতির কথা ভাবিতেছে তখন মর্কটরায় প্রেরিত পোর্তুগীস দস্যুপতি বেঞ্জামিন তাহাকে আক্রমণ করিল। বীরেন্দ্র তাহাকে পরাস্ত করিল কিন্তু প্রাণে মারিল না, যেহেতু আর্য্য-রণধর্ম্মে নিষেধ করে "ভূতলে পতিত হেন নিরস্ত্র শত্রুরে বধিতে শীতল রক্তে"। যুদ্ধান্তে বীরেন্দ্র কাঞ্চী নদীর প্রপাতের কাছে বসিয়া সেদিনের বিচিত্র ঘটনাবলীর কথা ভাবিতেছে এমন সময় মকটরায় আসিয়া তাহাকে মোগলবাহিনীতে যোগ দিতে বলিল। বীরেন্দ্র উত্তর করিল,

মুসলমানের হইয়া অস্ত্র ধরিব না, শিবজীর কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে ভারত-উদ্ধার হেতু আর্য্য-অরিগণকে নাশ করিবার জন্যই যুদ্ধ করিব। মর্কটরায় বলিল, "আর্য্য-অরি নহে কি হে মগ পর্তুগীস?" মর্কটের যুক্তিতে বীরেন্দ্রের মন ফিরিয়া গেল। মৃত মোহন্তের বস্ত্রমধ্যে প্রাপ্ত পত্র পড়িয়া মর্কট জানিল যে মোহন্ত মতলব করিয়াছিল যে তাহার সহচর ঢেঁকি পঞ্চাননের সহিত বিবাহ দিয়া সে কুসুমিকাকে উপপত্নী করিবে। এই পত্র পড়িয়া মর্কটের মাথায় নূতন ফন্দি গজাইয়া উঠিল। অন্তরাল হইতে তাহার স্বগতোক্তি বেঞ্জামিন শুনিল। সেও ইতিমধ্যে একদিন কুসুমিকাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে। বেঞ্জামিন যুদ্ধ করিতে ছুটিল। পঞ্চম সর্গের দৃশ্য রঙ্গমতী দেবমন্দির। এখানে কুসুমিকার সহিত বৃদ্ধা তপস্বিনীর মিলন হইয়াছে। তাহার কাছে বসিয়া কুসুমিকা নিজের দুঃখকাহিনী নিবেদন করিল। যুদ্ধ জয় করিয়া বীরেন্দ্র মোগলের হাতে পুরস্কার লইবে না বলিয়া ভৃত্য শঙ্করের সহিত যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িয়াছে। ষষ্ঠ সর্গে বীরেন্দ্র পার্ব্বত্য গহনে বিশ্রাম করিতেছে। অকস্মাৎ তাহার মনে পড়িল, কুসুমিকা অষ্টমী নিশাতে দেখা করিতে লিখিয়াছে। কতদূর গিয়া নারীকণ্ঠের রোদন ধ্বনি শুনিয়া বীরেন্দ্র ও শঙ্কর দ্রুতপদে গিয়া দেখিল যে এক বিবাহসভায় ঢেঁকি পঞ্চানন বর সাজিয়া বসিয়া আছে। পাশের ঘর হইতে ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া উন্মাদের মত বেগে সেখানে গিয়া বীরেন্দ্র দেখিল, কুসুমিকা অচেতন হইয়া পড়িয়া আছে,

একখণ্ড চন্দ্ররশ্মি
পড়ে আছে যেন কোনো আঁধার কুটীরে।

কুসুমিকাকে দেখিয়া বীরেন্দ্রের আবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তাহাতে তাহার বক্ষের ক্ষতস্থান হইতে রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। সে মূর্চ্ছিত হইল। মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে কুসুমিকা বীরেন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল। বীরেন্দ্র একবার চোখ চাহিয়া "মা" বলিয়া শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। সঙ্গে সঙ্গে কুসুমিকাও কালনিদ্রায় ঢলিয়া পড়িল। "একসঙ্গে দুটী ফুল পড়িল ঝরিয়া।" তপস্বিনী অবিচলনেত্রে দুইজনের মুখপানে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে অট্টহাসি হাসিয়া সে মশাল লইয়া মর্কটরায়ের মুখে চাপিয়া ধরিল। ইতিমধ্যে অতর্কিতে বেঞ্জামিন আক্রমণ করিয়াছে। উন্মাদিনী তপস্বিনী তখন সেই মশাল লইয়া ঘরে ঘরে আগুন ধরাইয়া বেড়াইতে লাগিল। রাত্রি অবসানে দেখা গেল যে অগ্নিদহনে এবং দস্যুলুণ্ঠনে "স্বপ্নশেষ রঙ্গমতী সুন্দর কানন।"

রঙ্গমতী কাব্যের কাহিনী ঐতিহাসিক নয় কবিকল্পিত। তবে মোহন্তের অত্যাচার-কাহিনীর মধ্যে বাস্তবতা কিছু থাকিতে পারে। রাঙ্গামাটীর বর্ণনায় কবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিচয় আছে। কিন্তু বর্ণনার দৈর্ঘ্যে এবং বাহুল্যে আখ্যায়িকা চাপা পড়িয়া গিয়াছে। বীরেন্দ্র তপস্বিনী শঙ্কর প্রভৃতি ভূমিকায় স্কটের ছায়া আছে। মধ্যে মধ্যে কাহিনীর পরিকল্পনার এবং কয়েকটি "গীত" বা গীতিকবিতার সংযোজনেও 'লেডি অব দি লেক'এর অনুসরণ দেখা যায়। কাব্যটি আদ্যোপান্ত অমিত্রাক্ষরে লেখা। ছন্দে মধুসূদনের ধ্বনি-তরঙ্গ ও ওজস্বিতা নাই। ভাষায় মধুসূদনের অনুকরণ সুপ্রকট। নামধাতুর ব্যবহারেও নবীনচন্দ্র মধুসূদনের পথাবলম্বী হইয়াছেন। যেমন, "নিম্মাইনু", "কলঙ্কিব", "ধ্বাণিয়া", "শান্তিব", "বিশ্রামিছে" ইত্যাদি। ক্রিয়াপদে ক্বচিৎ স্থানীয় উপভাষার পদ আছে—"কাঁদিতা", "করিতা", "লইত" ইত্যাদি। শব্দপ্রয়োগে গুরুচণ্ডালী দোষ মাঝে মাঝে আছে।

কার্য্যোপলক্ষে নবীনচন্দ্র ঐতিহাসিক স্মৃতিপূর্ণ রাজগিরে কিছুকাল যাপন করিয়াছিলেন। এখানে জরাসন্ধের স্মৃতি তাঁহাকে পুনরায় ভারতকাহিনী পাঠ করিবার প্রবৃত্তি দিয়াছিল। মহাভারত পড়িয়া এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মতত্ত্ব ও কৃষ্ণচরিত্র আলোচনা দেখিয়া নবীনচন্দ্র এক অভিনব মহাকাব্য রচনার প্রেরণা অনুভব করিলেন। আধুনিক ঐতিহাসিক মনোবৃত্তির বশে এবং "আর্য্য"-জাগৃতির তাগিদে নবীনচন্দ্র মহাভারতীয়-নাট্যের সূত্রধার শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া মহাভারত আদর্শের নূতন ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টিত হইলেন। এই প্রচেষ্টার ফলে তাঁহার কাব্যত্রয়ীর (trilogy) সৃষ্টি হয়—'রৈবতক' (১৮৮৬), 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩) এবং 'প্রভাস' (১৮৯৬)। কাব্যত্রয়ীর কেন্দ্রীয় ঘটনা যথাক্রমে সুভদ্রাহরণ, অভিমন্যুবধ এবং যদুবংশধ্বংস। মর্ম্মকথা হইতেছে নিষ্কাম কর্ম্ম ও নিষ্কাম প্রেমের ডোরে আর্য্য-অনার্য্যের রাখীবন্ধন এবং অখণ্ড হিন্দু-সংস্কৃতির পত্তন। নায়ক শ্রীকৃষ্ণ এই উদ্দেশ্য লইয়াই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার অনুকূল ছিল অর্জ্জুনের শৌর্য্য, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের মনীষা, সুভদ্রার প্রীতি এবং শৈলজার প্রেম। প্রতিকূল ছিল দুর্ব্বাসার অকারণ প্রতিহিংসা ও অভিমান এবং বাসুকির সংশয়।

রৈবতক কাব্যে বিশ সর্গ। প্রথম সর্গে অন্যমনস্ক শ্রীকৃষ্ণ দুর্ব্বাসার সম্ভাষণে প্রত্যুত্তর দিতে পারেন নাই বলিয়া দুর্ব্বাসার প্রতিহিংসাবৃত্তি জ্বলিয়া

উঠিয়াছে। সে শাপ দিল, "যাদব-কৌরবকুল হইবে বিনাশ।" দ্বিতীয় সর্গে কৃষ্ণ-অর্জ্জুনের ব্যাসের আশ্রম অভিমুখে গমন। পথে অর্জ্জুন ও সুভদ্রার পরস্পর দর্শন ও অনুরাগসঞ্চার। তৃতীয় সর্গে ব্যাস-কৃষ্ণ-অর্জ্জুন সংবাদ ও কৃষ্ণ কর্ত্তৃক অখণ্ড ভারতবর্ষ-গঠনকল্পনা—"এক ধর্ম্ম, এক জাতি, এক সিংহাসন"। চতুর্থ সর্গে দুর্ব্বাসা-বাসুকির ষড়যন্ত্র। দুর্ব্বাসা বাসুকিকে বুঝাইল, "ভণ্ড নারায়ণ" নেতা হইয়া ক্ষত্রিয়দিগকে ধরার ঈশ্বর করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছে। বাসুকি কৃষ্ণের বাল্যসখা, কিন্তু সুভদ্রার পাণিপ্রার্থনা করিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে বলিয়া সে এখন কৃষ্ণের বিপক্ষ। দুর্ব্বাসা তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে কৃষ্ণ এবং তাঁহার আশ্রিত ক্ষত্রিয় জাতি বিনষ্ট হইলেই বাসুকি সমগ্র ভারতবর্ষে অনার্য্যের মহারাজ্য স্থাপন করিতে পারিবে। পঞ্চম সর্গে সুলোচনার সহিত সত্যভামার রহস্যবিলাস। ষষ্ঠ সর্গে সুলোচনা-সত্যভামার কৌশলে সুভদ্রা-অর্জ্জুনের মিলন। সপ্তম সর্গে কৃষ্ণের বাল্যলীলাস্মৃতি। অষ্টম সর্গে বাসুকির কনিষ্ঠ ভগিনী জরৎকারুর পূর্ব্বস্মৃতি। কৃষ্ণকে প্রণয় নিবেদন করিয়া প্রত্যাখ্যাত হওয়ার বেদনা সে ভুলিতে পারিতেছিল না। জরৎকারু ভাবিয়াছিল যে কৃষ্ণের প্রত্যাখ্যানের হেতু হইতেছে "অনার্য্যের শোণিতে অধম, আর্য্যরক্ত কলুষিত করিবে না কদাচিৎ", তাই সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, "জ্বালাইলে যে শ্মশান, করিবে অনার্য্যা-প্রাণ তব তপ্ত রক্তে নিবারণ"। নবম সর্গে অর্জ্জুনের ছদ্মবেশী ভৃত্য শৈলের নীরবপ্রেমের পরিচয় এবং গোপনে পিতৃব্যপুত্র বাসুকির সহিত তাহার সাক্ষাৎ। শৈলের নিকট বাসুকি জানিতে পারিল যে অর্জ্জুন সুভদ্রার প্রেমার্থী। দশম সর্গে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সুভদ্রাকে দস্যুহস্ত হইতে রক্ষা এবং আততায়ীর কবল হইতে শৈল কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের পরিত্রাণ। একাদশ সর্গে কৃষ্ণ-সত্যভামা সংবাদ এবং অর্জ্জুনের সহিত সুভদ্রার বিবাহ-স্থিরকরণ। দ্বাদশ সর্গে ব্যাস-কৃষ্ণ সংবাদ। কৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিষ্কাম ধর্ম্মের ও অখণ্ড "মহা"ভারতের আদর্শ নির্দ্দেশ,

> আমার অনন্ত বিশ্ব ধর্ম্মের মন্দির,
> ভিত্তি সর্ব্বভূত-হিত; চূড়া সুদর্শন,
> সাধনা নিষ্কাম কর্ম্ম; লক্ষ্য নারায়ণ।

ত্রয়োদশ সর্গে দুর্ব্বাসা-বলদেব সংবাদ। মিথ্যাবাক্যে দুর্ব্বাসা পাণ্ডবদের প্রতি বলদেবের ক্রোধ জন্মাইলে বলদেব দুর্য্যোধনের হস্তে সুভদ্রাকে সমর্পণ করিতে চাহিলেন। চতুর্দ্দশ সর্গে জরৎকারুরূপী দুর্ব্বাসা ও বাসুকির

কথোপকথন। জরৎকারু বলিতেছে যে তাহার গুরু দুর্ব্বাসা সুভদ্রার বিবাহ-উপলক্ষ্যে যে কৌরব-পাণ্ডবের গৃহবিবাদ সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতে বাসুকির উদ্দেশ্য অনায়াসে সফল হইবে, "ভারতের রাজলক্ষ্মী সুভদ্রার সহ" তাহার অঙ্কগত হইবে। পঞ্চদশ সর্গে সত্যভামা রুক্মিণী সুলোচনা ও সত্যভামার বিশ্রম্ভালাপ। ষোড়শ সর্গে সত্যভামা-সুলোচনা কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের হস্তে সুভদ্রা সমর্পণ। সপ্তদশ সর্গে কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক "মহা" ভারত-আদর্শ ব্যাখ্যা,

এক ধর্ম্ম এক জাতি, একমাত্র রাজনীতি
একই সাম্রাজ্য নাহি হইলে স্থাপিত
জননীর খণ্ড-দেহ হবে না মিলিত।

অষ্টাদশ সর্গে দুর্ব্বাসা-জরৎকারুর দাম্পত্য-অশান্তির চিত্র। জরৎকারু মনের কথা চাপিয়া গিয়া স্বামীর কথায় সায় দিল এবং প্রতিজ্ঞা করিল, "অনার্য্য-রাজ্য করিব উদ্ধার।" ঊনবিংশ সর্গে অর্জ্জুনের কাছে শৈলের আত্মপ্রকাশ। নিষ্কাম প্রেমের দুরূহ ব্রতে শৈলই প্রথম সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। সে বলিল, "বিশ্ব চরাচর হবে মম পার্থময়"। বিংশ সর্গে সুভদ্রা-হরণ।

কুরুক্ষেত্র-রণে ভীষ্মের পতনের পর 'কুরুক্ষেত্র'এর আরম্ভ। প্রথম সর্গে ব্যাস ও তাঁহার শিষ্য ছদ্মবেশী শৈলের কথোপকথন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের হেতু ও পরিণতি বর্ণনা করিয়া ব্যাস ভগবদ্‌গীতা রচনা করিলেন এবং তাহা শৈলের হাত দিয়া সুভদ্রার নিকট পাঠাইয়া বলিয়া দিলেন,

যেই ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান্
সুভদ্রে! তোমাতে নিত্য, যে ধর্ম্মে দীক্ষিত
তব পতি বীরবর পার্থ মহারথী,
এই গ্রন্থে সেই ধর্ম্ম ভাষায় চিত্রিত।

দ্বিতীয় সর্গে উত্তরা অভিমন্যু এবং অভিমন্যুর ধাত্রীমাতা, সুভদ্রার সখী সুলোচনার কৌতুক-আলাপ। তৃতীয় সর্গে সুলোচনার কাছে সুভদ্রা নিজের মনের কথা বলিতেছে, "মাতৃস্নেহপূর্ণ বুকে আজি দেখিতেছি সব অভিমন্যু উত্তরা আমার!" শৈল আসিয়া সুভদ্রাকে গীতা গ্রন্থ দিয়া গেল। চতুর্থ সর্গে সুভদ্রা-অভিমন্যু সংবাদ। মাতা-পুত্র উভয়েই কৃষ্ণভক্ত এবং নিষ্কামধর্ম্মী। পঞ্চম সর্গে জরৎকারু ও বাসুকি ভ্রাতাভগিনীর মিলন এবং দুর্ব্বাসার মন্ত্রণা। দুর্ব্বাসা কুরুপাণ্ডবের শৌর্য্যকে হীন প্রতিপন্ন করিতে চাহিলে বাসুকির বীরহৃদয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। সে বলিল, যজ্ঞ-ব্যবসায়ী তুমি এই বীরত্বের মহিমা বুঝিবে না।

ষষ্ঠ সর্গে অভিমন্যু-উত্তরাকে লইয়া সুলোচনা বিরাটরাজ ও অর্জ্জুনের গার্হস্থ্য-কৌতুক,—"কুরুক্ষেত্রে পুতুল খেলা"। সপ্তম সর্গে দুর্ব্বাসার আদেশে জরৎকারু কর্ণের নিকটে গিয়া গোপনে ঋষির কাছে আসিতে বলিয়া প্রাণের টানে পাণ্ডব-শিবিরাভিমুখে চলিয়াছে কৃষ্ণের দর্শনপ্রত্যাশায়। শিবিরের দ্বারদেশে আসিলে প্রেমতন্ময়তায় সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। অষ্টম সর্গে জরৎকারুর জ্ঞানসঞ্চার হইলে সে দেখিল, সুভদ্রা তাহাকে কোলে করিয়া বসিয়া আছে এবং কৃষ্ণ পাশে থাকিয়া তাহার চক্ষে ললাটে বারিবর্ষণ করিতেছেন। কৃষ্ণ চলিয়া গেলে সুভদ্রা তাহার মনের গোপন ব্যথা জানিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল যে আর্য্য-অনার্য্যে ভেদ নাই কেন না তাহারা একই পিতার সন্তান, পার্থক্য কেবল মনুষ্যত্বের তারতম্যে, এবং

এই ধর্ম্মে মনুষ্যত্বে, আর্য্যজাতি শ্রেষ্ঠতর,
অনার্য্য হইল হীন এই হীনতায়।
তথাপি আর্য্যের ধর্ম্ম অপূর্ণ, অপূর্ণতার
জ্বলন্ত প্রমাণ এই কুরুক্ষেত্র হায়!

সুভদ্রার কথায় জরৎকারু সান্ত্বনা পাইল না, কৃষ্ণপ্রেমপিপাসায় তাহার চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত। অন্তরালে থাকিয়া কৃষ্ণ ব্যাপার বুঝিলেন। নবম সর্গে ভীষ্ম-কৃষ্ণ সংবাদ। ভীষ্ম দিব্যচক্ষে প্রেমধর্ম্মের ভবিষ্যৎ-ছবি দেখিতে পাইলেন,

গৃহে গৃহে কৃষ্ণমূর্ত্তি, হৃদয়ে হৃদয়ে!
মুখে মুখে কৃষ্ণনাম, যুগ-যুগান্তর!

দশম সর্গে কর্ণ-দুর্ব্বাসা সংবাদ। দুর্ব্বাসা কর্ণকে তাহার জন্মরহস্য জানাইল। কর্ণ পাণ্ডবদিগকে নির্ম্মূল করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে। অন্তরাল হইতে জরৎকারু দুর্ব্বাসা-চরিত্রের আরো কতকটা পরিচয় পাইল। একাদশ সর্গে অভিমন্যু-উত্তরার কথোপকথন। অভিমন্যু তাহার মাতৃকল্পা তপস্বিনী শৈলের নির্জ্জন উপাসনার কথা ব্যক্ত করিল। অভিমন্যুর শিক্ষা তিনজনের কাছে— কৃষ্ণ, শৈল এবং সুভদ্রা। তাহার মধ্যে বিশেষভাবে সুভদ্রাই তাহার জীবনের পথ দেখাইয়া দিয়াছে, "মানব-জীবন কর্ম্ম, স্বধর্ম্ম পালন।" দ্বাদশ সর্গে ব্যাস-কৃষ্ণ সংবাদ। ব্যাসের কাছে কৃষ্ণ ভবিষ্যৎ অশান্তির আভাস পাইলেন। ত্রয়োদশ সর্গে শৈল-সুভদ্রার অন্তরঙ্গ আলাপ এবং কৃষ্ণপ্রেমে উভয়ের চরিতার্থতা। চতুর্দ্দশ সর্গে যুদ্ধযাত্রার প্রারম্ভে অভিমন্যুর বিদায়গ্রহণ। ভাবী অশুভের আশঙ্কায় উত্তরা ও সুলোচনা তাহাকে যুদ্ধে যাইতে নিষেধ করিল কিন্তু

সুভদ্রা তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিল। হাত ছাড়াইয়া অভিমন্যু চলিয়া গেলে সুলোচনা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। পঞ্চদশ সর্গে অর্জ্জুনের অভিমন্যু-নিধনবার্ত্তা শ্রবণ এবং তাহার বুদ্ধির জড়তামুক্তি। গীতা শুনিয়াও যে-বীর্য্যাশ্রয়ী জ্ঞান অর্জ্জুনের হয় নাই অভিমন্যু-পতনে তাহা হইল,—"ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র বুঝিনু এখন।" ষোড়শ সর্গে সুলোচনার মৃত্যু, সুভদ্রার অসীম ধৈর্য্য এবং মৃত অভিমন্যু-সুলোচনার পার্শ্বে শৈল-সুভদ্রা-অর্জ্জুন-কৃষ্ণের ভাবসম্মিলন। সপ্তদশ সর্গে উত্তরার গভীর শোক এবং অভিমন্যুর মৃতদেহের সৎকার। চিতাগ্নির দীপ্তশিখায় মহাভারতের ছবি,

> নবধর্ম্ম-বেদি-মূলে বসিয়া দেবতাগণ—
> আর্য্য অনার্য্যের ধ্যানে, বেদি-বক্ষে নিরুপম
> নিষ্কামের মহামূর্ত্তি, তদুপরি বিরাজিতা
> জননী আনন্দময়ী, অতুলা প্রতিভাম্বিতা!
> বিদগ্ধ অধর্ম্ম-মল, রক্তবর্ণ কলেবর
> অর্দ্ধেন্দু-কিরীট শিরে, পাশাঙ্কুশ ধনুঃশর,
> —সমরাস্ত্র, শাসনাস্ত্র,—হইয়াছে শোভমান
> চারিভুজে চারিদিকে, ত্রিনেত্রে ত্রিকালজ্ঞান।
> ধর্ম্ম-সম্রাজ্ঞীর মুখ, অনন্ত মহিমা-ছবি,
> ভাসিল প্রভাতাকাশে যেন শান্ত-বাল-রবি।
> অনন্ত মানব-ব্যাপী ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান,
> নয়নে আনন্দ-অশ্রু গাহিতেছে কৃষ্ণনাম।

'প্রভাস'এর প্রথম সর্গে সত্যভামা-রুক্মিণীর সংলাপে কৃষ্ণের লীলা-সংবরণের আভাস। দ্বিতীয় সর্গে দুর্ব্বাসার চরেরা তাঁহাকে কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠিত শান্তি ও নিষ্কাম ধর্ম্মের অবস্থা জানাইতেছে। দুর্ব্বাসার সান্ত্বনা, তাহার অভিশাপ একদিন না একদিন ফলিবেই। তৃতীয় সর্গে শৈল-জরৎকারু সংবাদ। জরৎকারুর প্রেম আরো ঘনীভূত হইয়াছে। চতুর্থ সর্গে দুর্ব্বাসা কর্ত্তৃক বাসুকির প্রবঞ্চনা। পঞ্চম সর্গে প্রভাসে কৃষ্ণলীলোৎসব উপলক্ষ্যে আর্য্য-অনার্য্যের মিলন। ষষ্ঠ সর্গে কৃষ্ণান্বেষণে ভ্রাম্যমাণ জরৎকারুকে দেখিয়া যাদবগণের লালসার উদ্রেক ও আত্মকলহোৎপত্তি। সপ্তম সর্গে যদুকুলধ্বংস। অষ্টম সর্গে বলদেবের মহাপ্রস্থান ও কৃষ্ণের সহিত বাসুকির মিলন। নবম সর্গে জরৎকারু কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণে কৃষ্ণের লীলাসংবরণের পূর্ব্বে উভয়ের মিলন।

দশম সর্গে মুমূর্ষু দুর্ব্বাসার প্রতি সুভদ্রার কারুণ্য এবং দুর্ব্বাসার মুক্তি। একাদশ সর্গে বাসুকির প্রেমতন্ময়তা ও স্বর্গারোহণ। দ্বাদশ সর্গে ব্যাস-অর্জ্জুন সংবাদ। ত্রয়োদশ সর্গে অর্জ্জুনের কাছে শৈল শ্রীক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করিতেছে,

> আর্য্যদের আছে জ্ঞান, আছে শাস্ত্র আর্য্যদের,
> অনন্ত শাস্ত্র-শিক্ষক আছে ঋষিগণ,
> পতিত অনার্য্যদের কিছু নাই, কেহ নাই,
> দিও তাহাদের মুক্তি—পতিতপাবন!
> এই মন্দিরের ক্ষেত্রে আর্য্যের ও অনার্য্যের
> হইবে শ্রীক্ষেত্র, মহাসম্মিলনধাম,
> অনার্য্য ব্রাহ্মণ-আর্য্য গাবে এক কৃষ্ণ নাম—
> আর্য্য ও অনার্য্য এক প্রেমে ভাসমান,—
> প্রতিধ্বনি তুলি সিন্ধু গাবে হরিনাম।

রৈবতকের পরিকল্পনায় আদর্শ ছিল গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্ম। ইতিপূর্ব্বে বঙ্কিম-চন্দ্র এই নিষ্কাম কর্ম্মের আদর্শের সঙ্গে কঁতের মানব-হিতবাদ মিলাইয়া তাঁহার কৃষ্ণচরিত্রের খসড়া করিয়াছিলেন। সাক্ষাৎভাবে না হউক পরোক্ষভাবেও নবীনচন্দ্র তাঁহার পরিকল্পিত কৃষ্ণচরিতের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের নিকটেই ঋণী। বঙ্কিম বৃন্দাবনলীলাকে বাদ দিয়াছেন, নবীন তাহা করেন নাই। অবশ্য বৃন্দাবনলীলা নবীনের কাব্যে মুখ্য স্থান পায় নাই, রাধারও উল্লেখ নাই। বঙ্কিমের নিষ্কাম ধর্ম্ম বিশুদ্ধ জ্ঞানের ধর্ম্ম, তাহাতে ভক্তির উচ্ছ্বাসের স্থান নাই। নবীনচন্দ্রের কাব্যে ব্যাখ্যাত নিষ্কামধর্ম্মে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের নামাশ্রয়ী প্রেমবিহ্বলতা বড় স্থান অধিকার করিয়াছে। রৈবতকে প্রেমবিহ্বলতার তেমন চিহ্ন নাই বটে কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি নবীনচন্দ্রের যে টান ছিল, তাহা পরে (সম্ভবত গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রভাবে) কুরুক্ষেত্রে প্রভাসে বলবত্তর হইল। কুরুক্ষেত্র-প্রভাসের প্রধান প্রধান কয়েকটি ভূমিকায় যে কৃষ্ণভক্তিরসাতুরতা দেখা যায় তাহা নিশ্চয়ই গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলির প্রভাবের ফল।

আর্য্য-অনার্য্য জাতির সম্মিলন হইতেছে নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয়ীর মূলবস্তু। ইহা মহাকাব্যোচিত মহৎ ও প্রশস্ত বটে। কিন্তু আখ্যান-বস্তুর পরিকল্পনায় এবং রচনায় সে মহত্ত্ব রক্ষিত হয় নাই। আর্য্য-অনার্য্য সংঘাতের যে চিত্র নবীনচন্দ্র তাঁহার কাব্যত্রয়ীতে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে ঐতিহাসিক সত্যের মর্য্যাদা প্রায়ই অক্ষুণ্ন নাই। তাহাতে অবশ্য আসিয়া যায় না যদি কাব্যের মর্য্যাদা ঠিক থাকে। কিন্তু কাব্যের মর্য্যাদাও লেখক রাখিতে পারেন নাই।

নবীনচন্দ্র অনার্য্যকে বরাবর কৃপাদৃষ্টিতে দেখিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহার কাব্যের অনার্য্য পাত্র-পাত্রীরাও সর্ব্বদা স্মরণে রাখিয়াছে যে তাহারা আর্য্যের কাছে হীন। ইতিহাস একথা সত্য বলিয়া মানে না। এবং কাব্যে এই হীনতাবোধ আর্য্য নায়ক-নায়িকাদিগের চরিত্রমাহাত্ম্য খর্ব্ব করিয়াছে। বাসুকি-চরিত্রের অঙ্কনে লেখক সহানুভূতিনিষেকে কার্পণ্য করেন নাই, তথাপি একথা বলিতে পারি না যে বাসুকি মধুসূদনের রাবণের মত a grand fellow। সুভদ্রার কাছে শৈল এবং জরৎকারুকে নত হইতে হইয়াছে, কিন্তু তাহা সুভদ্রার ব্যক্তিত্বের জন্য নয়, তাহার আর্য্য-রক্তের জন্য। কাব্যের দিক দিয়া শৈলের ভূমিকা সুভদ্রার অপেক্ষা ভালো।

কাব্যত্রয়ীতে পুরুষ-ভূমিকার তুলনায় নারী-ভূমিকা স্ফুটতর। তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে তিনটি—সুভদ্রা শৈলজা এবং জরৎকারু। সুভদ্রার ভূমিকায় পৌরাণিকত্ব সম্পূর্ণভাবে বিসর্জ্জিত হইয়াছে। সুভদ্রা যেন দ্বিতীয় ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল, কুরুক্ষেত্র-রণক্ষেত্রে আহতের পরিচর্য্যা তাহার একমাত্র ব্রত। ইহাতেও আপত্তি ছিল না যদি তাহার এই মানবসেবা-প্রবৃত্তির বিকাশের একটা হেতু বা পূর্ব্বাভাস দেওয়া হইত। সুভদ্রা যত না হউক, শৈলজার এবং জরৎকারুর ভূমিকা সম্পূর্ণভাবে ইংরেজি রোমান্সের আদর্শে গড়া। সুলোচনা একেবারে বাঙ্গালী ঘরের বিধবা ঝিউড়ী। তাহার রসিকতা ও ছেলেমানুষি কাব্যের রসহানি ঘটাইয়াছে। পুরুষ চরিত্রের মধ্যে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন এই দুই প্রধান ভূমিকায় ব্যক্তিত্বের অত্যন্ত অভাব। কৃষ্ণ মানুষও নহেন দেবতাও নহেন—যেন একজন আধুনিক স্বপ্নবিলাসী দার্শনিক জননায়ক। অভিমন্যু দ্বিতীয় প্রহ্লাদ, তাহার উপর স্যর ফিলিপ সিড্‌নিও বটে। কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে উত্তরার ও সুলোচনার সঙ্গে ছেলেমানুষির সুদীর্ঘ বর্ণনা অভিমন্যু-ভূমিকাকে ফুটিয়া উঠিতে দেয় নাই। পুরুষ-ভূমিকার মধ্যে প্রধান হইতেছে দুর্ব্বাসা। নবীনচন্দ্র এই ঋষি-চরিত্রকেও একেবারে মাটি করিয়া দিয়াছেন। দুর্ব্বাসা কখনো চক্রান্তকারী পাষণ্ড কখনো ধূর্ত্ত প্রবঞ্চক, এবং কখনো বিকৃতবেশী বিদূষক। পৌরাণিক দুর্ব্বাসার ক্রোধোদ্দীপ্ত গম্ভীর মহিমা নবীনচন্দ্রের লেখায় চকিতের দেখাও দেয় নাই। বাসুকি পুরুষ-ভূমিকার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ব্যাসের অপ্রধান ভূমিকাও মন্দ নয়। আকাশের অথবা চাঁদের পানে চাহিয়া থাকা এবং মূর্চ্ছিত হইয়া পড়া অধিকাংশ পাত্রপাত্রীর রোগ। ইহাও বোধ করি রঙ্গমঞ্চের প্রভাবজনিত।

নবীনচন্দ্র তাঁহার কাব্যত্রয়ীতে ছন্দোবৈচিত্র্য আনিতে চেষ্টা করিলেও অমিত্রাক্ষর পয়ারে তিনি কিছুমাত্র উৎকর্ষ দেখাইতে পারেন নাই, মিত্রাক্ষরেও কোন বৈশিষ্ট্য নাই। নূতনত্বের মধ্যে দীর্ঘায়িত (ষোড়শাক্ষর) পয়ারের প্রাধান্য। রচনারীতিতে যথেষ্ট শৈথিল্য। একই শব্দের একসঙ্গে বার বার প্রয়োগ অত্যন্ত শ্রুতিকটু। লঘুতার বাহুল্য এবং বিশেষ করিয়া সুলোচনার কৌতুকচাপল্য কাব্যত্রয়ীর বিষয়মহত্ত্বের হানি করিয়াছে। নবীনচন্দ্রের রসবোধ জাগ্রত থাকিলে তিনি কুরুক্ষেত্রের ষষ্ঠ সর্গ নিশ্চয়ই লিখিতেন না।

রঙ্গমতীর পর নবীনচন্দ্র যে কাব্যগুলি রচনা করিলেন তাহা সবই অবতার-মহাপুরুষ-জীবনী-ঘটিত অথবা ধর্ম্মসংক্রান্ত। যীশুখ্রীষ্টের জীবনী লইয়া 'খৃষ্ট' (১২৯৭) লেখা। 'অমিতাভ'[১] (১৩০২) বুদ্ধের জীবনী। 'অমৃতাভ' (১৩১৬, দ্বি-স ১৩২৪) কাব্যে শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ-লীলাকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। নবীনচন্দ্র ভগবদ্গীতার (১৮৮৯) এবং মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীরও (১৮৯৪) পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন।

নবীনচন্দ্রের প্রথম গদ্য রচনা 'প্রবাসের পত্র' (১৮৯২)। 'ভানুমতী' (১৩০৭) গদ্য আখ্যায়িকা। মধ্যে মধ্যে পদ্যও আছে। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামে যে ভীষণ ঝড় হইয়াছিল তাহার পরিবেশে ভানুমতী-আখ্যায়িকার পরিকল্পনা। নবীনচন্দ্রের ধর্ম্মমত যে বিশেষ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের দিকে ঝুঁকিয়াছিল তাহার পরিচয় এই বইটিতে আছে। নবীনচন্দ্রের আত্মজীবনী পাঁচ খণ্ড 'আমার জীবন' (১৩১৪-২০) আর কিছু না হোক কৌতুকপ্রদ এবং সুপাঠ্য।

নবীনচন্দ্রের কাব্যে মধ্যে মধ্যে গীতিকবিতার সুর ঝঙ্কৃত হইয়াছে কিন্তু সাধনার ও সংযমের অভাবে তাহা নিরর্থ উচ্ছ্বাসের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে। রচনা-রীতিতেও পারিপাট্যের অভাব আছে॥

৫

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (১৮৫০-৯৮) বাঙ্গালা সাহিত্যে রোমান্টিক আখ্যায়িকা-কাব্য ও গাথা-কবিতার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ইঁহার অনেককাল পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র একটি গাথা-জাতীয় কবিতা লিখিয়াছিলেন, 'ললিতা' (১৮৫৬)। কিন্তু এটির

[১] প্রথম প্রকাশ (অংশত) 'বুদ্ধদেব' নামে জন্মভূমিতে।

সহিত নব-প্রবর্ত্তিত গাথা-কাব্যের বিশেষ সম্পর্ক নাই। অক্ষয়চন্দ্রের অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী, নবীনচন্দ্র সেন ও ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আখ্যায়িকা-কাব্য ও গাথা-কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। যে সাহিত্যগোষ্ঠীর পরিমণ্ডলে বালক রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা বিকাশের অবকাশ পাইয়াছিল সেখানে অক্ষয়চন্দ্রের প্রভাব বোধ হয় সর্ব্বোপরি ছিল। রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা 'বনফুল' প্রভৃতি কাব্যে বিহারীলালের প্রভাব আছে কচিৎ রচনারীতিতে, কিন্তু আখ্যানবস্তুর পরিকল্পনায় জাজ্বল্যমান দেখি অক্ষয়চন্দ্রের প্রভাব। যে উদাসিনী কাব্য এককালে রবীন্দ্রনাথ, নবীনচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র প্রমুখ কবিদিগকে নূতন প্রেরণা দিয়াছিল সে কাব্য ও কবির কথা সাহিত্য-রসিকেরা এখন ভুলিয়া গিয়াছেন। শুধু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতিতে এই বিস্মৃত কবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,

> বাল্যকালে আমার কাব্যালোচনার মস্ত একজন অনুকূল সুহৃদ জুটিয়াছিল। ৺অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় জ্যোতিদাদার সহপাঠী বন্ধু ছিলেন। তিনি ইংরেজিসাহিত্যে এম. এ.। সাহিত্যে তাঁহার যেমন বুৎপত্তি তেমনি অনুরাগ ছিল। বায়রন্ এবং সেকস্পীয়রের রসে তিনি আগাগোড়া রসিয়া উঠিয়াছিলেন। অপর পক্ষে বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণবপদকর্ত্তা, কবিকঙ্কণ, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, হরুঠাকুর, রাম বসু, নিধুবাবু, শ্রীধর কথক প্রভৃতির প্রতি তাঁহার অনুরাগের সীমা ছিল না। বাংলা কত উদ্ভট গানই তাঁহার মুখস্থ ছিল।…
>
> আনন্দ উপভোগ করিবার শক্তি ইঁহার অসামান্য উদার ছিল। প্রাণ ভরিয়া রস গ্রহণ করিতে ইঁহার কোন বাধা ছিল না এবং মন খুলিয়া গুণগান করিবার বেলায় ইনি কার্পণ্য করিতে জানিতেন না। গান এবং খণ্ডকাব্য লিখিতেও ইঁহার ক্ষিপ্রতা অসাধারণ ছিল। অথচ নিজের এই সকল রচনা সম্বন্ধে তাঁহার লেশমাত্র মমত্ব ছিল না। কত ছিন্ন পত্রে তাঁহার কত পেন্সিলের লেখা ছড়াছড়ি যাইত সেদিকে খেয়ালও করিতেন না। রচনা সম্বন্ধে তাঁহার ক্ষমতার যেমন প্রাচুর্য্য তেমনি ঔদাসীন্য ছিল। 'উদাসিনী' নামে ইঁহার একখানি কাব্য তখনকার বঙ্গদর্শনে[১] যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। ইঁহার অনেক গান লোককে গাহিতে শুনিয়াছি, কে যে তাহার রচয়িতা তাহা জানেও না।

'বাল্মীকি প্রতিভা'র (১৮৮১) কয়েকটি গান যে অক্ষয়চন্দ্রের রচনা এ কথা রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে বলিয়া গিয়াছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কোন কোন নাটকের কয়েকটি গানও অক্ষয়চন্দ্রের রচনা বলিয়া মনে করি।

'উদাসিনী' (১৮৭৪) কাব্যে রচয়িতার নাম ছিল না। কাব্যের

[১] জ্যৈষ্ঠ ১২৮১।

আখ্যানবস্তু কতকটা পার্নেলের 'দি হার্মিট' কাব্যের মত। একদা এই ইংরেজী কবিতাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার পাঠ্য ছিল, সেইজন্য ইহার অনেকগুলিই বঙ্গানুবাদ বাহির হইয়াছিল। এই অধুনা-অজ্ঞাত উদাসিনী কাব্যটির পরিচয় দিই।

প্রথম সর্গের দৃশ্য কিন্নর-কানন, সময় রাত্রি দ্বিপ্রহর। জটিল অরণ্যে পথহারা পথিক বনদেবীর সাক্ষাৎ পাইয়া আশ্বস্ত হইয়াছে। উভয়ে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখে, এক তরুণী প্রজ্বলিত চিতাগ্নিতে আত্মবিসর্জ্জন করিতে উদ্যত। আগন্তুকদের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তরুণী সরলা আত্মহত্যা হইতে আপাতত বিরত হইয়া নিজের করুণ কাহিনী তাহাদিগকে শুনাইল। দ্বিতীয় সর্গ হইতে সপ্তম সর্গের প্রথমাংশ পর্য্যন্ত সরলার আত্মকথা।

বিদর্ভের রাজ্যচ্যুত রাজা বিজয় কন্যা সরলাকে লইয়া সুরধুনী-তটে কুটীর বাঁধিয়া অজ্ঞাতবাস করিয়াছে। সরলার বয়স যখন চৌদ্দ তখন একদিন তাহার পিতা রোগে পড়িল। বাধ্য হইয়া সরলা বাহির হইল পথ্যের সন্ধানে। দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া সে গঙ্গাতীরে আসিয়া বসিল এবং ক্লান্তিভরে ঘুমাইয়া পড়িল। এমন সময় গঙ্গায় বান ডাকিল। যুবক সুরেন্দ্র দূর হইতে দেখিয়া সরলাকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাকে কুটীরে পৌঁছাইয়া দিল। সুরেন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সরলার পিতা দেহত্যাগ করিল। সুরেন্দ্র মৃতদেহের সৎকার করিয়া এবং সরলার সহিত অঙ্গুরীয় বিনিময় করিয়া কার্য্যব্যপদেশে চলিয়া গেল। সুরেন্দ্র আর ফিরে না দেখিয়া সরলা তাহার পিতার পূর্ব্ব-উপদেশ অনুসারে সে-দেশের রাজার কাছে গিয়া তাহার পিতার লেখা চিঠি দিল। পত্রে তাহাদের পরিচয়বৃত্তান্ত ছিল। রাজা কিছু না বলিয়া সরলাকে সমাদরে অন্তঃপুরে স্থান দিল। রাজবাড়ীর আদরযত্ন সত্ত্বেও সরলা সুরেন্দ্রের জন্য ব্যাকুল হইয়া রহিল।

একদিন অন্তঃপুরের নিভৃত উদ্যানে সরলা ও সখী সুলোচনা বেড়াইতেছে। তাহাদের

আঁচল লাগিয়ে গায়, ঝর ঝর ঝরে যায়
গোলাপের শিশির আসার।
কামিনীর পাপ্‌ড়ীগুলি নিঃশব্দে পড়িছে খুলি
উড়ে যায় অলি চারিধার॥

গন্ধরাজ ফুলে ডালে, কখন উড়ায়ে ফ্যালে,
অগুচ্ছ কুন্তলে সমীরণ।
প্রজাপতি উড়ে এসে, বসিছে কপোলদেশে,
কখন বা আটকে নয়ন॥

সুলোচনা সরলাকে গান শুনাইয়া ভুলাইতে ও রাজার ছেলের প্রতি তাহার মন আকৃষ্ট করিতে চেষ্টিত হইল। রাজপুত্র সরলাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে। কিন্তু সরলা বরং আজীবন সন্ন্যাসিনী হইয়া থাকিবে তবু তাহাকে বিবাহ করিবে না। সুলোচনা চলিয়া গেলে সরলা একেলা সেখানে বসিয়া আছে এমন সময় অলক্ষিতে সুরেন্দ্র আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইল এবং রাত্রি গভীর হইবার পূর্ব্বেই গোপনে উদ্যান পরিত্যাগ করিল।

সরলা ঘুমাইয়া দুঃস্বপ্ন দেখিতেছে। সুলোচনা আসিয়া তাহাকে জাগাইল। তাহার কাছে সরলা জানিতে পারিল যে উদ্যান হইতে পলাইবার সময় সুরেন্দ্র রাজপুত্রের হাতে ধরা পড়িয়াছে এবং শীঘ্রই তাহার মৃত্যুদণ্ড হইবে। সরলা রাজপুত্রের কাছে ছুটিয়া গেল এবং বন্দীকে ছাড়িয়া দিলে তাহার পাণিগ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইল। রাজার ছেলের সঙ্গে সরলার বিবাহের সব ঠিকঠাক হইয়া গেলে রানী তাহার আসল পরিচয় জানাইয়া তাহাকে তাহার পিতার পত্র পড়িতে দিল। পত্র পড়িয়া সরলার হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিল। অবশেষে বিবাহরাত্রি উপস্থিত হইল। সুলোচনা সরলাকে গান শুনাইতে লাগিল।

সরলা উদ্যানে আসিয়া অশোক গাছের গুঁড়িতে সুরেন্দ্রের লেখা কবিতা পড়িয়া জানিতে পারিল যে সুরেন্দ্র তাহার জন্য বিবাগী হইয়া গিয়াছে। সরলাও সেই পথ অবলম্বন করিবে ভাবিয়া তখনি প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া পলাইল। ঘুরিতে ঘুরিতে বনে আসিয়া সে বুঝিতে পারিল যে তাহার পূর্ব্বে সুরেন্দ্র সেখান দিয়া গিয়াছে। কিছু দূর গিয়া সরলা দেখিল, মানুষের হাড় পড়িয়া আছে এবং নিকটে রহিয়াছে "স্বর্ণময় কৌটা" ও "শঙ্কর-মূর্ত্তি অঙ্গুরী" যাহা সে সুরেন্দ্রকে দিয়াছিল। ইহা হইতে সে ধারণা করিল যে সেগুলি সুরেন্দ্রেরই অস্থি। হাড়গুলির উপর চিতাগ্নি জ্বালাইয়া সরলা নিজেকে আহুতি দিতে যাইবে এমন সময় আগন্তুকেরা আসিয়া বাধা দিল। সরলার বৃত্তান্ত শুনিয়া বনদেবী তাহাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিলেন। ঝড়বৃষ্টিতে চিতাগ্নি নিবিয়া গেল। তখন তিনজনে সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

অষ্টম সর্গের দৃশ্য "হিমালয় প্রদেশ"। বনদেবী, সরলা ও পথিক হিমালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। হিমালয়ের বর্ণনা,

একি রে অদ্ভুত সৃষ্টি! দেখে লাগে ভয়,
হৃদয়ে শোণিতস্রোত স্তব্ধ হয়ে রয়।
উর্দ্ধে বা পশ্চিমে পূর্ব্বে দিগন্ত প্রসারি,
অনন্তের প্রতিমূর্ত্তি রয়েছে বিস্তারি।
শৃঙ্গের উপরে শৃঙ্গ বেড়ে বেড়ে যায়,
দেখিতে দেখিতে দৃষ্টি আকাশে মিশায়।
নিবিড় নীরদ-জাল—ভেদ করি তায়,
উঠেছে অচল-রাজ কে জানে কোথায়!

হিমালয়ের তুঙ্গমহিমা ভারতের বর্ত্তমান অধঃপতনের শোচনীয়তা গাঢ়তর করিয়াছে কবির চিত্তে।

তুমিই কি হিমাচল—ওহে ধরাধর,
তোমারি বিশাল যশে পূর্ণ চরাচর?
কহ হে নগেন্দ্র! তবে কিসের লাগিয়ে
এখনো উন্নতশিরে আছ দাঁড়াইয়ে?
এত দেখে এত সয়ে—একি চমৎকার,
সরমে আনত মুখ হ'ল না তোমার।
এই যে ভারতভূমি—বৈজয়ন্ত ধাম,
আজন্ম তোমার পদে রয়েছে শয়ান—
কেমনে পাষাণ! কহ কি চিন্তা চিন্তিয়ে
কি দশা হয়েছে তার দেখ না চাহিয়ে।
এক দৃষ্টে চৌদ্দ লোক কর দরশন,
কহ তবে ভারতের সৌভাগ্যতপন—
রয়েছে ডুবিয়ে কোথা? আহ্বানো তাহায়,
ভারতের অমানিশা সহা নাহি যায়!

গোমুখীতে আসিয়া তাহারা গভীর তপস্যারত এক সন্ন্যাসীকে দেখিল। তাহার মুখের পানে চাহিয়াই সরলা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। সন্ন্যাসী তখন গঙ্গাস্তব পড়িতেছে। সন্ন্যাসীর কাছে সরলাকে রাখিয়া বনদেবী পথিকের সঙ্গে জলপাত্রের সন্ধানে গেলেন। সন্ন্যাসী সুরেন্দ্র। সে মূর্চ্ছিত সরলার কাছে আসিয়া তাহাকে চিনিতে পারিয়া চুম্বন করিল। মূর্চ্ছা ভাঙ্গিলে সরলা তাহার দেওয়া আংটি দেখিতে চাহিল। সুরেন্দ্র বলিল কিন্নরকাননে এক দস্যু তাহা অপহরণ করিয়া লইয়া যাইবার সময় বাঘের কবলে পড়িয়াছিল, তাহার পর কি হইয়াছে তাহা সে জানে না। বনদেবী ও পথিক ফিরিয়া আসিয়া

তাহাদের মিলন দেখিয়া সুখী হইল এবং তাহাদের বিবাহ দিবার যোগাড় করিল। দশম সর্গে বনদেবী নিজের আসল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রতিদেবী হইলেন।

হের হের ওই দেখিতে দেখিতে
কি শোভা উদয় মেদিনী মাঝে,
বনদেবী ওই দেখরে চকিতে
রতিদেবী রূপে সম্মুখে রাজে।

বসন্তের শোভাসম্ভারের আয়োজনে সুরেন্দ্র-সবলার বিবাহ হইয়া গেল।

অক্ষয়চন্দ্র পোপ্-এর 'এলোইস টু আবেলাড' অবলম্বনে 'মাধবমালতী' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।[১] ভারতবর্ষের ধারাবাহিক ইতিহাস অবলম্বনে অক্ষয়চন্দ্র 'ভারতগাথা' (দ্বি-স ১৯০০) কাব্য লিখিয়াছিলেন পাঠ্যগ্রন্থরূপে ব্যবহৃত হইবার উদ্দেশ্যে। একান্তভাবে বর্ণনাত্মক এই ক্ষুদ্র কাব্যটিতে মধ্যে মধ্যে সহজ কবিত্বের পরিচয় আছে। যেমন,

মোগল-সাম্রাজ্যখান　　বজ্র যার উপাদান
অথচ সৌন্দর্য্যে যেন ইন্দ্রধনুময়—
শৌর্য্যের কঠোর ক্ষেত্র,　　অথচ বিমোহি নেত্র—
বিলাসের উৎস হ'তে শতধারা বয়—
দিল্লী যার রাজধানী—　　(হৈমবতী পুরীখানি)
ভারত-ললাটে যেন দীপ্ত 'কহিনূর'—
সেই সে সাম্রাজ্যখান　　হোয়ে কিনা খান খান
ছড়ায়ে পড়িল যেন বিচূর্ণ মুকুর।

ভারতীতে অক্ষয়চন্দ্রের কয়েকটি গীতিকবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে একটি 'অভিমানিনী নির্ঝরিণী' রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্ন-ভঙ্গ' কবিতার সঙ্গে 'প্রভাতসঙ্গীত'এর প্রথম সংস্করণে (১৮৮৩) স্থান পাইয়াছিল।

অক্ষয়চন্দ্রের লেখার প্রধান গুণ অনায়াসসারল্য ও স্বচ্ছতা। গীতিকাব্যোচিত অনুভূতি এবং তাহার অকৃত্রিম প্রকাশও বিরল নহে। নিম্নে উদ্ধৃত অভিমানিনী নির্ঝরিণীর শেষ অংশ হইতে অক্ষয়চন্দ্রের গীতিকবিতার বিশেষত্বের পরিচয় মিলিবে।

[১] অল্প কিছু অংশ জ্ঞানাঙ্কুরে বাহির হইয়াছিল (পৌষ ১২৮২)।

দেখিব বিকায়ে হিয়ে
পরাণ-সর্ব্বস্ব দিয়ে
গম্ভীর সাগর-প্রেম পাওয়া কিনা যায়!
দেখিব এ দগ্ধ হৃদি নাহি কি জুড়ায়!
না জুড়াক মন প্রাণ,
নাই পাই প্রতিদান,
জ্বলন্ত যাতনে হৃদি হোক দগ্ধপ্রায়,
তবুও উজানে ফিরে
যেতে সাধ হয় কিরে!
প্রাণ মন বিসর্জ্জিয়ে রহিব হেথায়,
যাহাতে মিশেছি প্রেমে মিশিব তাহায়।

ভারতীতে (মাঘ ১২৮৬) প্রকাশিত 'সরস্বতী আহ্বান' কবিতাটি অক্ষয়চন্দ্রের রচনা বলিয়াই মনে করি। ফাল্গুন সংখ্যায় (ঐ) প্রকাশিত 'বুদ্ধদেবের স্বপ্নভঙ্গ'ও ইঁহার লেখা হওয়া সম্ভব। ভারতীতে 'সম্পাদকের বৈঠক' শীর্ষকে যে ইংরেজি কবিতার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইত তাহার অনেকগুলিও অক্ষয়চন্দ্রের লেখা। অক্ষয়চন্দ্র কতকগুলি ভালো গান লিখিয়াছিলেন। একটি উদ্ধৃত করিতেছি।

নিতান্ত না রইতে পেরে দেখিতে এলেম আপনি,
দেখ আর না দেখ আমায় দেখিব ও মুখখানি!
মনে করি আসিব না, এ মুখ আর দেখাব না,
না দেখিলে প্রাণ কাঁদে, কেন সে তা নাহি জানি!
এসেছি দিব না ব্যথা, তুলিব না কোন কথা,
সাধিব না কাঁদিব না, রব অমনি!
যেথা আছ সেথাই থাক, আর কাছে যাব নাক,
চোখের দেখা দেখ্‌ব শুধু, দেখেই যাব এখনি![১]

অক্ষয়চন্দ্রের কবিপ্রকৃতি ছিল যেমন ইমোশনাল রসগ্রহণ ক্ষমতাও ছিল তেমনি উদার। ইংরেজি সাহিত্যে তাঁহার অধিকার ছিল সুনিবিড়, অথচ রামপ্রসাদের গান শুনিতে শুনিতে তাঁহার চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইত—যদিও প্রচলিত ধর্ম্মসংস্কারে তাঁহার খুব আস্থা ছিল না। মাইকেলের সঙ্গে এই পর্য্যন্ত অক্ষয়চন্দ্রের মিল, অমিল হইতেছে এই যে নিজের রচনার প্রতি অক্ষয়চন্দ্রের মনোযোগ ও মমতা কিছুমাত্র ছিল না। থাকিলে বোধ করি ভালো হইত।

[১] সরলা দেবী সঙ্কলিত শতগান (তৃ-স ১৩৩০) পৃ ৯৮।

অক্ষয়চন্দ্রের পত্নী শরৎকুমারী চৌধুরাণী (?-১৯২০) সুলেখিকা ছিলেন। ইঁহার চমৎকার গার্হস্থ্য-চিত্রগুলি সাধনায় ভারতীতে ও নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শনে বাহির হইয়াছিল। কতকগুলি প্রবন্ধের সঙ্কলন 'শুভবিবাহ' (১৩১২) উপভোগ্য বই॥

৬

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৬-১৮৯৭) হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইঁহার কাব্যগ্রন্থ হইতেছে 'চিত্ত-মুকুর' (১২৮৫), 'বাসন্তী' (১৮৮০), 'যোগেশ-কাব্য' (১৭৮১) ও 'চিন্তা' (১৮৮৭)। প্রধানত ঈশানচন্দ্রের উদ্যোগে ১৩০০ সালে হুগলী হইতে 'পূর্ণিমা' বাহির হইতে থাকে। ইহাতে ইঁহার গদ্য ও পদ্য রচনা এবং 'সুধাময়ী' উপন্যাস (অসম্পূর্ণ) প্রকাশিত হইয়াছিল (১৩০১-০২, ১৩০৪)।

চিত্তমুকুরে তেইশটি কবিতা আছে।[১] প্রথম কবিতা 'কলঙ্কী জয়চন্দ্র'এ নবীনচন্দ্রের পলাশির-যুদ্ধের প্রভাব অনুভূত হয়। কয়েকটিতে হেমচন্দ্রের ক্ষীণ অনুকৃতি আছে। তবে অধিকাংশ কবিতায়ই ঈশানচন্দ্রের কাব্যের বিশিষ্ট সুর, অকৃতার্থ প্রেমের বেদনা, শোনা যায়। চিত্ত-মুকুরে এই সুর বেশ স্পষ্ট। নবীনচন্দ্রের কবিতার তুলনায় ঈশানচন্দ্রের কবিতায় আন্তরিকতা এবং কাব্যানুভূতি অনেক পরিমাণে খাঁটি। যেমন 'কে গাহিল' কবিতায়

শুনিলাম—কিন্তু কভু শুনিব না আর
সুধুই হারানু চিত্ত সঙ্গীত শ্রবণে,
সুখের পিপাসা চিত্তে কেন দুনিবার,
সাধের সামগ্রী কেন দুর্লভ জীবনে ?

চিন্তার কবিতা সংখ্যা চৌত্রিশ।[২] চিন্তার কোন কোন কবিতায় গীতি-উচ্ছ্বাসের প্রকাশ আরো অকৃত্রিম। এমন কি যেন রবীন্দ্রনাথের কৈশোর-রচনার ধ্বনি শোনা যায়। যেমন 'আমার প্রাণ' কবিতায়

জীবন্ত স্বপন যেন অনন্ত গগন-বক্ষে
পড়েছে ছড়ায়ে !
স্থাবর জঙ্গম জীব সকলি মোহেতে যেন,
নয়ন মেলায়ে !
আশার মধুর স্মৃতি, যেন আজ বিশ্বখানি—
আবেশে অচল।

১ অনেকগুলি এডুকেশন-গেজেটে ও বান্ধবে প্রথম বাহির হইয়াছিল।

২ এগুলি বঙ্গদর্শন ভারতী বান্ধব ইত্যাদি পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

বিধির প্রথম সৃষ্টি, মধুর আলোক যেন,
ভুবন উজ্জ্বল।
কল্পনে! বারেক আজ, বুকের পাষাণখানি,
দেও সরাইয়া।
শূন্যপথ ভাসাইয়া, জনস্রোত মাতাইয়া,
এই জোৎস্নার সনে যাই মিশাইয়া।

'যোগেশ' রোমান্টিক প্রেমের আখ্যায়িকা, বারো সর্গে গাঁথা। তবে কাহিনী-অংশ যৎসামান্য, গীতি-উচ্ছ্বাসই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। আদ্যন্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা। যতি প্রায়ই পয়ারের মত, অর্থাৎ পংক্তির শেষে প্রধান যতি। ঈশানচন্দ্র হেমচন্দ্রের মত পুরাপুরি মিলহীন পয়ার মাত্র রচনা করেন নাই। ছন্দের অনুরোধে প্রায়ই যুক্ত-ব্যঞ্জন বিশ্লিষ্ট হইয়াছে (যেমন, "গরভে", "পারশে", "চরমে")। কয়েকটি গান আছে। রচনারীতি সরল। পিতৃ-আত্মার আবির্ভাবে ও পরলোকের দৃশ্যে হেমচন্দ্রের প্রভাব দেখা যায়। "সুদীর্ঘ নিশ্বাস জ্বলন্ত পাবক মত বহিল নাসায়"—ইহাও হেমচন্দ্রের অনুকরণ। যোগেশের মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্তে আনমনে নর্ম্মদার সিঁথির সিঁদুর মুছিয়া ফেলা মধুসূদনের অনুকরণ। পঞ্চম সর্গে মধুসূদনের অনুকরণে বাগ্‌দেবী আহূত হইয়াছে নর্ম্মদার ও মন্দাকিনীর রূপবর্ণনার জন্য। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিম-মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনের নাম আছে। তাহার পর কবি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে জানি যে কবির নিজের অন্তর্দ্বন্দ্বই যোগেশের মর্ম্মান্তিক হৃদয়বেদনায় রূপান্তরিত,[১]

অকূল সাগরে পড়ি শিশুকাল হ'তে
তরঙ্গে তরঙ্গে বক্ষঃ গিয়াছে ভাঙ্গিয়া,
ভুজঙ্গ-গরল হ'তে তীব্রতর বিষ
বহিতেছে হৃদয়ের শিরায় শিরায়।
অনলে গরলে বক্ষঃ জ্বলিয়া ডুবিয়া
কি যে হইয়াছে এই প্রাণের ভিতর,
বর্ণিব কি, তাহা তব নহে অগোচর।

যোগেশ শিক্ষিত ভদ্র যুবক। সে

সততার চিত্রপট—নীতির দর্পণ,
মহত্ত্বের লীলাভূমি—পুণ্যের আশ্রম,
গাম্ভীর্য্যের প্রতিকৃতি—করুণার খনি,
বরদার প্রিয়সুত—কমলার আশা।

[১] চিত্তমুকুরের 'উদাসীন' ও 'আশা তৃষ্ণা প্রাণেশ্বরি কর বিসর্জ্জন' কবিতা দুইটি এই প্রসঙ্গে পঠনীয়।

দেশি-বিদেশি সাহিত্যের রসিক সে। তাহার প্রিয় কাব্য ও কবি হইতেছে "শকুন্তলা, রত্নাবলী, উত্তরচরিত, সেক্ষপীর, বাইরন, মিল্টন, হোমর, ওয়ার্ডসোয়ার্থ, সেলি, টেনিসন, মুর"। নর্ম্মদাকে বিবাহ করিতে গিয়া তাহার সখী মন্দাকিনীকে দেখিয়া যোগেশ মুগ্ধ হইল এবং ক্রমশ তাহাকে গভীরভাবে ভালোবাসিয়া ফেলিল। সাধারণ চোখে গৌরাঙ্গী নর্ম্মদা মন্দাকিনীর অপেক্ষা সুন্দরী। কিন্তু মন্দাকিনীর অবর্ণনীয় আকর্ষণ তাহার ছিল না। মন্দাকিনী যোগেশকে মনে মনে শ্রদ্ধা করে এবং বড় ভাইয়ের মত দেখে। যোগেশ যাহা চায় তাহা না পাইয়া মনে করিল মন্দাকিনী তাহার প্রতি উদাসীন। যোগেশের বাসনা যখন উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে তখন সে মন্দাকিনীকে প্রণয়নিবেদন করিয়া এক চিঠি লিখিয়া বসিল। মন্দাকিনী তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া যোগেশের প্রেম-নিবেদন প্রত্যাখ্যান করিল। মর্ম্মাহত যোগেশ ঘর ছাড়িয়া পলাইল। তাহার নিদারুণ লজ্জা যে মন্দাকিনী তাহাকে ভুল বুঝিয়াছে, "সে ভাবে পাপাত্মা আমি—পাশব পিপাসা করিবারে চরিতার্থ অনুরক্ত তায়।" কাব্যের আরম্ভে দেখা গেল যে মৃতকল্প হইয়া যোগেশ মালাবার পর্ব্বতে ভৈরব-মন্দিরের কাছে পড়িয়া আছে। উন্মাদের মত সে মন্দাকিনীর চিন্তায় বিভোর। এক ব্যাধ আসিয়া তাহাকে নিজের কুটীরে লইয়া গিয়া শুশ্রূষা করিয়া কিছু সুস্থ করিল এবং ভৈরবের সেবিকা ভৈরবীর কাছে যোগেশের বৃত্তান্ত জানাইল। ভৈরবী যোগেশের ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া বলিলেন, "জন্মান্তরে তব মন্দাকিনী পরিণীতা হইবে তোমার।"

যোগেশের মনে দুই বিপরীত ভাবনার দ্বন্দ্ব চলিতেছে। এক দিকে পত্নী-পুত্র-ভ্রাতার প্রতি স্নেহ ও কর্ত্তব্য, জননী-ভগিনী বিয়োগের শোক ও গৃহস্মৃতি, অপর দিকে মন্দাকিনীর সর্ব্বগ্রাসিনী চিন্তা। মনের এই অপরিসীম বিক্ষোভ এবং দেহের অযত্ন তাহাকে মৃত্যুদ্বারে উপনীত করিল। ভৈরবী দেখিলেন যে যোগেশকে ঘরে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে মন্দাকিনী ছাড়া কেহই পারিবে না। তিনি তখন মন্দাকিনী ও তাহার স্বামীকে লইয়া আসিলেন। যোগেশ অপেক্ষা করিয়া আছে ভৈরবীর প্রত্যাশায়। ওদিকে তাহার পিতৃ-আত্মা জানাইয়া দিয়াছে তাহার মৃত্যু আসন্ন। গুহার সম্মুখে বৃক্ষতলে বসিয়া শূন্যপানে চাহিয়া যোগেশ মৃত্যুর সঙ্গে বোঝাপড়া করিয়া মনকে কতকটা শান্ত করিয়া আনিয়াছে। তখন

> প্রথম প্রহর বেলা—তরুণতপন
> হইয়াছে দৃশ্যমান পূরব অম্বরে।

কহেলিকা-বিমণ্ডিত ভৈরব গিরির
অঙ্গে অঙ্গে শীতরশ্মি পড়েছে ছড়ায়ে।
নিম্নে উপত্যকা-ভূমে কুয়াসা-মণ্ডিত
দূর্ব্বাদলে পড়িয়াছে তরুণ কিরণ,
ভাসিছে বিষাদ-হাসি উপত্যকা-ভূমে।

এমন সময় "যোগেশ—যোগেশ" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে মন্দাকিনী আসিয়া উপস্থিত হইল। মরণের মুহূর্ত্তে যদিও তাহার বাসনা স্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে তবুও নিজের অন্তরের কথা যোগেশ আর চাপিয়া রাখিল না,

ঘৃণায় লজ্জায় নিজে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
মরিয়াছি কতবার—প্রাণের ভিতর
ভীষণ-নরক-কুণ্ড ছিলাম ধরিয়া,
আজ সে পিপাসা মম গেছে শুকাইয়া
কিন্তু উন্মাদের জ্ঞান মরণের আগে।

মন্দাকিনী স্বামীর বাল্যবন্ধু যোগেশের সুগভীর প্রেমের পরিচয় পাইয়া অনুতপ্ত হইল। শেষ সম্ভাষণ করিয়া মন্দাকিনীর মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া যোগেশের প্রাণবায়ু নিষ্ক্রান্ত হইল। ওদিকে পূর্ব্বমুহূর্ত্তে নর্ম্মদাও দেহত্যাগ করিল, কেননা সতী কখনো বিধবা হয় না। মন্দাকিনী যোগেশের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিল। যোগেশের আত্মা নর্ম্মদার আত্মার পাছু লইল ব্যাকুলভাবে ডাকিতে ডাকিতে। সে ডাক নর্ম্মদা-আত্মার শ্রুতিগোচর হইল না। যোগেশ-আত্মা নরকে কষ্ট পাইতে লাগিল, আর নর্ম্মদা-আত্মা সতীস্বর্গে বিরাজ করিতে থাকিল।

কাব্যের প্রধান দুই চরিত্র—যোগেশ এবং মন্দাকিনী—মন্দ হয় নাই। নর্ম্মদার ভূমিকা পুষ্ট হইলে ভালো হইত। বর্ণনায় মধ্যে মধ্যে কল্পনাচাতুর্য্য আছে। যেমন,

ভীষণ যামিনী যেন দেহ বিস্তারিয়া
পড়িয়াছে শৈল-অঙ্গে চাপিয়া হৃদয়।
গিরি যেন অন্ধকারে হইয়া কাতর
ক্লান্তভাবে তুলিতেছে শৃঙ্গ উর্দ্ধপানে।

৭

রাজকৃষ্ণ রায়ের (১৮৫২[১]-১৮৯৪) নাট্যরচনার আলোচনা আগে করা

[১] জন্মবৎসর আনুমানিক। নিভৃতনিবাসের পঞ্চম সর্গে কবি লিখিয়াছেন, "ষড়বিংশ বর্ষ আমার চলিয়া যায়।"

গিয়াছে।[১] ইনি গদ্যে-পদ্যেও—বিশেষ করিয়া পদ্যে—নিরলস লেখক ছিলেন। রামায়ণ-মহাভারতের পদ্য অনুবাদ হইতে গদ্য কবিতা পর্য্যন্ত কিছুই ইনি বাদ দেন নাই। পাঠ্যপুস্তকের বাহিরে বই লিখিয়া জীবিকাউপার্জ্জনের পথ এ দেশে ইনিই প্রথম দেখাইয়াছেন। রাজকৃষ্ণের লেখা গদ্য উপন্যাস ও গল্পের বই কয়খানি আছে। যেমন 'হিরণ্ময়ী' (১২৮৬), 'কিরণ্ময়ী' (১২৮৭) ও 'প্রতিফল' (১৮৯৩)। 'অনুপমা' (১২৯৫), 'জ্যোতির্ম্ময়ী' (১২৯৫), 'অদ্ভুত ডাকাত' (১২৯৫) ও 'শান্তিকুটীর' রাজকৃষ্ণের রচনা নয়, "সম্পাদিত"। এই বইগুলির অধিকাংশের লেখক (বা অনুবাদক) রাজকৃষ্ণের সহযোগী শরচ্চন্দ্র দেব হইতে পারেন। অনেকগুলি প্রচলিত রূপকথাকে রাজকৃষ্ণ গদ্যে ও পদ্যে রূপ দিয়াছিলেন।

পদ্য লেখায় রাজকৃষ্ণের স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থার জন্য এবং উপযুক্ত অনুশীলন ও সংযমের অভাবে তাহা প্রতিভার দীপ্তিতে জ্বলিয়া উঠে নাই। তবুও স্বীকার করিতে হইবে যে ইঁহার কবিতায় যে পরিমাণে স্বতঃস্ফূর্ত্তি ছিল তাহা অনেক সমসাময়িক কবির রচনায় পাই না। ছন্দেই রাজকৃষ্ণের স্বাধীনতার প্রকাশ বেশি। পদ্য-ঘেঁষা উচ্ছ্বাসপূর্ণ গদ্যকে পদ্যের পংক্তিতে সাজাইয়া ইনি তাহা গদ্য-কবিতায় পরিণত করিয়াছিলেন। কবিতার ছন্দে এবং ভাবে রাজকৃষ্ণ অনেক সময়ে হেমচন্দ্রের অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্রের সঙ্গে রাজকৃষ্ণের রচনার সাদৃশ্য দেখি শুধু একই শব্দের অথবা বাক্যাংশের অনুবৃত্তিতে এবং বাগ্‌বাহুল্যে। কিশোর রবীন্দ্র-নাথের অনুসরণ আছে কোন কোন কবিতার কাঠামোয়।

রাজকৃষ্ণ রামায়ণের (১৮৭৭-৮৫) ও মহাভারতের (১৮৬১-৬১) পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন। ইংরেজির অনুবাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে জেম্‌স্‌ ম্যাক্‌ফার্সনের 'পোয়েম্‌স্‌ অব্‌ ওসিয়ান'এর অংশত অনুবাদ 'অশ্বায়নের কবিতাবলী'।[১] নমুনা হিসাবে প্রথম ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

পুরাতন সময়ের একটি কাহিনী।
কেন, ওহে অদৃশ্য ভ্রমণকারী!
লোরার কণ্টক-তরু আছ বাঁকাইয়া?
কেন, বায়ু উপত্যকাচারী!
শ্রবণের পথ মোর দিয়াছ ছাড়িয়া?

[১] প্রথম প্রকাশ বীণায় (ফাল্গুন ১২৯৩, বৈশাখ ১২৯৪), গ্রন্থাবলী চতুর্থভাগে (১৮৮৯) সঙ্কলিত।

স্রোতের সুদূর কলরব
কি হেতু নীরব ? কেন শুনিতে না পাই ?
পর্ব্বত হইতে বীণা-রব
নাহি আসে কানে মোর, শব্দহীন ঠাই !

'গিরিসন্দর্শন'এর (রচনাকাল ১৮৭০)[১] আদর্শ বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর 'নিসর্গসন্দর্শন'। তৃতীয় সর্গে এবং ষষ্ঠ সর্গের আরম্ভে বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী'তে ব্যবহৃত ত্রিমাত্রিক ছন্দের ব্যবহার আছে। যেমন,

গিরি-শিরে ব'সে দেখিনু নয়নে,
প্রতীচি-বিভাগে গগন-রবি
গড়া'য়ে গড়া'য়ে পড়ি'ছে কেমনে,
প্রকাশি নূতন লোহিত ছবি !

'আগমনী' (রচনাকাল ১৮৭১)[১] পুরাণোধরণের পার্ব্বতীমঙ্গল কাব্যের মত। অসম্পূর্ণ 'সঙ্গীত স্বপ্ন' (রচনাকাল ১৮৭২)[১] সর্গাকারে লেখা আখ্যায়িকা কাব্য। লক্ষ্ণৌএর বেলীগাবদ ও ছত্রমঞ্জিল দর্শনে রচিত কবিতা দুইটি 'কালচক্র'এ[১] (রচনাকাল ১৮৭৩ ?) সঙ্কলিত হইয়াছে। নবীনচন্দ্রের পলাশির-যুদ্ধ কাব্যের পূর্ব্বাভাস ইহাতে আছে।

যে চক্রে সামান্য দ্বীপ হ'ল সুসজ্জিত,
যে চক্রে ভারতবর্ষ
করেছিল নভস্পর্শ,
সভ্যতা-সোপানে চড়ি' ; সে চক্রে পতিত
হইল ভারত পুন, ভাঙ্গিল সোপান ,
সে চক্রে ইংরাজ ভেসে,
আগত ভারত দেশে,
সে চক্রে ভারতে উড়ে বৃটিস নিশান।
আরো কি হইবে পরে—কে জানে সন্ধান ?

'বঙ্গভূষণ'এ (১৮৭৪) বল্লালসেন হইতে মাইকেল মধুসূদন দত্ত পর্য্যন্ত তেষট্টি জন কীর্ত্তিমান্ ও কীর্ত্তিমতী বাঙ্গালীর উদ্দেশ্যে রচিত সনেট আছে। 'অব্সর-সরোজিনী'[২] রাজকৃষ্ণ রায়ের সর্ব্বাধিক প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ। প্রথম ভাগের তুলনায় দ্বিতীয় ভাগের কবিতাগুলি ভালো, এগুলিতে অকৃত্রিমতার

[১] গ্রন্থাবলীতে সঙ্কলিত।

[২] প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ যথাক্রমে ১২৮৩, ১২৮৬ সালে ছাপা। আর দুইভাগ গ্রন্থাবলীতে সঙ্কলিত। অধিকাংশ কবিতাই বীণায় প্রথম প্রকাশিত।

পরিচয় আছে। উদাহরণরূপে 'স্বদেশ-প্রিয়ের শেষ দেখা'র প্রথম স্তবক উদ্ধৃত করিলাম।

জনম আমার ওই গঙ্গার সুন্দর কূলে,
যেখানে বিহঙ্গদল গান গায় মন খুলে,
যেখানে পবিত্র নদী
কলনাদে নিরবধি
রবি শশী দেখি' দেখি', পারাবারে যায় চ'লে,
যেখানে তরঙ্গমালা দোলেরে সে নদী-গলে,
যেখানে দিনের বেলা
মানবগণের মেলা,
তটিনী-তরল-জলে তপন-কিরণ জ্বলে,
নদী-কূলে বায়ু-বলে তরীগুলি টলমলে!

'উষা' কবিতায় বিহারীলালের প্রভাব আছে। যেমন,

উজ্জলবরণময়ী মধুরহাসিনী বালা
সুনীলগগন-কোলে করি'ছে প্রভাত-খেলা।
তপন পিছনে থেকে
খেলা দেখে থেকে থেকে,
নীল-সিন্ধু-জলে তুলি' লোহিত লহরী-মালা।

'নিভৃতনিবাস' (১৮৭৮) নয় সর্গে আখ্যায়িকা-কাব্যের ধরণে লেখা। গল্পাংশ নিতান্ত তুচ্ছ। ইহাতে কিশোর রবীন্দ্রনাথের গাথা-কাব্যের প্রভাব আছে বলিয়া মনে করি। গায়িকা নলিনীর রোগজীর্ণ দেহত্যাগ ও সৎকার উপলক্ষ্যে নায়ক বিজয়ের শোক এবং সেইসঙ্গে লেখকের বিবিধ উচ্ছ্বাস কাব্যের বিষয়। ছন্দের বৈচিত্র্যই কাব্যটির প্রধান গুণ। পঞ্চম সর্গের ভাঙ্গা ছন্দ অমিত্রাক্ষরের মত নয়, ফ্রি ভার্সের অনুরূপ। সপ্তম সর্গে "বিষমপংক্তি" ছন্দেও নূতনত্ব আছে। অষ্টম সর্গে একাবলী অমিত্রাক্ষর। যেমন,

প্রভাতে ফুটিয়ে ফুলকলি
দুপুরে লুটিয়া পড়ে তাপে,
মুহূর্ত্তেক সৌরভ ঢালিয়া
পরক্ষণে সে ধনে বঞ্চিত,
হেন কেন অসাধের দশা?

নবম সর্গে "বহুপদী-দীর্ঘরেখা" ছন্দ। যেমন,

এতেক কহিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া নলিনী-জীবন, হতাশ বিজয়, নলিনীর মুখ পানে চায়,
অমনি যেন গো, হৃদয় ছিঁড়িয়া, তাহারো জীবন, উড়িয়া চলিল, ভূমে পড়ি বিজয় লুটায়।

সংস্কৃত "দণ্ডক" ছন্দের অনুকরণেই রাজকৃষ্ণ "বহুপদী" ছন্দ চালাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহার ভালো উদাহরণ পাই চতুর্থ ভাগ অবসর-সরোজিনীর 'ভবের হাট'এ কবিতায়। ইহার প্রত্যেক ছত্রে প্রায় ৬০ করিয়া অক্ষর (সিলেব্‌ল্) আছে। রাজকৃষ্ণ রায়ের প্রথম "পদ্যপঙ্‌ক্তি গদ্য" অর্থাৎ গদ্য-কবিতা 'বর্ষার মেঘ' ১২৯১ সালের ৩রা শ্রাবণ লেখা হইয়াছিল। দ্বিতীয় কবিতা 'বর্ষার গোলাপ' হইতে প্রথম কয় ছত্র নিদর্শনরূপে উদ্ধৃত করিতেছি।[১]

> সাধের ফুল! ভিজে গেছিস্?
> তোর নধর অধরে ও টলটল কোচ্চে?—
> সুধা?—মধু?
> না, ও যে মেঘের জলবিন্দু।
> মেঘ কি নিষ্ঠুর, ছি ছি?
> সে কা'রই আদর জানে না,
> আদরের বদলে কষ্ট দেয়—পীড়ন করে,
> তুই তার সাক্ষী।
> আহা, বসন্তসময়ে তোকে দেখেছি,
> এখনও দেখছি,
> কিন্তু সে-তুই আর এ-তুই যেন এক-তুই নয়।

প্রচুর গান লিখিয়াছিলেন রাজকৃষ্ণ। ইহার নাটকের কোন কোন বাঙ্গালা ও ভাঙ্গা হিন্দী গান একদা লোকের মুখে চালু হইয়াছিল। রাজকৃষ্ণের গীতিসংগ্রহ-গ্রন্থ হইতেছে 'ভারত-গান' (১৮৭৮) ও 'গান' (১৮৮৮)[২]। রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র অনুকরণে রাজকৃষ্ণ ব্রজবুলি পদরচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাতে ভনিতা দিয়াছিলেন "সোমরায়"। 'সোমরায়ের পদাবলী'র[৩] একটির শেষাংশ উদ্ধৃত করিলাম।

> মাটীর মানুষ মজে, শিশিরকা রতনে
> পরখণে ক্ষয় যাব, খরকর তপনে।
> নাহি মিটে আশ্, তবু তছু পানে ধাওরে,
> রাধাশ্যাম এ জাতকো কব্, বা জিয়াওয়ে!
> অনিত্য ত্যজি নিত্য করব ধেয়ান,
> দেশ্‌কা সুগতি আর মানুখ কল্যাণ!
> কহিছে সোমরায় দেখহ বিচারি,
> কিসের ভাবনা ভবে মানব তোমারি।

[১] দ্বিতীয় কবিতাটি 'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি' পত্রিকার প্রথম খণ্ডে (১২৯২) প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। উভয় কবিতাই 'অবসর-সরোজিনী'র তৃতীয় ভাগে (গ্রন্থাবলী ১২৯২) সঙ্কলিত আছে।

[২] ইহাতে গানের সংখ্যা ২৮৩।

[৩] বীণা (পৌষ ১২৯৩) পৃ ৯৬-৯৭ দ্রষ্টব্য।

৮

যে সময়ের কথা বলিতেছি তখনকার সাময়িক খ্যাতিমান্ কতিপয় কবিতাকারের নাম এখন বড় শোনা যায় না। গোবিন্দচন্দ্র রায় (১৮৩৮-১৯১৭) কয়েকটি ছোট কবিতামাত্র লিখিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে 'ভারত-বিলাপ'এর[১] কয়েকটি ছত্র[২] স্বদেশী গান হিসাবে চলিত হওয়ায় এবং 'যমুনালহরী' পাঠ্যপুস্তকে উদ্ধৃত হওয়ায় একেবারে লুপ্ত হয় নাই।

বিজয়কৃষ্ণ বসুর প্রথম কাব্য 'বিলাপসিন্ধু' (১৮৭৪) স্ত্রীবিয়োগ উপলক্ষ্যে লেখা। ইঁহার 'অবকাশ-গাথা'র (১২৮৩) কয়েকটি কবিতা সংস্কৃত পজ্ঝটিকা তোটক কুসুমবিচিত্র প্রভৃতি ছন্দে রচিত। অবকাশ-গাথার শেষ কবিতা 'ভারতচন্দ্র' বিদ্যাসুন্দর-নাটকের তৃতীয় সংস্করণে (১৮৭৫) উদ্ধৃত আছে। কবিতাটিতে মধুসূদনের প্রভাব জাজ্বল্যমান। প্রথম ও শেষ স্তবক দুইটি উদ্ধৃত করিতেছি।

ভারত ! ভারতচন্দ্র, চারু, নিরমল,
অকলঙ্ক, পূর্ণকল, সুধা ঢলঢল।
ভাবের কৌমুদী ভাসে কবিতা-কুমুদ হাসে,
চিত্ত-অলি মধু-আশে মধুর ঝঙ্কারে,…
উছলে পুলকসিন্ধু গভীর ভঙ্কারে।
তুমি গোপীলতাভঙ্গ, কাব্য-ব্রজপুরে,
তব গণ্‌গণ্‌ তানে সদা আঁখি ঝুরে,
সেই হেতু ভিক্ষা চাই, তব হেন শক্তি পাই,
ধুয়িব কবিতা-স্রোতে মুদিয়া নয়ন,
হৃদম্বুজ-প্রতিষ্ঠিত বাণীর চরণ।

হরিমোহন মুখোপাধ্যায় কবিভূষণ (১৮৬০-?) সাধারণী-সোমপ্রকাশ-বান্ধব-নবজীবন প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা ও প্রবন্ধ লিখিতেন। ইনি কিছুকাল সোমপ্রকাশের সম্পাদনাও করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রথম প্রকাশিত কবিতা হইতেছে 'সকের ঠানদিদি' (চুঁচুড়া ১৮৭৩)। ইনি দুইখানি "মহাকাব্য" লিখিয়াছিলেন, 'মুকুট উদ্ধার' (ভবানীপুর ১২৮৫)[৩] ও 'অদৃষ্ট-বিজয়' (১৮৮১)। কাব্য দুইটিতে মধুসূদনের ও হেমচন্দ্রের অনুসরণ স্পষ্ট। 'জীবন-সঙ্গীত' (১২৮৭) খণ্ড-কবিতার সঙ্কলন। 'বষ্ঠম বউ' (১২৮৯)[৪] ব্যঙ্গ কবিতা এবং

[১] প্রথম ভাগ 'গীতি-কবিতা'য় (১২৮৮) সঙ্কলিত।
[২] "কত কাল পরে বল ভারত রে দুখ-সাগর সাঁতারি পার হবে" ইত্যাদি।
[৩] নামপত্রে "মুকুট-উদ্ধার', অন্যত্র 'মুকুটোদ্ধার'। [৪] সংস্করণ ১৩১১।

'শিবাজীর ভবানী-পূজা' দেশপ্রেমাত্মক কবিতা। হরিমোহন দুই-তিনখানি উপন্যাসও লিখিয়াছিলেন, 'যোগিনী', 'কমলাদেবী', 'জীবনতারা' ইত্যাদি। ইঁহার নাট্যরচনা 'প্রণয়-প্রতিমা' (১২৮২)।

অধরলাল সেনের (১৮৫৫-৮৫) কবিতার বই হইতেছে 'মেনকা' (১৮৭৪), 'ললিতাসুন্দরী (প্রথম সর্গ) ও কবিতাবলী' (১৮৭৪), 'নলিনী' (১৮৭৭) এবং 'কুসুমকানন' (১৮৭৭, দ্বি-স ১৮৮৩)। কয়েকটি কবিতা ইংরেজীর অনুবাদ। মেনকা ইংরেজ কবি মূরের 'লাল্লা রুখ্' কাব্যের অন্তর্গত 'প্যারাডাইজ অ্যাণ্ড দি পেরী' কবিতার স্বাধীন অনুবাদ।

আনন্দচন্দ্র মিত্রের (?-১৩১০) কবিতার বই হইতেছে 'মিত্রকাব্য (প্রথম খণ্ড ঢাকা ১৮৭৪, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৭৭, পরিবর্দ্ধিত তৃ-স ১৩০৪), 'হেলেনা-কাব্য' (প্রথম খণ্ড ময়মনসিংহ ১৮৭৬, দ্বিতীয় খণ্ড ঢাকা ও কলিকাতা ১৮৭৭), 'ভারত-মঙ্গল' (১৮৯৪)[১] ও 'প্রেমানন্দ কাব্য' (১৩০৩)। হেলেনা-কাব্য গ্রীক মহাকাব্য ইলিয়ডের কাহিনী লইয়া লেখা।[২] ভারত-মঙ্গলের বিষয় রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী। ত্রয়োদশ সর্গাত্মক হেলেনা-কাব্য ও ঊনবিংশ সর্গাত্মক ভারত-মঙ্গল অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। উভয়ত্র মধুসূদনের ব্যর্থ অনুকরণ। মিত্রকাব্যের অধিকাংশ কবিতায় হেমচন্দ্রের অনুকৃতি লক্ষণীয়। তৃতীয় সংস্করণের কয়েকটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ-প্রয়াস আছে।[৩] 'পদ্যসার' (১২৯৩), 'কবিতাসার' (১২৯৬) এবং 'পদ্যশিক্ষাসার' (১৮৯৭) বিদ্যালয়-পাঠ্য বই। ইঁহার অপর গ্রন্থ হইতেছে 'রাজকুমারী' (১৮৭৯) উপন্যাস, 'পরমার্থ-প্রসঙ্গ' (১৩০৬) ইত্যাদি। ইনি অনেকগুলি সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন।

নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা'য় (প্রথম খণ্ড ১৮৭৫, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৭৭) লেখকের নাম ছিল না। নারীরচিত কাব্য মনে করিয়া সেকালের অনেক সমালোচক কবিতাপুস্তকটির প্রশংসায় মুখর হইয়াছিলেন। বালক রবীন্দ্রনাথ 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা', 'অবসর-সরোজিনী' (রাজকৃষ্ণ রায়ের) এবং 'দুখসঙ্গিনী' (হরিশ্চন্দ্র নিয়োগীর)—এই তিনখানি অচিরপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ লইয়া 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় (কার্ত্তিক

[১] প্রকাশিত গ্রন্থ পূর্ব্ব-খণ্ড মাত্র। [২] বঙ্গদর্শনে (বৈশাখ ১২৮৫) নিন্দিত।
[৩] 'চোখের দেখা' কবিতাটি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

১২৮৩) এক প্রবন্ধ লিখিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে এগুলিতে প্রকৃত গীতি-কাব্যের লক্ষণ এবং যথার্থ কবিপ্রতিভার পরিচয় কিছু নাই।[১] রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনাটিই এই ভুবনমোহিনী-প্রতিভার নাম আজ অবধি বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অপর কবিতা গ্রন্থ হইতেছে 'আর্য্য সঙ্গীত (দ্রৌপদী-নিগ্রহ কাব্য)' (১৮৮০), 'আর্য্য সঙ্গীত (জাতীয়নিগ্রহ কাব্য)' (১৩০৯) এবং 'সিন্ধু-দূত' (১৮৮৩)।

'দুখসঙ্গিনী' (১২৮২)[২] ছাড়া হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী রচনা করিয়াছিলেন 'ভারতে সুখ' (১৮৭৫),[৩] 'বিনোদমালা' (১২৮৫, দ্বি-স ১৩০৫), 'মালতী-মালা' (১৮৯৯) ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ। দুখসঙ্গিনী বঙ্গদর্শনে প্রশংসিত হইয়াছিল। দুখসঙ্গিনীর ও বিনোদমালার কতকগুলি কবিতা পরিমার্জ্জিত হইয়া কয়েকটি নূতন কবিতার সহিত বিনোদমালার দ্বিতীয় সংস্করণে স্থান পাইয়াছিল। হরিশ্চন্দ্র নিয়োগীর কবিতার পরিচয়রূপে দুখসঙ্গিনীর দীর্ঘ 'জন্মভূমি' কবিতা হইতে একটি স্তবক উদ্ধৃত করিতেছি। ইহাতে মধুসূদনের স্পষ্ট অনুকৃতি রহিয়াছে।

> হায়রে কোথা সে সন্ধ্যা?—যে সন্ধ্যার কালে
> ছড়াত বিহঙ্গমালা মধুর কাকলী
> মন সুখে বন মাঝে বসি তরুডালে,
> প্রকৃতির কণ্ঠে যেন অমৃত আবলী
> বাজাত গম্ভীর শঙ্খ মঙ্গলের ধ্বনি
> তারাময়ী নিশি হেরি, প্রতি ঘরে ঘরে,
> পীনপয়োধরা যত কুলের রমণী,
> জ্বালিত প্রদীপমালা সুকোমল করে।

দীনেশচরণ বসু (১৮৫১-৯৮) বাঙ্গালী, বান্ধব প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা লিখিতেন। ইনি 'ঢাকাবার্ত্তা' ও 'ঢাকাপ্রকাশ' পত্রিকাও কিছুদিন সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইহার প্রথম কবিতার বই 'মানসবিকাশ' (১২৮০)। 'কবিকাহিনী' (ময়মনসিংহ ১৮৭৬) কাব্য এককালে কিছু সমাদর পাইয়াছিল। কবিকাহিনীতে হেমচন্দ্রের অনুসরণ দেখা যায়। ইহার অপর কাব্যগ্রন্থ হইতেছে 'মহাপ্রস্থান কাব্য' (১৮৯৪), একুশ সর্গে লেখা মহাভারতকাহিনী অবলম্বনে। ছন্দ বিলম্বিত পয়ার। দীনেশচরণ একখানি উপন্যাসও লিখিয়াছিলেন,

[১] জীবনস্মৃতি দ্রষ্টব্য।

[২] নবীনচন্দ্র সেনকে উৎসর্গিত।

[৩] প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্সের আগমন উপলক্ষ্যে।

'কুলকলঙ্কিনী' নামে।[1] বইটির আখ্যানবস্তু বাস্তবঘটনা অবলম্বনে পরিকল্পিত বলিয়া বোধ হয়।

প্রসন্নময়ী দেবীর (১৮৫৭-১৯৩৯) বাল্যরচনা 'আধ আধ ভাষিণী' কাব্য (১৮৭০) নিতান্ত ক্ষুদ্র পুস্তিকা। ইঁহার 'বনলতা'র (১২৮৭) কয়েকটি কবিতা ইংরেজির অনুবাদ। দুইখণ্ড 'নীহারিকা'য় (১৯১০; ১৮১৮ শকাব্দ) প্রসন্নময়ীর কবিতারচনার পরিণত নিদর্শন আছে।[2] ইঁহার গদ্য রচনা হইতেছে—ভ্রমণ-কাহিনী 'আর্য্যাবর্ত্ত' (১২৯৫), ক্ষুদ্র উপন্যাস 'অশোকা' (১২৯৬), জীবনী 'তারাচরিত' (১৯১৬) এবং স্মৃতিকথা 'পূর্ব্বকথা' (১৯১৭)॥

৯

আলোচ্য যুগে নাট্যকাব্য-যশোলোভীর মত কবিযশঃপ্রার্থীর ঘাটতি ছিল না। নিম্নে অপর কবিতা-কারদের নাম ও রচনার উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত রহিলাম। ইহাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাহুল্য মাত্র এবং ইহার মধ্যে অনেকগুলিই বিদ্যালয়পাঠ্য রচনা। কালীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী—'চিত্ততিমিরনাশক' (১৮৬৮) ও 'দাসত্বশৃঙ্খল' (১৮৭৬), মদনমোহন মিত্র[3]—'বনিতাবদম্ব' (১৮৭০, তৃ-স ১৮৭৭), 'পদ্যসোপান' (১৮৭০, চ-স ১৮৭৫) ও 'জীবনময় কাব্য' (ঢাকা ১২৯৬), মহিমচন্দ্র গুপ্ত—'বসন্তবিরহ' ও 'মন্দাকিনীবিলাপ' (১২৮৪), যাদবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—'পদ্মালিনী' (১৮৭২) ও 'কবিতা' (১২৮৫), মহিমাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—'বিপ্রবিহার' (১২৭৮) ও 'ঋতুবিলাস' (১২৭৯), ঈশানচন্দ্র দত্ত—'কাব্যতরঙ্গ' (১৮৭২),[4] উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী 'সৌদামিনী উপাখ্যান' (১৮৭২), রামগোপাল চক্রবর্ত্তী—'উন্মাদিনী' (১৮৭৪), রুক্মিণীকান্ত ঠাকুর—'উত্তরাবিলাপ কাব্য' (১৮৭৪) ও 'পদ্যমালা', হীরালাল দাস ঘোষ—'কাব্যকানন' (১৮৭৪), দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—'নবমালিকা' (১৮৭৪), অনাথবন্ধু রায়—'বৈদেহীবৈধব্য কাব্য' (ঢাকা ১২৮১), কুঞ্জবিহারী সাহা—'কবিতাকুসুমমালিকা' (১২৮১), তারকনাথ বিশ্বাস ও রমণকৃষ্ণ বসাক—'উর্ম্মিলা-সম্ভাষা' (১৮৭৪), গঙ্গাচরণ সরকার—'ঋতুবর্ণন' (চুঁচুড়া ১৮৭৪), অক্ষয়চন্দ্র সরকার—'শিক্ষানবিশের পদ্য' (ঐ ১৮৭৪) ও 'গোচারণের মাঠ'[5] (ঐ ঐ); দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ—'বিশ্বেশ্বরবিলাপ' (১২৮১), শ্রীনাথ কুণ্ডী—'তারকবধ কাব্য' (১২৮২), দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়—'অপূর্ব্বস্বপ্ন কাব্য' (বহরমপুর ১২৮২), শারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য—'নিসর্গসুন্দরী' (ঢাকা ১২৮২), রামলাল চক্রবর্ত্তী—'কবিতাকলাপ' (দ্বিতীয় ভাগ শ্রীরামপুর ১২৮২), সত্যচরণ গুপ্ত—'ললিত কাব্য' (১২৮২), নগেন্দ্রনারায়ণ অধিকারী—'রামবিলাপ'

[1] সেরপুর টাউনে মুদ্রিত, সচিত্র।

[2] পরবর্ত্তী কালে (বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্য্যন্ত) প্রকাশিত কবিতাগুলি সংকলিত হয় নাই।

[3] ইঁহার নাটকের আলোচনা যথাস্থানে করা গিয়াছে। ইনি একটি ঐতিহাসিক রোমান্স লিখিয়াছিলেন দুই খণ্ডে 'সমরশায়িনী' নামে (১৮৭৩)।

[4] অপর রচনা 'প্রবন্ধকুসুমাবলী' (১২৭৯)।

[5] যুক্তাক্ষর-বর্জ্জিত।

১৮৭৫), শ্যামাচরণ শ্রীমানী[1]—'সিংহলবিজয়', রামগতি চট্টোপাধ্যায়—'সুবারিবধ কাব্য' (১৮৭৫), মতিলাল ভট্টাচার্য—'কুসুমহার' (১২৮২), ভবিনীপ্রসাদ নিয়োগী—'কুসুমকলাপ' (১৭৯৭ শকাব্দ), শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের (?)—'বনকুসুম' (১৮৭৭), কানাইলাল মিত্র—'রূপ-অভিসার', 'কমলে কামিনী (১৮৭৬) ও 'স্মৃতিপট' (১৮৭০)[2], গিরিশচন্দ্র বসু 'বালিবধ কাব্য' (ভবানীপুর ১৮৭৬), বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—'সতীসত্তম কাব্য' (১৮৭৬), পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—'ভাবতীয়ম্‌' (১৮৭৬) প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন—'বঙ্গবধূ-বিলাপ' (বরিশাল ১৮৭৬), অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়[3]—'বিয়োগী বন্ধু' (১২৮৩) ও সচিত্র 'সিন্ধুবর্ণন' কাব্য (১২৯০), প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়—'কল্পনাকামিনী' (১৮৭৭), শ্যামগোবিন্দ চৌধুরী—'বিশ্রামলহরী' (১৮৭৭) ও 'বিশ্রামমালা' (১৮৭৮), যোগেন্দ্রনাথ সেন—'নিশীথে হিমাদ্রিশিখরে' (বরিশাল ১৮৭৭) ও 'ঊষা' (১৮৯৮), রজনীকান্ত চক্রবর্তী—'চিত্তোন্মাদিনী' (১৮৭৮), অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়—'রাবণবধ কাব্য (১৮৭৭), হরিশচন্দ্র সরকার—'দুঃখিনী' (১৮৭৮), প্রসন্নকুমার ঘোষ—'কুসুম-কলিকা' (১৮৭৮), শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়—'বনকুসুম' (১২৮৩?), শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য—'তিনটি কুসুম' (১৮৭৮), রাজকৃষ্ণ দত্ত[4]—'কবিতা-কল্পলতিকা' (১২৮৬), কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় (কাব্যবিশারদ)—'লুকেশিয়া' (১২৮৬)[5] ও 'চিন্তাকুসুম' (১২৮৮), যদুনাথ সেনগুপ্ত—'কুসুমকলিকা' (১২৮৮), হীরালাল বাগচী—'ধ্রুবসম্ভব কাব্য' (১২৮৯), দুর্গাচন্দ্র সান্ন্যাল—'মহামোগল কাব্য' (তিন পর্ব্ব ১২৮২-৮৪), রামজয় বাগচী—'কবিতাকুসুম' (১২৮৯) ও 'সঙ্গীতকুসুম' (১৮৮৬), ভবানীচরণ ঘোষ—'গীতিকবিতা' (১৮৮৬), গোবিন্দচন্দ্র বসু—'শান্তিজল' (১৮৮৬), বাঞ্ছাকৃষ্ণ মিত্র—'বিষাদ-মুকুল' (১২৯১); জীবনকৃষ্ণ ঘোষ—'দুর্য্যোধনবধ কাব্য' (১২৯৩), অক্ষয়কুমার সরকার—'তারক-সংহার কাব্য' (১২৯৫), কৃষ্ণবিহারী সেন—'কবিতামালা' (১২৯৫), হরিপদ গোঁয়ার—'পাণ্ডববিলাপ কাব্য' (১২৯৫); জলধিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—'বিবিধ কবিতা' (প্রথম খণ্ড ১২৮৮), কৃষ্ণেন্দ্র রায়—'সীতাচরিত্র' (বোয়ালিয়া ১২৯১), আবদুল আলা—'কবিতা কুসুমমালা' (প্রথম ভাগ ১৮৮৩), মোজাম্মেল হক—'কুসুমাঞ্জলি' ও 'অপূর্ব্ব দর্শন' (১২৯২), ইত্যাদি।

অনেকগুলি পদ্যের বই বেনামি অর্থাৎ লেখকের নাম ছাড়া প্রকাশিত হইয়াছিল। যাঁহাদের রচনা কিছুও আদৃত হইত তাঁহারা পরবর্তী সংস্করণে অথবা গ্রন্থে নাম প্রকাশ করিতেন। তবে অনেকেই সে সুযোগ পান নাই।

১০

বাউল-গানের ও পল্লীগীতির প্যারডি পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। ভাষা-সঙ্কর কবিতায় হাস্যরসের সৃষ্টি সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতেও অজ্ঞাত ছিল না। যেমন, স্রগ্ধরা ছন্দে গৃহস্থবধূর এই দুঃখকাহিনী,

[1] ইঁহার নাট্যরচনার উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি। গদ্য নিবন্ধ 'আর্য্যজাতির শিল্পচাতুরী' (১৮৭৪) বঙ্গদর্শনে (ভাদ্র ১২৮১) প্রশংসিত হইয়াছিল। [2] দ্বিতীয় সংস্করণে (১২৯০) একত্র সঙ্কলিত।

[3] 'ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতি' নাটকের লেখক।

[4] ইঁহার নাট্যরচনার কথা যথাস্থানে দ্রষ্টব্য। [5] লাটিনের কাব্যের অনুবাদ। 'লুক্রিসিয়া উপাখ্যান' (শকাব্দ ১৭৮২) নামেও একটি অনুবাদ বাহির হইয়াছিল। কালীপ্রসন্ন কয়েকটি ব্যঙ্গ কবিতা লিখিয়াছিলেন—'বঙ্গীয় সমালোচক' ও 'মিঠে কড়া'।

তৈলাৎ খুস্কোঽপি সম্যক্‌ ভালমতে ভিজে না কিংপুনর্হস্তপাদৌ
শ্বশ্রূর্মাতা গৃহে মে খাত্যে কিছু বলে না সর্ব্বদা কয় রাঁধো গা।
লজ্জাশীলাঃ পুমাংসো যদি কিছু খাইতে দেয় তত্র বৈরী মাগীরা
ইত্থং বাসো গুরো মে লুকিচুরি করিয়া প্রাণ বাঁচায় বৌ ছুঁড়ীরা।

ভারতচন্দ্র বাস্তব সরসতার খাতিরে মধ্যে মধ্যে "যাবনী মিশাল" ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন।

ব্যক্তিবিশেষের রচনাভঙ্গির ব্যঙ্গ-অনুকৃতি (প্যারডি) আধুনিক সাহিত্যের সৃষ্টি। বাঙ্গালায় ইহা দেখা দিল মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর পয়ারের প্রতিবাদে, জগদ্বন্ধু ভদ্রের[১] 'ছুচ্ছুন্দরীবধ কাব্য' (প্রথম সর্গ) নামক কবিতায়।[২] কবিতাটির খ্যাতি শুধু অদ্ভুত নামটির জন্যই। একটু নিদর্শন উদ্ধৃত করি।

অর্কপ্লক্ষরুহের তলে বিদ্রুত গমনে—
(অন্তরীক্ষ-অধ্বে যথা কলম্বলাঞ্ছিত,
সু-আশুগ ইরম্মদ গমে সন্‌সনে)
চতুষ্পাদ ছুচ্ছুন্দরী মর্ম্মরিয়া পাতা,
অটিছে একদা, পুচ্ছ পুষ্পগুচ্ছ-সম
নড়িছে পশ্চাৎভাগে।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গদ্য-ব্যঙ্গরচনার পরিচয় দিয়াছি।[৩] ব্যঙ্গ-পদ্য রচনায়ও ইন্দ্রনাথ দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন।[৪] 'উৎকৃষ্ট কাব্যম্‌' (১৮৭০) ক্ষুদ্র রচনা। 'ভারত-উদ্ধার' (১২৮৪) ভালো ব্যঙ্গ কাব্য। পঞ্চসর্গাত্মক, অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা। প্রথম সর্গে প্রস্তাবনা ও সরস্বতী-স্তব। মৃত প্রাচীন কবিদের বন্দনা করিয়া গ্রন্থারম্ভ লেখকের পছন্দ নয়। প্রথমত সকলেই তাঁহাদের বন্দনা করে, দ্বিতীয়ত লেখক বাঙ্গালী বলিয়া "পরপদধ্যান" "বর্দ্দাস্তিতে" পারেন না। দ্বিতীয় সর্গে সঙ্কল্প। নায়ক বিপিনকৃষ্ণ ও বন্ধু কামিনীকুমার অবিলম্বে ভারত-উদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তৃতীয় সর্গে

[১] ইঁহার অপর রচনা দেবলদেবী নাটক।
[২] অমৃতবাজার পত্রিকায় (১২ আশ্বিন ১২৭৫) প্রথম প্রকাশিত। ৭২ ছত্রের কবিতা।
[৩] পৃ ২২৪ দ্রষ্টব্য।
[৪] আনন্দবাজার-পত্রিকায় (শারদীয় সংখ্যা ১৩৪৪) 'ইন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

মন্ত্রণা। শনিবার বিকালে যথারীতি "আর্য্য-কার্য্যকরী সভা"-র বৈঠক বসিয়াছে। বিপিনকৃষ্ণ প্রস্তাব করিল,

স্বর যাহাতে
পরাস্তি ইংরেজে রণে, বিনা রক্তপাতে
আমাদের পক্ষে, হয় ভারত-উদ্ধার
উপায় তাহার অদ্য হোক বিবেচিত।

করতালিধ্বনির মধ্যে বিপিনকৃষ্ণ আসনপরিগ্রহ করিলে কামিনীকুমার উঠিয়া বলিল,

দণ্ডাইনু দ্বিতীয়িতে, ভদ্রলোকগণ,
সভার প্রস্তাব যাহা করিলা বিপিন।...

চতুর্থ সর্গে উদ্যোগ। পরদিন প্রত্যয়ে তোপ পড়িতে না পড়িতে ভারত-ভরসা বাঙ্গালী নেতারা শয্যাত্যাগ করিয়া

কোঁচান কাপড় কেহ করি পরিধান,
পরিয়া পিরান, গায় কোঁচান উড়ানী
বুকের উপরে বাঁধি ফুল উঁচু করি,
ইজের চাপকান কেহ কার্পেটের টুপি,
যাহার যেমন ইচ্ছা সাজিয়া উল্লাসে
ভারত-উদ্ধার ব্রতে উৎসৃজিল তনু,
বাহিরিল গৃহ হৈতে।

কেহ গেল সুন্দরবনে সুঁদরি গাছ কাটাইতে, কেহ বা চলিল উত্তরবঙ্গে বাঁশের চেষ্টায়, আবার অনেকে গেল পশ্চিমে বস্তা বস্তা ছাতু ও লঙ্কা চালান দিতে। ছাতু গেল পেশাওরে, লঙ্কা আসিল কলিকাতায়। ছাতু লইয়া বিপিনকৃষ্ণ কোন-রকমে সীমান্ত প্রদেশের ঘাঁটি পার হইয়া অশেষ কৌশলে সুয়েজ খালের ধারে গিয়া সেখানে ছাতুর বস্তা গুদামজাত করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। এদিকে কলিকাতায় মহাব্যাপার, ইংরেজরা কিছুই জানে না। সুঁদরি কাঠের বাঁটওয়ালা হাজার হাজার বঁটি এবং বাঁশের চোঙ্গার লক্ষ লক্ষ পিচকারি তৈয়ারী হইতেছে। তাহার পর চীৎপুরের খাল-ধার হইতে কেল্লা পর্য্যন্ত সুড়ঙ্গ কাটা হইল এবং তাহাতে লঙ্কার বস্তা ভরা হইল। এত সব কাণ্ড হইল "চুপি চুপি নিশিযোগে", সুতরাং "কেহ না জানিল বার্ত্তা, না শুধায়

কেহ।" বাজারে যত পটকা ছিল সব কিনিয়া লইয়া সলিতাগুলি খুলিয়া ফেলা হইল।

পটকা লঙ্কার স্তূপে মিশাইয়া দিয়া,
রাখিল সলতের সূত্র সুড়ঙ্গের মুখে।

পঞ্চম সর্গে উদ্ধার। যুদ্ধদিনে প্রত্যূষে উন্নিদ্র বিশুষ্কমুখ বীর বিপিনকৃষ্ণ পত্নীর কাছে বিদায় লইতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিলে পত্নী সান্ত্বনা দিয়া বলিল,

কি দুঃখে বা কান্দ?
নাহিক চাকুরী, তাই যাবে কি বিদেশে
করিতে অন্নের চেষ্টা, করিয়াছ মনে?
কাজ কি তোমার গিয়া, এত ক্লেশ যদি
পাও তুমি মনে, নাথ। কাটনা কাটিয়া
খাওয়াইব ঘরে বসি, ভাবনা কি তার?
অবশ্যই কোন মতে দিন কেটে যাবে।

বিপিনকৃষ্ণ চোখের জল মুছিয়া বলিল,

তা নয় প্রেয়সী,
স্বদেশ-উদ্ধার কল্পে বাহিরিব আজি,
করিব বিচিত্র রণ ইংরেজের সনে,
শেষে পরাস্তিব তারে।

গৃহিণী বলিল,

বলি প্রাণনাথ,
দেশ ত দেশেই আছে কি তার উদ্ধার?
এতই অমূল্য ধন স্বাধীনতা যদি,
নিতান্তই দিবে যদি সে ধন কাহারে,
আমারেই দাও নাথ, লব শিরঃ পাতি,
আমি তব চিরদাসী।

বিপিনকৃষ্ণ বলিল, আমাদের কৌশলের যুদ্ধ, ভয়ের কিছু নাই। পত্নী শুধাইল, "ভয় নাই যদি তবে চক্ষে কেন জল?" বিপিনকৃষ্ণ জবাব দিল, "যাত্রাকালে নেত্রজল বাঙ্গালী-কল্যাণ"। গৃহিণী বলিল, যদি নিতান্তই যাইতে হয় তো খাইয়া যাও—"আলুভাতে ভাত তবে দিই চড়াইয়া"।

অবশেষে বঙ্গ-বীরেরা কৌশল যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। বিপিনের পূর্ব্ব নির্দ্দেশমত সুয়েজ খালে ছাতুর বস্তা ফেলা হইয়াছে এবং তাহাতে খালের জল

শুখাইয়া গিয়াছে। জাহাজে করিয়া ইংরেজের পলাইবার পথ বন্ধ। বঙ্গবীর কেহ বটি হাতে এবং কেহ পিচকারিতে বালি-গোলা জল লইয়া রণে অগ্রসর হইল এবং ইংরেজ সৈন্যের চোখে বালি-মেশান জল পিচকারি করিয়া ছুঁড়িতে লাগিল। বিস্ময়ের জড়তা কাটিয়া গেলে ইংরেজ-সৈন্য সঙ্গীন উচাইয়া বাহির হইল। দুই চারিটা ফাঁকা আওয়াজ করিতেই বাঙ্গালী-সৈন্য প্রথমে ভড়কাইয়া গেল কিন্তু পরে সুড়ঙ্গের সলিতায় আগুন দিয়া যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইল। লঙ্কার ও পটকার স্তূপে আগুন লাগিলে বিষম কাণ্ড শুরু হইল!

> প্রবল লঙ্কার ধূম প্রবেশি অবাধে
> নাসারন্ধ্রে-পথে, খক খক খকে
> কাসাইল শত্রুদলে, হ্যাচ হ্যাঁচ হ্যাঁচে
> উচাইল ভয়ঙ্কর, কাঁদিল সবে। . .

বটি-হস্ত শামলা-ঢাল-ধারী উকীল-সৈন্যের কাছে ইংরেজ পরাজিত হইয়া শান্তির প্রস্তাব করিলে

> উকীল সম্মতি দিল, হইল নিয়ম
> দেশে না রহিবে কেহ ইংরেজ বালক
> অনুমতি না লইয়া, থাকিবে ভারতে
> ভৃত্যভাবে, ভারতের করিবেক সেবা।
> যে যেমন আছে এবে রহিবে তেমতি।

দেশ স্বাধীন হইয়া গেল।

ভারত-উদ্ধার কাব্যে তখনকার দিনের রাজনৈতিক আন্দোলনের হাস্যজনক দিকটা বেশ ফুটিয়াছে। "ভারতমাতা" এবং "ভারত-উদ্ধার" বুলি সে-সময়ে গদ্যে পদ্যে অবিরত প্রতিধ্বনিত হইয়া সমঝদার পাঠকের পীড়াদায়ক হইয়াছিল। ইন্দ্রনাথের কাব্যে ইহারই প্রতিক্রিয়া। অমিত্রাক্ষর পদ্যের প্যারডি হিসাবেও ইহা ছুচ্ছুন্দরীবধের তুলনায় অনেক্ ভালো লেখা।

"পঞ্চানন্দ" ছদ্মনামে[১] ইন্দ্রনাথ গদ্যে পদ্যে বহু চুটকি লেখা লিখিয়াছিলেন। এগুলি প্রথমে সাধারণী-পঞ্চানন্দ-বঙ্গবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল এবং পরে 'পঞ্চানন্দ' (প্রথম খণ্ড ১৮০৮) ও 'পাঁচু ঠাকুর' নামে কয়েক খণ্ডে সঙ্কলিত হইয়াছিল।[২]

[১] তখনকার প্রায় সকল ব্যঙ্গরচনাই বেনামিতে অথবা ছদ্মনামে বাহির হইত।

[২] বঙ্গবাসী কার্য্যালয় প্রকাশিত ইন্দ্রনাথ-গ্রন্থাবলীতে ইঁহার রচনার সম্পূর্ণ সংগ্রহ আছে।

অপর ব্যঙ্গকাব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে "সায়ের শ্রীনেহালচাঁদ"-এর "বিচিত্র রস-কাব্য" 'পৌষ-পার্ব্বণ' (১৮৮৩)।[১] এই অষ্ট "উপসর্গ"-আত্মক ব্যঙ্গকাব্যের মধ্যে বিভিন্ন ঋতুর উৎসব-বিষয়ক কয়েকটি ছড়া উদ্ধৃত হইয়াছে। কাব্যের আরম্ভে সমসাময়িক কবি-লেখকদের প্রতি কটাক্ষ আছে।

(মধুর মধুর ভাও ভাঙ্গিব রে আজ !)
নমি আমি শয্যাগুরু, তব রাঙ্গা পদে,
ব্রাহ্মণি ! হে বাঙ্গালিনী রমণীর মণি,
তব পদানত দাস শকট সঙ্গমে
চক্র যথা যায় দূর পন্থা পর্য্যটনে
তব রাঙ্গা পদ ধ্যান করি দিবানিশি,
পশেছে পাচক কত যশের মন্দিরে
দমনিয়া ভব-ভব দুরন্ত ক্ষুধারে—
অমর !—শ্রীমধুমিশ্র, বটু বঙ্করাম,
শ্রীহেম, ভুবনখ্যাতা বর-পুত্রী যিনি
অন্নদার, ভুবী-দিদি—ইক্ষুরস পাচী,
তুণারী-রাসভ-ধ্বনি-সন্নিভ চিৎকারী—
গো-পাল, গজেন্দ্র, হরি—মূর্ত্তিমান্ রূপী,
এ বঙ্গের অলঙ্কার !

গিরিশচন্দ্র ঘোষ যখন অনুগত কতিপয় অভিনেতা-অভিনেত্রী লইয়া গ্রেট্ ন্যাশনাল থিয়েটার ছাড়িয়া ষ্টার থিয়েটার করেন তখন সেই উপলক্ষ্যে "শ্রীমান্ দিগ্‌গজচন্দ্র বিদ্যানদী"-র ছয় সর্গ 'নটেন্দ্রলীলা কাব্য' (১২৯১) লেখা হইয়াছিল। আরম্ভেই গিরিশচন্দ্রের প্রতি কটাক্ষ,

সম্মুখ-সমরে জিনি মাইকেলী ছন্দে
আহা কি নবীন ছন্দ ভাতিল ভারতে
পয়ার-প্লাবিত দেশে মোহি বঙ্গবাসী।
কহ দেব নটমণি, মকরন্দ-ববি
সরস মরাল পুচ্ছ ধরি করশাখে
রচিলে যে নব গাথা কুটিকে মোহিয়া
অকালে এ বঙ্গভূমে, শেক্ষপীরে নিন্দি…

পরবর্ত্তী সর্গগুলিতে হেমচন্দ্রের রচনাভঙ্গির অনুকরণ। সমসাময়িক নাট্যশালার ইতিহাসের পক্ষেই বইটির কিছু মূল্য আছে।

[১] রাজকৃষ্ণ রায়ের 'বীণা' পত্রিকায় (১২৮৫) প্রথম প্রকাশিত।

"মহাকবি ধূর্জ্জটি" প্রণীত 'একাদশ অবতার বা পঞ্চানন্দমঙ্গল' (১২৯৩) ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বারো সর্গে লেখা, আদ্যোপান্ত অমিত্রাক্ষরে। 'গাধাবলি (পশুনীতি)' (১২৮৭)[১] পঙ্গু রচনা। ইহাতে চারি ছত্র করিয়া এক শত আট স্তবক আছে মানুষকে গাধা প্রতিপন্ন করিয়া। "বাইরণের আত্মা-পুরুষ প্রণীত" ও "শ্রীবিহারীলাল রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত" 'অবলা কি অ-বলা? (প্রথম পল্লব—স্বর্ণময়ী কবিতালতা)' (১২৯২) হেমচন্দ্রের অনুকরণে লেখা।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সরস কবিতার ধারা হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় নূতন একটু স্বাদ আনিয়া দিয়াছিল। হেমচন্দ্রের অনুসরণে সরস কবিতা অনেকেই লিখিয়াছিলেন, এবং সেকালের সীরিয়স্ কবিতার তুলনায় এই সরস কবিতাগুলি অনেক বেশি সুখপাঠ্য। একটিমাত্র উদাহরণ হিসাবে হারাণচন্দ্র রাহার 'আমি ত হব না বিধি এ প্রাণ থাকিতে!'[২] কবিতা হইতে তিনটি স্তবক (১, ৮, ৯) উদ্ধৃত করিতেছি।

আমি ত হব না বিধি এ প্রাণ থাকিতে,
পড়িতে ইংরাজী বই,
আপত্তি করেছি কই?
শিখেছি তোমার তরে কার্পেট বুনিতে,
শিখিয়াছি চিত্রকার্য্য তোমারে তুষিতে।

গোরু আর মদ খেয়ে ব্যাস তপোধন—
বদনে চুরুট রাখি,
বদরীতলায় থাকি
নাহি করিলেন বেদ ভারত রচন,
সোলা হেটে তিনি নাহি ঢাকিলা চৈতন।

ত্রেতা যুগে রামচন্দ্র ঠাকুর লক্ষ্মণ,
জানকী উদ্ধারহেতু,
সাগরে বাঁধিলা সেতু,
ঘেরিলা সোনার লঙ্কা বধিতে রাবণ
লন নাই সণ্টবিফ্, ভোজন কারণ!

সংস্কৃত ছন্দে সরস বাঙ্গালা কবিতা রচনায় প্রবীণতা দেখাইয়াছিলেন

[১] "শ্রীহরিমোহন রায় কর্ত্তৃক সংশোধিত", কানাইলাল শীলকে উৎসর্গিত।

[২] "কোন বাঙ্গালী যুবক বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহার ভার্য্যাকে বিবি সাজিতে বড় জিদ্ করেন, তাহাতে সেই যুবতী আদর ও খেদমিশ্রিত স্বরে নিম্নলিখিত ভাবে বলিতেছেন—" ('অবকাশরঞ্জন' দ্বি-স ১৮৮০)।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।[১] বেদজ্ঞ পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী তাঁহার যজুর্ব্বেদ-সংহিতার বঙ্গানুবাদের (১২৮৮) প্রারম্ভে মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত যে "অনুবাদকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়" দিয়াছেন তাহা সবিশেষ উপভোগ্য।[২] প্রথম শ্লোকটি এই,

গৌড়ে, কাল্‌না-স্বরধুনি-তটে ধাইগাঁ গ্রাম জানো,
সেই স্থানে, নরগুরু-কুলে, রামকান্তো ছিলেনো।
পাট্‌না জেলা জজিয়তি পদে মান্যযুক্তো হলেনো
তাঁরী পুত্রো বহুগুণযুতো রামদাসো পিতা নো॥

দেবেন্দ্রনাথ সেনও মন্দাক্রান্তা ছন্দে কবিতা লিখিয়াছিলেন॥

[১] পরে দ্রষ্টব্য। [২] কবিতাটি 'বঙ্গশ্রী'তে (শ্রাবণ ১৩৪১) 'মন্দাক্রান্তা ছন্দে লিখিত একটি বাঙ্গালা কবিতা' নামে পুনর্মুদ্রিত।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

নবীন কবিতার সূত্রপাত

১

পিষ্টপেষিত কবিতার ঝঞ্ঝনাধ্বনির মধ্যে বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী (১৮৩৫-৯৪) নূতন সুর ধরিলেন। বিহারীলাল সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। সংস্কৃত কাব্যের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। বিশেষ করিয়া কালিদাসের ও বাল্মীকির কবিত্বে ইনি ছিলেন ভরপূর। অপরদিকে পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি প্রাণের টান ছিল এবং ইংরেজি কাব্যের সহিতও একেবারে অপরিচয় ছিল না। বিহারীলালের কবিত্ব পোষাকি সাজ নয়, ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। তাই তাঁহার কাব্যসৃষ্টি স্বতঃস্ফূর্ত্ত, অন্তরঙ্গ এবং তাঁহার জীবলীলার অঙ্গীভূত। রবীন্দ্রনাথের কথায়, "তাঁহার মনের চারদিক ঘেরিয়া কবিত্বের একটি রশ্মিমণ্ডল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিত,—তাঁহার মধ্যে পরিপূর্ণ একটি কবির আনন্দ ছিল।" যে কাব্য জীবনের গভীরতর আনন্দ-উপলব্ধির উৎস হইতে উৎসারিত তাহার ভাবে আবেগ ও ভাষায় অস্ফুটতা থাকা অনপেক্ষিত নয়। প্রধানত এই আবেগ-আবিলতার জন্যই বিহারীলালের অকৃত্রিম প্রৌঢ় কবিত্ব তখনকার কাব্য-রসিকদের নজর এড়াইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সহৃদয় যাঁহারা কবির সহিত পরিচিত ছিলেন তাঁহারা সহজেই কবির আনন্দ-স্বরূপের মধ্যে তাঁহার কাব্যের মর্ম্মটি ধরিতে পারিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার বড়াল প্রভৃতি রসসন্ধায়ী ও কবি বিহারীলালের রচনার অনুরাগী ছিলেন। এই অনুরাগ ইঁহাদের মধ্যে দুই একজনের প্রতিভাস্ফূর্ত্তির সহায়ক হইয়াছিল।

হৃদয়াবেগের প্রবলতা ফেনোচ্ছ্বসিত হওয়ায় বিহারীলালের কাব্যের বিষয় তলাইয়া গিয়া প্রায়ই স্পষ্ট ও সুসংহত হইতে পারে নাই, এ অভিযোগ স্বীকার্য্য। ছন্দ লালিত্যময় এবং বেগবান্। তবে ভাষা সর্ব্বত্র কল্পনা-উচ্ছ্বাসের উপযুক্ত নয় এবং ভাবের সঙ্গে তাল রাখিতে পারে নাই। তবুও স্বীকার করিতে হইবে যে বিহারীলালের কাব্যে কল্পনা যেমন মৌলিক ভাষাও মোটামুটি তেমনি প্রকাশক্ষম।

বাঙ্গালা কবিতার ভাষায় তৎসম ও তদ্ভব শব্দের সমান মর্য্যাদা স্বীকার বিহারীলালের বড় কৃতিত্ব। যেমন,

> ফরফর নিশান চলেছে পোতশ্রেণী
> টলমল ঢলঢল, তরঙ্গ দোলায়,
> হাসিমুখী পরী সব আলুথালু বেণী
> নাচন্ত ঘোড়ায় চ'ড়ে যেন ছুটে যায়।[১]

প্রতিভার তুলনায় বিহারীলালের সৃষ্টি প্রচুর নয়, উপযুক্তও নয়। তাঁহার বাষ্পাকুল কবিকল্পনার মধ্যে আবেগের বেগ কম হইলে লেখনীর দৌড় মসৃণতর হইত। তবে তাঁহার কবি-প্রতিভায় খাদ ছিল না, এবং বঙ্গসুন্দরী, সারদামঙ্গল ও সাধের-আসন প্রভৃতি কাব্যের স্থায়ী মূল্য যেমনই হউক আধুনিক বাঙ্গালা অন্তরঙ্গ গীতিকাব্যের আদি কবি তিনিই।

বিহারীলালের সাহিত্যসাধনা প্রকাশ্যভাবে শুরু হয় 'পূর্ণিমা' পত্রিকার পৃষ্ঠায় (১৮৫৮-৫৯)। ইহাতে ইঁহার গদ্য পদ্য রচনা অনেক বাহির হইয়াছিল। গদ্যনিবন্ধ 'স্বপ্নদর্শন' (১২৬৫) ইঁহার প্রথম প্রকাশিত পুস্তিকা। তাহার পর বাহির হয় 'সঙ্গীতশতক' (১২৬৯)। বৈষ্ণব-পদাবলীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বাঙ্গালার বিশুদ্ধ গীতিকবিতার যে ধারাটি নিধুবাবু, শ্রীধর কথক, রাম বসু প্রভৃতির প্রণয়সঙ্গীতে আসিয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল তাহা বিহারীলাল নূতন খাতে বহাইয়া দিলেন সঙ্গীতশতকে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের পুরানো গীত-কবিতার সহিত শেষভাগের নূতন গীতি-কবিতার অখণ্ড সংযোগের সাক্ষ্য দিতেছে বিহারীলালের এই প্রথম গান-কবিতার বইটি। সুরতালের নির্দ্দেশ থাকিলেও সবগুলি ঠিক গানের ঠাটে বাঁধা নয়। যেগুলি গানের ঠাটে বাঁধা সেগুলির ভাবে-ভঙ্গিতে প্রায়ই নিধু-শ্রীধর প্রভৃতির রচনার প্রতিবিম্বন আছে। আর যেগুলি দীর্ঘতর রচনা এবং গানের ঠাটে বাঁধা নয় সেগুলিতে বিহারীলালের পরবর্ত্তী গীতি-কবিতার পূর্ব্বাভাস রহিয়াছে। পর পর দুই রকম রচনারই নিদর্শন দিতেছি।

> মনে যে বিষম সুখ
> কয়ে কি জানান যায়?
> কিছু কিছু পারিলেও
> কিবা ফলোদয় তায়।

[১] নিসর্গসন্দর্শন দ্বিতীয় সর্গ।

কুররী বিজন বনে
কাঁদে গো কাতর মনে,
কেবা বল তাহা শোনে,
বাতাসে ভাসিয়ে যায় ![1]

আকাশে কেমন ওই
নব ঘন যায়,
যেন কত কুবলয়
শোভে সব গায় !
মধুর গম্ভীর স্বরে
ধীরে ধীরে গান করে,
সুধা-ধারা বরষিয়ে
রসায় বসায় ।
শিরোপরে ইন্দ্রধনু
নানা রত্নময় তনু
কত শোভা শ্যামশিরে
শিখর চূড়ায় !
হৃদয়ে তড়িতমালা,
বিশ্ববিমোহিনী বালা,
খেলিতে খেলিতে হেসে
অমনি লুকায় ।...[2]

সঙ্গীতশতক সাধারণ্যে আদৃত হয় নাই, তবে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সেই সূত্রে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও তাঁহার ভ্রাতাদের সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠতা হয় এবং কবির কাব্যকলা অনুকূল শ্রোতার সমর্থন লাভ করিয়া পরিপুষ্টির সুযোগ পায়। বিহারীলালের কাব্যজীবনের ইহা বোধ করি সব চেয়ে বড় ঘটনা।

'বন্ধুবিয়োগ'ও (১৮৭০) প্রথমে পূর্ণিমায় বাহির হইয়াছিল। কাব্যটি পয়ার ছন্দে লেখা, চারি সর্গে গাঁথা। সর্গগুলির বিষয় যথাক্রমে কবির প্রথম পত্নী ও তিন বাল্যবন্ধুর স্মৃতি-বেদনা। রচনারীতি ঈশ্বরগুপ্তীয়। কাব্যটিতে দেশের ও সাহিত্যের প্রতি কবির গভীর অনুরাগের প্রকাশ আছে।

অল্পকাল চলিয়া পূর্ণিমা বন্ধ হইয়া গেলে বিহারীলাল 'অবোধবন্ধু' পত্রিকা আশ্রয় করেন (১২৭০-৭৬)। ইহাতে তাঁহার 'নিসর্গসন্দর্শন' (১২৭৬) ও 'প্রেমপ্রবাহিনী' (১৮৭০) সম্পূর্ণরূপে এবং 'বঙ্গসুন্দরী' (১৮৭০) অংশত প্রথম

[1] গীতসংখ্যা ৪৪ ।
[2] গীতসংখ্যা ৫৫ ।

বাহির হইয়াছিল। নিসর্গসন্দর্শনের সর্গগুলি বিভিন্ন সময়ে লেখা। প্রেমপ্রবাহিণী পয়ারে লেখা, পাঁচ সর্গে। ইহার কিছু অংশ পূর্ণিমায় বাহির হইয়াছিল। কাব্যের মর্ম্মকথা,—সংসারে আসল প্রেমের মর্য্যাদা নাই বুঝিয়া কবি যখন হতাশায় নিমগ্ন তখন অকস্মাৎ তাঁহার চিত্তে দৈবী আনন্দ-উপলব্ধি স্ফূরিত হয়।

আজি বিশ্ব আলো কার কিরণ-নিকরে,
হৃদয় উথলে কার জয়ধ্বনি করে,…
ক্রমে ক্রমে নিবিতেছে লোক-কোলাহল,
ললিত বাঁশরী-তান উঠিছে কেবল!
মন যেন মজিতেছে অমৃত-সাগরে,
দেহ যেন উড়িতেছে সমাবেগ-ভরে।

প্রেমপ্রবাহিণী কবিচিত্তের প্রথম জাগরণের ইতিহাস। কবির আত্ম-বিশ্লেষণ ও স্বরূপ পরিচয়,

সদানন্দ মন ছিল, মগ্ন ছিল ভাবে,
বুদ্ধি সন্থে অন্ধ ছিল সাংসারিক লাভে।
কিন্তু ছিল অতিশয় উদ্ধতের প্রায়,
ভঁড়েদের গ্রাহ্য নাহি করিত কাহায়।
বসে বসে আপনি হইত জ্বালাতন,
খামকা তাপিতে যেত আপন জীবন।
নিজের লেখায় ছিল বিষম বড়াই,
জানিত এ দেশে তার সমজদার নাই।

আত্মপ্রত্যয়ও বেশ ছিল,

ধৈর্য্য ধরি থাক বসি প্রফুল্ল অন্তরে,
যথার্থ বিচার হবে কিছু দিন পরে।
পিতারা নিকটে থেকে তাপে জ্বরজ্বর,
পুত্রেরা হেরিবে দূরে জুড়াবে অন্তর।

বিচারমূঢ় সাহিত্যশাস্ত্রীদের প্রতি বিহারীলালের অপরিসীম অবজ্ঞার প্রকাশ আছে স্পষ্টভাবে,

পরের পাতডাচাটা আপনার নাই,
মতামতকর্ত্তা তাঁরা বাঙ্গালার চাই।
মন কভু ধায় নাই কবিত্বের পথে,
কবিরা চলুক তবু তাঁহাদেরি মতে।
জনমেতে পান নাই অমৃতের স্বাদ!…
অমৃত বিলাতে কিন্তু মনে বড় সাধ!…

সাত সর্গে গাঁথা 'নিসর্গসন্দর্শন'এর (১৮৭০) রচনাকাল ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগ। একদা (১৬ কার্ত্তিক ১২৭৪) রাত্রিকালে যে ভীষণ ঝড় বহিয়া গিয়াছিল তাহা কাব্যটির শেষ তিন সর্গের বিষয়। ছন্দ চারি ছত্রের পয়ার স্তবক, প্রথম-তৃতীয় ও দ্বিতীয়-চতুর্থ ছত্রে মিল। প্রথম সর্গে[১] কবির চিন্তা। সংসারের প্রয়োজনের সঙ্গে কবির স্বাধীনচিত্ততার সংঘর্ষের ফলে কল্পনার স্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়া কবি লোকাবর্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন,

> উথলিছে ভয়ানক চিন্তা-পারাবার,
> তরঙ্গের তোড়ে পোড়ে যত দুব যাই,
> আঁধার আঁধার তত কেবল আঁধার,
> ধাঁদায় কানার মত কূল হাতড়াই।[২]

দ্বিতীয় সর্গে[৩] সমুদ্রদর্শন। সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া রামায়ণ-কাহিনীর স্মরণে কবির মনে দেশের পরাধীনতার বেদনা বাজিয়াছে,

> তোমারি হৃদয়ে রাজে ইংলণ্ড দ্বীপ,
> হরেছে জগত-মন যাহার মাধুরী,
> শোভে যেন রক্ষকুল-উজ্জ্বলপ্রদীপ,
> রাবণের মোহিনী কনক-লঙ্কাপুরী।
> এদেশেতে রঘুবীর বেঁচে নাই আর,
> তাঁর তেজোলক্ষ্মী তাঁর সঙ্গে তিরোহিতা!
> কপটে অনাসে এসে রাক্ষস দুর্ব্বার,
> হরিয়াছে আমাদের স্বাধীনতা-সীতা।[৪]

এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই কুণ্ঠা জাগিল,

> দাঁড়ায়ে তোমার তটে হে মহাজলধি,
> গাহিতে তোমার গান, এল একি গান
> যে জ্বালা অন্তর মাঝে জ্বলে নিরবধি,
> কথায় কথায় প্রায় হয় দীপ্যমান।[৫]

তৃতীয় সর্গে[৬] একটি কাহিনী, বীরাঙ্গনা। কাশীর কাছে কোন গ্রামের এক বধূ বিশ্বস্ত ভৃত্যের সঙ্গে স্বামীর নিকট যাইতেছিল। পথে ঝড় উঠায় তাহারা আশ্রয় লইতে গিয়া দুর্বৃত্তের কবলে পড়ে। প্রভুপত্নীকে রক্ষা করিতে গিয়া ভৃত্য প্রাণ দেয়। তখন সেই বীরনারী খাঁড়া ধরিয়া এক দুর্বৃত্তকে কাটিয়া ফেলিলে অপর সকলে পলাইয়া যায়।

[১] মোট স্তবক-সংখ্যা ২৬। [২] শেষ স্তবক। [৩] মোট স্তবক-সংখ্যা ৪৯। [৪] স্তবক ২৪-২৫। [৫] স্তবক ২৮। [৬] মোট স্তবক-সংখ্যা ৪৯।

চতুর্থ সর্গে[১] নভোমণ্ডল। নির্জ্জন নিশীথে তেতলার ছাদের উপরে শুইয়া কবি আকাশ পানে চাহিয়া ভাবিতেছেন,

শূন্যে শূন্যে মেঘমালে নাচিয়ে বেড়ায়,
চঞ্চলা চপলামালা তব নৃত্যকরী,
যেন মানসরোবর-লহরীলীলায়,
উল্লাসে সন্তরে সব অলকাসুন্দরী।[২]

পঞ্চম সর্গে[৩] ঝটিকার রজনী। বায়ুর তাণ্ডবলীলায় কবি বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছেন,

তুমিই না ছেলেদের ঘুমের বেলায়
"ঘুমপাড়ানী মাসিপিসী" গাও কানে কানে,
বুলাও ফুর্ফুরে হাত শুড়্শুড়িয়ে গায় ?
তাতেই তাদের চোখে ঘুম ডেকে আনে![৪]

ষষ্ঠ সর্গে[৫] ঝটিকাসম্ভোগ। সপ্তম সর্গে[৬] পরদিনের প্রভাত।

বঙ্গসুন্দরী প্রথমে ছিল নয় সর্গ, দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৮০) তৃতীয় সর্গ "সুরবালা" সংযোজিত হইয়া হইল দশ সর্গ।[৭] আসলে সুরবালা স্বতন্ত্র কাব্য এবং ইহা পরবর্ত্তী রচনা সারদামঙ্গলের উপক্রমণিকা। প্রথম সর্গ উপহার। ইহাতে কবিচিত্তের দৈবী অতৃপ্তির প্রকাশ। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে কবি নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারিতেছেন না, তাই

সর্ব্বদাই হু হু করে মন,
বিশ্ব যেন মরুর মতন,
চারিদিকে ঝালাপালা,
উঃ কি জ্বলন্ত জ্বালা!
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ পতন!

কবির চিত্তবিনোদনের একমাত্র অবলম্বন সেই সখার প্রণয় যাঁহাকে তিনি কাব্যখানি উপহার দিতে চাহেন।

[১] ঐ ২১। [২] স্তবক ৬। [৩] স্তবক-সংখ্যা ১৬।
[৪] স্তবক ১৩। [৫] স্তবক-সংখ্যা ৫৮। [৬] ঐ ১২।

[৭] "দ্বিতীয় সংস্করণে সুরবালা নামে একটি সর্গ নূতন সন্নিবেশ, পরাধীনী নাম সর্গের একটি কবিতা ত্যাগ, এবং অন্যান্য সর্গের কোন কোন কবিতার কোন কোন পদপরিবর্ত্তন করা হইল।" "বঙ্গসুন্দরী কাব্যে যে সকল বিষয় আছে, অষ্টম সর্গের প্রথম গীতিটি ব্যতীত, তৎসমস্তই আদৌ ১২৭৪ এবং ১২৭৬ সালের অবোধ-বন্ধু নামক অতীত মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত ৭৬ সালেই পুনর্ব্বার পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। অদ্য ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পূর্ণ হইল। ৫ঠা ফাল্গুন বসন্তপঞ্চমী সরস্বতীপূজা, ১২৮৬ সাল।"

দ্বিতীয় সর্গ নারীবন্দনা। বিচিত্ররূপিণী নারীর স্নেহে জগদীশ্বরীর করুণা ঝরিতেছে। তাঁহারই কমলচরণ ধ্যান করেন "ভাবে গদগদ মানস-খোলা" "প্রেমের সাগর মহেশ ভোলা", তাঁহারই উদ্দেশে কালিন্দীর কূলে দাঁড়াইয়া মদনমোহন রাধা রাধা বলিয়া বাঁশী বাজান, যে বাঁশী শুনিয়া গোপীরা পাগল হইয়া বনে বনে পদাঙ্ক খুঁজিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়,

> না হেরি সেথায় সে নীলকমলে,
> নেহারে সকলে বিকল মনে
> চরণ-প্রতিমা রয়েছে ভূতলে
> বাজিছে নূপুর সুদূর বনে।

তৃতীয় সর্গ সুরবালা। পরে লেখা হইয়াছিল বলিয়া এই কবিতাটির গাঁথুনি অশিথিল ও ভাব পরিপক্ক। কবির সৃষ্ট তিন মাত্রার ছন্দ ইহাতে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। উত্তর-মেঘের অনুসরণে কবি নিসর্গসন্দর্শনের চতুর্থ সর্গে লিখিয়াছিলেন,

> সেখানেতে পথ সব সোনা দিয়ে বাঁধা,
> স্বর্ণস্রোতস্বতী বোলে চোখে লাগে ধাঁধা।
> নীলমণি তরুশ্রেণী শোভে দুই ধারে,
> অপ্সরপ্রার্থিত বালা তলে খেলা করে।

এই ছবিই কবিকল্পনার নূতন রঙে রঞ্জিত হইয়া সুরবালারূপে দেখা দিল,

> একদিন দেব তরুণ তপন,
> হেরিলেন সুরনদীর জলে,
> অপরূপ এক কুমারী রতন,
> খেলা করে নীলনলিনী-দলে।

সুরলোকের এই অমরপ্রার্থিতাকন্যা একদা মর্ত্ত্যলোকে ভূমিষ্ঠ হইল শিশু সুরবালা রূপে। আত্মপ্রতিকৃতি দুহিতাকে রাখিয়া জননী অকালে দেহত্যাগ করিলে স্নেহের বাসা ভাঙ্গিয়া গেল কিন্তু আনন্দমূর্ত্তি কিশোরী সুরবালার অন্তরের আনন্দরস নষ্ট হইল না।

> শ্যামল বরণ, বিমল আকাশ,
> হৃদয় তোমার অমরাবতী,

মূঢ় যাহারা রূপের চটকে ভোলে তাহারা হয়ত সুরবালাকে রূপসী মানিবে না, কিন্তু সহৃদয় যে, যাহার "সরল পরাণে ঘোচেনি পাবন প্রেমের ঘোর", "তাহারি

নয়নে ও রূপমাধুরী, যমুনা-লহরী বহিয়া যায়।" কবির বাল্যবন্ধু সুরবালার রূপে মুগ্ধ।[১] ইনিও স্বর্গীয় শিশু,

চটুল সুন্দর কাহিল শরীর,
ছোট একখানি বসন পরা,
মুখ হাসি হাসি কপোল রুচির,
নয়ন যুগলে আলোক ভরা।

যৌবনারূঢ় হইয়া কবি-সখা বিদেশ ঘুরিয়া আসিলেন, এবং সুরবালার কল্পনামূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইল।

আচম্বিতে আসি হৃদয়ে উদয়,
শ্যামলবরণা নবীনা বালা,
পেশোয়াজ-পরা পারিজাতময়,
গলে দোলে পারিজাতের মালা।

তখন তাঁহার সুখের দিন,

মনের মতন করুণ জননী,
মনের মতন মহান্ ভাই,
মনের মতন কল্পনা রমণী
কোথাও কিছুরি অভাব নাই।

এমন সময় কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার বিবাহ দিলেন অন্যত্র। কবি-সখার মন ভাঙ্গিয়া গেল। কোথাও সান্ত্বনা না পাইয়া তিনি কল্পনা-সঙ্গিনীকে লইয়া হৃদয় জুড়াইতে চাহিলেন। মানসনেত্রে ফুটিয়া উঠিল সুরবালাব অভিমানিনী মূর্ত্তি। অভিমানিনীর অনাদৃত বেশভূষায় নব মাধুর্য্য সঞ্চারিত।

মধুর তোমার ললিত আকার,
মধুর তোমার চাঁচর কেশ,
মধুর তোমাব পারিজাত হার,
মধুর তোমার মানের বেশ!

কিন্তু এ কল্পনাসুখটুকুও স্থায়ী হইল না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু তাঁহাকে বজ্রাহত করিল। জ্ঞানবলে এবং সুরবালা-মূর্ত্তিধ্যানবলে চিত্ত স্থির হইলেও তাঁহার ভাঙ্গা মন আর জোড়া লাগিল না। কবির ভাবনা হইল,

না জানি বিধাত আরো কত দিনে,
হেরিব সখার মুখেতে হাসি!
সে সুরললনা কলপনা বিনে,
কে বাজাবে প্রাণে ভোরের বাঁশী।

[১] ইনি কি কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য?

চতুর্থ সর্গ চিরপরাধীনী। গৃহকোণে আবদ্ধ বাঙ্গালী-ঘরের অবজ্ঞানির্যাতিত বধূর মর্ম্মবেদনার সরল প্রকাশ এই কবিতায়। যতদিন বধূ জ্ঞানের আলোক পায় নাই ততদিন ছিল ভালো, "নিয়ে আপনার এটুকু ওটুকু হেসে খুসে বেশ কাটিতো কাল।" কিন্তু বইয়ের পাতার মধ্য দিয়া যে ভোরের আলো ঝলকাইয়াছে তাহাতে বধূর "ভাঙিয়ে গিয়েছে ঘুমের ঘোর"। তাই তাহার চিত্ত সংসারের খাঁচা হইতে বাহির হইবার জন্য ব্যাকুল। কিন্তু উপায় নাই,

প্রাণের ভিতর উদাস, নিরাশ,
ক্রমেই হুতাশ বাড়িছে মোর,
ওঠো ওঠো প্রায় প্রলয় বাতাস,
অভাগীর বাড়ী হয়েছে ভোর!

পঞ্চম সর্গ করুণাসুন্দরী। পাশের বস্তিতে আগুন লাগিয়াছে। কুটীর-বাসীর হতাশা অট্টালিকাবাসিনী করুণাময়ী বালিকার অন্তর স্পর্শ করিয়াছে।

এই যে দাঁড়ায়ে করুণাসুন্দরী,
উপর চাতালে থামের কাছে,
মুখখানি আহা চুন্‌পনা করি,
অনলের পানে চাহিয়ে আছে!

ষষ্ঠ সর্গ বিষাদিনী। "ধাঙড়া ভাঙড়া বেদড়া বরে" বিবাহিত পতিসুখবঞ্চিত সুন্দরী তরুণীর দুঃখে কবি ব্যথাতুর।

সপ্তম সর্গ প্রিয়সখী। সখীর অলস আঁখির স্মৃতিতে কবি বিহ্বল,

মরি সে নয়ন কেমন সরসে,
যেন কোন রসে রয়েছে ভোর,
যেন আছে আধ আলস-আবেশে,
ভাঙ্গে নাই পূরো ঘুমের ঘোর!

অষ্টম সর্গ বিরহিণী, পতির বিরহে সতী তন্ময়। নবম সর্গ প্রিয়তমা, পত্নীর কোলে শিশুপুত্রকে দেখিয়া কবি মুগ্ধ। দশম সর্গে অভাগিনী ("পতি-পত্র-হন্তা গর্ভবতী নারী")।

বঙ্গসুন্দরীতে বিহারীলাল যে ছন্দের রমণীয়তা দেখাইলেন তাহা প্রাচীন-পন্থীদের রুচিকর হয় নাই। এক সমালোচক লিখিয়াছিলেন, "যাত্রার সুর লইয়া পয়ারের রচনা করাতে কীর্ত্তিলাভের সম্ভাবনা নাই বলিয়াই আমরা চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে সাবধান করিতেছি। তিনি যেন গ্রন্থান্তর রচনাকালে এই গায়ক-ভান পরিত্যাগ করিয়া সুকবিত্ব খ্যাতি লাভ করিতে যত্নবান হয়েন"।[১]

[১] রহস্যসন্দর্ভ পঞ্চম পর্ব্ব পৃ ১৭৩।

বিহারীলালের শ্রেষ্ঠ কাব্য 'সারদামঙ্গল' (১২৮৬)।[১] অন্তরবাসিনী কাব্যলক্ষ্মীকে অন্তরে বাহিরে বিচিত্র কল্পনায় যে-ভাবে ও যে-রূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহাই কবি সারদামঙ্গলে আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সারদামঙ্গল একান্তভাবে "সাব্‌জেক্‌টিভ" অর্থাৎ আত্মগত, অন্তরঙ্গ কাব্য। এখানে কবিকল্পনা যেমন বাষ্পোদ্বেল ও পরিবর্ত্তনশীল কাব্যকল্পনাও তেমনি অবাস্তব ও উদ্বায়ু। সন্ধ্যাসূর্য্যের অন্তরাগ যেমন মেঘের পটে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে রঙ ফিরাইতে থাকে সারদামঙ্গলে রোমান্টিক কবিকল্পনা তেমনি ক্ষণে ক্ষণে রূপ পালটাইয়া চলিয়াছে। কাব্যের আখ্যানবস্তু বলিতে বিশেষ কিছু নাই। কবিচিত্তের সুনিবিড় রসোপলব্ধি কাব্যটির নীহারিকাবৎ উপাদান। রসাবেগ মাঝে মাঝে অত্যন্ত প্রবল হইয়া ভাবকে একেবারে ঝাপসা করিয়া দিয়াছে।

সারদামঙ্গল পাঁচ সর্গে গাঁথা। প্রথম সর্গে[২] কবিচিত্তে কাব্যলক্ষ্মীর প্রথম আবির্ভাব বিশ্বের জীবধাত্রী উষা-গায়ত্রীরূপে। দ্বিতীয় আবির্ভাব বাল্মীকির কবিমানসে করুণাময়ী রূপে। সহচরবিরহে ক্রৌঞ্চীর শোক অরণ্য প্রতিধ্বনিত করিয়া করুণহৃদয় মুনিকে বিহ্বল করিল। সেই কারুণ্যের ক্ষণসংযোগে কবি-মানসে কাব্যসরস্বতী জাগিয়া উঠিল। "যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে" কবির অন্তর হইতে বাহির হইয়া নিখিলের আনন্দলক্ষ্মী উমা রূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন কালিদাসের কাব্যশ্রীমণ্ডিত হইয়া। কবিহৃদয়ে কিন্তু কাব্যলক্ষ্মী দেখা দিতে লাগিলেন দুইরূপে—আনন্দলক্ষ্মী রূপে ও করুণাময়ী বিষাদিনী রূপে। কবিজীবনের নিগূঢ় বিরহব্যথায় আনন্দলক্ষ্মীর রূপ ক্ষণে ক্ষণে ঢাকা পড়িয়া যায়, তখন মৃত্যু হয় বাঞ্ছনীয়। তবুও সান্ত্বনা জাগে,

হেরিবে কাননে আসি
অভাগার ভস্মরাশি
অথবা হাড়ের মালা, বাতাসে ছড়ায়,
করুণা জাগিবে মনে—
ধারা ববে দু-নয়নে
নীরবে দাঁড়াইয়া রবে, প্রতিমার প্রায়।

[১] "১২৭৭ সালে 'সারদামঙ্গল' রচনা আরম্ভ হইয়া অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া থাকে, ১২৮১ সালে 'আর্য্যদর্শন' পত্রে তদবস্থাতেই প্রকাশিত হয়, এক্ষণে সম্পূর্ণ হইল।" জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নীর অনুরোধে কাব্যটিকে সম্পূর্ণ করিবার প্রেরণা পাইয়াছিলেন, এই কথা কবি 'সাধের আসন' কাব্যে বলিয়াছেন।

[২] মোট স্তবক-সংখ্যা ৩৫।

দ্বিতীয় সর্গে[1] হারানো আনন্দলক্ষ্মীর উদ্দেশে কবিচিত্তের অভিসার। কবিচিত্ত যেন সতীহারা শিব। দীর্ঘ বিরহের হতাশা,

কেমনে বা তোমা বিনে
দীর্ঘ দীর্ঘ রাত্র দিনে
সুদীর্ঘ জীবন-জ্বালা স'ব অকাতরে,
কার আর মুখ চেয়ে
অবিশ্রাম যাব বেয়ে
ভাসায়ে তনুর তরী অকূল সাগরে!

শেষে বলিষ্ঠ সান্ত্বনা,

মহান্ মনেরি তরে
জ্বালা জ্বলে চরাচরে,
পুড়ে মরে ক্ষুদ্রপ্রাণ পতঙ্গের প্রায়!
জ্বলুক যতই জ্বলে,
পর জ্বালা-মালা গলে,
নীলকণ্ঠ কণ্ঠে জ্বলে হলাহল-দ্যুতি!

তৃতীয় সর্গে[2] কবিচিত্তের দ্বন্দ্ব। হারানো আনন্দরসের অন্বেষণে হয়রান হইয়া কবিচিত্ত দ্বিগুণ ব্যথিত। অথচ আনন্দ-উপলব্ধির চকিত আভাস হইতেও একেবারে বঞ্চিত নয়। ইহাই জীবনের বিচিত্র দ্বন্দ্ব, "সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা"।

বাসনা বিচিত্র ব্যোমে
খেলা করে রবি সোমে
পরিয়ে নক্ষত্র তারা হীরকের হার,
প্রগাঢ় তিমির-রাশি
ভুবন ভরেছে আসি
অন্তরে জ্বলিয়ে আলো, নয়নে আঁধার।

কিন্তু আনন্দের সাড়া তো প্রাণে সব সময় জাগে না। তাই ব্যাকুল প্রশ্ন,

কোথা সে প্রাণের পাখী,
বাতাসে ভাসিয়ে থাকি
আর কেন গান কোরে ডাকে না আমায়!
বল দেবী মন্দাকিনী,
ভেসে ভেসে একাকিনী,
সোনামুখী তরীখানি গিয়েছে কোথায়!

[1] আরম্ভের "গীতি" ছাড়া স্তবক-সংখ্যা ২২।
[2] আরম্ভের "গীতি" ছাড়া স্তবক-সংখ্যা ৪২।

চতুর্থ সর্গে[১] হিমালয়ের উদার প্রশান্তির মধ্যে কবিচিত্তে আশ্বাসলাভ-প্রয়াস। পঞ্চম সর্গে[২] সেই পুণ্যভূমিতে অভিলষিত আনন্দ-উপলব্ধি,

এমন আনন্দ আর নাই ত্রিভুবনে!
হে প্রশান্ত গিরি-ভূমি,
জীবন জুড়ালে তুমি
জীবন্ত করিয়ে মম জীবনের ধনে!
এমন আনন্দ আর নাই ত্রিভুবনে!

'সারদামঙ্গল' নামকরণে কবি প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যের রীতি অনুসরণ করিয়াছেন। কাব্যটি গীতিপ্রণোদিত এবং গীতিবহুল, প্রাচীন ও আধুনিক দুই অর্থেই গীতি কাব্য। কাব্যের বিষয়ও দেবীমাহাত্ম্য, তবে লোক-উপাস্য দেবী নয়—কাব্যসরস্বতী।

সারদামঙ্গলের ভাষা কবিকল্পনার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। অর্থাৎ ইহার ভাষা ও ভাব দুইই অস্ফুট, কলগুঞ্জিত। মার্জ্জনার অভাব আছে কিন্তু কুণ্ঠা ও কৃত্রিমতা নাই। আদ্যোপান্ত তিন মাত্রার তরল ছন্দের পরিবর্তে ত্রিপদীঘেঁষা দীর্ঘ স্তবক ব্যবহৃত হইয়াছে। সারদামঙ্গলের ছন্দের অসাধারণ বিশেষত্ব প্রতি সর্গের শেষ ছত্রের মিল।

'মায়াদেবী'[৩] ক্ষুদ্র কাব্য। ইহার প্রথম তিন স্তবক কবির জ্যেষ্ঠপুত্র অবিনাশচন্দ্রের রচনা। 'শরৎকাল'এ[১] কয়েকটি খণ্ড-কবিতা সঙ্কলিত। 'নিশীথ সঙ্গীত'[৪] কবিতার এই স্তবকে ইংরেজি-অনুপ্রাণিত সমসাময়িক বাঙ্গালা কাব্যের প্রতি অবজ্ঞা ব্যক্ত।

এখন ভারতে ভাই,
কবিতার জন্ম নাই,
গোরে বসে অট্টহাসে কেরে কার ছায়া?
হা ধিক্! ফেরঙ্গ বেশে
এই বাল্মীকির দেশে
কে তোরা বেড়াস্ সব উল্কী-মুখী আয়া?

[১] ঐ ২৮। [২] আরম্ভের ও শেষের "গীতি" দুইটি ছাড়া স্তবক-সংখ্যা ২৬।

[৩] কবির জ্যেষ্ঠ পুত্র অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সঙ্কলিত বিহারীলালের গ্রন্থাবলীতে (দুই খণ্ড ১৩০৭, ১৩২০) সঙ্কলিত। মায়া দেবীর প্রথম প্রকাশ ভারতী ১২৮৯।

[৪] গ্রন্থাবলীতে সঙ্কলিত। প্রথম প্রকাশ প্রয়াস ১৮৯৯।

কবিতাটির শেষে কবিচিত্তের সুগভীর প্রেমের প্রকাশ,

ধিক্ রে অধম ধিক্
ভালবাসা 'প্লেটোনিক'
ছদ্মবেশী রসিক মধুর "মিয়ু মিয়ু",
প্রেমের দরাজ্ জান্,
আকাশে ঢালিয়া প্রাণ
সজোরে পাপিয়া হাঁকে "পীহ, পীহ, পীহু"।
দুর্ব্বহ প্রেমের ভার
যদি না বহিতে পার
ঢেলে দাও আকাশে বাতাসে ধরাতলে!
(মিটায়ে মনের সাধ
ঢালিয়া দিয়াছে চাদ)
ঢেলে দাও মানবের তপ্ত অশ্রুজলে!

শেষ স্তবকটি কিছু পরিবর্দ্ধিত হইয়া 'সাধের আসন' কাব্যে স্থান পাইয়াছে।

'ধূমকেতু'[১] (রচনাকাল ১১৮৯) কবিতা মাত্র। 'দেবরাণী'ও[১] তাই। 'বাউলবংশতি'[২] কবিরচিত বাউলগানের সঙ্কলন। আরো কয়েকটি গান ও কবিতা 'কবিতা ও সঙ্গীত'[৩] নামে সঙ্কলিত আছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা একটি পত্র-কবিতা (৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৭১) 'পুণ্য' পত্রিকায় (১৩০৭ অগ্রহায়ণ) বাহির হইয়াছিল।

কবিতা-ও-সঙ্গীতের একটি গানে ভাষা ও ছন্দের লালিত্য অভিনব,

পাগল করিল রে, তার আঁখি দুটি
তরঙ্গে টলমল নীল নলিন ফুটি।...
লুটিছে অঞ্চল
অনিলে চঞ্চল,
মকর-কেতন চরণে লুটালুটি।...

বাউল-বিংশতির কোন কোন গানে লীরিক রসের নিবিড়তা আছে। নিম্নে উদ্ধৃত গানটিতেও (১০) কবি প্রিয়া-আঁখিপ্রসাদের জয়গান গাহিয়াছেন।

[১] গ্রন্থাবলীতে সঙ্কলিত। প্রথম প্রকাশ প্রয়াস ১৮৯৯।
[২] গ্রন্থাবলীতে সঙ্কলিত। কয়েকটি গানের প্রথম প্রকাশ কল্পনা ১২৯৪।
[৩] গ্রন্থাবলীতে সঙ্কলিত। প্রথম প্রকাশ ভারতী ১২৮৯ এবং প্রয়াস ১৮৯৯

সে দুটি নয়ন!
জীবন আমার।
ত্রিভুবন হাসিতেছে কিরণে তাহার!
সে সুধাংশু করি পান
জুড়ায়েছে মন প্রাণ,
হেসে খেলে চলে যাব, ভাবনা কি তার!
যে জন্য এখানে আসা,
পরিপূর্ণ সে পিপাসা;
রুধিয়া অন্তের আশা থাকিব না আর—
বেশি থাকিব না আর॥

বিহারীলালের শেষ কাব্য 'সাধের আসন'[১] সারদামঙ্গলের পরিশিষ্টের মত। বিশুদ্ধ আনন্দরসোপলব্ধিকে এই কাব্যে কতকটা বাস্তব ও তত্ত্ব-রূপ দিবার চেষ্টা হইয়াছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী (মৃত্যু ১২৯০) বিহারীলালের কাব্যের, বিশেষ করিয়া সারদামঙ্গলের, অনুরক্ত পাঠিকা ছিলেন। ইনি কবিকে একটি পশমের আসন বুনিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে সারদামঙ্গলের এই কয় ছত্র তোলা ছিল,

হে যোগেন্দ্র! যোগাসনে
ঢুলু ঢুলু ঢুনয়নে
বিভোর বিহ্বল মনে কাঁহারে ধেয়াও?

কবির কাছে তাঁহার ভক্ত পাঠিকা এই সমস্যাপূর্ত্তি চাহিয়াছিলেন। কবি স্বীকৃত হইয়া তিনটি শ্লোক রচনা করিয়া ভুলিয়া গিয়াছিলেন। প্রশ্নকর্ত্রীর অকালবিয়োগের পর তবে সে কথা মনে পড়ে। তখন 'সাধের আসন' লিখিয়া কবি প্রতিজ্ঞা-পূরণ করেন।

সাধের আসনে উপসংহার ছাড়া দশ সর্গ। প্রথম সর্গ মাধুরী।[২] "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা", তাঁহারই উপলব্ধি বিচিত্ররূপের মধ্যে। ইনি বিশ্ববিমোহিনী মায়া,

কবিরা দেখেছে তাঁরে নেশার নয়নে।
যোগীরা দেখেছে তাঁরে যোগের সাধনে।

[১] প্রথম তিন সর্গ প্রথমে মালঞ্চে (১২৯৫-৯৬) প্রকাশিত। পরে কবি সর্গগুলি পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করেন। শেষের সর্গগুলি কবির জীবৎকালে প্রকাশিত হয় নাই।

[২] মোট স্তবক-সংখ্যা ৩০।

বিশ্বাত্মা দেবী তিনিই, যাঁহার মহান্ মূর্ত্তি দশদিকে স্ফূর্ত্তি পায় এবং "অনাদি অনন্ত কাল লোটে পদতলে!" মানব মনের উদার সুষমাও তিনি।

দ্বিতীয় সর্গ[১] গোধূলি ও নিশীথে। কবি বাল্যস্মৃতিসুপ্ত মাতৃরূপ ধ্যাননেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, তাঁহার "ফিরিয়া আসিছে যেন হারানো পুরাণ সুখ"। তৃতীয় সর্গ[২] প্রভাত ও যোগেন্দ্রবালা। কবি উপলব্ধি করিতেছেন,

তোমারি এ রূপরাশি
আকাশে বেড়ায় ভাসি,...
আপন লাবণ্যে তুমি বিভাসিত আপনি।
মোহিত হইয়া গাথে ভক্তিভাবে ধরণী।

চতুর্থ সর্গ[৩] নন্দনকানন। কবি প্রিয়ার রূপে জগৎলক্ষ্মীর প্রতিমা দেখিতেছেন। প্রিয়ার ভালবাসায় তিনি নিখিল মানবকে ভালোবাসিয়াছেন এবং আপনাকেও।

ভালবাসি নারী নরে,
ভালবাসি চরাচরে,
ভালবাসি আপনারে, মনের আনন্দে রই।

পঞ্চম সর্গ[৪] অমরাবতীর প্রবেশ পথ। কবি-চিত্ত যোগেন্দ্রবালাকে খুঁজিতে চলিয়াছে সেখানে। ষষ্ঠ সর্গ[৫] কে তুমি? "মর্ত্তের নির্ম্মল দিবা জীবলীলা অবসানে" পতিব্রতা মেয়ে চলিয়াছে অমরাবতীর পথে। কবিকে দেখিয়া তাঁহার চোখে জল ভরিয়া আসিল। সতীর সে অশ্রুবিন্দু কবির তৃষিত মন জুড়াইয়া দিল।

সপ্তম সর্গ[৬] মায়া। পতিব্রতা সতী অমরাবতীতে প্রবেশ করিলেন, কবির দ্বার রোধ করিল দ্বাররক্ষী কপিলা গাভী। অষ্টম সর্গ[৭] শশিকলা, স্থির-সৌদামিনী ও বীণা। আনন্দলক্ষ্মীর বালিকা-রূপের এই তিন বিচিত্র প্রকাশ অমরাবতীতে। সেখানে মায়াবিনী কাব্যসরস্বতী "করেছে মায়ার মন্ত্রে আকাশ পাতাল একাকার একাকিনী।"

নীল আকাশের তলে
স্বর্গের প্রদীপ জ্বলে
আকাশ-গঙ্গার জল
করিতেছে ঢলঢল,
কালের জটার জালে দোলে মন্দাকিনী—

[১] ঐ ৬+১৫। [২] ঐ ৭+৯। [৩] ঐ ২৫। [৪] ঐ ২৬। [৫] ঐ ২৩।
[৬] স্তবক-সংখ্যা ৩৩। [৭] ঐ ১১ এবং "কিন্নরগীতি"।

নবম সর্গ[১] আসনদাত্রী দেবী। ইঁহারই অনুরাগ ও উৎসাহ কবির এবং দেবীর আত্মীয়স্বজনের কাব্যসৃষ্টির আনুকূল্য করিয়াছিল।

সাক্ষাৎ আমার প্রাণ
'সারদামঙ্গল' গান,
অসম্পূর্ণ পড়েছিল, যেন মরে গিয়েছে,
বেসুরা বীণার মত
জানি না কি দশা হ'ত!
তোমারি আদরে দেবী! ফিরে প্রাণ পেয়েছে।
তোমার উৎসাহ-ধারা
বিচিত্র বিদ্যুৎপারা,
কতই বোবার মুখে কত কথা যুটেছে,
কতই পরমানন্দে
কত মত ছন্দবন্দে,
কত ভাবে ভঙ্গিমায়,
ইংরাজি ফরাশি কত বাঙ্গালায় বলেছে।

ইঁহার অবর্ত্তমানে কবির আশঙ্কা, "এদেশে ভারতী দেবী[২] বুঝি প্রাণে বাঁচে না"।

কারো বাজিল না মনে,
বজ্রাঘাত ফুলবনে!
সাহিত্য-সুখের তারা নিবে গেল কি কারণ।

দেবীর "করুণ নয়ন দুটী সদাই প্রাণেতে ভায়"—এই স্মৃতিই জানাইয়া দিল যে ইঁহাকেই কবি অমরাবতীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিলেন,

যোগেন্দ্রবালার কাছে
যে সব সঙ্গিনী আছে,
খেলিতে তাঁদের সনে দেখেছি আমি তোমায়,
করুণ নয়ন দুটি এখনো প্রাণেতে ভায়!

দশম সর্গ[৩] পতিব্রতা। পতিব্রতা সতীর প্রেমের মর্য্যাদা পুরুষে বোঝে না। তাই কবি বলিতেছেন, "যাও মা অমরাবতী, এস না ধরায়", তোমার প্রেম ব্যক্তিবিশেষকে তৃপ্তি না দিয়া যেন বিশ্বমানবের ব্যথায় শান্তি আনে।

প্রাণের অমৃত-রাশি
ঢেলে দাও মানবের তপ্তঅশ্রুজলে!

[১] আরম্ভের "গীতি" ছাড়া স্তবক-সংখ্যা ২০।
[২] ভারতী পত্রিকার প্রকাশে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নীর বিশেষ উৎসাহ ছিল।
[৩] আরম্ভের "গীতি" ছাড়া ১২ স্তবক মাত্র।

উপসংহারে[১] প্রশ্ন জাগিয়া রহিল, "কোথা সেই শ্যামাঙ্গী সুন্দরী !"

সারদামঙ্গলে রূপক এতটা অপরিণত যে তাহা প্রায় আভাসেই রহিয়া গিয়াছে। সাধের-আসনে রূপক অনেকটা দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে, তবে সুপরিস্ফুট কাহিনীতে গাথা পড়ে পাই। ইমোশনের অভিসারে ইহার বেশি হয়ত আশা করা যায় না॥

২

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮-৭৮) প্রধানত ক্লাসিকাল রীতির অনুশীলন করিলেও বিহারীলালের রোমান্টিক প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। বিহারীলালের মত তিনিও বিশেষ ভাবে প্রেমের কবি। সুরেন্দ্রনাথের বিশিষ্ট কাব্য 'মহিলা'র পরিকল্পনা বিহারীলালের বঙ্গসুন্দরী পাঠের ফল। অপর দিকে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের অনেক বিষয়ে মিল আছে। দুইজনেই যশোর জেলার লোক, সংস্কৃত- ও ফারসী-জানা এবং নীতিকবিতারচয়িতা। সুরেন্দ্রনাথ অধিকন্তু নিজের চেষ্টায় ইংরেজি সাহিত্যে প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের কাব্যকলা উচ্ছ্বাসবিহীন, চিন্তাগাঢ় ও দৃঢ়বদ্ধ। বাক্য তৎসমশব্দ-বহুল এবং সংক্ষিপ্ত, ক্রিয়াপদের—বিশেষত অসমাপিকার—প্রয়োগ কম। সংস্কৃতের অনুযায়ী উপমারূপক ও অনুপ্রাস প্রয়োগ ইঁহার রচনারীতির বিশিষ্টতা। যেমন শরৎশেষের প্রাতঃসূর্য্য বর্ণনা,

> পারদ মাথায় কিবা শারদ-শরীরে
> কাশ-ফুল কাননে দোলায়।
> কুয়াসার যবনিকা অন্তরালে ধীরে,
> হাসো বসি হেমন্ত উষায়।[১]

অথবা সন্ধ্যাদীপহস্ত বালিকার বর্ণনা,

> প্রদীপ লইয়া করে, সমীর শঙ্কায়
> এলো বালা সুমন্দগমনে,
> দীপ্ত মুখ, দীর্ঘ রক্ত-প্রদীপ-শিখায়,
> চুম্বিত, চঞ্চল সমীরণে।[২]

[১] শেষে "শোক-সঙ্গীত" ও "শান্তি-গীতি" ছাড়া মোট স্তবক-সংখ্যা ১১।

[২] সবিতা-সুদর্শন।

কিংবা পত্নীবিয়োগে কবির উক্তি,[১]

> ওখানে গগনে কা'ল ছিল এক তারা
> কে জানে কেমনে আজ কোথা হল হারা ?
> বারিধিবিপুলকূলে বালুকা বিস্তার,
> কে জানে কোথায় গেল এক কণা তার !

সুরেন্দ্রনাথের প্রথম-প্রকাশিত কাব্য 'ষড়ঋতুবর্ণন'[২] বাল্যরচনা। ১২৬৬ সালের শেষের দিকে 'মঙ্গল ঊষা' পত্রিকা বাহির হয়। তাহাতে সুরেন্দ্রনাথের কতিপয় কবিতা এবং প্রবন্ধ ছাপা হইয়াছিল। বিবিধার্থসংগ্রহেও দুই একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। রূপক কবিতা 'মাদক-মঙ্গল' ১২৭৪ সালে লেখা। 'সবিতা-সুদর্শন' ও 'ফুলরা' নামক গাথা কবিতা দুইটি ১২৭৫ সালে রচিত এবং পুস্তিকাকারে প্রকাশিত। দুইটিই আখ্যায়িকা কাব্য। আবুল ফজলের ভাই ফৈজী আকবরের আদেশে হিন্দুশাস্ত্র শিখিবার জন্য অনাথ ব্রাহ্মণবালকের ছদ্মবেশে সুদর্শন নাম ধরিয়া কাশীতে আসিয়া এক বিখ্যাত পণ্ডিতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। বালকের সৌন্দর্য্যে ও প্রতিভায় আকৃষ্ট হইয়া আচার্য্য তাহাকে গৃহে স্থান দেন। অবিবাহিতা বালিকা কন্যা সবিতা ছাড়া আচার্য্যের আর কেহ ছিল না। সুদর্শন ও সবিতা একত্র থাকিয়া অগোচরে পরস্পরের প্রতি প্রণয়াসক্ত হইল। সুদর্শনের যখন চোখ ফুটিল তখন নিজেকে সবিতার কাছ হইতে তফাতে রাখিতে লাগিল। সুদর্শনের ভাববিকৃতি দেখিয়া আচার্য্য মনে করিলেন তাহার অভিমান হইয়াছে। তিনি সুদর্শনকে একান্তে ডাকিয়া বলিলেন যে তাহার হস্তে সবিতাকে সমর্পণ করিয়া তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। সুদর্শন তখন মিথ্যার বোঝা আর বহন করিতে পারিল না, নিজের প্রকৃত পরিচয় দিল। অন্তরাল হইতে সবিতা তাহা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইয়া মূর্চ্ছায় ঢলিয়া পড়িল। সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গিল না। কন্যার মৃত-দেহের সৎকার করিয়া আচার্য্য তুষানলে দেহত্যাগ করিলেন। ইহাই সবিতা-সুদর্শনের কথাবস্তু।

ফুলরার আখ্যানবস্তু সবিতা-সুদর্শনেরই মত। সবিতা-সুদর্শনের নায়ক-নায়িকার মিলনের বাধা ধর্ম্ম, ফুলরায় সমাজ। 'বর্ষবর্ত্তন' (১৮৭২) আত্মচিন্তা ও নীতিমূলক কাব্য। সুরেন্দ্রনাথ সংস্কৃত ও ইংরেজি হইতেও কিছু অনুবাদ করিয়াছিলেন।

[১] মহিলা কাব্যের শেষে যোগেন্দ্রনাথ সরকার লিখিত কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী দ্রষ্টব্য।

[২] "ষড়্ঋতুবর্ণন কোন বন্ধু কর্ত্তৃক মৃজাপুর বিশ্বাস কোম্পানির যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। এখন উহা আর পাওয়া যায় না।"

কবির মৃত্যুর পর 'মহিলা' কাব্য প্রকাশিত হইয়াছিল (প্রথম অংশ ১৮৮০, দ্বিতীয় সংস্করণে দুই অংশ একত্র ১৩০৩)। কাব্যটি সম্পূর্ণ হয় নাই বলিয়া[১] কবি কাব্যের কোন নাম দেন নাই। রচনাকাল শ্রাবণ-ফাল্গুন ১২৭৮। বঙ্গসুন্দরীতে বিহারীলাল নারীর কয়েকটি বিশেষ অবস্থার চিত্র আঁকিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ নরজীবননাট্যে নারীর তিন প্রধান ভূমিকায় বন্দনা করিয়াছেন—মাতা, জায়া ও ভগিনী। শেষের ভূমিকায় শুধু চারিটি স্তবক লেখা হইয়াছিল। এটুকু ছাড়িয়া দিলে মহিলা কাব্যের তিন ভাগ।

প্রথম ভাগ উপহার। এখানে কবি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, "ধাতার করুণা মর্ত্তে নারী অবতার" কেমন করিয়া আদিম যুগে ধীরে ধীরে নরপশুর পশুত্ব লোপ করাইয়া সভ্যসমাজের পত্তন করিল। সংসার সৃষ্টি করিয়া বিধাতা দেখিলেন যে অভাবহীনতা সত্ত্বেও কি যেন অপূর্ণতার বেদনা বিশ্বমানবকে পীড়িত করিতেছে। তখন তিনি ধ্যানে বসিয়া বুঝিলেন এবং নারীকে সৃজন করিয়া সৃষ্টির অপূর্ণতা দূর করিলেন, "ভূলোক পুলকপূর্ণ, জন্মিল ললনা!"

বিকচপঙ্কজ-মুখে শ্রান্তি পরশিত
সলাজ লোচন ঢলঢল,
চাঁচর চিকুর চারু চরণ-চুম্বিত,
কি সীমন্ত ধবল সরল!···
পূজিবার তরে ফুল ঝ'রে পড়ে পায়,
হৃদি-ফল পরশে পাখীতে,
মুগ্ধ-মুখ কুরঙ্গিনী মুগ্ধ মুখে চায়,
ধায় অলি অধরে বসিতে!
স্পর্শে পদ রাগ-ভরা,
অশোক লভিল ধরা,
এল-কেশে কে এল রূপসী!—
কোন্ বন-ফুল কোন্ গগনের শশী!

নারী-প্রকৃতি আত্মোৎকর্ষের যে স্তরে উঠিয়াছে নর-প্রকৃতি যখন সেই স্তরে উন্নীত হইবে তখনই ভূতলে স্বর্গরাজ্যে নামিয়া আসিবে,

স্বার্থ-সাধনের তরে,
নরে না হানিবে নরে,
কৃপাণে রচিবে হল-ফল!—
গীতে লীন হইবে কলহ-কোলাহল!

[১] মহিলার প্রকাশক কবির কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার ১২৮৭ সালে প্রকাশিত প্রথম অংশের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন, "অকরুণ মৃত্যু, কবিকে কাব্যখানির নামকরণ করিয়া যাইতেও অবকাশ দেন নাই, বর্ত্তমান নাম আমরা উপস্থিত মতে নির্ব্বাচিত করিয়া দিলাম।"

দ্বিতীয় ভাগ মাতা। বাঙ্গালীর সংসারে সূতিকাগৃহের শোচনীয়তা এবং অন্তঃপুরের দুরবস্থার বর্ণনায় কবি মুখর। মেয়েদের কষ্ট দেয় বলিয়াই

বাঙ্গালী বাহিরে যায়,
কোথায় না মারি খায়,
বাঙ্গালী প্রবল মাত্র আপনার ঘরে।

তৃতীয় ভাগ জায়া। প্রসঙ্গক্রমে বিবাহপ্রথা বিবাহ-উৎসব পূর্ব্বরাগ বিধবার অবস্থা নারী-স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আছে। পত্নীর প্রতি কবির প্রেম এত সুগভীর যে পরলোকে গেলেও তাঁহার আত্মা প্রিয়ার সঙ্গসুখের লোভে ফিরিবে।

প্রভাতে হাসিব আমি বসিয়া তপনে,
হেরে তব রক্ত-মুখ নব জাগরণে !···
প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি সমীর-শঙ্কায়
আনিবে অঞ্চলে ঝাঁপি যখন সন্ধ্যায়,
হেরে উচ্চ রক্ত-শিখা প্রকাশিত তার,
জেনো আমি রাগভরে,
বসিয়া সে শিখা পরে,
চঞ্চল হয়েছি মুখ চুম্বিতে তোমার !
নিবিলে জানিবে, খেলা-কৌতুক আমার !!

সুরেন্দ্রনাথ টডের রাজস্থান-কাহিনী অনুবাদ করিয়াছিলেন (১২৮০-৮৫)। অপর গদ্য গ্রন্থ 'বিশ্বরহস্য' (১৯৩৪ সংবত, ১৮৭৭-৭৮)। 'হামির' নাটক প্রকাশিত হইয়াছিল কবির মৃত্যুর পরে (১৮৮১)।[১] সন্ধ্যার প্রদীপ কবির বিশেষ প্রিয় উপমান ছিল। এবিষয়ে তিনি একটি স্বতন্ত্র কবিতাও লিখিয়াছিলেন।[২] ইহার প্রথম স্তবকটি এই

হের দেখ জ্বালিয়াছে প্রদীপ সন্ধ্যার—
দেবরূপ দৃশ্য ধরা পরে !
চারিদিকে ছায়া পড়ে কাঞ্চন কায়ার—
আলো দ্বীপ অন্ধকার সাগরে ;
ললিত লীলায় কায়,
হেলে দুলে বিনা বায়,
শিখায় শরীর মাঝে নড়ে যেন প্রাণ.
দীপ নয়—যেন কোন দেব বিদ্যমান !

[১] সুরেন্দ্রনাথের অনেক গদ্য পদ্য রচনা পরে 'নলিনী' পত্রে বাহির হইয়াছিল।

[২] 'নলিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত (১২৮৭), 'প্রদীপ' পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত (বৈশাখ ১৩০৭)।

৩

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গুণী ও প্রতিভাবান্ সন্তানদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ বিচিত্রতর মনীষার অধিকারী ছিলেন। কনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের মত জ্যেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রনাথের (১৮৪০-১৯২৬) প্রতিভাও শুধু কাব্য-অনুশীলনে সীমাবদ্ধ থাকে নাই। সঙ্গীত, রেখাচিত্র, রেখাক্ষর-বর্ণমালা, গণিত, তত্ত্ববিদ্যা ও দর্শন প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথের অনুসন্ধিৎসা ছিল। কিন্তু কোন বিষয়েই তাঁহার

তত্ত্ববিদ্যা।

প্রথম খণ্ড—জ্ঞানকাণ্ড।

...নাথ ঠাকুর কর্তৃক

...যন্ত্রে মুদ্রিত।
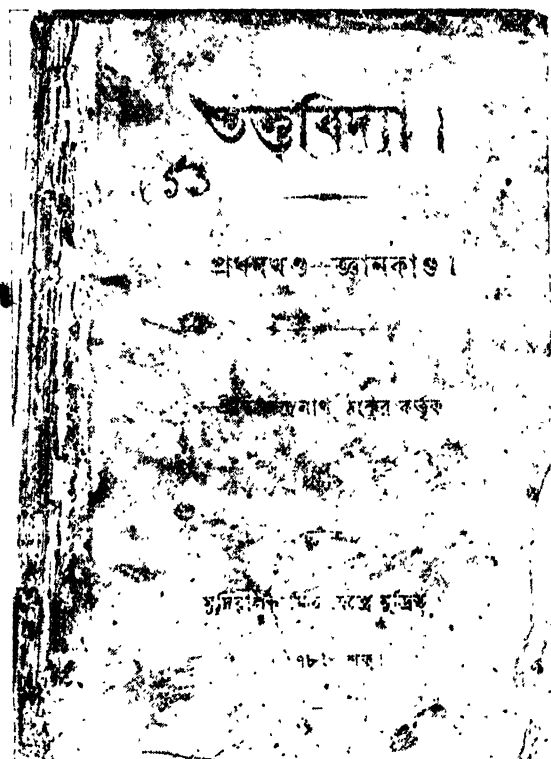
মন নিবদ্ধ থাকিত না, কেবল দর্শন-আলোচনা ছাড়া। আসল কথা হইতেছে যে দ্বিজেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বে প্রবল নিরাসক্তি ও অসাংসারিক ঔদাসীন্য ছিল বলিয়া কোন কাজে তাঁহার মন শিকড় গাড়িয়া বসিত না। তাই তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টি ও তত্ত্বালোচনা দুইয়েরই মধ্যে যেন অমনস্কতার ছাপ রহিয়া

গিয়াছে। কিন্তু ঠিক এই জন্যই দ্বিজেন্দ্রনাথের কাব্যকলায় এমন একটু লঘু সৌকুমার্য্যের সঞ্চার হইয়াছে তাহা আর কোথাও পাওয়া যায় নাই।[১] দ্বিজেন্দ্রনাথের গদ্য ও পদ্য রচনার রীতি অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত্ত এবং একান্তভাবে নিজস্ব। বিহারীলালের ও দ্বিজেন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টিতে মিল রহিয়াছে শুধু রূপকের আশ্রয়েই নয় প্রধানত কল্পনার স্বতঃস্ফূর্ত্তিতে এবং রচনার স্বাচ্ছন্দ্যেও। তবে বিহারীলালের কাব্যে গঠনশিল্পের অভাব আছে, আর দ্বিজেন্দ্রনাথের কাব্যে অনুভূতির উল্লাস মননশীলতায় নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রথমযৌবনের কাব্যরচনা মেঘদূত-অনুবাদের উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি। ইহা রসজ্ঞদের অনুমোদন লাভ করিয়াছিল। পিতার 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' (১৮৫২) অবলম্বনে ইনি 'পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম' রচনা করিয়াছিলেন। "মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি"—ইঁহার এই গান জাতীয়-আন্দোলনের মূলমন্ত্রের মত হইয়াছিল। ইনি ব্রহ্মসঙ্গীতও লিখিয়াছিলেন। এগুলি কবিতা হিসাবে অকিঞ্চিৎকর। দ্বিজেন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভার আসল পরিচয় 'স্বপ্নপ্রয়াণ'এ। যে ভাবাবেগে ভোর হইয়া কবি এই অদ্বিতীয় কাব্যখানি রচনা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার জীবনে পুনরাবৃত্ত হয় নাই।

'স্বপ্নপ্রয়াণ'এর (১৮৭৫)[২] রচনাকালের (১৮৭২-৭৩) কথা রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে বলিয়াছেন, "বড়দাদা তখন দক্ষিণের বারান্দায় বিছানা পাতিয়া সামনে একটি ছোট ডেস্ক লইয়া স্বপ্নপ্রয়াণ লিখিতেছিলেন। গুণদাদাও রোজ সকালে আমাদের সেই দক্ষিণের বারান্দায় আসিয়া বসিতেন। রসভোগে তাঁহার প্রচুর আনন্দ কবিত্ববিকাশের পক্ষে বসন্ত-বাতাসের মত কাজ করিত। বড়দাদা লিখিতেছেন আর শুনাইতেছেন আর তাঁহার ঘন ঘন উচ্চহাস্যে বারান্দা কাঁপিয়া উঠিতেছে। বসন্তে আমের বোল যেমন অকালে অজস্র ঝরিয়া পড়িয়া গাছের তলা ছাইয়া ফেলে তেমনি স্বপ্নপ্রয়াণের কত পরিত্যক্ত পত্র বাড়িময় ছড়াছড়ি যাইত তাহার ঠিকানা নাই। বড়দাদার কবিকল্পনায় এত

[১] সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গদ্য রচনায় অনেকটা এই ভাব আছে।

[২] দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩০৩, তৃতীয় ("নবতম") সংস্করণ ১৯১৪। নবতম সংস্করণে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন হইয়াছে। অনেক স্তবক পরিত্যক্ত এবং একাধিক স্তবক সংহত হইয়াছে। প্রথম সর্গ বঙ্গদর্শনে (শ্রাবণ ১২৮০) বাহির হইয়াছিল।

অজ্ঞাতনামা এক কবিও 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্য (১২৮৬) লিখিয়াছিলেন পারিবারিক কথা লইয়া। রচনাটি চারি "প্রহর"এ বিভক্ত। চতুর্থ প্রহরে দ্বিজেন্দ্রনাথের কাব্যের প্রভাব আছে।

প্রচুর প্রাণশক্তি ছিল যে, তাঁহার যতটা আবশ্যক তাহার চেয়ে তিনি ফলাইতেন অনেক বেশি। এইজন্য তিনি বিস্তর লেখা ফেলিয়া দিতেন।"

স্বপ্নপ্রয়াণ মনোজগতের রূপক। সেই হিসাবে স্পেন্‌সরের 'ফেয়ারী কুইন' কাব্যের এবং বনিয়ানের 'পিল্‌গ্রিমস্ প্রোগ্রেস' আখ্যায়িকার সঙ্গে তুলনা চলে। তবে স্বপ্নপ্রয়াণের রূপকত্ব সাহসিক কল্পনার উদ্দামতায় এবং শিল্পের কারুকার্যে অনেকটা ঢাকা পড়িয়াছে। স্বপ্নপ্রয়াণ আধ্যাত্মিক কাব্য নয়, পুরাপুরি সাহিত্য-রসাত্মক কাব্য। কবিকল্পনার মায়াজাল স্বপ্নপ্রয়াণে জ্যোৎস্নানিশীথের আলোছায়ার আলিম্পনমণ্ডিত কল্পপুরীর মোহমহিমা সঞ্চার করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কথায় "স্বপ্নপ্রয়াণ যেন একটা রূপকের অপরূপ রাজপ্রাসাদ। তাহার কত রকমের কক্ষ গবাক্ষ, চিত্র, মূর্তি ও কারুনৈপুণ্য। তাহার মহলগুলি বিচিত্র। তাহার চারিদিকের বাগানবাড়িতে কত ক্রীড়াশৈল, কত ফোয়ারা, কত নিকুঞ্জ, কত লতাবিতান। ইহার মধ্যে কেবল ভাবের প্রাচুর্য্য নহে, রচনার বিপুল বিচিত্রতা আছে। সেই যে একটি বড় জিনিষকে তাহার কলেবরে সম্পূর্ণ করিয়া গড়িয়া তুলিবার শক্তি, সেটি ত সহজ নহে।" ছন্দের ও ভাষার অসঙ্কোচ নিরঙ্কুশতা স্বপ্নপ্রয়াণের রচনা-মাধুর্য্যের বড় বিশেষত্ব। ইহা দ্বিজেন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভারও একটা বিশিষ্ট চিহ্ন। কাব্যের নায়কের মুখ দিয়া কবি নিজেরই পরিচয় দিয়াছেন,

"হে রাজন্! কবিতা-কমলিনীর
সবিতা নিরথ এই। বর-পুত্র সারদা-দেবীর
কবি কহে, "আমি
করি পাগলামি,
তা' যদি কবিতা হয় ভাগ্য সে কবির।"

মিত্রাক্ষর স্তবকের ছত্রে অসম যতির ব্যবহার করিয়া কবি বিস্ময়াবহ ছন্দোনৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। স্বপ্নপ্রয়াণের ছন্দোমাধুর্য্যের আর একটা বিশেষত্ব হইতেছে মিলের সৌষম্য। মিল অপ্রত্যাশিত হইলে ছন্দের সৌন্দর্য্য বাড়ে।[১] যেমন,

মরণেরে বরিয়াছে পরাণের প্রিয়!
কথায় এখন কারো[২] কান দিবে কি ও?

[১] রবীন্দ্রনাথের ছন্দোমাধুর্য্যেরও একটা বিশিষ্ট লক্ষণ অপ্রত্যাশিত অন্ত্যানুপ্রাস। ভাষা মাধুর্য্যেও জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠের রচনায় ঘনিষ্ঠ মিল আছে।

[২] প্র-স; তৃ-স "ভুলানে কথায় আর"।

তদ্ভব ও তৎসম শব্দের অনির্ব্বিচার ব্যবহারে এবং কথ্য ও লেখ্যভঙ্গির মিলনে স্বপ্নপ্রয়াণের রচনায় পদলালিত্যের সঙ্গে প্রসাদগুণের শুভসংযোগ ঘটিয়াছে, এবং সেইসঙ্গে কবির কৌতুকগম্ভীর ভাব বর্ণনায় অন্তরঙ্গ উজ্জ্বলতা দিয়াছে। যেমন,

ডাল পালা—জানালার দ্বার দিয়া
শশী দেখে মুখশশী নভস্তলে বসি' বাব-দিয়া
মরে মনোদুখে,
হাসে তবু মুখে!
মেঘের আড়াল পে'লে বাঁচিত কাঁদিয়া!
জল পেয়ে প্রাণ পেয়ে-উঠে তরু,
শষ্পি'-উঠে তৃণ-ভূমি, বাষ্পি'-উঠে তপ্ত যত মরু।
মনে পেয়ে আশা
হাসি'-উঠে চাসা
মাঠ-ময় বাজি-উঠে ভেকের ডমরু॥

দ্বিজেন্দ্রনাথের কাব্যকলা উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষার মৌলিকতায় ঝলমল, অনুপ্রাসের গুঞ্জনে কলকূজিত।[১] যেমন,

সরিৎ ত্বরিত বহে তট চুমি' চুমি'।

যথায় মহাবট, শিরে জট, অতি নিবিড়,
পালিছে চুপে-চাপে, খোপে-খাপে, অদ্ভুত নীড়।
নমনা নামি' নামি', উর্দ্ধগামী হইয়া উঠি'
বহে বিপুল ভার, অন্ধকার ধরে ভ্রূকুটি॥

কল্পনা সুধীরে উঠি',
ধরি' কপাট-দুটি,
আঁখিরে দিল ছুটি
বাহির পানে॥

কবি কহে কোথায় সে দিন হায়!
সেই সন্ধ্যাকাল[২], যবে পূর্ণিমার প্রেম-পিপাসায়
আগে-ভাগে[৩] শশী
উঠি' আছে বসি'—
ফুল কুড়া'তেছি মোরা, বকুল-তলায়!

[১] এইখানেও রবীন্দ্রনাথের রীতির সঙ্গে মিল আছে।
[২] "সন্ধ্যা না হইতে" তৃ-স। [৩] "পূর্ব্ব দিকে" ঐ।

মধ্যাহ্ন-দিবসে, আঁধার নিবসে !
তিলার্দ্ধ নড়ে না রাতি, অরণ্যের প্রশ্রয়-সাহসে।
সঙ্কট বড়ই !
গর্জ্জে শুন' অই—
গুহার ভাঙ্গিছে ঘুম উহার তাড়সে ॥

স্বপ্নপ্রয়াণ-কাহিনীতে রূপকের সঙ্গে রূপকথা জড়াইয়া আছে। সুপ্তিমগ্ন কবিচিত্ত উন্মনা রাজপুত্রের মত নিরুদ্দেশের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। প্রথম স্বর্গ মনোরাজ্য-প্রয়াণ।[১]

সুপ্তিতে ডুবিয়া গেল জাগরণ,
সাগর-সীমায় যথা অস্ত যায় জ্বলন্ত তপন।

অমনি স্বপন-রমণী আসিয়া "কবির মনো-মন্দিরে খুলি দিল রহস্যের চাবি"। দেখিতে দেখিতে ছায়া-পথ বাহিয়া কামচারী মনোরথ নামিয়া আসিল। স্বপনের আজ্ঞায় কবি রথে উঠিলে সারথি কল্পনা-কুমারী রথ চালাইয়া দিল মনোরাজ্যের অভিমুখে। কল্পনার সঙ্গে মনোরাজ্যে অভিসার কবির চিরবাঞ্ছিত।

তোমা-সঙ্গে তথায় না যা'ব যদি
কেন তবে এতেক সাধা-সাধনা শৈশব-অবধি।
অই মম তপ
অই মম জপ,
অই চাঁদে উনমাদ বাসনা-জলধি ॥[২]

দ্বিতীয় সর্গ নন্দনপুর-প্রয়াণ।[৩] মনোরাজ্যে পৌঁছাইয়া দিয়া কল্পনা চলিয়া গেল, কবির অন্তরের আনন্দ তিরোহিত হইল। তখন সখ্যরস আসিয়া কবিকে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিল। দাস্যরস আসিয়া অতিথিসৎকার করিলে সখ্যরস কবিকে নন্দনপুরের পরিচয় দিল। নন্দনপুরের রাজা আনন্দ, রাণী মায়া, দুহিতা কল্পনা। জ্যেষ্ঠ-পুত্র প্রমোদ মাতার-প্রদত্ত বিলাসপুর রাজ্যে আমোদে মত্ত রহিয়াছে। দূত আসিয়া খবর দিল কবিকে রাজা ডাকিছেন। সখ্যের সঙ্গে কবি রাজার কাছে গেলে চিনিতে পারিয়া রাজা সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন,

"শূন্য মোর পূর্ণ হ'ল এত দিন পরে।
সেই তুমি কবি
ফিরিতে অটবী,
ঘরে না থাকিতে স্থির মুহূর্ত্তের তরে।
ধীর যুবা এবে দেখি মনোহর !"

১ স্তবক-সংখ্যা প্র-স ২৫, তৃ-স ২৪। ২ "অই দিকে ধায় সদা বাসনার নদী" প্র-স।
৩ স্তবক-সংখ্যা প্র-স ১৭৩, তৃ-স ১৫১।

কবিও আনন্দ-নিকেতন পূর্ব্বপরিচিতের মত দেখিল। রাজার আদেশে কবিকে সখ্যরস বিলাসপুর দেখাইবার ভার লইল। নন্দনপুরে বিচিত্র দৃশ্য দেখিবার পর কল্পনার সঙ্গে কবি গেল গহন-মন্দিরে মায়ার দর্শনে। দুই সহচরীর সঙ্গে কল্পনা যেই শোভার সুখরাজ্য বনে প্রবেশ করিল অমনি

দক্ষিণের দ্বার খুলি মৃদুমন্দ-গতি
বনভূমে পদার্পিয়া[1] ঋতুকুলপতি
লতিকার গাঁটে গাঁটে ফুটাইল[2] ফুল।
অঙ্গে হেরি পরাইল[3] পল্লব-দুকূল॥
কি জানি কিসের লাগি হইয়া উদাস
ঘরের বাহির হ'ল মলয়-বাতাস।
ফুলের ঘোমটা খুলি কাড়য়ে সুবাস,
"এ নহে সে" বলি' শেষে ছাড়য়ে নিশ্বাস॥[4]

কবি দেখিল মায়া তাঁহারই মাতৃমূর্ত্তি। মায়ার পাগলী সই রাজসী কবির চোখে ভাবাঞ্জন লাগাইয়া দিল। ভাবনেত্রে কবি কল্পনার লীলাবিলাস দেখিতেছে এমন সময় অকস্মাৎ মায়ার অপর সখী তামসী আসিয়া উপস্থিত হইলে ভাবতন্দ্রা ছুটিয়া গেল বিষণ্ণমনে সখ্যের সঙ্গে নৌকায় চড়িয়া কবি বিলাসপুর যাত্রা করিল।

তৃতীয় সর্গ বিলাসপুর-প্রয়াণ।[5] শৈশবসখা প্রমোদ বহুকাল পরে কবিকে দেখিয়া চিনি চিনি করিয়া বলিল,

মন মোর বলিতেছে তোমা-সনে পরিচয় আছে।
কোথায় আলয় ?

কবি আত্মপরিচয় দিল,

ভাতে যথা সত্য-হেম, মাতে যথা বীর,
গুণ-জ্যোতি হরে যথা মনের তিমির!
নব শোভা ধরে যথা সোম আর রবি,
সেই দেব-নিকেতন আলো-করে কবি।

[1] "বাহির হয়্যাছে কিবা" তৃ-স। [2] "ফুটাইতে" ঐ। [3] "পরাইছে" ঐ।
[4] "ভয়ে ভয়ে পদার্পয়ে, তবু পথ ভুল্যে
গন্ধ-মদে ঢলি-পড়ে এ ফুলে ও ফুলে।" প্র-স।
[5] স্তবক-সংখ্যা প্র-স ১৮৬, তৃ-স ১৫৬।

জানিয়া প্রমোদ উল্লসিত হইয়া আগাইয়া আসিল,

"স্বপ্ন দেখিতেছি একি। করিয়াছি দেব-নিকেতনে
কত কাব্য-পাঠ,
কত বাল্য-নাট!
কবিবরে দেখি আজি একি শুভক্ষণে!"

কবি বাল্যসুখস্মৃতির কথা তুলিলে প্রমোদ বাধা দিয়া বলিল,

"ও সুর আজিকে নয়!
পরিয়াছে নব বসন্তের সাজ নিকুঞ্জনিলয়—
দেখিয়াছ তাহা?" [১]

প্রমোদের আদেশে লালসার নৃত্যগীত আরম্ভ হইল। অতৃপ্তকর্ণে গান শুনিতে শুনিতে কবির "আঁখি উঠিল বাদলি"। গান থামিলে কবি প্রমোদকে বলিল,

কে বুঝে তোমার লীলা। এ যে সেই পুরাণো পূরবী—
যাহা তার-স্বরে
প্রাসাদ-শিখরে
গাহিতাম দু-সখায় অস্তে গেলে রবি।[১]

গানের পুরস্কার বলিয়া কবি লালসার গলায় কল্পনা-প্রদত্ত মালা পরাইয়া দিল। হাস্যরস সেই মালাটি লালসার কাছ হইতে চাহিয়া লইয়া কল্পনাকে দেখাইয়া কবিকে অপ্রতিভ করিল। কল্পনার অভিমান কবির চিত্তে বিরহবেদনা জাগাইল।[২] তাহা ভুলাইবার জন্য সখ্যরস তাহাকে প্রমোদের রাজসভায় লইয়া আসিল। সেখানে বীররস রসাতল-রাজের কবল হইতে আশ্রয়প্রার্থিনী প্রমদাকে লইয়া আসিলে যখন প্রমোদের আদেশে ভৃত্যেরা তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া যাইতেছে তখন রসাতলাধিপতির ছদ্মবেশী অনুচর দৈত্যেরা তাহাকে হরণ করিয়া পলাইল। দুঃখিত হইয়া কবি রাজসভা পরিত্যাগ করিল, সখ্য-রস অনুগামী হইল। কল্পনার বিরহে কাতর হইয়া কবি প্রকৃতি-মাতার সান্ত্বনা খুঁজিল।

দেখিতে না পারে দুঃখ কাহারো—অতীব বোধবান
বনস্পতি ওষধি সরিৎ সিন্ধু প্রস্তর পাষাণ।
আমরা যখন যাব বন-সামিয়ানা-তল দিয়া,
সম্মুখে হরিণ আসি' দাঁড়াইবে ঘাড় উঁচাইয়া,

[১] প্র-স নাই। [২] পৌরাণিক পারিজাতহরণ কাহিনী এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

শ্যাম উতপল-আঁখি নিপাতিয়া জিজ্ঞাসা-মানসে,
আমরা বলিব 'ভয় নাই মৃগ বেড়াও হরষে।...'

ঠাহরিয়া ক্ষণকাল স্থির র'বে হরিণ-শাবক,
শাখা-যুত দুই শৃঙ্গ দোঁহে মোরা করিব আটক।
ছাড়াইতে শৃঙ্গ-দুই হরিণ-শাবক রহি' রহি'
বাঁকাইবে ঘাড় মনোহর নাটে, উপদ্রব সহি'॥

সখ্যের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া কবি একরোখে চলিয়া প্রমোদের অধিকারের বাহিরে বিষাদারণ্যে গিয়া পড়িল। সেখানে সূর্য্যালোক কখনো পড়ে না, সেখানে "দিনমানে ডাকে শিবা রাত্রি-অনুমানে।" চেতনা দেবী আবির্ভূতা হইয়া কবিকে সমঝাইয়া দিলেন, "বিষাদ-অরণ্যে আর কিছু নাই কেবলি শোচনা!" কবি প্রণাম করিতে না করিতেই দেবী অন্তর্ধান করিলেন।

ঘনাইয়া অমনি বন-আঁধার,
পাতিল ভয়ের দুর্গ, দশদিক্ করি' একাকার।...
ডাকিলে সাড়া-দিবার নাহি লোক।
নিশ্বাসিয়া উঠে ঝাউ, কত যেন হইয়াছে শোক।...

বড় বাদুড়ের পাখা
ঝাপটি' তরু-শাখা
গতি করিয়া বাঁকা
বাজিয়া যায়!
কভু বা বন-বিড়াল
বাহিয়া-উঠি' ডাল
লয়ে লুটের মাল
লাফায় গায়॥

চতুর্থ সর্গ বিষাদপুর-প্রয়াণ।[১] বিষাদারণ্যে পথহারা হইয়া কবি নানা-প্রকার বিভীষিকা দেখিতে লাগিল। কিছু দূর গেলে জাড্যের ভক্ত অনুচর দানব আধি ও ব্যাধি তাহাকে ধরিয়া বিষাদ-নরপতির কাছে লইয়া চলিল। অদ্ভুতরসের বিভীষিকার দলও সঙ্গ লইল।

দূরে প্রেত যক্ষ
করে ঘোর লক্ষ,
নিকটে দেখায় যেন তরুটা কেবল॥

[১] স্তবক-সংখ্যা প্র-স ৯১, তৃ-স ৯০।

ঝুপ্‌সি-ঝাপ্‌সি বন-আবডালে,
হাপ্‌সি-বদন-সব উঁকি দেয়, ভর-দিয়া ডালে।
কিম্ভূত-আকার,
অতি চমৎকার,
প্রকাশ-পাইয়া উঠে, জোনাক্‌-মশালে॥

অবশেষে দানব-রাজের নিকেতন

দেখা-দিল অট্টালিকা মহাকায়;
পার্শ্বে পড়িতেছে ভাঙি', উচ্চ শিরে মহীরু শিথায়।
ভাঙা জানালায়
বায়ু ফুসলায়,
আছেন কাল-পেচক থামের মাথায়॥

ভাঙ্গা ফটক দিয়া প্রাসাদে ঢুকিয়া কবি সভাগৃহে উপস্থিত হইল।

হাঁ করিয়া আছয়ে প্রচণ্ড ঘর,
জানালা ঠেলিয়া বায়ু চলি'-যায়, বলি 'সর সর্‌'![১]

সভাসদেরা আসন গ্রহণ করিলে বিষাদ-ভূপ গন্ধর্ব্ব হাহাহুহু আসিয়া সিংহাসনে বসিল। বসিয়াই মন্ত্রীকে লইয়া পড়িল,

"তুমি যেন ঠিক হৃষিকেশ॥
বারো-মাস অনন্ত-শয্যায় লীন,
একরতি চেতন কেবল হয় বেতনের দিন!"
মন্ত্রী বলে, "ভূপ
বেতন কিরূপ
দু-চক্ষে না দেখিলাম বৎসরেক তিন"

রাজা বলিল,

ছিলে শুধু অস্থি
হইয়াছে হস্তী,
বেতন পে'লে কি আর থাকিবে পৃথিবী?

রাজা হাই তুলিলে "কুড়ি কুড়ি অমনি পড়িল তুড়ি, যুড়ি' সব ঠাঁই।" তাহার পর কাজ দেখিতে চাহিলে মন্ত্রী বলিল, "কোন কাজ অবশিষ্ট নাই," তবে কিনা

"কাজের নাহিক আদি, নাহি শেষ!
যত করা যায় কাজ, তত বাড়ে, সমুদ্র-বিশেষ!

১ "থামান দুষ্কর" প্র-স।

হও তুমি রুক্ষ
তাতে নাই দুঃখ।
চাহিলেই দিব আমি কাজের নিকেশ ॥”

প্রথমে গুরু ভণ্ড-তপ ও চেলা কপট-বৈরাগ্যের বিচার হইল, তাহার পর কবির। প্রমোদের গুপ্তচর সন্দেহ করিয়া কবিকে কারারুদ্ধ করা হইল এবং স্থির হইল নরবলি দিবার জন্য তাহাকে ভয়ানক-রসের কাছে পাঠানো হইবে। অন্ধ কারাকক্ষে

অতি উচ্চ প্রাচীরের উচ্চ দেশে,
জানালা দেখিয়া কবি, চাহিয়া রহিল অনিমেষে !
আলোকের পথ
খুলিয়া ঈষৎ,
জ্যোৎস্না পড়োছে মারা, পদ দ্বয় এসে ॥

আধি-ব্যাধি আসিয়া কবিকে পাতালের গহ্বর-পথে লইয়া চলিল।

পঞ্চম সর্গে রসাতল-প্রয়াণ।[১]

গম্ভীর পাতাল ! যথা কাল-রাত্রি করাল-বদনা
বিস্তারে একাধিপত্য ! শ্বসয়ে অযুত ফণি-ফণা
দিবা-নিশি ফাটি' রোষে, ঘোর নীল বিবর্ণ অনল
শিখা-সঙ্ঘ আলোড়িয়া দাপাদাপি করে দেশময়
তমোহস্ত এড়াইতে।

সেই পাতালে ভয়ানক-রস দলবল জড় করিয়াছে দেখিয়া কবি ভয়ে শিহরিল। ভয়ানক-রস পুরোহিতকে ডাকিয়া বলিল, চামুণ্ডা দেবীর কাছে ইহাকে বলি দাও—“সমরে অমর হই, এ মোর মানস”। এমন সময় এক করালমূর্ত্তি কাপালিক আসিয়া উপস্থিত, তাহার “পিঙ্গল নয়নে যেন মহেশের কোপানল-জ্বালা !” কাপালিক কবিকে ভোগবতী-কূলে লইয়া গিয়া অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় বাঁধিয়া রাখিল। বন্ধনে পড়িয়া কবি মায়া-জননীকে স্মরণ করিতে লাগিল। ভৈরব কাপালিক শবসাধনায় বসিল।

শবের সে বুকের উপরে চড়ি',
মুখে ঢালি-দেয় মদ্য, ভয়ানক মন্ত্র পড়ি' পড়ি'।

[১] স্তবক-সংখ্যা প্র-স ১৪৭, তৃ-স ১৪৬।

ক্ষণে ক্ষণে শব
করে আর্ত্ত রব,
ক্ষণেকে চেতন পেয়ে উঠে ধড়-মড়ি' ॥
ভৈরব করিতে থাকে মন্ত্র-জপ,
মর-মর শবদ করিয়া উঠে শ্মশান-পাদপ,
রহিয়া রহিয়া
মাঠ-মধ্য-দিয়া
আলেয়া চলিয়া-যায় করি দপ্ দপ্ ॥

বলি দিবার পূর্ব্বে কাপালিক চামুণ্ডাকে আহ্বান করিয়া স্তব পড়িতে লাগিল। স্তব-পাঠ শেষ হইলে

রম্ ঝম্ রম্ ঝম্ শব্দ উঠে।
ভূত-প্রেত-পিশাচ দাঁড়ায় সবে, যোড় কর-পুটে
আইল কালিকা
কপাল-মালিকা,
বল্লু-মেঘে, বক্ত-জিভা, সন্ধ্যা-রাগে ফুটে ॥

কালীমূর্ত্তি দেখিয়া কবি দ্বিগুণ কাতর হইয়া মায়া-মাতাকে ডাকিতে লাগিল,

সেই স্নেহের বদন
অভয়-সদন
একটিবার দেখাও জননি, দেখিয়া মরি!

তখন করুণাদেবী আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার

বাহন নধর
নব-জলধর,
পশু না পক্ষী না, পাছে ক্লেশ পায় প্রাণী ॥

করুণা আসিয়া কবির হাতে রাখী বাঁধিয়া দিলেন, কবি কাপালিকের অদৃশ্য হইল। নরবলি না পাইয়া ডাকিনী-যোগিনীরা কাপালিককে খাইতে আসিলে কাপালিক পলাইল, কালিকামূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল এবং কবির বন্ধন আপনা-আপনি খসিয়া গেল। কবিকে সঙ্গে লইয়া করুণা পাতালগহ্বরে গিয়া প্রমদাকে মুক্ত করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিলেন।

ষষ্ঠ সর্গ সমর-প্রয়াণ।[১] বীর-রসের ও ভয়ানক-রসের দলের যুদ্ধ এবং

[১] স্তবক-সংখ্যা প্র-স ১২৩, তৃ-স ১১৭।

ভয়ানকরসের সৈন্যের পরাজয়। তাহার পর দুই দলের প্রধান বীরদের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ—দাক্ষ্যের সহিত দুর্ভিক্ষের, স্বাস্থ্যের সহিত মারীর, মৈত্রের সহিত হিংসার এবং কৌশলের সহিত অত্যাচারের, এবং দ্বিতীয় পক্ষদের পরাজয়। শেষে ভয়ানক-রসের সঙ্গে বীর-রসের যুদ্ধ ও ভয়ানক-রসের পরাজয়।

সপ্তম সর্গে শান্তি-প্রয়াণ।[১] যুদ্ধের নিষ্ঠুর দৃশ্য দেখিয়া কবির অন্তরে বৈরাগ্যের উদয় হইলে কবি করুণাকে কাতরভাবে ডাকিতে লাগিল। সুসঙ্গকে লইয়া দেবী স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিলেন এবং কবিকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, সুসঙ্গ তোমাকে তপঃ-পর্ব্বতে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে। সুসঙ্গের সঙ্গে কবি চলিল তপঃপর্ব্বতে। সেখানে কবি দম-শমের উপদেশ লাভ করিল,

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চাও যদি,
শ্রেয়ঃপথে চলিতে আরম্ভ কর, আজিকে অবধি।
এসেছ হেথায়
যখন, বৃথায়
বহিয়া না যায় যেন জীবনের নদী।

দমের কাছে ধৈর্য্য-কবচ ও শমের কাছে জ্ঞান-পরশু লাভ করিয়া কবি সুসঙ্গের পিছু পিছু তপোগিরিশিখরে উঠিতে লাগিল। নানাপ্রকার প্রলোভন ও ইন্দ্রিয়বিকার তাহাকে টলাইতে বৃথা চেষ্টা করিল। মানবহৃদয়ের দহতর ক্ষুদ্রতায় ব্যথিত হইয়া কবি সুসঙ্গের কাছে দুঃখ করিতে লাগিল,

কি আছে এ ছার ভব-ধামে ?
আছে বটে প্রেম-রত্ন! কিন্তু কোথা! প্রেম শুধু নামে।

চাবি-বন্ধ হৃদয় সকলি প্রায়, দৃঢ়-মুষ্টি কর!
পদ-প্রসারিতে-মানা চারিদিকে গণ্ডি-আঁকা ঘর!
এ করিছে গর্জ্জন, ও কাঁপে থর-থর, এর মুখ
ভ্রুকুটিতে ভয়ঙ্কর, শোক-দুঃখে ওর ফাটে বুক!

এ'র অভিমান উঠে সকল-হইতে উচ্চে চড়ি',
সাধ-যায় চরাচর পদতলে যা'ক্ গড়াগড়ি!
ও দাঁড়ায় কর-যোড়ে অত্যাচার-ভারে অবনত,
যত ভার চাপাও ততই সহে বলদের মত।

[১] স্তবক-সংখ্যা প্র-স ১৭৯, তৃ-স ১৭১।

কিন্তু কোথা হেন মন, কিছু যাঁতে নাহি ফের-ফার ?
কোথায় সে মন, যাঁর আছে বোধ—হৃদয় সবার
এক ছাঁচে ঢালা, কেহ নহে পর, এক বাসস্থান
সকল জগ-জনের, ক্ষুধা-তৃষ্ণা সবার সমান ॥

সুসঙ্গ কবিকে সান্ত্বনা দিল,

কবি তুমি—কিসের দুঃখ তোমার, কথা পেলে প্রাণে
ফুটিয়া কহিতে পার' বেদনা জগত-জন-কাণে !
যাহা শুনি' অশান্ত নিতান্ত যে বালক—খেলা ত্যজি'
সেও বসে শান্ত হয়ে ! সেও তার ভাব-রসে মজি'

আপন কাজল আঁখি করয়ে সজল। সেইরূপ
নীল-সরসিজ-দলে হিম-বিন্দু ঝরে টুপ, টুপ,
তখন যামিনী-মাতা মনে পেয়ে যাতনা দুঃসহ
বিদায়-চুম্বন তান তাহারে সজল-আঁখি সহ ॥...

অরণ্যের পাখী তুমি, বিলাপের ধ্বনি কেন মুখে !

চিরকাল তুমি অরণ্যের পাখী' থাকিবেও তথা
চিরকাল ! বলিতেছি আমি সেই অরণ্যের কথা,
যে অরণ্য বাতাসের সনে মুখামুখি কথা কয়—
ডরে না ঝড়ে-ঝাপটে, দিগন্ত-প্রাচীরে বদ্ধ নয়,

আপনে আপনি রঙ্গে বিস্তারিয়া সদানন্দ-শাখা !

চিত্তে পরম শান্তি লাভ করিয়া কবি আনন্দ-ভূপতির রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। রাজা প্রমোদকে রাজ্যভার ছাড়িয়া দিতে এবং কল্পনাকে কবির হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। করুণা আসিয়া প্রমদার সঙ্গে বীর-রসের বিবাহ দিতে বলিলেন। মিলন-উৎসব সম্পন্ন হইল। অবশেষে গভীর নিশীথে পর্ব্বতশিখরে দেবতারা মিলিয়া পরমব্রহ্মের স্তব গাহিলেন। কবির স্বপ্নপ্রয়াণ শেষ হইল। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে নিদ্রাভঙ্গে কবি যখন বাহির উদ্যানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তখনো

নিঃশব্দ-তরঙ্গবতী
চলে গঙ্গা[১] ভাগীরথী
ধীরে ধীরে[২] সাগরের পানে ।

ভারতীতে দ্বিজেন্দ্রনাথের যে-কয়টি কবিতা বাহির হইয়াছিল তাহার মধ্যে

[১] "নিরখিল" প্র-স। [২] "চলিতেছে" ঐ।

'অন্তিম বাসনা' উল্লেখযোগ্য।[১] 'গুম্ফ-আক্রমণ কাব্য'[১] লঘু সরস কবিতা, তিন সর্গে গ্রথিত।

'যৌতুক না কৌতুক?'[১] (১৮৮৩) ক্ষুদ্র গাথা-কাব্য। কাহিনী রূপকথার মত, সরস ও কৌতুকাবহ। সুরাজ্যের রাজা সুরসেনের পুত্র কুমারসেন। তাহাকে নিতান্ত বালক রাখিয়া রানী স্বর্গে গেলে রাজা শোক ভুলিবার জন্য বৎসরান্তে নূতন রানী ঘরে আনিল। যথাসময়ে নূতন রানীর পুত্র হইল, নাম রঙ্গনাথ। কুমারের মুখে নূতন রানীর প্রতি "মা" সম্বোধন না শুনিয়া রাজা ক্ষুব্ধ ছিল। নবকুমারের জন্মের পর ক্ষোভ বিদ্বেষে পরিণত হইল, রানী তাহাতে যোগান দিতে লাগিল।

অঙ্গার ছিল আগে মনের কালি—
ক্রোধের ধরিল আগুন,
মহিষী দিল তাহা ফুঁ-দিয়া জ্বালি—
জ্বলিয়া উঠিল দ্বিগুণ॥

রাজা রঙ্গনাথকে যুবরাজ মনোনীত করিলে কুমারসেন মাতুলালয়ে চলিয়া গেল, সেখানে তাহার "পড়াশুনায় কাটে দিন"।

একদা মৃগয়ায় যাইতে কুমারসেনের মন হইল। ঔৎসুক্যের ঝোঁকে রাত্রি আর পোহায় না।

সঘনে ফিরয়ে পাশ, পোহায় না রাতি।
প্রহর বাজিল যেই
ভাবে "চারি বাজে এই,"
দুফুর বাজিতে শুনি দমি' যায় ছাতি॥

অবশেষে ঘড়িতে তিনটা বাজিতে কুমারসেন শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া

বয়স্য-দলের ঘরে
প্রবেশি' উল্লাস-ভরে
বলে, "ওঠো ওঠো জাগো, রাত্রি আর নাই।"
কারো বা নাসিকা ডাকে,
ঢোক গিলে থাকে থাকে,
ঈষৎ নয়ন মেলি' আবার যা তাই॥

১ 'কাব্যমালা'য় (১৩২৭) সঙ্কলিত।

কেহ বলে "রাত্রি ঢের",
বলিয়া ঘুমায় ফের,
কেহ বলে, 'সবে আগে একসঙ্গে যোঠো" ।
কুমার বলিল, "কি এ !
ম'রেছ না আছ জিয়ে—
শত ডাকে সাড়া নাই ! ওঠো ওঠো ওঠো !"

মৃগের পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে কুমারসেন দ্বিপ্রহরে রৌদ্রতাপে অবসন্ন হইয়া মূর্চ্ছা গেল। জ্ঞান হইলে দেখে সে পুকুরের ধারে শুইয়া আছে, কতকগুলি সুন্দরী তরুণী শুশ্রূষা করিতেছে। সেদেশের স্বাধীন রাজকুমারীর সখী তাহারা আসিয়াছিল দেবদর্শনে। কুমারসেন সুস্থ হইলে তাহাকে দেবালয়ের পথ দেখাইয়া দিয়া তরুণীরা চলিয়া গেল। কুমারসেন আসিয়া দেবালয়ের আতিথ্য স্বীকার করিল।

মাতাপিতৃহীন রাজনন্দিনী অনিন্দিতা মন্ত্রীর সাহায্যে রাজ্যশাসন করে। সে বিবাহে উৎসাহহীন। রাজ্যের লোকের ইচ্ছা কুমারী সে দেশেরই কোন সামন্তরাজাকে বরমাল্য দেয়। মন্ত্রীর নির্ব্বন্ধে রাজকুমারী অবশেষে ছদ্মবেশে স্বয়ংবরা হইতে রাজি হইল। মন্ত্রী এই কথা প্রচার করিয়া দিল যে রাজকুমারীর এক ঐশ্বর্য্যহীন অথচ উচ্চ-বংশোদ্ভূত সখী আছে আগে তাহার স্বয়ংবর হইবে তবে রাজকন্যার, এবং যে সখীর বরমাল্য লাভ করিবে সে রাজকন্যাকে হারাইবে। রাজকন্যার গোপন অভিপ্রায়,

আপন সখী হ'য়ে আপনি আমি
সাধিব হেন মোর ব্রত।
আমার হ'বে যত আমার স্বামী
ধরণীর হবে না তত ॥

দেবালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়া সখীরা অনিন্দিতাকে কুমারসেনের কথা বলিল। অনিন্দিতা চুপি চুপি ধাত্রীকে পাঠাইয়া দিল কুমারসেনকে দেখিয়া আসিতে। ধাত্রী আসিয়া বলিল, "দুয়ারে সঁপিল বিধি—ছেড়ো না—হেন নিধি"। শুনিয়া রাজকন্যা ব্যস্ত হইয়া উঠিল কুমারসেনকে দেখিতে। সেদিন শিবচতুর্দ্দশী। অপরাহ্লে অনিন্দিতা দেবালয়ে গেল শিবপূজা করিতে। সখীরা শিবালয়ের নিকটবর্ত্তী কাননে কুমারসেন-অনিন্দিতার সাক্ষাৎকার ঘটাইয়া দিল। অনিন্দিতাকে রাজবালার সখী পরিচয় দিয়া তাহারা স্বয়ংবরের কথা কুমারসেনকে জানাইল।

রাজকন্যার পাণিপ্রার্থী হইয়া যে-সব রাজপুত্র আসিয়াছে তাহারা রাজকন্যার সখীর স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত হইতে রাজি নয়। শেষে কুমারসেন হাজির হইয়া মুখরক্ষা করিল। অনিন্দিতা কুমারসেনের কণ্ঠে বরমাল্য দিল। তাহার পর রঙ্গনাথকে জব্দ করিবার জন্য সখীরা ষড়যন্ত্র করিয়া, এক কদাকার দাসীকে রাজকন্যা সাজাইয়া রঙ্গনাথের প্রেমমুগ্ধ বলিয়া তাহাকে জানাইল। লোভে পড়িয়া রঙ্গনাথ পণ্ডিতকে দিয়া এই প্রেমপত্র লিখাইয়া লইয়া "রাজবালা"র সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল,

> পঁচিশ ছাড়িল বাণ, পঞ্চবাণ চুবা'য়ে চুবা'য়ে
> পাঞ্চালীর কালো-রূপ কালকূটে,
> দ্বিগুণ পঞ্চ-নয়ন কাল-নীরে দিল রে ডুবায়ে
> মূর্খদের তবু কি নয়ন ফুটে !···

কুরূপা "রাজকন্যা"কে বিবাহ করিতে রঙ্গনাথ আগ্রহ প্রকাশ করিলে সখীরা তাহাকে জানাইল,

> কা'ল রাত্রে ঝাঁটা'য়ে ফেলেছে সখী সকল জঞ্জাল—
> উন্মাদিনী হইলে আটকে কেবা !
> সব রাজা সখীরে যৌতুক দিয়া চুকিয়াছে কা'ল—
> রাত্রি-দিন করিবে প্রেমেরই সেবা ॥

রঙ্গনাথের বুক কাঁপিয়া উঠিল, তবুও সে কৌতুক বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিল। তখন সখীরা ছদ্মরাণীকে সত্যমিথ্যার প্রমাণ দিতে অনুরোধ করিলে

> বলে ছদ্মরাণী, "নাথ কি আর বলিব—কি না জান !
> রাজ-কার্য্য রমণীর বিড়ম্বনা !
> রাজ্য-ময় কেবলি কপট মনে কপাট ভেজানো !
> রাজ্যের ত্রিসীমা আর মাডাবো না !
> আমায় নাথ ল'য়ে চল—
> যা'ব তোমার সঙ্গে ।
> চাই মোরে চরণে দলো,
> চাই তোল পালঙ্কে !"

কোনরকমে তাহাদের হাত এড়াইয়া রঙ্গনাথ পলাইয়া বাঁচিল। কিন্তু যখন সে কুমারসেনের সিংহাসন-আরোহণ অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ-পত্র পাইল তখন তাহার মনে যেন সংশয়ের কণ্টক বিঁধিল,

> বিরলে বসিয়া খালি উলটায় পালটায় মুখে
> "যৌতুক না কৌতুক", কিছুতে আর সন্দেহ না চুকে ॥

শুধু কাহিনীর অথবা কাব্যরসের জন্যই নয় 'যৌতুক না কৌতুক ?' আরো একটি কারণে মূল্যবান্। ইহা রবীন্দ্রনাথের বিবাহ-উপলক্ষ্যে প্রীতি-উপহাররূপে রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ যে ধনি-কন্যার পাণিগ্রহণ করেন নাই কুমারসেনের কাহিনীর মধ্যে তাহার ইঙ্গিত আছে। কাব্যের শেষে এই যে কয় ছত্র "ছদ্মবেশধারী উৎসর্গ বা উপসর্গ" আছে তাহাতে রবীন্দ্রনাথের উদীয়মান প্রতিভার বন্দনা,

> শর্ব্বরী গিয়াছে চলি'। দ্বিজরাজ শূন্যে একা পড়ি
> প্রতীক্ষিছে রবির পূর্ণ উদয়।
> গন্ধ-হীন দু-চারি বজর্নাগন্ধা ল'য়ে তড়িঘড়ি
> মালা এক গাঁথি কেলি অসময়
> সঁপিল-রবির শিরে বলি' এই, "আশিসি তোমারে
> অনিন্দিতা স্বর্ণ-মৃণালিনী হোক
> সুবর্ণ তুলির তব পুরস্কার। বঙ্গপাণি কারে
> যে পড়ে সে পড়ুক খাইয়া চোক!"

জ্যেষ্ঠের সাধনা ও আশংসা কনিষ্ঠের জীবনে পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ সংস্কৃত ছন্দে বাঙ্গালা কৌতুক-কবিতা লেখায় পারদর্শী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথম বিলাতে যান তখন দ্বিজেন্দ্রনাথ নব্য বাঙ্গালীর বিলাত-প্রয়াণ-লিপ্সাকে উপহাস করিয়া শিখরিণী ছন্দে একটি কবিতা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।[১] প্রথম স্তবকটি এই,

> বিলাতে পালাতে ছটফট করে নব্য-গৌড়ে,
> অরণ্যে যে জন্যে গৃহগ-বিহগ-প্রাণে দৌড়ে।
> স্বদেশে কাঁদে সে, গুরুজন-বশে কিছু হয় না,
> বিনা হ্যাট্টা কোট্টা ধুতি-পিরহনে মান রয় না।

বাঙ্গালায় রেখাক্ষর বর্ণমালা বা শর্টহ্যাণ্ড লিপির উদ্ভাবনের প্রথম প্রচেষ্টা দ্বিজেন্দ্রনাথেরই।[২] পয়ার ও ছড়া ছন্দে রচিত ইহার 'রেখাক্ষর বর্ণমালা'য়[১] বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সঙ্গে সরস কবিতার দুর্লভ সংযোগ হইয়াছে।

[১] ভারতীতে (আশ্বিন ১২৮৬) প্রথম প্রকাশিত, রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র'এ (১৮৮১) পুনর্মুদ্রিত।

[২] 'বালক', 'ভারতী', 'পুণ্য' প্রভৃতি পত্রিকায় অংশত প্রকাশিত। বহুকাল পরে (১৩১৯) প্রিয়ম্বদা দেবীর হস্তলিপি হইতে লিথো ছাপা পুস্তক-আকারে।

প্রথমপ্রথমের বিদ্যা ঢুকিলে মাথায়,
পুরা লেখা সাঙ্গ হ'বে অর্দ্ধেক পাতায়॥
কাগজ বাঁচিবে ঢের নাহি তায় ভুল।
বাঁচিতেও পারে কিছু ডাকের মাশুল॥

বাঙ্গালা বর্ণমালা হইতে "এ্যা" অক্ষর বর্জ্জন করিবার প্রসঙ্গে কবি-বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন,[১]

কাজ নাই, কর্ম্ম নাই, ছড়াইয়া ঠ্যাং,
ভাবে ভোর হএিয়া ডাকেন কোলা ব্যাঙ॥
চৈতন্য-চরিতে দে'ন মাঝে মাঝে ডুব।
হ'এ্যা খা'এ্যা পেয়ে তথি আড্ডা জমে খুব॥

দ্বিস্বরের অগ্রপশ্চাতের উদাহরণ,

কৈলাস বলাই গউর বাউলে
চড়ায় নাবিয়া চড়িল ভাউলে॥
তলে বিছাইল বিছানা গদি।
সওয়া অ্যাক্টায় পের'ল নদী।...

"ন-ঙ-ম-প্রধান যুক্তাক্ষরের পদাবলী",

আনন্দের বৃন্দাবন আজি অন্ধকার
গুঞ্জরে না ভৃঙ্গকুল কুঞ্জবনে আর॥
কদম্বের তলে যায় বংশী গড়াগড়ি।
উপুড় হইয়া ডিঙ্গা পঙ্কে আছে পড়ি॥
কালিন্দীর কূলে বসি কান্দে গোপনারী।
তরঙ্গিণী তরাইবে কে আর কাণ্ডারী॥

[১] 'পুণ্য' (ফাল্গুন-চৈত্র ১৩০৫) পৃ ৩১৩। প্রকাশিত গ্রন্থে এই অংশ নাই।

আর কি সে মনোচোর দেখা দিবে চক্ষে।
সিদ্ধি-কাঠি থুয়ে গেছে বিন্ধাইয়া বক্ষে ॥

"ষ-প্রধান যুক্তাক্ষরের পদাবলী",

কৃষ্ণ গেছে গোঠ ছাড়ি রাষ্ট্র পথে হাটে,
শুষ্কমুখে রাধিকার দুষ্‌খে বুক ফাটে ॥
কৃষ্ণ বলি ভ্রষ্ট বেণী বক্ষে ধরি চাপি
ভূপৃষ্ঠে লুটায়ে পড়ে মর্ম্মদাহে তাপি ॥
কষ্টে বলে অষ্ট সখী শোয়াইয়া কোলে,
চিন্তা করিও না রাই কৃষ্ণ এল' বলে ॥
এত বলি হাহু করে বাষ্প আর মোছে।
সবারই সমান দশা কেবা কারে পোছে ॥
দুষ্টবধে পুরে নাই কৃষ্ণের অভীষ্ট।
অদৃষ্টে অবলাবধ আছে অবশিষ্ট ॥

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

নবীন গীতিকবিতা

১

বিহারীলালকে বলিতে পারা যায় উদাসীন রোমান্টিক কবি। তাঁহার কবিতায় তাঁহার ব্যক্তিগত দুঃখসুখের ভালোলাগা-মন্দলাগার, বহিঃসংসারের সহিত তাঁহার সংস্রবের ও সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়ার চিহ্ন নাই। তাঁহার অনুগামী কবিদের রচনায় এ উদাসীনতা দেখি না। ইঁহাদিগকে নব্য-রোমান্টিক বা গার্হস্থ্য রোমান্টিক কবি বলিতে পারি। ইঁহাদের অগ্রণী হইতেছেন দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৫-১৯২০)। ইঁহার রচনাভঙ্গিতে মাইকেলের রীতির সঙ্গে বিহারী-লালের রীতির মিলন হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ ভাবুক, কিন্তু বিহারীলালের মত আত্মহারা নহেন, এবং ইঁহার কবিতার বিষয়ও নিরাবিল ভাবনির্ভর ও বস্তু-নিরপেক্ষ নয়। স্বভাবতই নারীপ্রেমের বিচিত্র প্রকাশ দেবেন্দ্রনাথের কাব্যে মুখ্য স্থান পাইয়াছে। পরিণত বয়সে বাৎসল্যও দেখা দিয়াছে। বিহারীলালের অধ্যাত্মদৃষ্টি ছিল বৈদান্তিক গোছের, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন বৈষ্ণবীয়-ভক্তিরসিক। রচনা-শিল্পের প্রতি অমনোযোগিতায় দুই কবিই কতকটা সমানধর্ম্মা।

দেবেন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা স্বতঃস্ফূর্ত্ত এবং আবেগ-উচ্ছ্বসিত। তাঁহার ভালোলাগার দৃষ্টি ছিল সর্ব্বদা সজাগ। ভাষায় কুণ্ঠা আছে, কিন্তু লঘু হাস্য-তরঙ্গিত ভাবের আবেগ তাঁহার কবিতায় নিজস্বতা দিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথের কাব্যকলা কতটা পরিণতি পাইতে পারিত তাহা বলিতে পারি না, তবে ভক্তির আবেগ তাঁহার শেষের দিকের কবিতাগুলিকে হয়ত কিছু দিগ্‌ভ্রষ্ট করিয়াছে। তবুও স্বীকার করিব যে দাম্পত্যপ্রেম ও বাৎসল্যপ্রীতি এবং ভক্তিরস—এই তিন দিকেই তাঁহার কবিতার স্বাভাবিক প্রবণতা। নিপীড়িত ও ভাগ্যবঞ্চিতের প্রতি কবির সহানুভূতির মধ্যে কোন রকম মাতব্বরি ভাব নাই।

সমাসোক্তি এবং সম্বোধন দেবেন্দ্রনাথের রচনারীতির নিজস্ব ভঙ্গি। উপমা-উৎপ্রেক্ষায় দেশবিদেশের কাব্য-কাহিনীর ইঙ্গিতও একটি বিশেষত্ব। অবশ্য এইসব বিষয়ে মধুসূদনই গুরু। প্যারাম্ফিসিসের ব্যবহারেও মধুসূদনের

অনুসরণ। হেমচন্দ্রের প্রভাব অনুভূত হয় কয়েকটি কবিতার ছন্দে ও ভাবে। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তো দুর্লক্ষ্য নয়ই। দেবেন্দ্রনাথের হাত খুলিয়াছিল সনেটে। ইঁহার সনেটের ভাষায় মধুসূদনের এবং নির্মাণে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সত্ত্বেও নিজস্বতা দেখা দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা দেবেন্দ্রনাথকে যে কতটা নাড়া দিয়াছিল তাহার একটি প্রমাণ 'রবীন্দ্র বাবুর সনেট' কবিতাটি।

হে রবীন্দ্র, তোমার ও সুন্দর সনেট
কি সরস! নারিঙ্গির সুরভি সমীরে,
মুক্ত-বাতায়নে বসি ক্ষুদ্র জুলিয়েট,
ফেলিছে বিরহশ্বাস যেন গো সুধীরে!
আধেক নগন তনু বাকল-ভূষণে,
মালিনীর তীরে যেন বালিকা সুন্দরা,
সলিলে কাঁপিছে শশী, চঞ্চল নয়নে
কাঁপে তারা, কাঁপে উরু গুরু গুরু করি!
নববলয়িতা লতা বালিকা যৌবন
শিহরিয়া উঠে যথা সমীর পরশে,
লাজে বাধ বাধ বাণী, রূপের আলসে
ঢল ঢল তোমার ও কবিত্ব মোহন!
পাঠ করি সাধ যায়, আলিঙ্গিয়া সুখে
প্রিয়ারে, বাসন্তী নিশি জাগি সকৌতুকে।[১]

'প্রিয়তমার প্রতি'ও বেশ উপভোগ্য প্রেমের কবিতা।

নয়নে নয়নে কথা ভাল নাহি লাগে,
আধ গ্লাস জল যেন নিদাঘের কালে,
চারিধারে গুরুজন; চল অন্তরালে,
দোঁহার হিয়ার মাঝে কি অতৃপ্তি জাগে!
কে যেন গো কাণে কাণে কহিছে সোহাগে,
"আন থালা, ক্ষুদ্র এই কলার পাতায়
একরাশ শেফালিকা কুড়ান কি যায়"?
সুধু নয়নের দৃষ্টি ভাল নাহি লাগে।
বন্দী হয়ে সনেটের ক্ষুদ্র কারাগারে
কাঁদে যথা সুকবিতা গুমরে গুমরে
মনোদুঃখে, ঘোমটার জলদ আঁধারে
তোমার ও মুখশশী কাঁদিছে কাতরে!
ছাদে চল; মুক্ত বায়ু; বহিছে তটিনী,
দ্রৌপদীর সাড়ি সম সচন্দ্র যামিনী![২]

[১] পারিজাত-গুচ্ছে সঙ্কলিত। প্রথম প্রকাশ সাহিত্য দ্বিতীয় বর্ষ (১২৯৮)। পৃ ১৩৬।
[২] পারিজাত-গুচ্ছে সঙ্কলিত। প্রথম প্রকাশ সাহিত্য দ্বিতীয় বর্ষ পৃ ২৪৯।

নব্য-রোমান্টিকদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ বোধ করি সবচেয়ে বেশি "গার্হস্থ্য" কবি। বাঙ্গালী মেয়ের ঘরোয়া রূপ-সজ্জা, তাহার প্রেমসেবার সৌরভ কবির মন ভুলাইয়া রাখিয়াছে সর্ব্বদাই। কবির কল্পনাও তাই সর্ব্বত্র পত্নীপ্রেমকে বিচিত্র-ভাবে রসায়িত করিয়া সার্থকতার সন্ধানে ফিরিয়াছে।

"কোথা তুমি ? কোথা তুমি ? কোথা তুমি ?" বলি,
জীবনের দীর্ঘ দিবা করি পর্য্যটন!
আমারি কণ্ঠেতে দোলে নব রত্নাবলী,
"কোথা হায়" বলি তবু করি অন্বেষণ!
কস্তুরী-সৌরভাকুল মৃগের মতন,
হে বাঞ্ছিত! তোমা লাগি ছুটিয়া ছুটিয়া
ক্লান্ত-অবসন্ন-দেহে, প্রদোষে ফিরিয়া,
হেরিলাম গৃহে শোভে অমূল্য রতন!
এস, তোমা চিনিয়াছি শৈশবসঙ্গিনি!
কূলে,কূলে জলখেলা তোমাতে আমাতে,
ফুল তোলা, তারা গোণা বাসন্তী নিশাতে,
ছাদেতে চাদনি-রাতে শৈশব-কাহিনী!
এই সব স্মৃতি-পুষ্প অঞ্চলেতে ভরি,
তুমি আছ দ্বারে বসি আমি ঘুরে মরি![১]

যে সর্ব্বাতিশায়ী নারীপ্রেম সমাজবন্ধন উল্লঙ্ঘন করিতে বাধ্য হইয়া পরিশেষে কলঙ্ক-অপমানের তুষানল প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে তাহার স্বীকৃতি আছে 'কলঙ্কিনীর আত্মকাহিনী'তে।[২]

দুই চারি পুত্র-কন্যা পতির ঔরসে
প্রসবিয়া যাহাদের সতীত্বের ভাণ,
তা'রা সবে সতী লক্ষ্মী! আমি কিন্তু, আমি,
আশৈশব তিল তিল পুড়ি তুষানলে,
এক হাতে স্বাদু-ফল অন্ন ও ব্যঞ্জন,
অন্য করে স্বর্ণপাত্রে জাহ্নবীর বারি—
তবু হায় দুর্ভিক্ষের কাঙ্গালীর মত,
নিয়ত শুকায় তালু দারুণ তৃষ্ণায়,
নিয়ত ক্ষুধায় হায় জীর্ণ হয় ছাতি!

নারীবন্দনা দেবেন্দ্রনাথের কাব্যে বার বার উদ্‌গীত হইয়াছে। কবিও জানিতেন যে তাঁহার বীণার প্রধান তার ইহাতেই বাঁধা।

[১] 'তুমি', গোলাপ-গুচ্ছে সঙ্কলিত। [২] অশোক-গুচ্ছে সঙ্কলিত।

এক যে বিধবা আছে এ দেশের মাঝে,
তাহারি মূরতি মোর হৃদয়েতে রাজে !
পাটল অধরে তার
চঞ্চল ধূসর কেশে
ডুবায়ে তুলিকা ঘন, আঁকি আমি ছবি—
অতি ক্ষুদ্র, বাঙ্গলার কবি।…
এক যে সধবা আছে, কোলে পিঠে যার
শিশু-স্মর রেখে গেছে ফুল-ছবি তার !
সীমন্ত-সিন্দুরে তার
চরণ-অলক্ত-রাগে
ফলাইয়া নবরাগ, আঁকি আমি ছবি—
চির দুঃখী, বাঙ্গলার কবি।… [১]
জানি আমি নারি, তুমি কবি বিধাতার
শ্রেষ্ঠ কাব্য ; সুকোমল কান্ত পদাবলী,
ছন্দো-বন্ধে, অনুপ্রাসে মরি কি ঝঙ্কার !
শ্যামের মুরলী সম শব্দের কাকলী !…
তাই সখি, বঙ্গ-কবি, 'চিত্রা'র উদ্যানে
বসিয়া ("অকূল শান্তি, বিপুল বিরতি,
নাহি কাল, দেশ !") চাহি তব মুখ-পানে,
অনিমেষে করে সখি তোমারি আরতি !
"অন্তর মাঝারে তার একা একাকিনী"
তুমি জ্যোৎস্না—চারিধারে আঁধার যামিনী !… [২]

দেবেন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার পরিশেষ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের মত নারী-স্তবেই নয়। বাৎসল্যের রসানুভূতিও তাঁহার কবিমানসে ঢেউ তুলিয়াছিল।

এ কি কাণ্ড ! এ ব্রহ্মাণ্ড, মুখ পানে চেয়ে,
অবাক্ আপনা-হারা, ওলো রাঙা মেয়ে !

হালকা ছাঁদে সরস কবিতা অনেকগুলি লিখিয়াছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। তাহাতে নির্মল কৌতুকহাস্যই প্রধান রস। ঝাঁঝালো ব্যঙ্গ পাই দুই একটি কবিতায়। যেমন 'কবির জন্ম'এ,[৩]

নিম ও নিসিন্দা আর ক্ষিপ্ত ডালকুত্তার রুধিরে
সৃজিলা সমালোচক ভাসি' ধাতা নয়নের নীরে।…
মনু-পৈতা বংশ-কঞ্চি জড়াইয়া মোরগের ঠ্যাঙে
সৃজিলেন বঙ্গ-আর্য্য—মচকায় তবু নাই ভাঙ্গে।

[১] 'আমি কে ?' অশোকগুচ্ছে সঙ্কলিত। [২] 'নারী-মঙ্গল' অশোক-গুচ্ছে সঙ্কলিত।
[৩] অপূর্ব-নৈবেদ্যে সঙ্কলিত

কবিজীবনের প্রথমে দেবেন্দ্রনাথ প্রভাবিত হইয়াছিলেন মাইকেলের মেঘনাদ-বধের দ্বারা। 'উর্ম্মিলা কাব্য' ও অসমাপ্ত 'দশাননবধ কাব্য' কবিতা দুইটি

উর্ম্মিলা-কাব্য।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন

ফুলবালা-গীতিকাব্য-রচয়িতা-প্রণীত।

These are great maxims, sir, it is confess'd;
Too stately for a woman's narrow breast.
Poor love is lost in men's capacious minds;
In ours, it fills up all the room it finds.

John Crowne.

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোংর বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে
ষ্ট্যান্‌হোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত ও গ্রন্থকার কর্তৃক
গাজিপুরে প্রকাশিত।

সন ১২৮৭ সাল।

ইহার বড় প্রমাণ। মাইকেলের প্রভাব তাঁহার কবিতার ভাষায় শেষ অবধি জের টানিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের বলিব না, ভারতী গোষ্ঠীর প্রভাবও প্রথম

হইতেই ছিল, তাহার প্রমাণ 'ফুলবালা' কবিতাগুলি। তাহার পরে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব—তবে তাহা কেবল কবির রুচিতেই পর্য্যবসিত ছিল, ভাবে ও শিল্পে প্রতিফলিত হইতে পারে নাই। কাব্যের নামকরণের দ্বারা দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার অগ্রগামী ও সমসাময়িক তিন কবিমুখ্যকে স্বীকার করিয়াছেন—'অপূর্ব্ব-ব্রজাঙ্গনা' ও 'অপূর্ব্ব-বীরাঙ্গনা'য় মাইকেলকে, 'হরিমঙ্গল' প্রভৃতিতে বিহারীলালকে এবং 'অপূর্ব্ব-নৈবেদ্য'এ রবীন্দ্রনাথকে।[১] অন্যথা কাব্যের নামকরণ ফুলের নামে—'ফুলবালা', 'অশোকগুচ্ছ' ইত্যাদি।

দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় ফুলের অপর্য্যাপ্ততা। দোপাটি, বনতুলসী, গুলে-বকাওলি, সদা-সোহাগিন্, হর-শিঙ্গার—ইত্যাদি কবিপ্রসিদ্ধিহীন ফুলও বাদ যায় নাই। এমন কি কচুপাতাও উপেক্ষিত নয়।

লোকে তোরে ঘৃণা করে, তবে অনাদৃতা !…
কি আশ্চর্য্য ! এই ক্ষুদ্র প্রজাপতি গিয়া
পরশিল যেই তোর তরল শরীরে
হরষে বিবশ ভুঁই, উঠিলি কাঁপিয়া,
দরদর, ঝরঝর ঝরিল শিশির !

দেবেন্দ্রনাথের জীবন বেশির ভাগই কাটিয়াছিল উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে—প্রথমে গাজীপুরে পরে এলাহাবাদে ওকালতি উপলক্ষ্যে। কয়েকটি ফুলের কবিতায় "খোট্টা কবির" উত্তর-পশ্চিম বাসের পরিচয় আছে। এই দিক দিয়া 'হরশিঙ্গার' কবিতাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২]

বলদেব পালিত দেবেন্দ্রনাথের আত্মীয় ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথকে গাজীপুরে তিনিই লইয়া গিয়াছিলেন। বলদেবের কবিতার প্রভাব দেবেন্দ্রনাথের রচনায় পড়ে নাই, একটি ছাড়া। ব্যতিক্রমটি 'অপূর্ব্ব মেঘদূত কাব্য'—পূর্ব্বমেঘের তেরটি শ্লোকের মূল মন্দাক্রান্তা ছন্দে অনুবাদ।[২] দেবেন্দ্রনাথের কবিতাটিতে রাধা মেঘ-দূত পাঠাইতেছে দ্বারকায় কৃষ্ণের কাছে। প্রথম শ্লোক এই,

রৌদ্রে ক্লান্তা বিকল-কুমুদী কম্পিতা দেহ-শাখে
বাণে বিদ্ধা বিভল হরিণী—আকুলা, ম্লাননেত্রা !
নৃত্যোন্মত্তা মুখর যমুনা শিঞ্জিতা ভূমিকুঞ্জে,
ক্ষোভে যাপে দিবসরজনী রাধিকা কৃষ্ণহারা !

[১] রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার প্রতি দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কাব্যবিশারদের 'মিঠে-কড়া'র জবাবে দেবেন্দ্রনাথ যে কবিতাটি লিখিয়াছিলেন তাহা এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। রবীন্দ্রনাথও "কবিভ্রাতা" দেবেন্দ্রনাথকে 'সোনার তরী' উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

[২] শেফালী-গুচ্ছে সঙ্কলিত।

দেবেন্দ্রনাথের প্রথম কবিতার বই 'ফুলবালা' (১২৮৭)।[১] সূর্য্যমুখী, রক্তজবা, কদম, গোলাপ প্রভৃতি ফুল উদ্দেশ করিয়া কবিতাগুলি লেখা।[৩] যেমন,

কেন ফুল, কাঁদে হিয়া তোরে নিরখিলে ?
কিছুতেই লুকাবারে পারি নারে শোক ?
সহসা মরম জ্বলে স্মৃতির অনলে,—
অশোক কেন রে তোরে বলে তবে লোক ?
বিপুল বিশ্বের কথা যাই ফুল ভুলে,—
একটি শোকের মূর্ত্তি জাগে অনিবার !
জনম-দুঃখিনী সীতা অশোকের মূলে
একাকিনী, ফেলিছেন নয়ন আসার !···

১২৮৭ সালে দেবেন্দ্রনাথের আরো দুইখানি চটি কবিতার বই বাহির হইয়াছিল—উর্ম্মিলা-কাব্য[১] ও 'নির্ঝরিণী'[১]। উর্ম্মিলা-কাব্যে নাম কবিতা ছাড়া আর একটি কবিতা আছে, 'ফুলবালাদিগের উক্তি'—স্পষ্টতই ফুলবালা-কবিতামালার উত্তর। কবিতাটিতে বিহারীলালের ভঙ্গি অনুভূত হয়। যেমন,

যেমনি বরণ-দ্যুতি,
তেমতি মনের(ও) গতি,
ঢল ঢল করি মোবা ভাবের সাগরে ,
তাই বাসি প্রেমিকেরে
তাই বাসি সুন্দরীরে,
"ফুল করি" বাঁধে মোরে চির-প্রেমডোরে ,
সুন্দরতা কি যে ধন,
উদারতা কি যে ধন,
সুন্দর ভাবুক বিনা বোঝে কি অপরে ? [৩]

নির্ঝরিণীর 'আঁখির মিলন'এর শেষ স্তবকটি উদ্ধৃত করিতেছি। লেখনীর পরিপক্কতা লক্ষিতব্য।

আঁখির মিলন ওরে, আঁখির মিলন ওযে
আঁখির মিলন !
পাখী, শাখী, তরঙ্গিণী, করে সুমধুর ধ্বনি,—
"আয় খ্যাপা, ধেয়ে আয়, পাবি দরশন !"

[১] এই পুস্তিকাগুলির অনেক কবিতা পরে 'অশোকগুচ্ছ', 'গোলাপগুচ্ছ', 'অপূর্ব্ব নৈবেদ্য' প্রভৃতি কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। নির্ঝরিণীর দুইটি কবিতা কীট্স্ হইতে, একটি কবিতা পোপ হইতে এবং একটি কবিতা মুর হইতে অনুদিত।

[২] 'অশোক', অশোক-গুচ্ছে সঙ্কলিত। [৩] উর্ম্মিলা-কাব্য পৃ ২৮ !

ফেল্‌-ফেল্‌ করি চায়,　　ভেবে ঠিক নাহি পায়,
কোন দিকে ? হায় ও যে সকলি মোহন !
প্রকৃতির সাথে হয়,　　কবি চিত্ত-বিনিময়,
সংসার বোঝে না সেই জীবন্ত স্বপন,
ওই আঁখির মিলন।

১২৮৭ সালের পর বহুদিন যাবৎ দেবেন্দ্রনাথের কবিতা 'ভারতী', 'সাহিত্য', 'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্রিকার অবগুণ্ঠনেই ছিল। কতকগুলি কবিতা 'অশোক-গুচ্ছ' (১৩০৭, দ্বি-স ১৩১৯) ও 'হরিমঙ্গল' (১৩১১, দ্বি স ১৩১৯) কাব্যে সঙ্কলিত হয়। অবশেষে ১৩১৯ সালে বাহির হইয়াছিল এই কাব্য পুস্তক-পুস্তিকাগুলি—'গোলাপগুচ্ছ', 'পারিজাতগুচ্ছ', 'শেফালিগুচ্ছ', 'অপূর্ব্ব-নৈবেদ্য', 'অপূর্ব্ব-শিশুমঙ্গল', 'অপূর্ব্ব-ব্রজাঙ্গনা', 'অপূর্ব্ব-বীরাঙ্গনা', 'কৃষ্ণ-মঙ্গল', 'খৃষ্ট-মঙ্গল', 'গৌরাঙ্গ-মঙ্গল', 'জ্ঞানদা-মঙ্গল',[১] ও 'কার্ত্তিক-মঙ্গল', ইত্যাদি। দেবেন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের মধ্যে অশোকগুচ্ছ, গোলাপগুচ্ছ, পারিজাতগুচ্ছ, শেফালীগুচ্ছ এবং অপূর্ব্ব-নৈবেদ্য এই পাচখানিই প্রধান।

অশোকগুচ্ছে কয়েকটি ভালো প্রেমের কবিতা আছে। যেমন 'লাজ ভাঙান',

ঘোমটা খুলিবে না'ক ? থাক তবে বসি।
আমি করি কাব্য-পাঠ, যামিনী জাগিয়া!
একি ! একি চাঁপাগুলি গেছে বুঝি খসি ?
খোঁপা চাহে ফুলগুলি কাঁদিয়া, কাঁদিয়া।
আমি দিব ? কাজ নাই—পরশে আমার,
(আমি গো চঞ্চল বড় !) খুলিবে কবরী !
কুন্তলের ফুলদানি, আহা মরি মরি !
চাপাগুলি ফিরে পেয়ে, হাসিছে আবার !
এমন সুন্দর পান কে গো সেজেছিল ?
হাসিছ ? তোমারি কীর্ত্তি ? এ বড় অন্যায় !
তব ওষ্ঠ এত লাল ! পানের বাটায়,
আমা লাগি ভিন্ন পান কে বল আনিল।
"যাও—যাও"—সে কি কথা ? ধরি ছুটি কর,
আমিও রাঙ্গিয়া লই আপন অধর !

অথবা 'ভুল',

একি নয়নের ভুল !—হইয়ে আকুল,
এলোচুল, পরি' এক আট পৌরে শাড়ী,
থাক যবে, দুই কাণে দুটি ক্ষুদ্র দুল,

[১] জ্ঞানবিকাশ লাইব্রেরীর কল্পিত অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বন্দনা।

দুই হাতে চারি গাছি চুড়ি বেলোয়ারী,—
একি গো আঁখির দোষ !···
নিশীথে উজ্জলরূপে হয় দিবা-ভুল :
দিবসে, শর্ব্বরী ঘোর, এলাইলে চুল !

অশোকগুচ্ছের 'রাধা'য় ও পারিজাতগুচ্ছের 'বধূ'তে রবীন্দ্রনাথের 'বধূ'র অনুসরণ।

গোলাপগুচ্ছের একটি বড় কবিতা 'কদম্বসুন্দরী'। এটিতে বিশেষ কৌশলের সহিত যেন বৈষ্ণব-কবিতার সহিত রবীন্দ্রনাথের 'বিজয়িনী'র বৈষ্ণব-রূপান্তর মেলানো হইয়াছে এবং সবশুদ্ধ কবিতাটি "অভিনব বস্ত্রহরণ" রূপ লইয়াছে।

বহু দিন, বহু দিন গত , এক দিন
এই বৃন্দাবনে, বঙ্গের মৈথিল কবি
বিদ্যাপতি এসেছিল তীর্থ দরশনে !
আদরে যতনে তাঁরে সুচতুর পাণ্ডা
দেখাইল কুঞ্জে কুঞ্জে, বিপিনে বিপিনে,
রাধাগোবিন্দের মূর্ত্তি, ভক্তের বাসনা।
একি সেই নব বৃন্দাবন ? আহা মরি
চির সাধের স্বপন, কবির !—নবীন
তরুপথ, নব নব বিকশিত ফুল।
নবীন বসন্ত, নবীন মলয়ানিল,
আকুল নব অলিকুল !···
একি সেই বৃন্দাবন ?

যথা, রসময়-রাস-রভস-রস মাঝে
মরি ঋতুপতি-রাতি রসিকবর কাজে !
রসবতী রমণীরতন ধনী রাই,
রাসরসিক সহ সরস অবগাই ,
রঙ্গিনীগণ সব রঙ্গহি নটই,
রণরণি কঙ্কণ কিঙ্কিণী রটই ,
বিদ্যাপতি কবি আনন্দ-সায়রে মগ্ন,
মুখে নাহি বাণী !···

'অপূর্ব্ব কৃষ্ণ-প্রাপ্তি' কবিতাটি শেফালীগুচ্ছেও স্থান পাইয়াছে। কবিতাটির শেষাংশ এই,

আমারে কটাক্ষ করি, কহে কোনো রসিক ধীমান্,
রঙ্গভরে, ব্যঙ্গস্বরে, সন্তাদরে পাইতে "বাহবা !"—
"তোমার প্রতিভা এবে কৃষ্ণপ্রাপ্তা ! হে কবিপ্রধান !"
সে কৌতুক, মহাহর্ষে, হেসে উঠে হৃদিহীন সভা !

উহারা হাস্থক্ উচ্চে, চন্দ্রোদয়ে শ্যামাঙ্গী নিশার
বাড়ে রূপ, কৃষ্ণ-প্রাপ্ত হোক্ নিত্য প্রতিভা আমার!

গোলাপগুচ্ছে কীটস্ ও পো-র কয়েকটি কবিতার অনুবাদ আছে।

কাব্যরচক মাত্রেরই প্রতি দেবেন্দ্রনাথের প্রবল সহানুভূতি ছিল। তাঁহার কাছে অনেক তরুণ কবি আসিতেন, এমন অনেকেও যাঁহারা সবেমাত্র পদ্য-রচনায় হাত দিয়াছেন। তরুণ কবি ও কবিকল্পদের নামেও তিনি কবিতা লিখিয়াছিলেন। অপূর্ব্ব-নৈবেদ্যে ইঁহাদের নামে কবিতা আছে,—সরোজকুমারী দেবী, প্রমীলা বসু, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাশ, কালিদাস রায়, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ইত্যাদি॥

২

দেবেন্দ্রনাথ সেনের কাব্যকলার সঙ্গে 'প্রসূন', 'প্রেম ও ফুল' (১২৯৪) 'কুঙ্কুম' (১২৯৮), 'কস্তূরী' (১৩০২), 'চন্দন' (১৩০৩), 'ফুলরেণু' (১৩০৩), 'বৈজয়ন্তী' (১৩১১) প্রভৃতি কবিতা-গ্রন্থের রচয়িতা গোবিন্দচন্দ্র দাসের (১৮৫৫-১৯১৮) কাব্যকলার একদিকে যেমন গভীর মিল আছে অপরদিকে তেমনি গুরুতর অমিলও আছে। দুজনেই প্রেমের কবি, বিশেষ করিয়া দাম্পত্য-প্রেমের। তবে দেবেন্দ্রনাথের প্রতিভাস্ফূর্ত্তি পত্নীত্বের সনাতন আদর্শকে ঘিরিয়া এবং তাঁহার প্রণয়কবিতার ব্যঞ্জনা প্রেমের রসমধুরিমায়। গোবিন্দচন্দ্রের কবিত্ব উৎসারিত হইয়াছিল তাঁহার যৌবনসঙ্গিনী পত্নীর প্রেমে এবং ইহা প্রবাহিত হইয়াছিল এই যৌবন প্রেমস্বপ্নের স্মৃতি-খাতেই। তবুও কবিতায় প্রেমের প্রকাশ পুরাপুরি পত্নীনিষ্ঠ নয়, এবং তাহাতে প্রেমের স্থূলদিকটার, দেহের আকর্ষণের, বেশি ঝোঁক। এই হিসাবে গোবিন্দচন্দ্র সমসাময়িকদের মধ্যে স্বতন্ত্র। গোবিন্দচন্দ্রের দেহসর্ব্বস্ব প্রেমের আদর্শ,

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ!
আমি ও নারীর রূপে,
আমি ও মাংসের স্তূপে,
কামনার কমনীয় কেলি-কালীদহ—
ও কর্দ্দমে—অই পঙ্কে,
অই ক্লেদে—ও কলঙ্কে,
কালীয় নাগের মত সুখী অহরহ!
আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ।[১]

[১] 'আমার ভালবাসা' (১৩০১), কস্তূরী।

এই দেহসর্ব্বস্ব নারীপ্রেমই কবির সাধ্য।[১] প্রেমের দুর্নিবার তীব্রতা বা প্যাশনের কাছে দুনিয়ার সব কিছুই অবাস্তব।

বিশাল ব্রহ্মাণ্ড হয় হোক স্বপ্নময়,
সে আমি অনন্ত সত্য অনাদি অব্যয়![২]

ইংরেজি সাহিত্যে গোবিন্দচন্দ্রের অধিকার ছিল না। সমসাময়িক বাঙ্গালা সাহিত্যই তাঁহার কাব্যানুশীলনে পাঠ দিয়াছিল। সমসাময়িক ও পূর্ব্বগ কবিদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথের ও দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব সবচেয়ে স্পষ্ট। গোবিন্দচন্দ্রের প্রতিভায় দীপ্তি ছিল, অনুভূতিতে প্রগাঢ়তা ছিল, অভিজ্ঞতায় দুঃখদহনের প্রচণ্ডতা ছিল। কিন্তু কাব্যকলায় সর্ব্বত্র ভাবের সংযম এবং ভাষার বাঁধুনি ছিল না। (সনেট রচনায় কবির ব্যর্থতা সমধিক পরিস্ফুট।) তবুও ভাবের গাঢ়তা ও ভাষার লালিত্য বিরলপ্রকাশ নয়। যেমন,

বহিছে শীতল বায়ু—পরাণ পাতিয়া,
জানিনা, কেমন ঘুমন্তভাবে আছি দাঁড়াইয়া!
সেই চুল, সেই ফুল, সে দাড়িম্ব শির,
সেই শ্যাম-অঙ্গে বিলসিত কম্পিত সমীর!
সে কম্পন প্রতিঘাতে
প্রাণে সেই পুষ্পপাতে,
সে সুর-সুষপ্তি-সুপ্ত হৃদয় রুধির!
সেই মোহে মূর্চ্ছাপন্ন,
সেই প্রাণ অবসন্ন,
সম্মুখে কৌমুদী-কান্তি শ্যাম-সোহাগীর![৩]

গোবিন্দচন্দ্রের জন্ম পূর্ব্ববঙ্গে। জীবনও কাটিয়াছিল সেখানে। পূর্ব্ববঙ্গ আরো অনেক কবিকে ধারণ ও পোষণ করিয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের বিশেষ শ্রীছাঁদটি কিঞ্চিৎ পরিমাণে গোবিন্দচন্দ্রের কবিতায়ই প্রথম প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। নিম্নে উদ্ধৃত ছত্রগুলিতে গুটিকতক নাম ও শব্দের সাহায্যে নিদাঘ-দিনাবসানের ছবিটি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এও কি স্বপন?
বৈশাখে বিকাল বেলা, মেঘে মেঘে করে খেলা
বহিতেছে মৃদু মৃদু শীত সমীরণ!

১ 'ধর্ম্মগ্রন্থ' (১২৯৮), ফুলরেণু। ২ 'অনাদি অব্যয়' (১২৯৬), ঐ।
৩ 'সেই একদিন আর এই একদিন' (১২৮৭), প্রেম ও ফুল।

দয়েল বসিয়া আছে
পশ্চিমে 'কাফিলা' গাছে,
ঝুলিছে বাঁশের আগে মুমূর্ষু কিরণ !
'উলুছন' ফুলগুলা,
কাঠীর আগায় তুলা,
কে যেন করিয়ে গেছে দীপ আয়োজন ![1]

এই চারি ছত্রে যে ধ্বনিচিত্ররূপটি ফুটিয়াছে তাহা উপভোগ্য,

ধুইয়া দিয়াছে চুল খৈল-গিলা দিয়া,
পেছন দুয়ারে বসি রউদে শুকায়,
পছঁয়ের 'নীলা নীলা' বাতাস আসিয়া
এলাইয়া মেলাইয়া পলাইয়া যায় ![2]

গোবিন্দচন্দ্রের কোন কোন কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়িয়াছে।[3] কচিৎ ভাষায়ও ইহা দুর্লক্ষ্য নয়। যেমন,

এক পায়—দুই পায়
বসন্ত চলিয়া যায়
শ্যাম মমতায় মেখে বন উপবন ![4]

গোবিন্দচন্দ্র 'মগের মুলুক' (১২৯৯) নামে একটি ব্যঙ্গকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তীব্র ব্যক্তিগত আক্রমণ থাকার জন্য কাব্যটির প্রচার বন্ধ করা হয়। কবি জীবনে যে প্রচুর অশান্তি ও উপদ্রব ভোগ করিয়াছিলেন তাহার নিদারুণ ক্ষোভ কোন কোন কবিতায় ধ্বনিত হইলেও কাব্যসৃষ্টি ব্যাহত হয় নাই। বরঞ্চ ইহাতে ঝাঁঝের সঞ্চার হওয়ায় রচনা রসাল হইয়াছে ॥

উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক হইতে বাঙ্গালা মহিলারচিত কবিতার ধারাবাহিক নিদর্শন মিলিতেছে। ইহাদের মধ্যে রচনা গৌরবে প্রসন্নময়ী দেবীর পরেই গিরীন্দ্রমোহিনী (দত্ত) দাসী (১৮৫৮-১৯২৪) উল্লেখযোগ্য। গিরীন্দ্রমোহিনীর প্রথমপ্রকাশিত নিবন্ধ 'হিন্দু মহিলার পত্রাবলী'তে (১৮৭২) স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া লেখা চিঠি কয়েকটি সঙ্কলিত হইয়াছিল। তাহার পর বাহির এই কবিতার বইগুলি—'কবিতাহার' (১৮৭৩), ভারত-কুসুম' (১৮৮২), 'অশ্রু-কণা' (১৮৮৭, দ্বি-স ১২৯৮), 'আভাষ' (১২৯৭), 'শিখা (১৩০৩), 'অর্ঘ্য' (১৩০৯),

১ 'এও কি স্বপন ? (১২৯৮), কুঙ্কুম। ২ 'চুল শুকান' (১৩০১), ফুলরেণু।
৩ 'আজ কারে মনে হয় ?' (১২৯৩), কস্তুরী। ৪ 'বঙ্কিমচন্দ্র' (২৭ চৈত্র ১৩০০), ঐ।

'স্বদেশিনী' (১৩১২), 'সিন্ধুগাথা' (১৩১৪), নাট্যকাব্য 'সন্ন্যাসিনী বা 'মীরাবাই' (১৮৯২) ইত্যাদি।

গিরীন্দ্রমোহিনীর রচনায় রসদৃষ্টির পরিচয় আছে, লিপিকুশলতারও পরিচয় আছে। শাদাসিধা বর্ণনায় রসসঞ্চারে গিরিন্দ্রমোহিনী তাঁহার পূর্ব্বগ অনেককেই ছাড়াইয়া গিয়াছেন। ভারতীয় সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে গিরীন্দ্রমোহিনীর সখ্য ছিল এবং গিরীন্দ্রমোহিনীর শ্বশুরালয়ে সাবিত্রী লাইব্রেরীকে কেন্দ্র করিয়া যে সাহিত্যগোষ্ঠী জমিয়া উঠিয়াছিল তাহার সহিত একদা ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অনুমান হয় যে রবীন্দ্র-রচনার পরোক্ষ প্রভাব ছাড়াও হয়ত এইসূত্রে গিরীন্দ্রমোহিনীর কবিতা কচিৎ রবীন্দ্রনাথের হাতে সংস্কার লাভ করিয়াছিল।[১] তবুও অনেক কবিতাতেই স্বকীয়তা স্বীকার্য্য।

সেই শান্ত দ্বিপ্রহর, জনশূন্য যে প্রান্তর,
ঘুরে ঘুরে ঘুঘু দুটি ডাকে।
বায়ু বহে হু হু করি, তপ্ত ধূলা উঠে ঘুরি
পথিকের নয়ন-সন্তাপে।[২]

মনে হয় কে যেন
আমায় ভালবাসে,
তাহার বাসনাখানি
মোর চারি পাশে
মৃদুল মলয় প্রায়
অলক্ষ্যে বহিয়ে যায়
গোপন তরাসে![৩]

গ্রাম্য জীবনের, গ্রামের পরিবেষ্টনে বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনায় ও সেই আবেষ্টনে বাল্যস্মৃতির আলিম্পনরচনায় গিরীন্দ্রমোহিনীর দক্ষতা বিশেষভাবে পরিস্ফুট। যেমন,

পুকুরে নির্ম্মল জল, ঘেরা কলমীর দল,
হাঁস দুটি করে সন্তরণ,
পুকুরের পাড়ে বাঁশ-বন।
শূন্য জল কোলাহল, কিচিমিচি পাখী-দল
সাঁই সাঁই বায়ুর স্বনন,
রোদটুকু সোনার বরণ।

[১] অশ্রুকণার ভূমিকা দ্রষ্টব্য। [২] 'নিদাঘে,' আভাষ। [৩] 'পরশ ফাঁদ,' অর্ঘ্য।

লুটায় চুলের গোছা, বালা দুটি হাতে গোঁজা,
একাকিনী আপনার মনে
ধান নাড়ে বসিয়া প্রাঙ্গনে।[১]

পড়িতেছে মনে কত হাসি খেলা, শৈশবের সুখ দুখ,
ভাষা ভাষা আঁখি, কচি রাঙ্গা ঠোঁট, কত সুকুমার মুখ।
পড়িছে মনেতে পূজার আরতি, ঢাক, ঢোল কাড়া দল,
সঙ্গিনীর সনে চামর দোলানো ধুঙ্গুরের কোলাহল।
পড়িছে মনেতে শীতের সকালে ভোরে মাঠে ছুটে খেলা।
মনে পড়িতেছে শেফালি বিছানো শিউলি গাছের তলা।[২]

কলিকাতা শহরের বর্ষাসিক্ত দিনের নিরানন্দ শ্রীহীনতার বর্ণনা,

হেথা গায়ে গায়ে ঠাসা কোঠা, টিনের পাইপ আঁটা
নিঃশব্দে পড়ে জল ঝরি ,···
ফুটো ছাত, ভিজে কোঠা জল পড়ে ফোঁটা ফোঁটা,
ছাতে ছাতে চলে দাগরাজা—
আরও কি শুনিতে আছে বাকি ?[৩]

নিম্নোদ্ধৃত "কণিকা"টিতে রচনার গাঢ়তর পরিচয় আছে।

যবে উথলিত অশ্রুনদী
দোঁহার কপোলতলবাহা
চুম্বনের তলে মিশে,
তখনি জগত নাহি![৪]

৪

স্বর্ণকুমারী দেবীর কাব্যরচনায় অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর ও বিহারীলালের অনুসরণ দেখা যায়। ইহার 'গাথা' (১২৯৭) কাব্যে চারিটি কবিতা সঙ্কলিত আছে[৫] তাহা অক্ষয়চন্দ্রের অনুসরণে লেখা। বিহারীলালের অনুসরণ শুধু ছন্দে। ছোট গীতিনাট্য 'বসন্তউৎসব'এ (১৮৮০) স্বর্ণকুমারীর গীতিকবিতার ভালো নমুনা মিলিবে। কচিৎ কিশোর রবীন্দ্রনাথের রচনার ছায়া নিতান্ত অস্পষ্ট নয়। বসন্ত-উৎসবের এই গানটি এখনো শোনা যায়,

উষা। ধ'র্‌লো, ধর্‌লো ডালা, এই নে কামিনী-ফুল
ইন্দু। তু সখি আঁচল দিয়ে তাড়া লো ভ্রমরাকুল।

[১] 'গ্রাম্য ছবি' (১২৯২), অশ্রুকণা।
[২] 'বাল্যস্মৃতি,' আভাষ।
[৩] 'বর্ষা-মঙ্গল' অর্ঘ্য।
[৪] 'জগতের মৃত্যু' (ভারতী কার্ত্তিক ১২৯৭)।
[৫] ভারতীতে প্রথম প্রকাশিত।

উষা। উঁহু, সখি মরি জ্বলি
কপোলে দংশেছে অলি—
ইন্দু। কপালে দংশেনি সে তো ভ্রমরারি একি ভুল!
উষা। মিছে, সই, ফুল তুলি, ঝোরে গেল পাপ্‌ড়িগুলি,
ভাঙ্গা ভাঙ্গা তারামত ছেয়েছে গাছেরি মূল।
ইন্দু। তুলি গে নলিনী ওই—
উষা। আমি তো যাব না সই,
মৃণাল কাঁটার ঘায়ে কে বল' হবে আকুল?
ইন্দু। সে ভয়ে পিছোয় কে বা তুলিতে অমন ফুল?

স্বর্ণকুমারী ব্রজবুলিতেও গান রচনা করিয়াছিলেন। যেমন,

নিঃঝুম নিঃঝুম রাতে,
ঝম্পিত পল্লব দক্ষিণ বাতে।
পেখল সজনি সতিমির রজনী
অম্বরে চন্দ্র ন তারকা ভাতে।
ঝিল্লি-ঝঙ্কৃত বন পরিপূরিত
কলয়ত জাহ্নবী মৃদুলপ্রপাতে॥

'বাল্যসখী' ইহার ভারতীতে প্রকাশিত প্রথম কবিতা।[১] স্বর্ণকুমারীর অধিকাংশ কাব্যরচনা 'কবিতা ও গান'এ (১৩০২) সঙ্কলিত আছে।

৫

অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৮) বিহারীলালের কাব্যপদ্ধতিকে মুখ্যভাবে অনুসরণ করিলেও গুরুর প্রভাব অনেকটাই কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমারের ভাবোচ্ছ্বাস সংযত এবং বিষয়বস্তু সংহত ও স্পষ্টতর। গুরুর আনন্দতন্ময়তার পরিচয় শিষ্যের রচনায় নাই। তবে গুরুর রচনাশৈথিল্যও দেখা দেয় নাই। বৈষ্ণব-আলঙ্কারিকদের পরিভাষায় বলিতে গেলে বিহারীলাল ভাবসম্মিলনের কবি, অক্ষয়কুমার প্রেমবৈচিত্ত্যের। দেবেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের মিল দেখি গার্হস্থ্য প্রেমে। উভয়েরই কাব্যস্ফূর্ত্তির উৎস পত্নীপ্রেম। তবে দেবেন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা পত্নীপ্রেমিকতায় ও গার্হস্থ্যের গণ্ডীতে আবদ্ধ, আর অক্ষয়কুমারের কাব্যলক্ষ্মী অন্তঃপুরে বাস করিয়াও রসের সঙ্কীর্ণতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। ভগবদ্‌ভক্তির প্রকাশও উভয়ের কবিতার একটা সমান ধর্ম্ম। গোবিন্দচন্দ্র দাস ও অক্ষয়কুমারের মধ্যে সাধর্ম্ম্য পাইতেছি

[১] ফাল্গুন ১২৮৪, পৃ ৩৮৩-৮৪।

ভাবাবেগের তীব্রতায়। গোবিন্দচন্দ্রের আবেগ ছিল প্যাশনেট, বাসনাবিল; অক্ষয়কুমারের আবেগ ছিল ইণ্টেলেক্‌চুয়াল, ভাবনাউদ্বেল। এই কারণে একই ভাবের কবিতায় অক্ষয়কুমার রসসৃষ্টিতে যতটা সার্থক হইয়াছেন গোবিন্দচন্দ্র ততটা নন। অথচ অনুভূতির বাস্তবতা ও তীব্রতা গোবিন্দচন্দ্রের কবিতায় যত প্রত্যক্ষ অক্ষয়কুমারের কবিতার তত নয়। দুইজনেই নারীরূপের উপাসক। একজন চাহেন নারীরূপকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিয়া উপভোগ করিতে, অপরজন চাহেন দূর হইতে ধ্যানকল্পনায় অনুভব করিতে। গোবিন্দচন্দ্র জোর গলায় বলেন, "আমি ভালবাসি তারে অস্থিমাংস সহ," আর অক্ষয়কুমার ভাবস্বপ্ন দেখেন, "কি যেন নারীর রূপে ছেয়েছে সকলে!" দুইজনেই পত্নী-শোচক কাব্য লিখিয়াছেন, 'কুঙ্কুম' ও 'এষা'। কাব্য দুইটির মধ্যে কবিদ্বয়ের বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে অনুসরণ করা যায়।

বয়সে প্রায় সমান হইলেও অক্ষয়কুমারকে রবীন্দ্র-পূর্ব্ব কবি বলিয়া ধরা হয়। তাহার কারণ ইঁহার রচনায় বিহারীলালের অনুবর্ত্তন। কিন্তু অক্ষয়কুমারের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও উপেক্ষণীয় নয়। অক্ষয়কুমারের অনেক পূর্ব্ব হইতেই রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখিতে শুরু করিয়াছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথে প্রথম-যৌবনের কবিতা অক্ষয়কুমারের রচনাকে প্রভাবিত করিয়াছিল। অক্ষয়কুমারের প্রথম-প্রকাশিত (?) কবিতা 'রজনীর মৃত্যু'[১] রবীন্দ্রনাথের 'তারকার আত্মহত্যা'র[২] অনুসরণে লেখা। অক্ষয়কুমারের 'নিদাঘে'[৩] ও 'মথুরায়'[৪] রবীন্দ্রনাথের 'বনের ছায়া' ও 'বসন্ত অবসান'[৫]-এর প্রতিধ্বনি। রবীন্দ্রনাথ—"কোথা রে তরুর ছায়া, বনের শ্যামল স্নেহ", অক্ষয়কুমার—"কোথা সে নিকুঞ্জ-ছায়া অলস পরশ-খেলা?" রবীন্দ্রনাথ—"কখন বসন্ত গেল এবার হ'ল না গান," অক্ষয়কুমার—"আমারি হ'ল না গান, আমারি বাঁশরী নাই! বসন্ত সে এল গেল, ব'সে আছি শূন্যে তাই!" "নিশি রে, কি পত্র লিখিস্ তুই তারকা-অক্ষরে, আকাশের পরে!"[৬] এই উৎপ্রেক্ষাও রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব। রবীন্দ্রনাথের "কৈশোরক" কবিতায় যে অস্ফুট ব্যাকুলতা এবং অকারণ হৃদয়-বেদনা উদ্বেলিত হইয়াছে তাহা অক্ষয়কুমারের কবিতাকেও স্পর্শ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যাহা হৃদয়ারণ্যে অ-রূঢ়যৌবন কবিচিত্তের দিশাহারা

[১] বঙ্গদর্শন কার্ত্তিক ১২৮৯, 'প্রদীপ'।
[২] ভারতী জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮, 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'।
[৩] 'কনকাঞ্জলি'।
[৪] 'ভুল', 'কনকাঞ্জলি' (দ্বি-স)।
[৫] 'কড়ি ও কোমল'।
[৬] 'নিশীথে', ভুল।

চঙ্‌ক্রমণ, অক্ষয়কুমারের রচনায় তাহা প্রেমের অকৃতার্থতা ও দৈবহত মিলনের অস্থিরতা।

> সুরে, শ্বাসে, ত্রাসে, জলে ভেসে গেছে কথা!
> যে কথার আগাগোড়া ফেলেছি হারাই,—
> কি ক'রে বুঝাব সেই এলোমেলো ব্যথা,
> ভাবিয়া, হারায়ে দিশে এ-ও করি তাই![১]

আসল কথা, অক্ষয়কুমারের রচনার ভাবে বিহারীলালের প্রৌঢ় কবিতা ও রবীন্দ্রনাথের কৈশোরক কবিতার মধ্যে সেতুবন্ধনের প্রয়াস রহিয়াছে।

অক্ষয়কুমারের কাব্যসৃষ্টি প্রচুর নয়। 'প্রদীপ' (১২৯০, দ্বি-স ১৩০০),[২] 'কনকাঞ্জলি' (আশ্বিন ১২৯২, দ্বি-স ১৩০৪), 'ভুল' (১২৯৪)[৩] ও 'শঙ্খ' (১৩১৭)। এই কয়খানি বইয়ে ইঁহার কবিতা সঙ্কলিত আছে। 'এষা' (১৩১৯) কবিপত্নীর "ইন্ মেমোরিয়াম্" বা শোচক কাব্য।

অক্ষয়কুমারের রচনার বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে হৃদয়াবেগের প্রাবল্য কবিকে বাহিরে চঞ্চল করে নাই কিন্তু অন্তরে গভীরভাবে ভাবাবিষ্ট ও তন্দ্রাতুর করিয়াছে, এবং তাঁহার কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে নারীপ্রেমের শান্ত স্নিগ্ধতা। এই প্রেম প্রত্যক্ষ-উপলব্ধির বস্ত, তাই তাঁহার রচনায় বিরহের অবকাশ আছে, প্রেম-স্মৃতির উপলক্ষ্য নাই। নারীপ্রেম অক্ষয়কুমারের কবিতার একমাত্র বিষয়। কবির প্রেয়সী তাঁহার পত্নী, কিন্তু শুধু পত্নী নন, তিনি নারী, কবির চিত্ত মথিত করিয়া মর্ম্ম দলিত করিয়া যিনি "তৃপ্তির নরকে" কবিকে "অতৃপ্তির খেদে" জ্বালাইয়াছেন তথাপি যাঁহার মিলনে পরিপূর্ণ চরিতার্থতা অপেক্ষা করিতেছে। শিব-শিবানীর রূপকের মধ্যেও কবি এই সত্যই দেখিয়াছেন।

> আমি জগতের ত্রাস, বিশ্বগ্রাসী মহোচ্ছ্বাস,
> মাথায় মত্ততা-স্রোত, নেত্রে কালানল,
> শ্মশানে মশানে টান, গরলে অমৃতজ্ঞান,
> বিষকণ্ঠ, শূলপাণি প্রলয়-পাগল।

[১] 'কেন—বাঁধিতেছে, খুলিতেছে বারবার বীণা', বীণা বৈশাখ ১২৯৪ পৃ ২৪৪।

[২] তৃতীয় সংস্করণে (১৯১৩), সুরেশচন্দ্র সমাজপতির "প্রস্তুতি" বা ভূমিকা আছে। "উপহার" সমেত কবিতাসংখ্যা সাতাশ, তাহার মধ্যে তিনটি কবিতা নূতন।

[৩] 'ভুল' পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। ইহার কতকগুলি কবিতা দ্বিতীয় সংস্করণ প্রদীপে ও কনকাঞ্জলিতে এবং শঙ্খে সঙ্কলিত হইয়াছে।

তুমি হেসে ব'সে বামে, সাজাইয়া ফুলদামে,
কুৎসিতে শিখালে, শিবে, হইতে সুন্দর।
তোমারি প্রণয়-স্নেহ, বাঁধিল কৈলাস-গেহ,
পাগলে করিল গৃহী ভূতে মহেশ্বর।[১]

কবিচিত্তে যে বাসনা-ভাবনার, প্যাশন-ইমোশনের, সমুদ্রমন্থন চলিতেছে তাহা হইতে মুক্তির উপায় রহিয়াছে দেহের বাহুল্য বর্জ্জনে, প্রেমের উৎস উন্মোচনে, আত্মবিলোপে।

শত নাগিনীর পাকে বাঁধ বাহু দিয়া,
পাকে পাকে ভেঙ্গে যাক এ মোর শরীর।
এ রুদ্ধ পঞ্জর হ'তে হৃদয় অধীর
পড়ুক ঝাঁপায়ে তব সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপিয়া!
হেরিয়া পূর্ণিমা-শশী টুটিয়া লুটিয়া
ক্ষুভিয়া প্লাবিয়া যথা সমুদ্র অস্থির,
বসন্তে বনান্তে যথা দুরন্ত সমীর
সারা ফুলবন দলি নহে তৃপ্ত হিয়া।

ভাবাবেগের আবর্ত্ত থিতাইয়া আসিলে অকৃতার্থতার বেদনা জুড়াইয়া গেলে প্রশান্তির প্রলেপ পড়িলে নারীর মহিমা নূতন রসরূপে দেখা দেয়।

আমার পরাণ ভাসিয়া যায়, পড়ে বা উছলি
যেন এক মহাকাব্যে হ'য়ে ওতপ্রোত।...
হৃদয়ে হৃদয় দিয়ে এস, সখি, তবে,
রূপ-বনে প্রেম-কাব্য মিশাই নীরবে।[২]

তাহার পরে জাগিল জীবনের শেষ প্রশ্ন,

একি শুধু ভাব-হীন ভাষা?
এই যে কথার পিছে প্রাণান্ত পিপাসা!
এই যে চাহনি কাছে, কি অশ্রু ফুটিয়া আছে!
কি শ্বাস নিশ্বাস পাছে, দিন-রাত যোঝে!—
এই যে সুরের পরে, কত গান হাহা করে!
কত ছবি আছে প'ড়ে খসড়ার খোঁজে!
একি ভাব-হীন ভাষা, কেহ নাহি বোঝে?[৩]

কোথা তুমি, ভালবাসা, যে তুমি—সে তুমি দূরে!
গান ত হইল শেষ,
কোথা তুমি সুর-রেস?
সুখ দুখ হ'লো শেষ—হ'লো শেষ কারে ঘুরে?[৪]

[১] 'অভেদ প্রভেদ', প্রদীপ। [২] 'আলিঙ্গন', ভুল। [৩] 'ভুল', ভুল। [৪] 'শেষ', ভুল।

ব্রাউনিঙের মত অক্ষয়কুমারও এই প্রশ্নের উত্তর পাইলেন ঈশ্বর-বিশ্বাসে, সৃষ্টির চরম কল্যাণময়ত্বে।

> জীবনে আশ্বাস দিয়ে—মরণে বিশ্বাস দিয়ে
> যেমন গড়িয়াছিলে পুন গ'ড়ে লও।[১]

অক্ষয়কুমারের ভাষা সংযত ও পরিমিত। বাক্‌সংযম, শব্দচয়ন এবং পদলালিত্যের সঙ্গে ভাবগাম্ভীর্য্যের মিলন ইঁহার রচনাভঙ্গির বিশেষত্ব। পারেন্‌থেসিসের বাহুল্য দেবেন্দ্রনাথের মত। ছন্দবৈচিত্র্যের দিকে যদিও তেমন ঝোঁক ছিল না তবুও ছন্দোবিদগ্ধতার প্রমাণ অপ্রচুর নয়। রবীন্দ্রনাথের 'সোনারতরী'র খরতাল নৃত্যচপলতার পূর্ব্বাভাস রহিয়াছে অক্ষয়কুমারের 'বৃন্দাবন'এ।[২]

> বাঁধিতেছিলাম মন, আপন ঘরে!—
> কেন গৃহ ছাড়িলাম, বাঁশীর স্বরে?
> সমুখে প্রমোদ বন,
> ফুটে ফুল অগণন!
> উড়ে অলি, নাচে শিখী, হরিণী চরে।—

রবীন্দ্রনাথের মত অক্ষয়কুমারও ব্রাউনিঙের ভক্ত পাঠক ছিলেন, এবং ইঁহার কাব্যকলায় ব্রাউনিঙের প্রভাব আছে। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রদীপের কবিতাগুলি ব্রাউনিঙের অনুকরণে সাজানো।[৩] প্রথম অংশে অবতরণিকায় কবি নারী-সৌন্দর্য্যে সৃষ্টির চরিতার্থতা লক্ষ্য করিয়াছেন। দ্বিতীয় অংশে সংসারে নারীপ্রেমের অচরিতার্থতা তাঁহাকে হতাশায় ডুবাইয়াছে। তৃতীয় অংশে কবিহৃদয়ে ক্লান্তি ও অবসাদের প্রশান্তি। নিজের হৃদয়বেদনা হইতে কবি দৃষ্টি ফিরাইয়াছেন, "চারিদিকে হেলাফেলা তবু কি সুন্দর!" চতুর্থ অংশে প্রেমের গীতিতে কবি নিজের প্রেমের সুরটি প্রকৃতির সহজ সৌন্দর্য্যের সুরে মিলাইয়া দিয়াছেন।

> যাস্, বায়ু, পায় পায়—
> শুইয়া পড়িস্ গায়,
> কোরক-হৃদয়ে তার গানটিরে দিস্ রেখে;

[১] 'কোথা তুমি', প্রদীপ। [২] প্রথমপ্রকাশ ভারতী, মাঘ ১২৯২।

[৩] "সাজাইবার গুণে গীতিকবিতাবলীতেও বেশ একখানি কাব্যের আভাস বা হৃদয়ের একটি ক্রমবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এবার একটু সে রকম চেষ্টাও করিয়াছি।…এই বিন্যাস-নৈপুণ্য রবার্ট ব্রাউনিঙে শিক্ষা।" প্রদীপের আটাশটি কবিতার মধ্যে শুধু সাতটি প্রথম সংস্করণ হইতে গৃহীত, এবং তাহাও "আমূল পরিশোধিত"।

সে যেন মধুর ঘুমে—
গানটির ধীর চুমে
স্বর্গের স্বপন সঙ্গে শৈশব-স্বপন দেখে।

পঞ্চম অংশে পারিপার্শ্বিকের সহিত কবির মানসিক বিরোধ, কবিচিত্তের দৈবী অসন্তুষ্টি, এবং ঈশ্বর-বিশ্বাসের মধ্যে আশ্বাস-অন্বেষণ। ষষ্ঠ অংশে কামনা-বিরহিত উদার প্রেমে আশ্বাসলাভ।

শত ফেরে প্রাণ ঢাকি তবে দূরে বসে থাকি,
অহো একি কপটতা—মাঙ্গল্যে সন্দেহ।
নগ্ন প্রাণে নগ্ন দেহে শিশু আসে ভব-গেহে,
কেন রবি-শশী-চোখে ধরা করে স্নেহ?

কনকাঞ্জলির প্রথম সংস্করণে ছাব্বিশটি কবিতা ছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে অর্দ্ধেকের বেশি কবিতা নূতন। উৎসর্গ কবিতার উদ্দিষ্ট কবিগুরু বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী। কাব্যের প্রথম অংশ 'কিশোর কথা'য় কবিচিত্তের অস্থিরতা, দ্বন্দ্ব ও তাহার অবসানের প্রকাশ। "বাস্তবে স্বপনে দ্বন্দ্ব"—প্রেমের এই চিরন্তন সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত কবি পাইয়াছেন,

বুঝি না বাঁশরী দূরে
সহস্র আস্থায়ী ঘুরে,
অসীম মিলন স্মরে সসীম বিচ্ছেদে।

দ্বিতীয় অংশ 'বৃন্দাবন-গাথা'য় রাধাকৃষ্ণপ্রেমগীতিকে যৎসামান্য উপলক্ষ্য করিয়া কবি নিজের হৃদয়বেদনাই ঢালিয়া দিয়াছেন। শেষ কবিতা 'অবশিষ্ট' কবিরই আত্মকথা। তৃতীয় অংশ 'বনলতা' একটি ছোট গাথা-কাব্য। ইহার শেষ কবিতায় হুগোর 'টয়লার্স অব্ দি সী' কাহিনীর ছায়া আছে। দীর্ঘ 'উপহার' দ্বারা 'ভুল' কাব্য রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের উপর একটি সনেটও আছে।[১] পারিবারিক গোষ্ঠীর বাহিরে রসবিদ্ কর্ত্তৃক রবীন্দ্রনাথের ইহাই প্রথম প্রকাশ্য অভিনন্দন। কবিতাটিতে অক্ষয়কুমারের সনেটের উদাহরণ মিলিবে।

কোটি কোটি বর্ষা নিশি ঘুরেছে জগত,
শত কোটি কোটি তারা ঘেরে চারি ধার,
জ্বলিয়া—নিবিয়া গেছে, খদ্যোতের মত!
পথিক পায় নি পথ, গন্তব্য তাহার।

[১] পরে 'শঙ্খ' কাব্যে সঙ্কলিত।

মেঘ-স্তরে-স্তরে আজ, সুদূর আকাশে,
কনকের রেখা মত কি যেন ফুটিছে।
বিহঙ্গের কল-কলে, কুসুমের বাসে,
স্তম্ভিত সমীর যেন চমকি উঠিছে।
হিমাদ্রির অভ্র-ভেদি শিখরে শিখরে,
সপ্তমে প্রভাত-স্তোত্র কাঁপিছে গম্ভীরে।
তমসার শ্যাম কূলে, কুটীরে কুটীরে,
সর্জ্জরস-ধূম-স্তর ওঠে স্তরে স্তরে।
জগত—জগত নয়, যেন স্বর্গ-ছবি।
সংসার, চকিত নেত্রে, ফোটে রবি—কবি!

ভুলে কতকগুলি ছোট ছোট কবিতা-কণিকা আছে, তাহার কয়েকটি হুগোর কবিতার অনুবাদ বা অনুসরণ।

অক্ষয়কুমারের পত্নীবিয়োগে 'এষা' কাব্যের উৎপত্তি। কাব্যটি পূর্ণপরিণত জীবনের রচনা। 'উপহার' ও 'নিবেদন' ছাড়া চারি অংশ—'মৃত্যু', 'অশৌচ', 'শোক' এবং 'সান্ত্বনা'। এষার মর্ম্মবাণী হইতেছে বৈয়ক্তিক কামনা—"মানবীর তরে কাঁদি, যাচি না দেবতা"। মানবাত্মার পরিণতির পক্ষে শোকদহন অপরিহার্য্য,

এ মোহ-কলঙ্ক-শিখা—তোমারি কি হোমশিখা,
দাহিয়া নীচতা দৈন্য উঠিছে গগনে?

অক্ষয়কুমার কিছু গানও লিখিয়াছিলেন। তাঁহার একটি গানে রবীন্দ্রনাথ সুর দিয়াছিলেন। গানটি এই,

বুঝতে নারি নারী কি চায় চায় গো।
মাঝখানে ছেদ কইতে কথা
চাইতে চাইতে মুদে পাতা
হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলে
আসতে কাছে ফিরে যায়।

৬

কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩) অল্প বয়সেই কবিতারচনায় হাত দিয়াছিলেন। সমসাময়িকদের মধ্যে ইনিই রবীন্দ্রনাথের দ্বারা সর্ব্বাধিক প্রভাবিত হইয়াছিলেন[১] যদিও পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্যধারার সহিত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। কামিনী রায়ের কবিদৃষ্টি আত্মগত অথচ বাহিরের প্রতি উদাসীন নয়, এবং

[১] রবীন্দ্রনাথের সংশোধন ইঁহার রচনায় অনপেক্ষিত নয়।

বিহারীলালের মত ভাবোন্মত্ত অথবা অক্ষয়কুমারের মত ভাবতন্ময়ও নয়। বিষয়নিষ্ঠা, নীতিচিন্তা এবং উপদেশাশ্রয় ইহার রচনাকে পূর্ব্বগামী কবিদের ধারার সঙ্গে যুক্ত রাখিয়াছে। ভাষা পরিমিত ও সংযত, কিন্তু সঙ্গীতময় নয়। ছন্দে তরঙ্গ ও বৈচিত্র্য নাই।

কামিনী রায়ের কাব্যে নারীহৃদয়ের প্রকাশ যতটা অকৃত্রিম এমনটি ইতিপূর্ব্বে কোন মহিলার রচনায় দেখা যায় নাই। দৈব-হত অথবা প্রিয়-বিড়ম্বিত নারীপ্রেমের সশঙ্ক কুণ্ঠা এবং আত্মলোপী ব্যক্তিনিরপেক্ষ নিঃস্বার্থতা ইহার কাব্যের বিশিষ্ট সুর। এইরূপ নৈর্ব্যক্তিক সুর বৈষ্ণব-কবিতায় পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু কামিনী রায়ের কাব্যে ইহা একান্তভাবে বৈয়ক্তিক। কবিহৃদয়ের মর্ম্মকথা,

হয় হোক্ প্রিয়তম,
অনন্ত জীবন মম
অন্ধকারময়,
তোমার পথের পরে
অনন্ত কালের তরে
আলো যদি রয়।[১]

তুমি পতি, তুমি প্রভু, মন, মান মম
সকলি তোমার হাতে, দল যদি হায়,
এই রমণীর মন, তাহা, বল প্রিয়তম,
তোমারি চরণপ্রান্তে লুটাবে ধরায়।[২]

প্রিয়তমের ভালোবাসা বাঁধিয়া রাখিবার মত কোন গুণ নাই বলিয়া যৌবন-তপস্যার উপর নির্ভর করিতে হয়।

আমি যৌবনের লাগি তপস্যা করিব ঘোর,
কালে না করিবে জয় জীবন-বসন্ত মোর,
জীবনের অবসান হোক যেইদিন হবে,
যাবৎ জীবন মম তাবৎ যৌবন রবে,
এই আমি করিয়াছি পণ।[৩]

কামিনী রায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আলো ও ছায়া' (১৮৮৯) হেমচন্দ্রের লিখিত ভূমিকা লইয়া বাহির হয়। প্রথমপ্রণয়ের ভীরুতা ও বিচ্ছেদকাতরতা অধিকাংশ কবিতায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। শেষে 'মহাশ্বেতা' ও 'পুণ্ডরীক' নামে যে দুইটি দীর্ঘ কবিতা[৪] আছে তাহাতে ভাবের ও রচনার গাঢ়তার

[১] 'পান্থ যুগল', আলো ও ছায়া।
[২] 'নিরুপায়', মাল্য ও নির্ম্মাল্য।
[৩] 'যৌবন তপস্যা' আলো ও ছায়া।
[৪] রচনাকাল ১৮৮৬।

পরিচয় লভ্য। সংস্কৃত সাহিত্যের চরিত্র অবলম্বনে কাব্যরচনা ইহাই প্রথম। দ্বিতীয় গ্রন্থ 'মাল্য ও নির্ম্মাল্য' (১৩২০, দ্বি-স ১৯১৮)। ইহাতেও কবির প্রথম-জীবনে লেখা (১৮৮০ হইতে) কয়েকটি কবিতা আছে। মাল্য ও নির্ম্মাল্যের রচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব স্পষ্টতর। অধিকাংশ কবিতায় ঔদাসীন্যপ্রত্যাখ্যাত ও আশাহত মুগ্ধ নারীহৃদয়ের মৃদু অভিমান-অনুযোগ এবং আত্মলোপের সুর আছে।

> তোমার কণ্ঠের স্বর, তব দৃষ্টিখানি,
> মনে হয়, আমি যেন চিরদিন জানি ,
> আশা হ'ল তোমা হ'তে ভাল করে পাব
> আপনার পরিচয় ,...[১]

প্রিয়ের উদাসীনতা আন্তরিক নয়—ইহাই সান্ত্বনা। সমাজের ও সংস্কারের বাহিরে পাইলে, অভিমান ও ভুল-বোঝা দূর হইলে, মানসলোকে মিলন হইবে বাধাহীন।

> যদি একদিন শুধু জীবনে ছুটি পাই,
> জগতের সীমাশেষে দু'জনে মিলে যাই,
> বিধাতার আঁখি ছাড়া' দ্বিতীয় নাহি কেহ,
> সন্ধ্যারূপে ঘিরে রবে দুজনে তাঁর স্নেহ ,...[২]

কামিনী রায়ের অপর কাব্যগ্রন্থ হইতেছে 'পৌরাণিকী' (১৩০৪), 'অশোক-সঙ্গীত' (১৯১৪), 'গুঞ্জন' (১৩১১), 'দীপ ও ধূপ' (১৯২৯) এবং 'জীবনপথে' (১৯৩০)। পৌরাণিকীতে একটি ক্ষুদ্র নাটিকা 'একলব্য' এবং দুইটি কবিতা 'ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি দ্রোণ' ও 'রামের প্রতি অহল্যা' আছে। অশোকসঙ্গীত ও জীবনপথে সনেটগুচ্ছ। প্রথমটিতে পুত্রবিয়োগবিধুর জননীর ব্যথার প্রকাশ। গুঞ্জনে রবীন্দ্রনাথের 'শিশু'র অনুসরণ।

দীপ-ও-ধূপের কয়েকটি কবিতায় অসহযোগ-আন্দোলনের প্রতি কবির সহানুভূতির প্রকাশ আছে। জীবনপথের সনেটগুলি অনেককাল পূর্ব্বে লেখা। প্রথম অংশ 'সহযাত্রা'।[৩] এখানে পাই প্রণয়স্মৃতির রোমন্থন। দ্বিতীয় অংশ 'একেলা'য় বিরহের নিরাশ্রয়তা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তৃতীয় অংশ 'ঝরা ফুল'এ বিবিধ কবিতা আছে। সনেটগুলির ভাষায় ও গঠনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে পড়িয়াছে।

[১] 'হৃতাভিজ্ঞান'। [২] 'একদিনের ছুটী' (রচনাকাল ১৮৯১)।
[৩] রচনাকাল ১৯০৬।

কামিনী রায়ের কবিতার ভাষা সরল, সংযত এবং পরিমিত। ভাবে ও ভাষায় সংযম ও শালীনতা ইহার রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। হৃদয়-দ্বন্দ্বের মধ্যে নৈতিক এবং বৃহত্তর আদর্শের সঙ্গতি অন্বেষণ ইহার কবিতার মর্ম্মকথা। ইহাই কবির নারীহৃদয়ের আসল পরিচিতি। পৌরাণিক কাহিনীর প্রতি কবির যে বিশেষ আকর্ষণ ছিল তাহা পৈতৃক।[১] ইহার পরিচয় পাই 'অম্বা' নাটিকায় এবং 'পৌরাণিকী কাব্যে। ইহার অপর নাট্যগ্রন্থ 'সিতিমা'য় (১৯১৬) প্রাচীন পরিবেশে রোমান্টিক ট্রাজেডি বর্ণিত হইয়াছে। 'ধর্ম্মপুত্র' (১৯০৭) টলষ্টয়ের 'গড্ সন' গল্পের অনুবাদ॥

৭

বঙ্কিম-যুগশেষের বৈদগ্ধ্যের শেষ শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি, রবীন্দ্রনাথের যৌবনবন্ধু, শ্রীহর্ষ হইতে রাস্‌কিন পর্য্যন্ত "সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক," প্রিয়নাথ সেন (১৮৫৪-১৯১৬) অনেক কবিতা লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সেগুলি কখনো মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠা হইতে কুড়াইয়া কাব্যগ্রন্থাকারে সঞ্চিত হয় নাই বলিয়া তিনি সাধারণ্যে কবি বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন নাই। প্রিয়নাথ হালকা ও ভারি দুই চালেরই কবিতা রচনা করিয়াছিলেন কতকটা রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করিয়া। তবে লঘু ছাঁদের কবিতা তাঁহার হাতে তেমন উতরায় নাই। যেমন,

বদনখানি চাঁদের আলো
        কালো কেশের রাশি
হাসি-ভরা ঠোঁটখানি তার
        পরাণ-উদাসা।
তনয় দুটি সাঁজের তারা
        ভেসে ভেসে রয়
কথা কইলে পরে আধ আধ
        দুটি কথা কয়।...[২]

প্রিয়নাথ ফিট্‌জেরাল্ড্-কৃত ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতের (রুবাইয়ের মিল রাখিয়া) অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।[৩] প্রথম স্তবকটি এই,

প্রভাতে উঠিল ধ্বনি মোর সুরা-ঘরে—
"মাতাল পাগল মোর, লক্ষ্মীছাড়া ওরে

[১] কবির পিতা ছিলেন ঐতিহাসিক উপন্যাসলেখক চণ্ডীচরণ সেন।
[২] 'লজ্জাবতী,' ভারতী কার্ত্তিক ১২৯২।
[৩] তিরিশটি রুবাই সাহিত্যে (পৌষ ১৩০৭) বাহির হইয়াছিল।

পূর্ণ করি সুরাপাত্র—সুরা দিয়ে আয়,
আয়ুপাত্র না পুরিতে অদৃষ্টের করে।"

সনেটগুলিতেই প্রিয়নাথের মিতভাষিণী কবিতার নিজস্ব রূপটি ফুটিয়াছে—রূপসৌষ্ঠবের সঙ্গে ভাবগভীরতার সম্মিলনে। যেমন 'বসন্ত অন্তে' "কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রিয়বরেষু,"

অচির হায় বসন্ত এল—গেল চলে—
নিভে গেল কোকিলের দীপক-পঞ্চম,
ভঙ্গুর কুসুম-শোভা ভেঙ্গে পড়ে ঢলে,
প্রভঞ্জনে পরিণত—উৎপাৎ বিষম—
অলস—পরশ-মধু মলয়ার বায়!
যায় যদি যাক চলে ক্ষণিকের স্নেহ।
অফুরাণ ফুলরাখি কোথা তাহা হায়!
এ যে শুধু ছলনার মরীচিকা গেহ।
যে মদিরা পান তরে প্রাণ তৃষাতুর
কোথা তাহা?—কোথা জ্বলন্ত যৌবনা তব
শোভনা প্রকৃতি কবি? বিশাল চিকুর
আবরে প্রকাশে যার তন্থুর বিভব—
নগ্ন দেহ—কম্প্র বক্ষ—মদির নয়ন
ঢালুক অশেষ নেশা—পুলক দহন।[১]

আর একটি নমুনা,

ধরা যে তোমায় পাব, কেমনে—কোথায়?
লেলিহান দীর্ঘ তৃষা মিটাই কেমনে?
কোন রূপে বহুরূপী, হৃদয়-বেলায়—
তোমারে করিয়া বন্দী নিবাই চরণে
অশেষ বাসনা-উর্ম্মি—সংক্ষুব্ধ জীবনে!
ধ্যান বল, প্রেম বল,—নিষ্ফল প্রয়াস!
পাইলেও পাই নাই—মিটে না তিয়াস।
চির উপভোগ নেশা—চির-অন্বেষণে![২]

গদ্যরচনায়, বিশেষত সাহিত্য সমালোচনায় তখন খুব কম লেখকই ছিলেন প্রিয়নাথের সমান। প্রিয়নাথের সমালোচনা-প্রবন্ধগুলি এবং অপর গদ্যরচনা—তাহার মধ্যে একটি গল্পও আছে—'প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি'তে (১৩৪০) সঙ্কলিত হইয়াছে॥

[১] রবীন্দ্রনাথের 'প্রত্যুপহার' "(পূর্ব্বোক্ত কবিতা-প্রসঙ্গে রচিত) শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেনের করকমলে উপহৃত"—"অচির বসন্ত হায় এল গেল চলে" ইত্যাদি কবিতা সহ 'প্রদীপ' পত্রিকায় প্রকাশিত (জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭)।

[২] 'মানসী' বঙ্গদর্শন (নবপর্য্যায়) মাঘ ১৩০৮।

৮

যে স্থায়িত্বগুণ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকগুলিতে নাই তাহা তাঁহার হালকা ছাঁদের কবিতায় ও হাসির গানে আছে। ব্যঙ্গকৌতুকের ডালা সাজাইয়াই দ্বিজেন্দ্রলাল সাহিত্যের আসরে প্রথম দেখা দিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র গদ্যরচনা 'একঘরে'তে (১৮৮৯) বিলাতফেরতদের প্রতি গোঁড়াদের মনোভাব লইয়া কৌতুক করা হইয়াছে। তাহার পর বাহির হয় এই কবিতার বইগুলি—দুইভাগ 'আর্য্যগাথা' (১৮৮২, ১৮৯৩), 'আষাঢ়ে' (১৩০৫), 'মন্দ্র' (১৩০৯), 'আলেখ্য' (১৩১৪) ও 'ত্রিবেণী' (১৩১৯)। আষাঢ়ে ও মন্দ্রের মাঝখানে বাহির হয় 'হাসির গান' (১৩০৭)।[১]

দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার বৈশিষ্ট্য দুইটি, কৌতুকের স্পর্শ, এবং ছন্দে ও ভাষায় প্রচলিত রীতি উল্লঙ্ঘনের দুঃসাহস। কবি হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলাল খুব সার্থকতা দেখাইতে পারেন নাই, তবে পদ্যের ললিত রীতিতে গদ্যের ঔদ্ধত্য আনিয়া বাঙ্গালা কাব্যের ছাঁইলে অভিনব শক্তি সঞ্চার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই চেষ্টার পিছনে যদি দীর্ঘতর প্রযত্ন ও সাধনা থাকিত তাহা হইলে হয়ত তাঁহার কবিসৃষ্টি শেষ অবধি সার্থক হইত। মন্দ্রের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের কবিকৃতির অকৃপণ মূল্য বিচার করিয়াছেন, "এই কাব্যে যে ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অবলীলাকৃত ও তাহার মধ্যে সর্ব্বত্রই প্রবল আত্মবিশ্বাসের একটি অবাধ সাহস বিরাজ করিতেছে। সে সাহস কি শব্দনির্ব্বাচনে, কি ছন্দোরচনায়, কি ভাববিন্যাসে সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ণ।...কাব্যে যে নয় রস আছে, অনেক কবিই সেই ঈর্ষ্যান্বিত নয় রসকে নয় মহলে পৃথক্ করিয়া রাখেন,—দ্বিজেন্দ্রলালবাবু অকুতোভয়ে এক মহলেই একত্রে তাহাদের উৎসব জমাইতে বসিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে হাস্য, করুণা, মাধুর্য্য, বিস্ময়, কখন্ যে কাহার গায়ে আসিয়া পড়িতেছে, তাহার ঠিকানা নাই।"[২]

দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যপদ্ধতির গুণ হইতেছে ভাবে ভাষায় ও ছন্দে অকুণ্ঠ সাহস ও বলিষ্ঠ স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতাই তাঁহার কতকগুলি সীরিয়াস কবিতাকে ঝাঁঝালো করিয়াছে। কিন্তু ভাষা প্রায়ই নিতান্ত গদ্যঘেঁষা এবং

[১] কয়েকটি গান প্রথমে ভারতীতে বাহির হইয়াছিল। 'নন্দলাল' প্রথম বাহির হইয়াছিল ভারতীতে (বৈশাখ ১৩০৩)।

[২] বঙ্গদর্শন (নবপর্য্যায়) কার্ত্তিক ১৩০৯।

ছন্দোবন্ধ শিথিল হওয়ায় কাব্যরসের কিছু হানি করিয়াছে। কাব্যশিল্পে প্রযত্নের অভাব এবং শব্দনির্ব্বাচনে দুর্ব্বলতা দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার প্রধান দোষ। ক্বচিৎ ইংরেজি ধরণের শব্দপ্রয়োগও তাই। দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ করিতে ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিলেন।[১]

দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার একটি ভালো নমুনা 'কেরাণী'[২] হইতে শেষ স্তবক উদ্ধৃত হইল।

খেটে খেটে খেটে
যে কয় দিন বাকি আছে তাও যাবে কেটে,
বিধাতার আদালতে পরকালে গিয়ে,
উত্তর দেবার সময় আছে—"দিইছি তিন মেয়ের বিয়ে,
তাহাই আমার ধর্ম্ম,
তাহাই আমার কর্ম্ম,
বিয়ে দিতে দিতে প্রায় কেটে গ্যাছে জন্ম,
আর, নিজে তুই বিয়ে করে ফুরিয়ে গ্যাল 'প্রমায়',
আর কিছু করিবারে পাইনিক সময়।"

এই ধরণের মিশ্ররস দ্বিজেন্দ্রলালের বাৎসল্যরসের কবিতারও বিশেষত্ব। যেমন,

একি রে তার ছেলে-খেলা বকি তায় কি সাধে,—
যা দেখবে বলবে ওমা, এনে দে, ওমা দে!…
শুনলো কারো হবে বিয়ে,
ধরল ধূয়ো অমনি গিয়ে—
"ওমা আমি বিয়ে করব"—কান্নার ওস্তাদ্ এ!
শোনে কারো হবে ফাঁসি,—
অমনি আঁচল ধরল আসি—
"ওমা আমি ফাঁসি যাব"—বিনি অপরাধে।

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি বিশেষ অভাব মোচন করিয়াছে॥

৯

উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর সন্ধি-দশকগুলিতে অনেক কবিতাকার অল্পবিস্তর খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন সাধারণ পাঠকসমাজে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ

[১] মন্দ্রের 'জাতীয় সঙ্গীত' মানসীর 'দুরন্ত আশা'র অনুকরণ। আলেখ্যের কয়টি কবিতায় শিশুর অনুকরণ প্রচেষ্টা দেখা যায়। [২] মন্দ্র, প্রথম প্রকাশ সাধনা অগ্রহায়ণ ১৩০১।

ক্ষমতাশালী ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু বেশির ভাগই নকলিয়া ও মক্‌শনবীশ। যাঁহারা একাধিক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করিয়া নিজের নামকে কিছুপরিমাণে স্থায়িত্ব দিয়াছিলেন তাঁহাদের কথা সংক্ষেপে সারিয়া দিলে উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের ইতিহাসে ডোর দেওয়া যায়।

এ সময়ের মহিলা কবিদের পদ্যলেখায় যে হাত খুলিয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে হয়। 'প্রমীলা' (১৮৯০) ও 'তটিনী' (১৮৯২) কাব্যের লেখিকা প্রমীলা নাগ (?-১৮৯৬) অল্প বয়সে লোকান্তর গমন না করিলে বাঙ্গালা কাব্যের লাভ হইতে পারিত। সরোজকুমারী (গুপ্তা) দেবী (১৮৭৫-১৯২৬) 'হাসি ও অশ্রু' (১৮৯৫), 'শতদল' (১৩১০) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের ও 'কাহিনী বা ক্ষুদ্র গল্প'এর (১৩১৫) রচয়িত্রী। মাইকেল মধুসূদনের জ্ঞাতিভ্রাতুষ্পুত্রী মানকুমারী বসু (১৯৬৩-১৯৪৩) 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি', 'কনকাঞ্জলি' (১৮৯৬), 'বীরকুমার-বধ' (১৩১০) প্রভৃতি কাব্য লিখিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রথম রচনা দুইটি গদ্য—স্বামীর অকালমরণে ভাবোচ্ছ্বাস 'প্রিয়-প্রসঙ্গ', ও 'বনবাসিনী' (১৮৮৮)। অপর কবিতারচয়িত্রী হইতেছেন—ষোড়শীবালা দাসী,[১] জ্ঞানেন্দ্রমোহিনী দত্ত,[২] শ্রীমতী মৃণালিনী,[৩] নগেন্দ্রবালা (মুস্তফী) সরস্বতী,[৪] সুরমাসুন্দরী ঘোষ,[৫] অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা,[৬] কুসুমকুমারী রায়চৌধুরী,[৭] নিস্তারিণী দেবী,[৮] অনঙ্গমোহিনী দেবী,[৯] বিনয়কুমারী বসু[১০] ও লজ্জাবতী বসু[১১]।

"মহাকাব্য" ও লম্বা কাহিনীকাব্য রচনার দুঃসাহস দেখাইয়াছিলেন দুই চারি জন। তাহার মধ্যে কয়েকজনের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। মানকুমারী বসুর 'বীরকুমার-বধ'এর (১৩১০) বিষয় অভিমন্যুর কাহিনী। হরগোবিন্দ (লস্কর) চৌধুরীর 'দশাননবধ' (১৩১০)[১২] সংস্কৃত মাত্রাছন্দে রচিত। শশধর রায় লিখিয়াছিলেন তিনখানি কাব্য,[১৩] মধুসূদনের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু

[১] 'পুষ্পপুঞ্জ' (১২৯১)। [২] 'ধূলিরাশি' (১৮৯৪)।

[৩] 'প্রতিধ্বনি', 'নির্ঝরিণী' (১৮৯৫), 'কল্লোলিনী' (১৮৯৬), 'মনোবীণা' (১৯০০)।

[৪] 'মর্ম্মগাথা' (১৩০৩), 'প্রেমগাথা' (১৩০৫), 'অমিয়গাথা' (১৩০৮), 'ব্রজগাথা' (১৩০৯)।

[৫] 'সঙ্গিনী' (১৯০১), 'রঙ্গিনী' (১৯০৩),। [৬] 'প্রীতি ও পূজা' (১৩০৪), 'খোকা' (১৯০৪)।

[৭] 'প্রসূনাঞ্জলি' (১৩০৭), 'মর্ম্মোচ্ছ্বাস' (১৩১১)। [৮] 'মনোজবা' (১৯০৪)। [৯] 'শোকগাথা' (১৩১৩), 'প্রীতি' (১৩১৭)।

[১০] বামাবোধিনী পত্রিকায় ও অন্যত্র ইঁহাদের কবিতা বাহির হইত।

[১১] প্রথম ভাগ 'রাবণবধ' নামে বাহির হইয়াছিল (১৩০০)। [১২] 'ত্রিদিববিজয়' (১৩০৩), 'রাঘববিজয়' (১৩১০), 'বঙ্গদর্পণ' (১৩১০)। [১৩] 'পৃথ্বীরাজ' (১৩২২) ও 'শিবাজী' (১৩২৫)।

দুইখানি।[১] মুহম্মদ কাজেম (১৮৫৪-১৯৫১) "কায়কোবাদ" ছদ্মনামে কাব্য-রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রথম রচনার মধ্যে দুইটি কবিতা ১২৯৭ সালের ভারতীতে বাহির হইয়াছিল। ইঁহার রচনাবলীর মধ্যে 'মহাশ্মশান' কাব্য (১৯০৪) ও 'অশ্রুমালা' (চ-স ১৯২৭) উল্লেখযোগ্য। পাণিপথের তৃতীয়যুদ্ধ ও মারাঠা-শক্তির পতন-কাহিনী লইয়া মহাকাব্যের ছাদে মহাশ্মশান রচিত। অপর মুসলমান লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শেখ ফজলল করিম,[২] ও মোজাম্মেল হক[৩]।

সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদে ব্যাপৃত ছিলেন নবীনচন্দ্র দাস।[৪] জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বিহারীলালের[৫] ও রবীন্দ্রনাথের[৬] অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যতীন্দ্রকুমার রায়চৌধুরীর[৭] রচনায় ও ভবানীচরণ ঘোষের[৮] কবিতায় হেমচন্দ্রের অনুবর্ত্তন করিবার চেষ্টা আছে। পুলিনবিহারী দত্ত[৯] ও সুরেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত[১০] রবীন্দ্রনাথকে অনুকরণ করিয়াছিলেন। অপর কয়েকজন কবিতাকারক হইতেছেন—গোবিন্দচন্দ্র বসু[১১], ইন্দুভূষণ রায়[১২], রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়[১৩], নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত[১৪], হেমচন্দ্র ঘোষ[১৫], যোগেন্দ্রনাথ সরকার[১৬], বরদাচরণ মিত্র[১৭], নিত্যকৃষ্ণ বসু (?-১৯০০)[১৮] ও নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য (১২৬৬-১৩৪৬)[১৯]। নিত্যকৃষ্ণ 'সাহিত্য' পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। ইঁহার কবিতার ভাষা সংযত, গদ্যঘেঁষা এবং ভাব সংহত ও বস্তুনিষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আছে। নবকৃষ্ণের কবিতাগুলি বহুদিন ধরিয়া মাসিকপত্রিকার পৃষ্ঠাতেই ছড়ানো ছিল। ইঁহার কবিতার ছন্দোঝঙ্কারে সহজ নৈপুণ্যের পরিচয় আছে। শিশুপাঠ্য কবিতায় ইঁহার স্বাভাবিক দক্ষতা ছিল॥

[১] 'পরিত্রাণ' (১৩১০)। [২] 'হজরৎ মহম্মদ' (১৩১৯)।

[৩] 'রঘুবংশ' (১৮৯১), 'কিরাতার্জুনীয়' (১৯০৬), 'শিশুপালবধ' (১৯০৩) ও ক্ষেমেন্দ্রের 'চারুচর্য্যাশতক' (১৯১৩)। প্রথম বই 'আকাশ-কুসুম কাব্য' (১২৯০ দ্বি-স ১৮৯৩), প্রথম প্রকাশ হালিসহর-পত্রিকায় ১২৮৭ সালে। অপর কাব্যপুস্তিকা 'শোকগীতি'র (১৯০০) প্রথম দুই কবিতা যথাক্রমে কুপারের 'অন্ দি রিসীট্ অব্ মাই মাদার্স পিক্‌চার' এবং গ্রের 'এলিজি'র অনুবাদ।

[৪] 'তৃণপুঞ্জ' (১২৮৯, তৃ-স ১৩২৯)। [৫] 'বীণা ও বাঁশরী' (১২৯৮)।

[৬] 'ছিন্ন আশা' (১২৯৩, দ্বি-স ১২৯৭)। [৭] 'গীতিকবিতা' (১২৯৪)। [৮] 'হৃদয়প্রতিধ্বনি' (১২৮৯), 'কাব্যকণা' (১৩১৬)। [৯] 'ঝঙ্কার' (১২৯০)। [১০] 'শান্তিজল' (১৮৮৬) ও 'শান্তি-ষট্‌ক' (১৩০৩)। [১১] 'অঞ্জলি' (১২৬৪)। [১২] 'প্রলাপ' (১২৯২)। [১৩] 'উপহার' (১৮৮৭) ও 'বিসর্জ্জন' (১৮৮৭)। [১৪] 'মানসপ্রবাহ' (১৮৮৭)। [১৫] 'দীপ্তি' (১৮৯১)। [১৬] 'অবসর' (১৩০২) ও মেঘদূতের অনুবাদ (১৮৯৩)। [১৭] 'মায়াবিনী' (১২৯২) ও 'প্রেমের পরীক্ষা' (১২৯৯)। 'ভবানী' (১৩২৬) গল্পের বই, মৃত্যুর অনেককাল পরে সঙ্কলিত। [১৮] 'পুষ্পাঞ্জলি' (১৩৪১)।

সংযোজন-সংশোধন

পৃষ্ঠা ১৫ পংক্তি ৯

রাজনারায়ণের 'আত্মীয় সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত' বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক রচনা। অ্যাডিসনের কিছু অনুসরণ আছে; তবে অধিকাংশেই রচনাটি মৌলিক।[১]

পৃষ্ঠা ২৬ পংক্তি ২০

লেবেডেফের পরে যে রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের খবর মিলে তাহা প্রধানত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উদ্যোগে ঘটিয়াছিল। সমসাময়িক সংবাদপত্রে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার (Hindu Thoatre) সম্বন্ধে যে সামান্য কিছু বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে জানা যায় যে প্রধানত এখানে ইংরেজি নাটকের সম্পূর্ণ অথবা আংশিক অভিনয় হইত। বাঙ্গালা অভিনয় যে একেবারেই হয় নাই তাহা নয়। উইল্‌সনের বিক্রমোর্বশীর অনুবাদ অবলম্বনে এক যাত্রা-পালার মত বস্তু হিন্দু থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর। সেই সঙ্গে শেক্‌স্‌পিয়রের জুলিয়াস সিজরের শেষ অঙ্কও অভিনীত হইয়াছিল।[২] এ বিষয়ে সমাচার-চন্দ্রিকায় (৭ জানুয়ারি ১৮৩২) "কস্যচিৎ পাঠকস্য" যে চিঠি বাহির হইয়াছিল তাহা যাত্রা-গীতাভিনয়ের ইতিহাসের পক্ষে তাৎপর্য্যপূর্ণ।

> এক্ষণে কেবল কালীয়দমন রামযাত্রা চণ্ডীযাত্রা যাহা রাঢ়দেশীয় ক্ষুদ্রলোকের সন্তানেরা করিয়া থাকে তাহাতেই দেখা যায় (।) এক্ষণে ভদ্রলোকের সন্তানেরা ঐ ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন (।) ইহা অবশ্যই উত্তমরূপে হইতে পারিবেক। অধিকন্তু সুখের বিষয় ইহারা ধনিলোকের সন্তান (।) ইহাঁরদিগকে প্রতিপদে পেলা দিতে হইবে না (।) কালিদমনের ছোড়াগুলা সর্ব্বদাই টাকাপয়সা চাহে (।) তাহারা পয়সা বা সিকি আধুলি না পাইলে দর্শকদিকের নিকট আসিয়া অনেকরকম রঙ্গভঙ্গ করে সম্মুখ হইতে যায় না (।) সুতরাং তাহাতে মনে সন্তোষ জন্মুক বা না হউক কিঞ্চিৎ দিতেই হয় (।) এ রকম যাত্রায় সে আপদ নাই।

পৃষ্ঠা ২৮ পংক্তি ৬

আধুনিককালে বাঙ্গালীর প্রথম মৌলিক নাট্যরচনা (যেমন প্রথম মৌলিক কবিতা ও গল্প রচনা) হিন্দু-কলেজের ছাত্রের এবং ইংরেজিতে। এটি কৃষ্ণ-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে পাদ্রি) রচিত 'দি পার্সিকিউটেড' (১৮৩১)[৩]।

[১] বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত (বৈশাখ আষাঢ় ১৩৬০) শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য্য লিখিত 'একটি দুর্লভ রচনা' দ্রষ্টব্য।

[২] সংবাদপত্রে সেকালের কথা (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত), দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ২৭৯।

[৩] কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেটে পুনর্মুদ্রিত (১৯৪১)।

উদারপন্থীর উপর গোঁড়া হিন্দুদের নির্যাতন যাহা কৃষ্ণমোহন নিজে অনুভব করিয়াছিলেন তাহাই রচনাটির উপজীব্য। সুপণ্ডিত ও বহুভাষাবিদ্ কৃষ্ণমোহন বাঙ্গালাতেও বই লিখিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে বিদ্যাকল্পদ্রুম বা 'এন্সাইক্লোপীডিয়া বেঙ্গলেন্সিস্' ছাড়া কোনটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।

পৃষ্ঠা ৯৮ পংক্তি ২৪—'লক্ষ্মণবর্জ্জন' পঠিতব্য।

কেদার গঙ্গোপাধ্যায় শেক্স্পিয়রের 'টেম্পেষ্ট' বাঙ্গালায় অল্প পদ্য সংবলিত গদ্য উপন্যাসের আকারে অনুবাদ করিয়াছিলেন 'ঝটিকা' নামে (১৮৭৮)। বইটির প্রথম অংশ 'সেক্স্পীয়রের জীবন-বৃত্তান্ত'।

পৃষ্ঠা ১০০ পাদটীকা ১

কাশীপ্রসাদের *Shair and Other Poems* ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ছাপা হয়। ইহাতে তাঁহার একটিমাত্র বাল্যরচনা ('Hope') স্থান পাইয়াছিল। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি গদ্য লিখিতে থাকেন। হিন্দু কলেজ হইতে বাহির হইবার পর (জানুয়ারী ১৮২৯) কাশীপ্রসাদ সংস্কৃত, ফারসী ও হিন্দি শিখিয়া লন। অত্যন্ত সংস্কৃত-ঘেঁষা বলিয়া কাশীপ্রসাদ শ্রীরামপুর-গোষ্ঠীর রচনার নিন্দা করিয়াছিলেন। তাহার ফলে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশনের কর্তৃপক্ষ বাইবেলের নূতন সংস্করণের কপি কাশীপ্রসাদকে দিয়া সংশোধন করিয়া লইয়াছিলেন। কাশীপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের কাব্যের কিছু অংশ ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন।

পৃষ্ঠা ১৪৩ পংক্তি ১৮—'বিশ্বমঙ্গল নাটক' পঠিতব্য।

পৃষ্ঠা ১৪৫ পংক্তি ৩৫—'মোহভোগ' পঠিতব্য।

পৃষ্ঠা ১৪৬ পংক্তি ৬—'কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের' পঠিতব্য।

পৃষ্ঠা ১৭২ পাদটীকা—বইটির নাম 'জ্যোতির্বিবরণ' (১৮৫৯)।

পৃষ্ঠা ২২০ পংক্তি ২৪—'বিজয়া' পঠিতব্য।

পৃষ্ঠা ২৬৩ পাদটীকা ১—'প্রবন্ধ-মঞ্জরী' পঠিতব্য।

পৃষ্ঠা ২৮৩ পংক্তি ২২—'রাধারমণ কর' পঠিতব্য।

পৃষ্ঠা ৩৩০ পংক্তি ২১

অমরেন্দ্রনাথ দুইখানি বড় গল্পও লিখিয়াছিলেন, নাম 'অভিনেত্রীর রূপ' ও 'আদর'। বিষয়বস্তুতে লেখকের আত্মজীবনীর ছায়াপাত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়

নির্ঘণ্ট

গ্রন্থকার

গ্রন্থ

বিবিধ